

ଆମାଦେରଗାନ୍ଧିଜୀ

ଶ୍ରୀଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାଲଧର

প্রবন্ধ :

শ্রীঅন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :

শ্রীবিভূতিকৃষ্ণ পাল

দস্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বাগমারী রোড

কলিকাতা

চিত্র মুদ্রন :

নিউ গ্যা আর্ট প্রেস

প্রকাশক :

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী

৯ আমাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ

গান্ধী-জন্মতিথি

আমি শীলোদ

স্ব. ক. শাকী

শ্রোতা-পদ-রেণু করো মন্তক-ভূষণ ।

তোমরা এ অমৃত নিলে সকল হবে শ্রম ॥

—কবিরাজ গোস্বামী

এই সংস্করণের বিক্রয়মূল্য থেকে এক হাজার টাকা বাংলার উপেক্ষিত

গান্ধী-মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য

কেউ বা ধনী, কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—

গরিব মেয়ে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,

আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল ।

ষণ্ঠা যখন আসে তেড়ে

উঁচিয়ে ঘুষি ডাঙা নেড়ে

আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,

‘ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো,

খোকাবাবুর ঘুম ভাঙানো,

ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে ।’

সিধে ভাষায় বলি কথা,

স্বচ্ছ তাহার সরলতা,

ডিল্লম্যাসির নাইকো অত্মবিধে ।

গারদখানার আইনটাকে

খুঁজতে হয় না কথার পাকে

জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে ।

দলে দলে হরিণবাড়ি

চলল যারা গৃহ ছাড়ি

যুটল তাদের অপমানের শাপ—

চিরকালের হাতকড়ি যে

ধুলায় খসে পড়ল নিজে,





আমাদের গান্ধিজী

আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগের কথা।

সিন্ধু ও বোম্বাই প্রদেশের মাঝে যে দেশটুকু আছে সেখানে অনেকগুলি ছোট-খাটো দেশীয় রাজ্য আছে, তাদেরই মধ্যে একটার নাম রাজকোট। রাজকোটের এক ইঞ্চুলে সেদিন বিশেষ গুরুত্বের ভাব,—ইনস্পেক্টার এসেছেন ইঞ্চুল দেখতে।

যাটার মশাইরা জন্ত, কোনো ক্রাশে কোনো ছেলের মুখে কোনো কথা নেই, হেড-যাটার মশাই বারান্দা দিয়ে মাঝে মাঝে ঘুরে যাচ্ছেন, যাটার মশাইরা ছেলেরাটিকে বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছেন,—ইনস্পেক্টার এলে কি ভাবে উঠে দাঁড়াতে হবে, প্রেরণা দিচ্ছিলো করলে কি ভাবে বলতে হবে, ইত্যাদি।

ছেলেরা দুই-মি ভুলে গেছে, বুকের ভিতর টিপ-টিপ করছে।

যথাসময়ে ইনস্পেক্টার আইলস সাহেব এসে পড়লেন। গটমট করে এসে তিনি ক্রাশে ঢুকলেন, বললেন—কোন ক্রাশ ?

—চতুর্থ শ্রেণী। এটা ইংরাজী পড়ার ঘটা।

—বেশ, তোমরা নিজের নিজের খাতায় পাঁচটা ইংরাজী শব্দ লেখ দিকি। বানান ভুল করো না কিন্তু।

ছেলেরা খাতা খুলে বলে, যাটার আইলস এক একটা শব্দ বলেন, ছাত্রেরা খাতায় লেখে। যাটার মশাই পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন, কেমন লেখা হচ্ছে।

সামনের সব কক্ষন ছেলেই ঠিক ঠিক লিখছে কিন্তু মোহনদাস যে শেষ কথাটি ভুল করে কেললো ‘কেটল’ (kettle) শব্দটিতে দুটো t আছে আর ও একটা t লিখে বলে আছে! এই একটা ছেলের একটা ভুলের জন্য, সমস্ত ক্রাশটির অধ্যাতি হবে। যাটার মশাই ছেলোটর পাশে এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু বলে দেবার তো উপায় নেই, ছুতোয় ডগা দিয়ে ইসারা করলেন—পাশের ছেলের খাতা দেখে ভুলটা শুধরে নাও। কিন্তু মোহনদাস নেহাৎ ভালো মানুষ, ইসারার অর্থ সে বুঝতে পারলো না। তার ভুল বানানই ইনস্পেক্টার সাহেবের সামনে ভুলে ধরলো।

মোহনদাস ছাড়া আর সবাইকারই ঠিক হয়েছিল। সেজন্য আইলস সাহেব অবশ্য কিছু বললেন না। কিন্তু তিনি চলে যাবার পর যাটার মশাই বললেন—তোমার বক্ত

আবাহের গান্ধী

বোকা ছেলে আমি জীবনে দেখি নি। অতো ইসারা করলুম তবু পাশের ছেলের খাতাটা দেখে শুধরে নিতে পারলে না।

আর্ট-নয় বছরের ছেলেটা মাথা হেঁট করে বহুনি ওনার পাশের ছেলের খাতা দেখে টুকতে পারে নি বলে তার মনে কিন্তু এতটুকু দুঃখ হোল না; দুঃখ হোল এই ভেবে যে, যে-খাতা আর সবাই জানে সেটা সে জানে না। সেদিন থেকে ইন্ডুলের বই পড়ায় সে আরো বেশী করে মন দিল।

ছেলে মানুষ তার উপর প্যাঠা বইও অনেকগুলি।

ভাল করে পড়া করতেই দিন কেটে যায়।

নীরল বই,—পড়তে মন বসে না, তবুও পড়তে হয়, আর সব সহপাঠীদের পিছনে তো পড়ে থাকা যায় না।

সকাল সন্ধ্যা মোহনদাস কেবল পড়ার বই পড়ে।

হঠাৎ একদিন চোখে পড়লো বাবা একখানি বই কিনে এনেছেন—‘শ্রবণের পিতৃভক্তি’।

হুঁ এক পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে গল্পটা বেশ জমে ওঠে। পৌরাণিক কাহিনী। অন্ধ পিতামাতার একমাত্র ছেলে শ্রবণ। বয়স নেহাৎ কম, কিন্তু সাধ্যমত বাপমায়ের পেরায় কোন জট করে না। সেই ছেলে বখন মারা যায় তখন তার বাপ-মায়ের হৃদয়ে চোখে আর জল রাখা যায় না। বইখানি শেষ করে বালক মোহনদাস কঁদে ফেলে। শ্রবণের মৃত্যুদৃশ্যটা চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে।

দিন কয়েক পরে এক চিত্রপ্রদর্শকের দল ঘুরতে ঘুরতে রাজকোটে এলো; ম্যাজিক-লিওনে ছবি দেখিয়ে তারা পরস্য রোজগার করে। ছেলেমেয়ের কাছে তখনকার দিনে অমন মজার ব্যাপার আর কিছু ছিল না। সবাই হৈ-হুঁ করে ছুটলো তাদের ছবি দেখতে।

মোহনদাসও একদিন তাদের ছবি দেখলো।

পৌরাণিক কত গল্পের কত ছবি তারা দেখালো, তার মধ্যে শ্রবণের পিতৃভক্তির কয়েকখানি ছবিও ছিল। সস্ত-পড়া গল্পটি তখনও তার চোখের সামনে ভাসছে, বালকের মনের কল্পনা সেই ছবিগুলির মধ্যে যেন প্রাণ খুঁজে পেল, বালক তন্ময় হয়ে গেল। একখানি ছবিতে দেখলো, শ্রবণ কাঁধে একটি বাক নিয়েছে, সেই বাকের দুধারে দুই ঝোলায় অন্ধ বাপ-মাকে বসিয়ে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছে, ছবিখানি মোহনদাসের

ভারী ভালো লাগলো। তারপরই এলো বৃত্তান্ত, চোখের জলে মোহনদাসের বুক ভেসে গেল।

তারপর কতদিন গেল। শ্রবণকে বালক ফুলতে পারলো না, পিতৃভক্তির কথা উঠলেই বালক অশ্রুমনস্ক হয়ে যায়, পড়ার বইয়ের পাতার উপর ভেসে ওঠে শ্রবণের মুখ, কানে এসে বাজে শ্রবণের বাণ-মায়ের করুণ বিলাপ। বাবা একটা কনসার্টিনা কিনে দিয়েছিলেন সেইটি নিয়ে কখনো কখনো এক। বসে বালক বাজাতো সেই করুণ বিলাপের স্বর।

ছোট নগরটির বুকে একদিন সাড়া পড়ে গেল,—এক যাত্রার দল এসেছে, গীতাভিনয় হবে!

তখনকার দিনে যাত্রা হওয়াটা মোটেই সাধারণ ব্যাপার নয়। নগর-শুভ্র লোক ভেঙে পড়লো যাত্রার আসরে।

বাড়ীর লোকদের সঙ্গে বালক মোহনদাস গেল দেখতে। কোথা দিয়ে কখন যে রাত কেটে গেল টের পেল না। হরিশ্চন্দ্রের নির্ভা, রোহিতাশের বৃত্ত, শৈব্যার দ্বন্দ্ব তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, কতবার যে সে চোখ মুছেছে তার হিসাব নেই। যাত্রা বখন ভাঙলো তখনও তার চোখের কোলে অশ্রুর ছাপ। ঊষার আলোর যাত্রার আসর থেকে সে বখন উঠে এলো তখন শুধু একটিনাত্র অহুসৃষ্টি তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—শুধু একটা কথার জন্য হরিশ্চন্দ্র কত দ্বন্দ্ব শেল, কত সত্য থেকে টললো না। রাজ্য, টাকা-পয়সা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবের চেয়ে সত্য বড়। তারও যদি এমন একটা রাজ্য থাকতো তাহলে সেও একবার হরিশ্চন্দ্র হবার চেষ্টা করতো।

স্বাম্যশে শোন। আর একটি গল্প বালক মোহনদাসের মনে দাগ কাটে, হরিশ্চন্দ্রের মত ঝাঁকে চণ্ডাল সাজতে হয়নি, সহজ সত্যকে যিনি সরলভাবে প্রকাশ করেছিলেন, অস্ত্রায়কে অস্ত্রায় বলতে তাঁর বাধে নি, কোন শাস্তি তাঁকে নত করতে পারে নি—সে ভক্ত প্রহ্লাদ।

আর রাজা রামচন্দ্র। পিতার সত্যপালনের জন্য চৌক বছর বনে যেতে স্বিধা করলেন না। যেদিন রাজা হবেন সেইদিনই বনে চলে গেলেন। সত্যপালন তাহলে রাজা হওয়ার চেয়ে বড়।

বালক মোহনদাসের মনে সত্য-অহুসৃষ্টির উদ্বেগ ঘটলো সেইদিন থেকে।

সত্যনিষ্ঠা তার বাবার ততো কম নেই। অস্ত্রায়ের প্রতিবাদ করে জেলে যেতেও তিনি ভয় পান নি।

আবাদের গাঙ্গী

পলিটিক্যাল এজেন্টের এক কর্মচারী রাজকোটের রাজা ঠাকুরকে অপমান করেছিল। মোহনদাসের বাবা করমচাঁদ তখন ছিলেন রাজকোটের দেওয়ান, তিনি লোকটিকে তখনই রীতিমত ধমকে দিলেন। লোকটা ভয়ে গিয়ে পলিটিক্যাল এজেন্টকে কি বোঝালো কে জানে, এজেন্ট হুকুম দিয়ে দেওয়ানেরই অস্তায় হয়েছে, তাঁকেই মাপ চাইতে হবে।

কাবা গাঙ্গী ছিলেন ভারী তেজী লোক, নির্ভয়ে তিনি উত্তর দিলেন—কখনো না। আমি কোন অস্তায় করিনি।

সেক্ষেত্র রাজ্যের উপর পলিটিক্যাল এজেন্টের কথতা অসীম, রাজকোটের দেওয়ানকে তিনি জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কাবা গাঙ্গী জেলে থেগেন তবু মাপ চাইলেন না।

তাকেও দ্বিধা তার বাবার মত হতে হবে—অস্তায়কে স্বীকার করা চলবে না। জীবনে কখনো অস্তায়ের কাছে মাথা নোয়াবেন না।

যা সেবার প্রতিজ্ঞা করলেন সূর্য্যদর্শন না করে তিনি থাকেন না। বর্ষাকাল, এইমাত্র সূর্য্য দেখা গেল, আবার এখনি মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। খাবার সময় আকাশের পানে তাকিয়ে তারা বসে আছে—সূর্য্য একবার দেখা গেলেই মাকে গিয়ে খবর দেবে। সারাটা দুপুর বসে থেকে থেকে হয়তো এক সময় সূর্য্য দেখা গেল, ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনতে আনতে আবার মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল, সন্ধ্যা অবধি আর সূর্য্য দেখা গেল না, সারা দিন মায়েরও খাওয়া হোল না।

পর পর অমন হয়তো তিনদিন কেটে গেল। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে। মাকেও তিনদিন উপবাসে থাকতে হোল।

এও এক ধরনের সত্য পালন। দেবতার উদ্দেশে নিজের চিন্তাশক্তি।

বিকাল বেলা মায়ের সঙ্গে মোহনদাস কোন কোন দিন যায় বিষ্ণুমন্দিরে, কোন দিন বা বাবার হাত ধরে যায় রিবেকরের মন্দিরে। সেখানে লাখা মহারাজ নিত্য সন্ধ্যায় তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করেন, তাঁর মিষ্টি গলা গানের শ্রবণ মত শ্রবিত হয় :

রঘুপতি রাঘব রাজারাম

পতিত পাবন সীতারাম

পিতার পাশে বসে বসে সে রামায়ণ পাঠ শোনে। মাঝে মাঝে বালক বোঝে না। সুমিষ্ট কণ্ঠ তার মনকে প্রভাবিত করে রাখে। মহারাজের মুখের পানে সে

আবাহনের পাঁচিল

তাকিরে থাকে : স্বপ্নের দুর্ভাগ্য বাহবা, ছেলেবেলায় নাকি এঁর ভূঁই হয়েছিল। হাত পা কত হচ্ছে, বল পড়ছে, বস্তু পড়ছে, আবাহীর বন্ধুরা দু'পাশে গলে আছে। ভাঙার সময় অসাধ্য এ রোগ একবার ধরলে আর বন্ধ নেই। কত লোক কত কথা বললে, লাখা মহারাজ কিন্তু একটুই বিচলিত হলেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার ডাক। বিশ্বেরের বন্ধিরে এসে যাবের উপর প্রসারী বেদগাতার লাগান আর রাম নাম জপ করেন। বেদগাতার মধ্যে কি ছিল কে জানে, বীরে বীরে যা উঠতে লাগলো, লাখা মহারাজের হৃৎ সেরে গেল। কঠোর কতটুকুনি পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে মিলিয়ে গেল তাঁর সেই থেকে। তাঁর যে কোন মিন হুঁই হয়েছিল এখন আর জা বসে হয় না।

লাখা মহারাজের মুখের পানে তাকিরে মোহনদাস সেই সব কথাই জাখে। বাড়ী ফিরে বাড়ী বন্ধা বাসীর কাছে কথা জুললে তিনি বললেন—রাম নাম জপ করলে অমনি হয়। দেবতার নামের কাছে কি আর ভাঙার বস্তি বলে কিছু আছে? অমনি কিছুই কি, রামনাম করলে ভূত প্রেত শুদ্ধ পালায়।

ভূত প্রেতের ভয় মোহনদাসের খুব বেশী, সময় অসময় ভয় পেলেই সে রামনাম জপতে শুরু করে।

পাঠশালার পড়া শেষ করে মোহনদাস হাই-স্কুলে ভর্তি হলেন।

ভাল ছেলে : এক বছর পুরস্কার পেলেন, দু'বছর বৃত্তি পেলেন, দু'মাসের মধ্যে এক বছরের পাঠ শেষ করে ডবল প্রমোশন পেলেন একবার।

কিন্তু অমন ভাল ছেলেরও মুন্সিল হোল, জ্যামিতি আর সংস্কৃত নিয়ে।

জ্যামিতি পড়ানো হয় ইংরাজীতে, ক্লাশে মাষ্টার মশাই তো দিবা বুঝিয়ে দিয়ে বান, তখন বুঝতে কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু নিজে পড়ার সময়েই যত গোলমাল, সবই যেন ঘুলিয়ে যায়। তার উপর ক্লাসে পড়া দেবার সময় বলতে হয় ইংরাজীতে। জাগাগোড়া মুখ না করে উপায় নেই। একটির পর একটি প্রতিজ্ঞা পাশ হয়, মোহনদাস ভাবেন কত মুখস্থ করতে হবে, শেষ অবধি কি সমস্ত বইখানিই মুখস্থ করে নাকি। তাবলে একেবারে আশাও ছাড়েন না, যতটা সম্ভব জেনে রাখেন।

জ্যামিতি পড়ানো হয় ইংরাজীতে, মাথা খুলে যায়, দেখেন অতি সাধারণ মুক্তি দেওয়া, এ তো অতি সাধারণ জিনিস থেকে আর তাঁকে মুখস্থ করতে হয় না, জ্যামিতি জলের যত সহজ হয়ে যায়।

জ্যামিতির সবস্তু তো মিটলো, কিন্তু সংস্কৃত। নতুন শব্দরূপ, শব্দরূপ, শব্দ।

আমাদের পাকিস্তান

মশায়,—কত মুখস্থ করবেন ? তার উপর পণ্ডিতমশাই বসে আছেন লোক, পড়া না হবে আর রক্ষা নেই !

সংস্কৃতের বদলে ফার্সি পড়া চলে,—এতো মুখস্থ করবার হাঙ্গামা নেই, মৌলবী সাহেব বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, পড়াও দেন কম করে ।

মোহনদাস সংস্কৃত ছেড়ে ফার্সি ক্লাশে গিয়ে যোগ দিলেন ।

মোহনদাস ফার্সি ক্লাশে যাচ্ছে পণ্ডিত মশাইয়ের দৃষ্টি এড়ায়নি, পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডে সেদিনই মোহনদাসকে ডেকে বললেন—বাবা, তোমার বাবা দেওয়ানজী পরম বৈষ্ণব । আর সংস্কৃত আমাদের দেবভাষা, হিন্দুধর্মের যত কিছু শাস্ত্র সব সংস্কৃতেই লেখা । অমন বৈষ্ণবের সন্তান হয়ে সামান্য পরিশ্রমের ভয়ে তুমি নিজের ধর্মের ভাষাটাই ছেড়ে দেবে ? যেখানে যখন কঠিন লাগবে আমাকে বলবে, আমি যদি তোমাকে না শেখাতে পারি তখন অল্প কথা । দেখনা কদিন চেষ্টা করে, তারপর ফার্সি তো আছেই !

কঠোর পণ্ডিত মশায়ের কাছে এমন সিদ্ধ নেহ মোহনদাস আশা করেন নি, বড় লজ্জা পেলেন ।

পণ্ডিত মশাই বললেন—এখন গোড়ার দিকে হয়তো একটু কঠিন লাগছে, কিন্তু এর ভিতরে প্রবেশ করলে দেখবে এমন মিষ্টি ভাষা আর নেই !

পরদিন থেকে মোহনদাস আর ফার্সি ক্লাশে গেলেন না, পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডের কাছে বীতিমত সংস্কৃত পড়তে শুরু করে দিলেন ।

বছর তেরো বৎসরে মোহনদাস বিড়ি খাওয়া শুরু করলেন । বন্ধুবান্ধবের কুসংসর্গে মিথ্যে নয়, কিশোর চিন্তের চপলতার খেলায় ।

কাকা সিগারেট খান,—এক মুখ ঘোঁরা কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে মাথার উপর, তাঁরও ইচ্ছা করে তিনি অমনি করে ঘোঁরা ছাড়েন, গোলাকার ঘোঁরাগুলো ধাক্কা খায় কড়িকাঠের গায়ে । কিন্তু সিগারেট পান কোথেকে ? সিগারেট কিনতে ভোতা পরল চাই !

অন্তরক এক বছর কাছে কথাটা পাড়তেই সে বললো—কাকাবাবু খেয়ে সিগারেটের টুকরাগুলো কেলে দেন সেগুলো হুড়িরে নিয়ে রেখে—আমরা সেগুলো খাব !

বন্দ্যু মুক্তি নয়, কাকাবাবুর কেলে-দেওয়া সিগারেটের শেবটুকু নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ক'দিন খুশখান চললো ।

জীবনের প্রতিশ্রুতি

কিছু লে কড়কু! 'আলো' করে, 'বোমা' ফেরাব না। 'আলো' করে 'বোমা' ফেলে হলে, বড় সিঁচায়েট কিনে বেঁচে হবে। কিন্তু পরশা!

বাড়ীর চাকরদের পকেটে খুঁজা পরশা থাকে। সবসময় 'আরই' ই-একটা চুরি রে বিড়ি বা সিঁচায়েট কিনে বাতাসা ভাসতে থাকলো।

কিছু যুগল হোল বিড়ি সিঁচায়েট শুকিয়ে রাখার বড় আকুসা দেখানো নেই। ফলের কাছে পরশা থাকে, বিড়ি কিনতে পারে, খেতে পারে, শুকিয়ে রাখতে পারে, এর বড় কড়াকড়ি লব কি এই ছোটদের বেলা।

না। এভাবে আর জীবন চলে না, এ জীবন রেখে কোন লাভ নেই।

হ্যা, তারা আত্মহত্যাই করবে। তারা 'হু' বহু হুঁতরো হুলের বিড়ি রেখে দেবে।

জবল থেকে ডুবনে হুঁতরোর বিড়ি সংগ্রহ করলো সান্নাশিরি বলে, তারপর ছায়েলো ফেরারীর যাকিরে গিরে এলীশে বি বিয়ে ঠাকুরকে শেষ প্রবাস জানালো। হুঁতরোর বিড়িগুলি নিয়ে বহলো এটিমনিরেক এক কোণে। খুঁজা একটা করে বিড়ি হুঁতে হুঁতরো হুঁতরো।

কিছু বীজ। খেতে বিড়ি করে। জিনিসে সান্নাশিরি করে বীজ একটা করে বীজ—সান্নাশিরি বিড়ি রাখার বড় তার আত্মহত্যা করবে। বীজের কাছে বিড়ি নেই। বড় হলে তো অনেক বিড়ি সিঁচায়েট বাতাসা থাকে, এমন মাই-বাওরা হোল।

স্বার বিড়ি বাতাসা ভাসলো না। পকেট থেকে বিড়িগুলি ফেলে দিলে তারা বান খেতে উঠে পড়লো। সান্নাশিরি হুঁতরো এলো বানবীর যাকিরে। ঠাকুরকে প্রবাস ই-এতিজা করলো—বিড়ি আর বাতাসা, আর বড় আত্মহত্যা করার হুঁতরো বড় কার আর করলো না।

খম্বা বেশ হাসুকা হয়ে গেল, মোহনবান বাড়ী কিনে আরো।

এই সময় বাড়ীতে বিয়ের দুই সপ্তাহে গেল।

এক রকম জিনিস দিয়ে। বনামসমসেব, তার বেলায় বড় বড় বড় বড় হুঁতরো হুঁতরো।

কিন্তু পর দিন বড় হুঁতরো হুঁতরো—বীজের কাছে সিন্ধু করা হুঁতরো, আর বন মোহন হুঁতরো, কি কি হুঁতরো হুঁতরো, ইত্যাদি।

আবাবের শাস্তি

মোহনদাসকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেন—কোথায় কখন কখন ব্যবহার করতে হবে।

সময়-অসময় বাড়ীর ঘেরেরা একাধারে গান শুভে যেন, প্রতিবেশীদের শাস্তি ভয় হচ্ছে সেদিকে তাঁদের খেয়াল থাকে না।

বাবা ও কাকার বয়স হয়ে গেছে, এইটাই তাঁদের শেষ কাজ, কাজেই বুঝামের আর অস্ত থাকে না। বিয়ের কয়েকটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, মোহনদাস তা জানতেও পারেন না। হাতের কাছে খেলবার মত এক সন্নিধী পেয়ে মনটা খুসি হয়।

কদিন পর থেকে আবার রীতিমত পড়াশুনা শুরু হয়।

মোহনদাস সেবার সপ্তম যানে উঠেছেন।

ইন্সুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, দোরাবজী এডল্‌জি গিমি। ছেলেদের স্বাস্থ্যের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে উচু ক্লাশে যত ছেলে পড়ে সবাইকেই বিকালে খেলার মাঠে হাজির হতে হবে। হয় খেলা, না হয় ব্যায়াম—একটা কিছু না করলে শরীর মজবুত হবে না।

বিকাল চারটার সময় ইন্সুলের মাঠে ছেলেদের নাম ডাকা হয়। হাজির না থাকলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কৈফিয়ৎ শুনে হেডমাষ্টার মশাই যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলেই জরিমানা দিতে হবে—এক আনা বা দু-আনা।

মোহনদাসের একদিন জরিমানা হয়ে গেল।

খেলা-ধুলা কি ব্যায়াম করা মোহনদাস পছন্দ করতেন না সত্যি, তা বলে বাড়ীর মশাইকে ঠাকি মেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তবুও—

তখন মনিং ইন্সুল হচ্ছে, দুপুরে ইন্সুল হলে ছুটির পর একেবারে খেলার মাঠ হয়ে আসেন, কিন্তু মনিং ইন্সুল হলে আবার বাড়ী থেকে যেতে হয়। সেদিন দুপুরে মেঘে মেঘে আকাশ ছেঁয়ে ছিল, সময়টা ঠিক বুঝতে পারেননি, ঘড়িও ছিল না, বিকালে বেরতে দেবী হয়ে গিয়েছিল। মাঠে গিয়ে দেখেন অনেক আগেই খেলাধুলা শেষ হয়ে গেছে।

পরদিন হেডমাষ্টার মশাই ভো কৈফিয়ৎ চেয়ে বসলেন।

মোহনদাস সত্য কথাই বললেন, কিন্তু গিমি সাহেব তা বিশ্বাস করলেন না, জরিমানা করে দিলেন।

দু-এক আনা জরিমানা দেওয়াটা কিছু নয়, কিন্তু হেডমাষ্টার মশাই যে তার কথা

আখ্যায়িক

বিশ্বাস করলেন না, তাকে মিথ্যাবাদী বলে ধরলেন এই দুখটাই বড় হয়ে যাবে
বাকলো, সারাটা দিন নিজেকে বড় ছোট বলে মনে হতে লাগলো। যে অস্ত্র তিনি
করেননি তার জন্য তাকে সাজা পেতে হবে। কেবলই কারা পেতে লাগলো।

পরদিন মোহনদাস আবার হেডমাষ্টার মশাইকে সব কথা বললেন। গিমি সাহেব
মাফ হিলেন ভালো, এবার আর তিনি অবিশ্বাস করলেন না, বললেন—বেশ, তুমি
যখন বলছ, এবার না হয় তোমার অরিমানা মাগ করে দিলাম, কিন্তু এখন থেকে
সময় ঠিক রেখে চলবে।

আর কোন দিন মোহনদাসের মাঠে যেতে দেয়ী হয়নি।

সেই থেকে হোল সময়সুবিধিতার শিক্ষা।

মোহনদাস ভালো করে খেলতে পারতেন না, ভালোভাবে ব্যায়াম করতে পারতেন
না, সব সময়েই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন।

কারুর সঙ্গেই ভালো করে ভাব জমাতেন পারতেন না, বন্ধ ছিল নেহাৎ কম।

একটা বন্ধ ছিল ভারী দুই,—বিড়ি খেতো, মাংস খেতো।

বড়দা বলতেন—মোহন, ওর সঙ্গে মিশো না, ও ছেলে ভালো নয়।

মা বলতেন—মোহন ওর সঙ্গে তোমার না মেশাই ভালো।

মোহন হেসে বললেন—তোমরা কিছু জোবো না মা, কদিনের মধ্যে আমিই ওকে
গুপ্তে দিচ্ছি, দেখো—

কিন্তু তার মন বদলাবে কি সে-ই মোহনদাসের মন বদলে দিল। বন্ধুটী প্রায়ই
বলতো—দেখ ভাই, খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে ধর্মকর্মের কোন যোগ নেই। রীতিমত
যদি মাংস খেতে না পার তাহলে শরীর মজবুত হবে না, মনের বল বাড়বে না।
জান তো কবি নরদ বলছেন :

দেখ ভাই, ভীমের মত ইংরাজের ছেলে

কীণ দেহী ভারতীয়ে শাসে অবহলে

পাঁচ হাত দীর্ঘ বপু তাদের আকার

মাংসাহার একমাত্র কারণ তাহার।

বন্ধুটী বল—দেখ ভাই, যদি ইংরাজের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে চাও,
তাহলে মাংস খেয়ে আগে ওদের মত গায়ে জোর কর, তবে তো মারামারি করতে
পারবে, তবে তো সাহস বাড়বে।

—মাংস খেলে সাহস বাড়বে ?

আবাহের গান্ধিজী

—নিশ্চয়। দেখ না, সাহেবগুলোর কি সাহস!

এই সাহসের কথার মোহনদাসের মনে আর বিশ্বাস থাকে না। ভয় বেচারার সঙ্গেই সাধী। আলো নিবিয়ে রাজ্যে গুতে পারে না, অন্ধকার হলেই মনে হয় এখনি বুঝি ষাটের নীচে থেকে ভূত বেরবে, হয়তো বা পাশের জানালা দিয়ে লম্বা হাত বের করে চোরে কখন গলা টিপে ধরবে, কোন এক সময় একটা সাপ এসে গুয়ে থাকবে বিছানার পাশে। মনটা ছ্যাং ছ্যাং করতে থাকে, ঘুম আর আসে না। আর মাংস খাওয়া অভ্যাস করলে, এই সব ভয় আর থাকবে না! শুধু সাহস আর সাহস!

তখনই মোহনদাস মাংস খেতে রাজী হয়ে গেলেন।

সেইদিনই বিকাল বেলা বন্ধুটী সব ব্যবস্থা করে ফেললো। নদীর ধারে নিরিবিলিতে বসে কক্ষনে মিলে মাংস আর পাউরুটি খাওয়া হোল।

কিন্তু মাছ মাংস খাওয়া তো আর অভ্যাস নেই, মনের মাঝে কেমন বেন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো, স্বপ্ন দেখলেন: ছাগলের মাংস হজম হয়নি, ময় ছাগলটা তার পেটের মধ্যে বেঁচে উঠেছে, কল্পনায় আর্তনাদ করছে!

ঘুম ভেঙে যায়, মনটাও খারাপ হয়ে যায়, সারা রাত আর ঘুম হয় না।

কিন্তু মনের এই বিকার স্থায়ী হয় না, সাহসী হবার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হয়ে ওঠে। বন্ধুটির সঙ্গে আবার একদিন মাংস খাবার আয়োজন হয়। এবার তবে আর নদীর ধারে নয়, এবার এক বড়লোকের বাড়ীতে দিব্যি সাজানো হলঘরে ডাইনিং টেবিলে বসে মাংস-ভোজন চলে।

এবার আবার প্রথমবারের মত মনে বিকার আগে না।

বার করেক খেতে খেতে বেশ অভ্যাস হয়ে যায়। পাঠার কথা আর মনে ওঠে না, মাংসটা কেমন রান্না হোল সেই কথাই ওঠে।

মুষ্কিল বাধে কিন্তু বাড়ীতে। বিকালে পেট ভরে মাংস খেলে, খাচ্ছে তো, আর কিছু খাওয়া চলে না, বাড়ী ফিরে মোহন মাকে বলেন—আজ আর কিছু খাব না মা, ভালো থিদে হয়নি।

মায়ের কাছে এমনি মিছে কথা বলতে হয়—হু-একবার নয়, বারবার।

সে রাজ্যে গুয়ে গুয়ে ভাবেন, শ্রবণের পিতৃভক্তির কথা, ভাবেন হরিশচন্দ্র কখনও মিথ্যাকে আশ্রয় করেন নি। তাঁদেরই আদর্শে তিনি নিজেকে গড়ে তুলতে চান, অথচ মায়ের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছেন দিনের পর দিন।

সারারাত মোহনের চোখে ঘুম আসে না। গুয়ে গুয়ে শুধুই ভাবেন। দুবছর আগের বিড়ি খাওয়ার কথাটা তার মনে আগে, তখন তো এমন ভাবে দিনের পর

আমাদের বাড়ি

দিন বাপমায়ের কাছে মিছে কথা বলতে হয়নি, কিন্তু বাসে খাওয়ার ভাত আর তা হচ্ছে। বিড়ি খাওয়াটা অতো সহজে ছেড়ে দিলেন, আর আজ বাসে খাওয়াটা ছাড়তে পারবেন না? অন্যায়কে জয় করতে পারবেন না?

মোহনদাস মন স্থির করে ফেললেন। পরদিনই কিছুটিকে জানিয়ে দিলেন—আর আমি বাসে খাব না।

এক কথায় বাসে খাওয়া বন্ধ হোল বটে, কিন্তু অতো সহজে জের মিটলো না। এই সব ব্যাপারে মেজদার ধার হয়ে গেছে প্রায় পঁচিশ টাকা, সেই ধার এখন শোধ হয় কিসে? জলপানির পয়সা জমিয়ে এতো গুলো টাকা তো কোনদিনই শোধ করা যাবে না। এদিকে হোটেলওলা প্রতিদিনই তাগিদ দিচ্ছে—টাকাটা এবার শোধ করে দাও?

মেজদার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।—কি করবেন? কি করলে দেনা শোধ হবে? বাড়ী থেকে চাইলেই তো সব জানাজানি হয়ে যাবে। তাহলে?

মেজদার হাতে একটা সোনার তাগা ছিল, ঠিক হোল তা' থেকে দরকার মত কেটে নিয়ে, বিক্রী করে, দেনা শোধ করা হবে?

তু'ভাই স্রাকরার দোকানে ছুটলেন।

তাগা কেটে ঋণ শোধ হোল।

ঋণ মুক্ত হলেন বটে কিন্তু মোহনদাস মনে শান্তি পেলেন না; তাঁর মনের মাঝে কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো,—খুবই অগ্রায় করা হয়েছে, তিনি বাপ মায়ের স্নেহের অপমান করেছেন। শ্রবণ বা হরিশচন্দ্র কখনও এমন করতেন না।

নাঃ, বাপ মায়ের কাছে কোন কিছু লুকানো ভালো নয়। বাবায় কাছে সে সব কথা বলবেন। কিন্তু বাবায় সামনে এতো কথা বলবেন কেমন করে? বাবা একবার মূখের পানে তাকালেই তো সব গোলমাল হয়ে যাবে। বাবা অবশ্য কোনদিনই গ্রহণ করেননি, এখন যে গ্রহণ করবেন, তাও তো মনে হয় না। তবু—

মোহনদাস এক লম্বা চিঠি লিখে ফেললেন।

শেষে লিখলেন—আমি আপনার কাছে কমা চাইছি। এমন কাজ আর কখনও করবো না। এর জন্য আপনি আমাকে যে শাস্তি দেবেন, তাই আমি মাথা পেতে নেব।

চিঠিখানি হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে মোহনদাস পিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

স্বাধীনতার স্বপ্ন

কাবা গান্ধীর তখন অস্থখ, বিছানার স্তরেছিলেন। মোহনদাস চিঠিখানি তাঁর হাতে দিলেন।

চিঠি পেয়ে কাবা গান্ধী বিস্মিত হয়েছিলেন, পড়তে পড়তে তিনি উদ্বেজিত হয়ে বিছানার উপর উঠে বসলেন। মুখের রেখার রেখার ছুটে উঠলো ব্যাকুলতা, ব্যাকুলতা রূপাকবিত্ত হোল বিরক্তি ও ক্রোধে, শেষে তিনি বেন সাহসে খুঁজে পেলেন। ক্রুদ্ধিতে বিদ্ধ হয়ে উঠলো তাঁর মুখ, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন, চোখের কোলে জল টলল করে উঠলো। একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করলেন না, চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেললেন।

পিতাকে মোহনদাস কোনদিন এমন রূপে দেখেননি। ক্রোধের কোন কারণ ঘটলে উদ্বেজনার যে মাহুঘটা মাটিতে মাথা ঠুঁকে কপাল ফুলিয়ে ফেলেন, পুত্রের এতো বড় অপকর্মের জন্য তিনি কি বিধান দেবেন, কে জানে! সম্ভব মনে মোহনদাস এতক্ষণ পিতার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু পিতা যখন কিছুই বললেন না, তখন মোহনদাস বুঝলেন পিতা সত্যনিষ্ঠাকে কত দূর ভালবাসেন,—ব্যক্তিগত লাভ কতির উপর তিনি সত্যকে স্থান দিয়েছেন, সেইজন্যই বোধ হয় কয়েক বছর আগে পলিটিক্যাল এজেন্টের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার সাহস তাঁর হয়েছিল। শ্রদ্ধায় মোহনদাসের মন ভরে গেল।

মোহনদাসের মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে পিতার অস্থখ ক্রমশঃ বাড়ছে।

খেলাধুলার মাঠ থেকে ছুটি নিয়েছেন, ইন্স্কুল থেকে ফিরেই বরাবর এসে বসেন বাবার কাছে।

রাত দশটা এগারোটা অবধি পিতার বিছানার পাশেই কাটান। কখনো মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, কখনো পা টিপে দেন, কখনো বা হাত টেপেন।

করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

একদিন রাত এগারোটার সময় বেচারী মোহনদাস সবেমাত্র নিজের ঘরে এসে শুয়েছেন, এখন সময় চাকরটা ছুটে এলো—গোকাবাবু, শিগুগির আহন, কর্তা কেমন করছেন।...

মোহনদাস ছুটে গেলেন। পিতা তখন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। অল্পকণ পরেই তিনি দেহত্যাগ করলেন।

শোকের প্রথম আঘাতে কিশোর মোহনদাস মুহুমান হয়ে পড়লেন। কারণ—অকারণে মনে উঠতে লাগলো কত ছোট ছোট ঘটনা, কত টুকরো টুকরো কথা।

আব্বাসের বাড়ী

মনে পড়লো পোষকঘরে পিতার হাত ধরে কিছু-বন্ধিরে ও দায়ী-বন্ধিরে বেড়ানো।
 বিবেচনের বন্ধিরে পিতার কোলের কাছটিতে বলে লখা মহাদায়কের রামায়ণ পাঠ
 লোনা,—আরো কত কি।

কিন্তু সব কিছুই পড়ে যায়, মহাকাল বিশ্বস্তির আচ্ছাদন চোরে দেব মান।
 আব্বাসের শান্ত হয়ে আসে কখন। বীরে বীরে আব্বাস আত্মহীন কান্না হুক হয়।

বছর ছয়েক পরে মোহনদাস প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন।

তখনকার দিনে সব আব্বাস পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল না, কাথিয়াবাড়ের ছাত্রদের
 যেতে হোত আমেদাবাদে।

মোহনদাসকেও আমেদাবাদে আসতে হয়েছিল।

রাজকোট থেকে আমেদাবাদ প্রায় দেড়-শো মাইল পথ। এতটা পথ মোহনদাস
 কোন দিন একা যান নি, কিন্তু এবার যেতে হোল। অল্প সময় হলে হয়তো কেউ
 সঙ্গে যেত, কিন্তু এখন পয়সার বড় টানটানি কাছেই—

আঠারো বছরের ছেলেটা একক যাত্রাপথে শক্তিত হয়ে উঠেছিলেন সত্যি, কিন্তু
 যেতে যখন হবেই, তখন আর ভেবে লাভ কি।

কয়েকটা দিন কোন রকমে আমেদাবাদে কাটিয়ে মোহনদাস বাড়ী ফিরলেন।

পরীক্ষা ভালই হয়েছিল, মোহনদাস ভালো ভাবেই পাশ করলেন।

এবার কলেজে পড়ার পালা।

মোহনদাস ভবনগরের শ্রামলদাস কলেজে ভর্তি হলেন।

রাজকোট থেকে ভবনগর অনেক দূর, কিন্তু কাছাকাছি আর তো কোন কলেজ
 নেই।

কিন্তু কলেজে পড়া বেশীদিন চলে না। পিতৃবন্ধু যাজ্ঞজী দবে একদিন বলেন—
 কলেজে পড়ে কি হবে? চার বছর পড়ে বি-এ পাশ করে একটি বাট টাকা
 মাহিনার কেরানী হ'বে তো? না হলে আরো দু'বছর পড়ে একটা উকিল হবে।
 তার চেয়ে মোহনকে বিলাতে পাঠিয়ে দাও, ব্যারিষ্টার হয়ে আয়ুক। বছর
 তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসবে। হাজার চার পাঁচ টাকা খরচ হবে বটে, কিন্তু
 রাজগারের জন্ত ভাবতে হবে না। দেওয়ানের ছেলে একবার বিলাত থেকে ঘুরে
 এলে কাথিয়াবাড়ের যে কোন রাজ্যে একটা দেওয়ানী জোটাতে কোন কষ্ট হবে না।
 •ওকে এই বছরেই বিলাতে পাঠাও।

দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—কি মোহন বিলাত বাবি?

আমাদের বাড়ী

মোহনদাস বললেন—বাবো, কিন্তু ওখানে ওকালতি না পড়ে ডাক্তারী পড়া যায় না ?

দাদা বললেন—বাবার একান্ত ইচ্ছা ছিল তুমি আইন পড়। বৈকালের ছেলে ডাক্তারী পড়তে গিয়ে মড়া চিরবে এ তিনি পছন্দ করতেন না।

যাভজী বললেন—ডাক্তারী পড়লে তো আর দেওয়ানী মিলবে না। ব্যারিষ্টার হয়ে কিরলে দেওয়ানী, কি ওই ধরনের একটা কোন বড় চাকরী মিলতে পারে, তাতে সংসারের এতোগুলো লোকের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ খানিকটা লাঘব হবে তো।

দাদার মনে লাগলো, সেই দিনই মায়ের কাছে কথা পাড়লেন—মোহনকে বিলাত পাঠালে কেমন হয় ? যাভজী বলছিলেন...

সব শুনে মা বললেন—তোমার কাকাবাবু রয়েছেন পোরবন্দরে, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা ভালো না ?

মায়ের কথা মত পরদিনই মোহনদাস পোরবন্দর বাতী করলেন। তখনও ওখানে রেলগাড়ী হয়নি, গরুর গাড়ীতে পাঁচ দিনের পথ, অর্ধেক পথ গাড়ীতে এসে বাকী অর্ধেক উটের পিঠে পার হলেন।

দাদা বলে দিয়েছিলেন—ঠাকুরদা ও বাবা ছিলেন পোরবন্দরের দেওয়ান, ওই রাজ্য থেকে কিছুটা সুযোগ সুবিধা পাবার দাবী আমাদের আছে। কাকাবাবুর সঙ্গে পোরবন্দরের এডমিনিষ্ট্রেটর সাহেবের সঙ্গে খুব খাতির আছে। কাকাবাবু তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেই বিলাতে পড়ার খরচটা ওখানকার এষ্টেট থেকেই ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

কাকাবাবু কিন্তু বিলাত যাওয়াটা ঠিক পছন্দ করলেন না, বললেন—আমি কি বলবো। বিলাতে গেলেই দেখি সব স্নেহ হয়ে যায়। তবে তোমার মা অসুস্থ হয়ে মিলে তুমি যেতে পার, আমি 'না' বলবো না। আর ওই এডমিনিষ্ট্রেটর সাহেবের কাছে এই বুড়ো বয়সে আমি আর তোমার জন্য ভিক্ষা চাইতে পারবো না, তুমি বরং নিজে গিয়ে তার সঙ্গে একবার দেখা কর গে, সাহেব নাহুব ভালো, একটা কিছু সুবিধা তিনি করে দেবেন।

মোহনদাস সেই দিনই সাহেবের কাছে চিঠি লিখলেন।

সাহেব জবাব দিলেন—আমার বাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর। কথা হবে।

মোহনদাস সেইদিনই সাহেবের বাড়ীতে গেলেন।

নীচের অফিস-ঘরে কাজকর্ম সেরে লেলি সাহেব তখন উপরে উঠছেন, সিঁড়ির মুখে মোহনদাসকে ডেকে পাঠালেন।

বাঁচারে বাঁচিলী

বেচারী কাছে এসে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই বললেন—হ্যাঁ, তোমার কথা আমি সব শুনেছি, আসে বি-এ পাশ কর, তারপর এসো, এখন আমি তোমার জন্ত কিছুই করতে পারবো না।

সাহেব গটগট করে উপরে উঠে গেলেন। মোহনদাস স্তম্ভ হয়ে নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, কত আশা করে এসেছিলেন, কত কথা বলবেন বলে মনে মনে খসড়া করেছিলেন, কিন্তু একটি কথা বলারও ফুরসৎ সাহেব দিলেন না।

হতাশ হয়ে মোহনদাস রাজকোটে ফিরলেন।

মান্ডজী বললেন—না হয় ধার করে টাকার জোগাড় কর।

দাদা বললেন—যেভাবেই হোক টাকার জোগাড় আমি করবো।

যা কিন্তু তখনও থিখা করছেন। একদিন কথায় কথায় বললেন—বিলাতে পড়তে যাওয়া আমার কিন্তু ভালো মনে হয় না। শুনেছি ছেলেরা সেখানে গিয়ে মদ খায়, মাংস খায়, মোহনও তো তাদের মত হয়ে আসবে।

মোহনের তখন জিদ বেড়ে গেছে, বললেন—তুমি দেখো না, আমি কখনও সে রকম হব না।

মায়ের মন, ছেলেকে স্বপ্নের প্রবাসে পাঠাতে সহজে সম্মতি দিতে পারেন না, বললেন—দেখি একবার বেচারজী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করি—

বেচারজী স্বামী জৈন সন্ন্যাসী, গাঙ্গী-পরিবারের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়। সুখে-দুখে, সম্পদে-বিপদে সৎ নির্দেশ পাবার জন্য সকলেই বেচারজীর মুখের পানে তাকায়। সব শুনে বেচারজী স্বামী মোহনদাসকে কাছে ডাকলেন, বললেন—মায়ের সামনে আজ তোমাকে তিনটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে—বিলাতে গিয়ে মদ খাবে না, মাংস ছোঁবে না, আর মেম-সাহেবদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করবে না।

তখনই মায়ের পা ছুঁয়ে মোহনদাস প্রতিজ্ঞা করলেন, মায়ের মনে আর কোন সংশয় রইল না।

তখনকার দিনে বিলাত যাওয়া বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। রাজকোটের হাই স্কুলে হৈ চৈ পড়ে গেল—মোহনদাস বিলাত যাচ্ছে।

ইস্কুলের ছেলেরা এক সভা করলো।

সভার মাঝে মোহনদাসের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল, অনেক ভালো ভালো কথা বললো, শুভেচ্ছা জানালো সকলেই।

সভা শেষে ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু বলা দরকার, সেজন্য মোহনদাস ভৈরী হয়েই

আমাদের দাঁড়ী

এসেছিলেন। দাঁড়িয়ে উঠে পকেট থেকে একখানি লেখা কাগজ বের করে পড়তে শুরু করলেন—সমবেত সহপাঠী, বন্ধু ও ভ্রম্যহোদয়গণ...

এইটুকু পড়েই মোহনদাস থামলেন, একবার চোখ তুলতেই দেখেন সামনের সবাই তাকিয়ে আছে তার মুখের পানে। থর থর করে সারা দেহ কেঁপে উঠলো, মাথা ঘুরে গেল, লেখাটা আবার পড়তে গিয়ে কথা সব জড়িয়ে গেল, তোতলা হয়ে গেলেন। কি যে পড়ছেন তা নিজে ছাড়া আর কেউই বোধ হয় শুনতে পেল না। তা না পাক, কোন রকমে কাগজের লেখাটা শেষ করেই রূপ করে বসে পড়লেন, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

পরদিন মোহনদাস বোম্বাই রওনা হলেন।

তখন বর্ষাকাল। ভারত মহাসাগরে এই সময়টা ঝড়-ঝাপটার সময়। তার উপর ক'দিন আগে ঝড়ের মুখে পড়ে একখানি জাহাজ ডুবে গেছে। জানা-নোনা অনেকেই বললো—ক'দিন সবুর কর, আবহাওয়াটা একটু শান্ত হোক তখন যাবে। তাছাড়া এতটুকু ছেলে...একা একা...

কথাটা দাদার মনে লাগলো, স্বেচ্ছাচার প্রতীক্ষায় মোহনদাসকে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রেখে তিনি রাজকোটে ফিরে গেলেন।

ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের শ্বিগা-সমাজ একদিন মোহনদাসকে ডেকে পাঠালো, সমাজপতি শেঠজী বললেন—তুমি বিলাত যাচ্ছ বলে শুনলাম, সেখানে ওই সব কল্যাণ-দের সঙ্গে মেলামেশা করলে জাতধর্ম থাকে না, সেই জন্য আমরা তোমার বিলাত যাওয়া অনুমোদন করতে পারছি না।

মোহনদাস বললেন—মা'ও গোড়ায় ওই কথাই বলেছিলেন, আমি সেইজন্যে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি বিলাতে গিয়ে আমি মদ মাংস ছোঁব না।

—সে তুমি যতই বল—শেঠজী অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন—সেখানে একবার গিয়ে পড়লে ওসব কোন প্রতিজ্ঞাই টিকবে না, আমি অমন অনেক দেখেছি। সেইজন্যই তোমার আত্মীয় হিসাবেই বলছি, বিলাতে যাবার কোন দরকার নেই, ওই ইচ্ছা তুমি ত্যাগ কর।

—এখন আর তা হয় না, বিলাতে যাব বলেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। তাছাড়া পণ্ডিত মাভজী বলেছেন বিলাত যাওয়ার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। সাধু বেচারজীও তো অনুমতি দিয়েছেন...

—তা তাঁরা দিন, কিন্তু স্বজাতি ও সমাজেরও তো একটা যত আছে।

আমাদের দাদিমা

—কিন্তু আভির সঙ্গে আমার বিলাতে যাওয়ার বে কি সম্পর্ক আছে, তাত্তো বুঝতে পারছি না।

—এর কলে কিন্তু তোমাকে জাতিচ্যুত হতে হবে।

—কি করবো বলুন, এখন আমি নিরুপায়।

শেঠজীর চোখদুটি লাল হয়ে উঠলো, বললেন—বেশ, তাহলে আজ থেকে তুমি জাতিচ্যুত হলে।

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলকে এটুকুও জানিয়ে দিলেন—অজাতি কেউ এই বিলাতযাত্রী যুবকের সঙ্গে যোলাযেশা করলে, কোন ব্যাপারে মোহনদাসকে কোন রকম সাহায্য করলে তাকে পাঁচ সিকা জরিমানা দিতে হবে।

মোহনদাস কিন্তু এসবে ভয় পেলেন না। দাদাকে চিঠি লিখে জানালেন সব কথা।

দাদা জবাব দিলেন—কাকুর কোন কথায় কান দিও না, যাওয়া স্থির করে যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই যাবে।

মোহনদাসের আর কোন জুঁজবনা রইল না, এখন কবে জাহাজে চড়ে বসবেন সেই হোল চিন্তা।

হঠাৎ এক সন্ধ্যা মিলে গেল : এ্যাঙ্ক রায় মজুমদার নামে এক বাঙালী জুনাগড়ে ওকালতী করতেন, তিনি বিলাত যাচ্ছেন ব্যারিষ্টারী পড়তে।

কিন্তু তখনও মোহনদাসের টাকা এসে পৌঁছায় নি, চিঠি লিখে টাকা আনিয়ে নেবেন তারও সময় নেই। তাড়াতাড়ি এক আত্মীয়ের কাছে গিয়ে হাত পাতলেন—এখনকার মত কিছু টাকা আমাকে ধার দিন পরে দাদার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।

আত্মীয়টি ঘাড় পাতলো না, বললো—তোমাকে সাহায্য করে শেষে আমিও একঘরে হব ?

শেষে এক বন্ধু টাকা দিল, দুট কিনি দিল, জাহাজের টিকিট কিনি দিল।

মোহনদাস সাগরের বুকে ভেসে পড়লেন।

জাহাজ।

মজুমদার মশাই ছাড়া আর সবাই বিদেশী। মন খুলে কাকুর সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই,—কখন ইংরাজী ভাষার কোথায় কান্ ভুল হয়ে যায়।

মজুমদার মশাই বলেন—অমন লজ্জা পাবার কি আছে ? বিদেশী ভাষা, ভুল ভো হবেই, মনের ভাবটা বুঝিয়ে দিতে পারলেই হোল।

কিন্তু এই মনের কথা বোঝাবার জন্য মোহনদাস দিনরাত মনে মনে খসড়া করেন।

খাবারের দাঙ্গা

খাবার ঘরে বেতে গেলে হয় তো কারুর সঙ্গে ইংরাজীতে বেশীকথ কথ্য বলতে হবে, সেই ভয়ে মোহনদাস খাবার ঘরে অবধি যান না। ঘরে খাবার আনিয়ে একা একা খান।

একদিন এক ইংরাজ ডক্টর মোহনদাসকে জিজ্ঞাসা করে বললেন—কি কর ? কোথায় যাবে ? কারুর সঙ্গে আলাপ কর না কেন ? খাবার ঘরে তোমাকে দেখি না কেন ? ইত্যাদি...

মোহনদাস তো কোন রকমে উত্তর দিলেন—আমি মাংস খাইনা বলেই খাবার ঘরে গিয়ে বসি না।

ইংরাজটা হেসে বললেন—একবার ইউরোপে গিয়ে পৌঁছাও, তারপর দেখা যাবে। এমনি ঠাণ্ডা যে মাংস না হলে সেখানে একদিনও চলবে না।

মোহনদাস আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন—তেমন হলে সেখান থেকে চলে আসতে হবে। মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে মাংস আমি খাব না।

—দেখা যাবে !—বলে ডক্টর মোহনদাস হাসলেন অবিশ্বাসের হাসি।

কদিন পরে জাহাজ এসে লাগলো সাউদাম্পটন বন্দরে।

মজুমদার মশাইয়ের সঙ্গে মোহনদাস এসে উঠলেন লণ্ডনের ভিকটোরিয়া হোটেলে।

প্রকাণ্ড হোটেল, বিরাট ব্যাপার। অচেনা মানুষের ভীড় গিজগিজ করছে। অভিনব আদব কায়দা! অস্বস্তিকর পরিবেশ। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে। এখান থেকে কোথায় যাবেন তাই ভাবেন।

খবর পেয়ে ডাক্তার প্রাণজীবন মেহেতা এলেন দেখা করতে, বললেন—হোটেলে থেকে পড়াশুনা করার অনেক খরচ, কোন বাড়ীতে অতিথি হয়ে থাকলে খরচ অনেক কম পড়বে। সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।

কথায় কথায় মেহেতার টুপিটা মোহনদাস হাতে তুলে নিয়েছিলেন, ছেলেমানুষের খেলালে টুপিটার কালো রেশমের উপরে হাত বুলাচ্ছিলেন। পালিশ-করা কালো রেশমের মশফ ভর্জীটা হাতের চাপে রুক্ষ হয়ে উঠলো, ডাক্তার মেহেতা তাড়াতাড়ি টুপিটা হাত থেকে টেনে নিলেন, বললেন—এই যাত্রা বললাম কখনও কারুর জিনিষে হাত দিবে না, আর এখনই তুলে গেলে ? ভারতবর্ষের মত সহজ স্বচ্ছন্দে এখানে চলা চলবে না। জোরে কথা বললে লোকে হাসবে। পরিচয় হতে না হতেই আপনি কি করেন—কোথায় থাকেন, জিজ্ঞেস করলেই অভয় ভেবে লোকে পাশ

যে। কথার কথার 'জর' 'জর' বললে লোকের ভাববে বাজার বাজার চাকর।
আবাহার বেশে প্রাণখোলা ব্যবহারের সঙ্গে একে খোখাও মিলবে না।
মেহেতার উপদেশ মত মোহনদাস পরদিনই হোটেল হাউসে তার আত্মীয়দের
এক আহারের সহযোগী এক সিঁদী ভবলোক।

মেহেতর ডিকটোরিয়া হোটলে থাকার বরখ খরচ পড়লো তিন পাউণ্ড—প্রায়
চাল্লিশ টাকা। যে সব বাচ্চাংগের খাবার তিনি খাননি, বললে জানতে
লাছিলেন হোটেলের বিলে তারও দাম খরচ হয়েছিল।

বাক নতুন বাসায় তো উঠে এলেন, বেশ নিরিবিলি, কিন্তু বড় একা একা বলে মনে
হয়। হোটেলের ভীড়ের মধ্যে এমনভাবে নিজেকে উপলব্ধি করা যায়নি। অপরিচিত
রিবেশ, অজানা পথঘাট, অচেনা সব মুখ, ভিন্ন ভাষা। মন হাঁপিয়ে উঠে, কেবলই
ভীর কথা মনে পড়ে, মায়ের কথা মনে পড়ে। খেতে বললেই চোখে জল আসে,
দ্রোণে শুয়ে শুয়ে মোহনদাস কাঁদেন।

কিন্তু কান্দতে কান্দতে একদিন কান্না থেমে যায়, নতুন পরিবেশের সঙ্গে কিশোর
ক্রমশঃ পরিচিত হয়ে উঠে, মোহনদাস আশ্বস্ত হয়ে, মন দৃঢ় করেন—যত কষ্টই
কি না কেন, এখান থেকে তাঁকে বাতুল হয়ে ফিরতেই হবে, ব্যারিটার হতে হবে,
তার বা-ভাই-বোন তারই মুখের পানে তাকিয়ে আছেন যে।

ভাতার মেহেতার কিন্তু এ-বাড়ী পছন্দ হোল না। বললেন—না, এখানে থাকা
চলবে না, শুধু লেখাপড়া শেখার জগুই তো বিলাতে আসা নয়, বিলিতি আদম-
কায়দাও তো শিখতে হবে।

মেহেতা সেখান থেকে মোহনদাসকে নিয়ে এলেন রিচমণ্ডে এক পরিচিত ভব-
লোকের বাড়ীতে।

নতুন গৃহস্থানী চমৎকার ভবলোক, মোহনদাসকে তিনি দেখতেন নিজের ছোট
ভাইয়ের মত। প্রথমেই তাঁর চোখে বাজলো মোহনদাসের খাওয়া-দাওয়ার বাচ-
বিচার। ছোকরা যদি মাংস না খায়, তাহলে এই ঠাণ্ডার দেশে টিকবে কেমন
করে?

বাড়ীর গিন্নী কি আর করেন, সকাল বিকাল যবের খুদ সিদ্ধ করে দেন, তাতে না
থাকে ছুন না থাকে লজা, মোহনদাস চোখ কান বুঁজে তো সেটুকু গিলে ফেলেন।
সঙ্গে থাকে দু-তিন ব্রাইশ ক্রটি আর একটু জ্যাম। জ্যাম দিয়ে ক্রটি খেতে মন্দ লাগে
না। ইচ্ছা হয় আরো কয়েক টুকরো ক্রটি চেয়ে নেন, কিন্তু চাইতে লজা করে।

আবাহনের পাকিস্তান

পৃথিবীর চোখে কিছুই এড়ায় না, বিরক্তির হারে একদিন তিনি বললেন—তুমি যদি আমার ভাই হতে আমি তোমাকে দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতাম, এই রকম খাওয়া খাওয়া করে তিন বছর এদেশে তুমি টিকবে কেমন করে তাই আমি ভাবি।

—কিন্তু মায়ের কাছে যে আমি প্রতিজ্ঞা করে এসেছি।

—তোমার মা কি জানেন যে এখানে এতো শীত, এমন বরফ পড়ে। যে দেশের মা খাদ্য। এদেশে মা ও মাংস না খেলে তিন দিনে তোমার শরীর ভেঙে পড়বে। দু-একদিন জো নয়, পুরো তিনটি বছর এখানে তোমাকে থাকতে হবে। জীবনটা তো একটা গোয়া তুমি নয়।

—আপনি আমাকে মাগ ককন, আপনি যা যা বললেন সবই আমি মানি, কিন্তু মায়ের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি তার নড়চড় করতে পারব না।

ভদ্রলোক তখনকার মত আর কিছু বললেন না। তবে এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরলেন, একদিন বললেন—চলো, থিয়েটার দেখে আসি। পথে এক রেইরেটে লাঙ্কা-আহার সেয়ে নিলেই হবে।

মোহনদাসের হাত ধরে তিনি গিয়ে ঢুকলেন হলবোর্গ রেইরেটে। বিরাট হোটেল, রাজকীয় জাঁকজমক, সারি সারি কত যে টেবিল, আর কত লোক যে সেখানে আছে। বাজনা ও আলোর জৌলুবে চোখ ঝলসে যায়। তারই মাঝে একটি ছোট টেবিলে মুখোমুখি বসলেন দু'জনে।

প্রথমেই এলো নূপ।

ভদ্রলোক বললেন—কই খাও।

মোহনদাস একটু ইতস্ততঃ করলেন, বললেন—দাঁড়ান, আগে ফিল্মস করে নিই, এটা মাংসের নূপ কি না।

—যদি মাংসের নূপই হয়, কি হবে?

—খাব না।

—ব্যবহারিক শিষ্টাচারটুকুও তুমি জান না, এই হোটেলে এতো লোকের সামনে...

—কিন্তু মাংস তো আমি খাব না।

—এখানে মাংস ছাড়া তুমি আর কি পাবে? সারারাত তাহলে উপোস করে থাকবে।

—কাছেই একটা নিরামিষ রেইরেট আছে, যদি...

—বেশ, সেখানে গিয়ে পাওগে। খেয়ে এসে বাইরের ফটকে অপেক্ষা করো—মোহনদাস উঠে পড়লেন।

মোহনদাসের ব্যক্তি

বেচারার অন্তরে সেদিন আত্মার ছিল না, মিরে দেখলেন নিরামিষ যেই জৈষ্ঠি আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। কিরে এসে হলবোর্গের কঠোর সামনে পাচকারী কল্পে লাগলেন।

ভগবান বোধ হয় সেদিন তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন।

ইংরাজ ভ্রমলোকটি কিন্তু সেদিন থেকে মাংস খাওয়া সম্পর্কে আর কোন কথাই জ্ঞানেন নি। যাবে যাবে শুধু উৎকর্ষ প্রকাশ করতেন—এই ঠাণ্ডার বেশে তুমি কি করে স্বাস্থ্য রক্ষার রাখবে, তাজো ভেবে পাই না!

মোহনদাস এবার ঠিক করলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁর বত চূর্ণলতা থাক না কেন, বাইরের আদব কারদায় তিনি পুরোদস্তর সাহেব হবেন।

বোঝাইয়ে কেনা পোষাকগুলি বাতিল করে দিলেন।

আর্মি-নেভি স্টোর্স থেকে পোষাক কিনলেন, বগু টাট থেকে হাট কিনলেন। শুধু একটা সাদা-পোষাকেরই দাম পড়লো দেড়শো টাকা, একটা টুপির দাম পড়লো চৌদ্দ টাকা।

দাদার কাছে চিঠি লিখলেন—সোণার চেন পাঠিয়ে দিন, নাহলে পকেট-বাড়ি বৃকে খোলাতে পারছি না।

বেশভূষা হোল, এবার প্রসাধনের পর্ব। চুলগুলো বেজায় অবাধ, কোনমতেই পালিশ থাকতে চায় না, প্রতিদিন আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে অন্ততঃ ৭ মিনিট মাথায় বুরুস না ঘবলে মনে স্বস্তি হয় না, তবু মনে হয় চুলগুলো যেন ঠিক থাকতে চাইছে না।

এবার কিছু নাচ শেখা দরকার। বিলিভী ভ্রমসমাজে মিশতে হলে ওটা জানতে হবে।

পর্যতাল্লিশ টাকা খরচ করে মোহনদাস এক নাচের ক্লাসে ভর্তি হলেন।

সপ্তাহ খানেক নাচ শিখলেন, নাচবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই পিয়ানোর তালে তালে পা পড়ে না, দেহের ভঙ্গিয়াও ঠিক হয় না, স্বরজ্ঞান না থাকলে মনে ছন্দজ্ঞান আগে না, আগে স্বরজ্ঞান দরকার। কাজেই—

পর্যতাল্লিশ টাকা দিয়ে মোহনদাস একখানি বেহালা কিনলেন, এক আরো কিছু টাকা খরচ করে ভর্তি হলেন এক বাজনা শেখার ইচ্ছা।

তারপর ভালো ইংরাজী জোর করে বলতে শেখার ইচ্ছায় এক বহুত-শিক্ষক

মোহনদাসের বাক্তী

হুঁশে পের কমলেন, এক নির্দিষ্ট কক্ষের ভিতরে তাঁর ছাত্র হলেন। তিনি বক্তৃতা-সংগ্রহের কথা বলি কিনে, একটি বক্তৃতা ঘূষ করে আসতে বললেন।

বক্তৃতা ঘূষ করতে করতে সহসা মোহনদাসের মনে বিরক্তি আগলো। এই ইংরাজী বক্তৃতা শিখে তাঁর হবে কি? দেশে বক্তৃতা করছেন কোথায়? সেখানে তাঁর ইংরাজী বক্তৃতা শুনে কে, বুঝবে কে? বিলাতে তিনি তো আর চিরকাল থাকবেন না, এখানকার নাচ শিখে তাঁর লাভ কি হবে? আর বেহালা বাজনা তো দেশে কিরে গিয়ে কোন বড় ওস্তাদের কাছেও শেখা চলতে পারে। দাদা কত কষ্ট করে দেশ থেকে টাকা পাঠাচ্ছেন, সে কি এই সব নাচ গান আর বক্তৃতা শেখার জন্য?

সেই দিনই মোহনদাস দু'খানি চিঠি লিখলেন:

বক্তৃতা-শিক্ষককে লিখলেন—আর বক্তৃতা শেখার দরকার নেই।

নাচ-শিক্ষককে লিখলেন—আজ থেকে নাচ শেখা বন্ধ হোল।

বেহালাটি নিয়ে নিজে গেলেন বেহালা শিক্ষয়িত্রীর কাছে, বললেন—বাজনা আর শিখবেন না, শিক্ষয়িত্রীর যদি সুবিধা হয়, তাহলে বেহালাটি তিনি যেন আর কাউকে বেচে দেন।

পরসার অপচয় কমলো, সময়ের অপব্যবহারও আর রইল না, মোহনদাস এবার রীতিমত পড়াশুনায় মন দিলেন।

প্রথমেই মনে উঠলো রীতিমত ইংরাজী শেখার কথা।

এক বন্ধু বললেন—এখানকার ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে দাও তাতে ল্যাটিন পড়তে হবে, ল্যাটিন ভাষাটা ভালো মত জানা থাকলে ইংরাজীটা দ্রুত হবে।

কথাটা মোহনদাসের মনে লাগলো, ভর্তি হলেন এক প্রাইভেট ইন্সুলে।

লগনে ছ' মাস অন্তর ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়, তখন আর পাঁচ মাস বাকী। একইবারে সময়ের রীতিমত এক ছক কেটে নিয়ে মোহনদাস পড়াশুনা শুরু করলেন।

কিন্তু পাঁচ মাসের মধ্যে ইংরাজী ছাড়া আরো দুটি বিদেশী ভাষা—ফরাসী ও ল্যাটিন শিখে পরীক্ষায় পাশ করা নেহাৎ সহজ কথা নয়। মোহনদাসও পারলেন না, ল্যাটিন ভাষায় তিনি কেবল করলেন।

মনটা নেহাৎ মুষড়ে পড়লো, দাদা কত কষ্ট করে দেশ থেকে টাকা পাঠাচ্ছেন আর তিনি বিলাতে বসে তাঁর অপচয় করছেন। একটা সামান্য পরীক্ষায় পাশ করার মত যোগ্যতাটুকুও তাঁর নেই।

খানাবার ব্যাখ্যা

খানাবার সূর্য্যকাল সেবার অন্ত মোহনদাস তৈরী করলেন।

এবার তিনি নিজের খরচও অনেক কমিয়ে ফেললেন। মাসে খরচ প্রায় পচিশ টাকা। এবার সেটাকে কয়দে আনলেন সেতুশো টাকায়। এতদিন তার ঘর আর শোবার ঘর আলাদা ছিল, দু'খানি ঘরের ভাড়াও দিতে হতো। এবার একখানি ঘর ভাড়া নিলেন পচিশ টাকায়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও ছুটী খাবলয়ী হবার চেষ্টা করলেন। একটা ঠোঁট জোগাড় করে নিজের খাবার জই তৈরী করতে লেগে গেলেন।—সকাল বেলা ঘরের খুদ সিঁড়ি আর কোকো, র সন্ধ্যাবেলা শুধু কোকো তৈরী করে নিতেন সেই ঠোঁড়ে। শুধু দুপুরের খাওয়াটা ইরে খেতেন আর রাজের জন্ত কুটি কিনে আনতেন বাইরে থেকে। এতে খাবার চ দৈনিক এক টাকার বেশী পড়তো না, বার বার রেটুরেটে ছুটোছুটি করার মারি থেকেও বেঁচে গেলেন। দাদার উপর খরচার ভার অনেকটা সংকপ তে পেরেছেন ভেবে মোহনদাস স্বস্তি পেলেন, নতুন উৎসাহে শুরু করলেন।

এবার মোহনদাস ব্যাটিক পাস করলেন।

ইতিমধ্যে মোহনদাস ব্যারিষ্টারী পড়াও শুরু করেছেন।

ব্যারিষ্টারী পড়া বিশেষ কঠিন কিছু নয়, বছর তিনেক লাগে পড়তে। পড়ার া খাওয়ার ব্যাপারটাই বড়। মাসে গড়-পড়তায় আটটি করে ভোজ-সভা বসে, তার মধ্যে অন্ততঃ ছুটো ভোজে হাজির থাকলেই চলবে। এই সব সভায় জজেরা আসেন, ছাত্রদের সঙ্গে মোটামুটি কিছু-কিছু আলোচনা করেন। কেউ কেউ বক্তৃতা দেয়, তারপর চলে খাওয়া-দাওয়া।

বিলতী রীতি অনুযায়ী খাওয়ার সঙ্গে মদেরও ব্যবস্থা আছে। ছোট ছোট এক একটি টেবিলের চারিপাশে চারজন করে ছাত্র বসে, প্রত্যেককে মাথা পিছু আধ বোতল করে মদ দেওয়া হয়। আহাৰ্য্য ও মদের দাম বাবদ ছাত্রদের কাছে থেকে মাথা পিছু দু-তিন টাকা করে নেওয়া হয়। ওখানকার যে কোন একটা হোটেলের একবেলা খেতে এর যোগ্য খরচা পড়ে। এই জগত এই সব ভোজ-সভায় ছাত্ররা সাধ্যমত কখনও কামাই করে না।

• ব্যারিষ্টার হতে হলে এই ভোজ-সভায় হাজির থাকতেই হবে, মোহনদাসও এসে বসতেন, কিন্তু তিনি খেতেন না কিছুই—মাংস খাবেন না, মদ তিনি স্পর্শ করেন না। একটি টেবিলের একপাশে বসে বসে তিনি দেখতেন আর ভাবতেন—এই

আমাদের দায়িত্ব

বাংলাহাট আর ময়দানের মধ্যে আইন শিকার কতটুকু গুচ্ছ নিহিত থাকতে পারে, ছাত্ররা এথেকে আইনের কি শিখছে ?

লাজুক মোহনদাস চুপ করে একপাশে বসে থাকলেও দু-এক দিনেই তাঁর উপর সহপাঠীদের নজর পড়লো। সবাই মোহনদাসকে নিজের টেবিলে পাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলো। মোহনদাস মদ খায় না, যে টেবিলে সে বসবে সেই টেবিলে তার ভাগ্যে আধ বোতল মদ সেই টেবিলের আর তিনজন উপরি খেতে পারে, সেইজন্যই ছাত্রমহলে মোহনদাসের কদর বেড়ে যায়, সবাই আগে থেকে বলে রাখে—মোহনদাস কালকের ভিনারে তুমি আমাদের টেবিলে বসবে !

সেই দলে মোহনদাসের মত আরেকটি ছাত্র ছিল; সে পার্শ্ব, সে-ও মদ মাংসের বিরোধী। ভোজ-সভায় আর সবাই খায় আর তারা দুজনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এদিকে ভিনারের ফী দিতে হয় ঠিকই। শেষে আর পাঁচ জনের কথা মত দু'জনে মিলে এক দরখাস্ত করলো,—আমরা নিরামিষ খাই, আমাদের সেই মত ভোজ্য দেওয়া হোক !

দরখাস্ত মঞ্জুর-হোল, দু'জনের জন্য ফলমূল ও নিরামিষ খাওয়ার ব্যবস্থা হোল !

মোহনদাস এবার কিছু মেলামেশা শুরু করলেন।

লগনে নিরামিষ ভোজীদের এক সমিতি ছিল। তাদের একখানি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল, মোহনদাস তাদের দলভুক্ত হয়ে পড়লেন। নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়ও ঘটলো।

নিরামিষ ভোজী কয়েকজনকে নিয়ে মোহনদাস নিজের পাড়াতেই এক ক্লাব করে বসলেন। নিজে হলেন তার সম্পাদক, সভাপতি হলেন ভক্তার ওলঙ্কীল্ড আর সহকারী হলেন স্তার এডুইন আর্নল্ড।

নিরামিষ ক্লাবের একজন উৎসাহী কর্মী হলেও পাঁচ জনের সামনে দাঁড়িয়ে মোহনদাস কখনও কিছু বলতে পারতেন না। দু এক বার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেই পা কাঁপে, তার পর বেই দেখেন সবাইকার দৃষ্টি এসে পড়েছে তাঁর মুখের উপর, আর মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। যা কিছু বলার ছিল সবটুকু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়।

একবার মোহনদাস ঠিক করলেন কাগজে লিখে নিয়ে গিয়ে পড়বেন, চোখ থাকবে কাগজের উপরে, কান্নাই চোখের পানে আর তাকাতে হবে না, কথার খেঁই হারিয়ে যাবে না, গড় গড় করে পড়ে যাবেন জলের মত।

আশাবের শাক্ষিণী

ভেবে-চিন্তে শাক্ষিয়ে-ওছিয়ে একটি বক্তৃতা লিখলেন—ফুলক্ষেপের পুরো একটি

।

সভার বাসে কাক্সর পানে আর তাকালেন না, উঠে পাড়িয়ে কাগজখানি মেলে লেন চোখের সামনে। তথাপি মনে হোল সবাই তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে ছে, পা কঁপে উঠলো, অক্ষরগুলো সব চোখের সামনে জট পাকিয়ে হিজিবিজি য়ে গেল, পড়া আর হোল না, ক্লপ করে মোহনদাস চেয়ারে বসে পড়লেন। কিছু অ্যাধক রায় পাশেই ছিলেন, কাগজখানি নিয়ে তিনি পড়লেন লেখাটি।

এই দুর্বলতাটুকু অর করতে মোহনদাসের বহু বছর লেগেছিল।

ব্যারিষ্টারী পাস করে যখন তিনি বিলাত থেকে ফিরছেন, নিরামিষী বন্ধুদের এক ঐতি-ভোজে আপ্যায়িত করেন। বিলাতী রীতি অনুযায়ী ভোজনপর্বের আগে কিছু-ল গান-বাজনা হয়, তারপর নিমন্ত্রণ-কর্তা কিছু বলেন। কি কি বলবেন অনেক মাগে থেকেই মোহনদাস মনে মনে তার খসড়া করে রেখেছিলেন কিন্তু উঠে পাড়িয়ে একটি বাক্য শেষ করতে না করতেই তাঁর কথার খেই হারিয়ে গেল আর কিছু বলার ত খুঁজে না পেয়ে মোহনদাস এক কথায় তাঁর ভাষণ শেষ করলেন—আপনারা যে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন ও এসেছেন তার জন্ত আমি আপনাদের ধন্যবাদ নানাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি মোহনদাস বসে পড়লেন, কিছুক্ষণ আর মুখ তুলতে পারলেন না, তাঁর অবস্থা দেখে উপস্থিত সকলের মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছে, চোখ না তুলেই সেক্ষু তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন।

ব্রাইটনের এক রেইরেটে মোহনদাস একদিন খেতে গেছেন। কি খাবেন, ওয়েট্রেস এসে মেহুটা এগিয়ে ধরলো। মেহুটা আগাগোড়া ফরাসী ভাষায় লেখা। মোহনদাসের তখনও ভালোমত ফরাসী ভাষা লেখা হয়নি। তালিকা দেখে কোন্ খাবারটা নিরামিষ, কোন্টি আনতে বলবেন তা ভেবে পেলেন না; অখচ কিছু না খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে আসতেও পারেন না, ভাবলেন ওয়েট্রেসকে একবার জিজ্ঞাসা করে নেবেন কি না।

সামনের টেবিলে এক মহিলা বসেছিলেন। তিনি মোহনদাসের এই ইতস্ততঃ ভাবটা লক্ষ্য করলেন, ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর দেয়ী হোল না, বললেন—আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? মেহুটা পড়ে দোব?

মোহনদাস মুহু হেসে মাথা নাড়লেন।

আমাদের গাফিলত

মহিলা তালিকা পড়ে মানে বুঝিয়ে দিলেন, মোহনদাস কি খাবেন, আর কি খাবেন না তাও বলে দিলেন। কথার কথার বিবিসি আলাপ জমে উঠলো, বিদায় বেলায় মহিলাটি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ী বাবার জন্ত।

মোহনদাস রবিবার দিন গেলেন সেই মহিলার বাড়ীতে।

মহিলা সাদরে অভ্যর্থনা জামালেন। অনেকগুলি মেয়ে ছিল সেই বাড়ীতে, তাদের সঙ্গে মোহনদাসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। লাজুক মোহনদাস কেমন-যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, কান্নার সঙ্গেই ভালোমত আলাপ করতে পারলেন না।

বিদায়-কালে মহিলাটি আবার তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন পরের রবিবারের জন্ত।

পর পর কয়েকটি রবিবার-সন্ধ্যা সেই বাড়ীতেই মোহনদাসের কাটলো।

বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে মোহনদাস ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। তাদের বন্ধুঘটা পাকা করে ফেলার জন্ত ভদ্র-মহিলারও খুব উৎসাহ আছে বলে মনে হোল।

হঠাৎ একদিন মোহনদাসের মনে কেমন যেন একটা খটকা বাধলো—ভদ্র-মহিলাটি কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে জানাই-করতে চায় নাকি ?

যত দিন যায় তত ভাবনা বাড়ে।

প্রতি রবিবারেই মোহনদাস সেই বাড়ীতে যান, কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারেন না।

শেষে ঠিক করলেন চিঠি লিখে সব জানাবেন। চিঠিও লিখে ফেললেন : আপনি আমাকে ছেলের মত স্নেহ করেন, সেই স্নেহের বশেই আমার সঙ্গীহীন হৃদয় প্রবাস-জীবনকে সহজ করে তোলার জন্ত আপনি বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেই পরিচয় আজ অন্তরঙ্গতায় এসে পৌঁচেছে। আপনি কল্পিত ভাবছেন মেয়েটিকে আমি বিয়ে করবো। সেইজন্য আগেই আমি আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে সেই ছেলেবেলায়, আমার বয়স ছিল তখন সবে মাত্র তেরো বছর। সত্য প্রকাশ করাই ভালো। আশা করি সেজন্য আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'ব না।.....

চিঠি তো লিখলেন কিন্তু ভাষাটা মনঃপূত হোল না, ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার লিখলেন। আবার ছিঁড়লেন। শেষে আবার লিখলেন। এবারকার চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিনই মহিলার কাছ থেকে উত্তর এলো : মিথ্যা ধারণা নিয়ে মন খারাপ করো না, যথারীতি রবিবার সন্ধ্যায় তোমার নিমন্ত্রণ রইলো। তেরো-বছরে বিয়ে হওয়াটা

আমাদের বাহিনী

জারী মজার ব্যাপার, সেই কাহিনীই সেদিন তোমার কাছে আমরা শুনবো। আসতে তুলো না কিছু।

সেদিন থেকে সেই বাড়ী যেতে মোহনদাসের মনে আর কোন সঙ্কোচ রইল না।

ছেলেবেলা থেকেই মোহনদাসের খেলাধুলায় উৎসাহ কম। কোন রকম ব্যায়াম করা পছন্দ করতেন না, লম্বা লম্বা পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়ানোটাই সবচেয়ে আরামপ্রদ বলে তাঁর মনে হোত। বিলাতেও সেই অভ্যাসটাই বজায় ছিল। ইচ্ছামত মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়াতেন যখন বৈদিকে খুসি।

ওদেশে বিদেশী অতিথিদেরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর মেয়েরা বিকালের দিকে বেড়াতে বের হয়—এই হোল রীতি। মোহনদাসও গৃহস্থামীর মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরুতেন।

তখন মোহনদাস ভেঁটনোরে থাকেন, বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। কথা বলতে বলতে বার বার মেয়েটি তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা পা ফেলেও মোহনদাস তার নাগাল ধরতে পারছেন না। মেয়েটি যেন হাওয়ায় উড়ছে। অথচ বয়সে সে মোহনদাসের চেয়ে ছোট নয়, বরং বছর পাঁচেকের বড়ই হবে।

চড়াই ভেঙে মেয়েটি বরাবর একটি ছোট পাহাড়ের মাথায় এসে উঠলো। এবার সেই চূড়া থেকে নেমে আসার পালা। মেয়েটি এক মিনিট ডাবলো না, তীরের মত এক দৌড়ে নেবে গেল। হীল উঁচু জুতো পায় দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ছুটে কোথাও তার বাধলো না। এক নিঃশ্বাসে নীচে এসে মেয়েটি চীৎকার জুড়ে দিল—নেবে আস্থন, নেবে আস্থন, নাবতে পারবেন তো ? না ভয় করছে...হাত ধরে নাবিয়ে আনবো নাকি ?...

রীতিমত স্পোর্টসম্যান না হলে তেমন ভাবে নীচে নামা বড় সহজ কথা নয়। অনেক কষ্টে, ভয়ে ভয়ে কখনো পাথর ধরে, কখনো বসে বসে অতি সাবধানে মোহনদাস তো নীচে নামলেন। গায়ে তখন রীতিমত ঘাম দেখা দিয়েছে।

মেয়েটি ঠাট্টা করে চীৎকার করে উঠলো—সাবাস ! সাবাস !!

মোহনদাস বড়ই লজ্জা পেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—ইংরাজ মেয়েদের সঙ্গে সহজে আর কখনোও বেড়াতে বেরবেন না।

এতদিন মোহনদাস হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

আমাদের গান্ধিজী

তার উপর বিলাতী পরিবেশের মাঝে পড়ে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আর কোন কৌতূহলও ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ তাঁর দুটি বন্ধু জুটে গেল,—হুই ভাই, হু'জনেই খিওজকিট।

ম্যাডাম ব্রাভাটস্কি তখন হিন্দু দর্শন ও ব্রহ্মবাদ নিয়ে বিলাতে সাড়া তুলেছেন।

তাঁর শিষ্য আনি-বেশাস্তের তখন খুব নাম। তাঁদের ব্যক্তিত্ব বিলাতের এক দল ইংরাজকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, এই যুবক হু'জন সেই দলের।

মোহনদাসকে একদিন তাঁরা দুজনে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ম্যাডাম ব্রাভাটস্কি ও আনি-বেশাস্তের কাছে।

তারপর একদিন তাঁরা হু'জনে হু'খানি গীতা যোগাড় করে আনলেন, বললেন—তুমি হিন্দু, সংস্কৃত গীতাকথানি তোমার ভালমতই জানা আছে, এই সংস্কৃত গীতাকথানি তুমি পড়বে আর ইংরাজীতে আমাদেরকে মানে বুঝিয়ে দেবে। আর এই এডুইন আর্গল্ডের লেখা গীতার ইংরাজী অম্ববাদখানি খুলে আমরা মিলিয়ে মিলিয়ে পড়বো।

মোহনদাস 'না' বলতে পারলেন না। ইচ্ছলে যেটুকু সংস্কৃত পড়েছিলেন, তাই সম্বল করে গীতাপাঠ শুরু করলেন। হিন্দুর ছেলের সংস্কৃত জানা যে কতখানি দরকার তা তিনি এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। আর তারই সঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রবণ করলেন ইচ্ছলের সেই পণ্ডিত মশাইটিকে।

প্রতিদিনই গীতা পড়েন, মানে ভাঙেন। বন্ধু হু'জন চলে যাবার পরেও অনেক সময় গীতার অনেক শ্লোক, অনেক কথা তাঁর মাথায় ঘুরতে থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২ ও ৬৩ সর্গ্যাক শ্লোক দুটি তিনি মুখস্থ করে ফেলেন :

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেবুপজায়তে।

সঙ্গাং সঙ্গায়তে কামাং ক্রোধোহভিজায়তে।

ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহ সংমোহাৎ নৃতিবিভ্রমঃ।

নৃতি-দ্রুশাদ বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চাতি।

[বিষয়ের চিন্তা করতে করতে মাহুকের মনে জাগে আসক্তি। আসক্তি থেকে জন্মায় কামনা। কামনা থেকে আসে ক্রোধ। ক্রোধ থেকে মোহ। মোহ নৃতি প্রকাশ করে। তখন বুদ্ধি নষ্ট হয়ে বিনাশ অবশ্যজারী।]

গীতা শেষ করে মোহনদাস বাইবেল পড়েন। বিশ্বর 'সারমন অন্-দি-মার্টিন' মোহনদাসকে মুগ্ধ করে :

'অস্তায় দিয়ে অস্তায়কে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করো না। যদি কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে বা গাল ফিরিয়ে দিও। যে তোমার গানের জাবাটা কেড়ে নেবে, তোমার আলখাল্লাটাও তাকে দিয়ে দাও'...

আমাদের দায়িত্ব

তারপর পড়লেন বুদ্ধদেবের জীবনী 'লাইট অব এনিরা'।

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ও বিজয় তত্ত্বাবধান মধ্যে চিত্তবিকারকে জয় করার যে ইচ্ছিত আছে, মোহনদাসের মনে তা এমনভাবে রেখাপাত করলো যে ধর্মের প্রতি একটা বত-কুর্ভ অহুয়াগ জেগে উঠলো তাঁর হৃদয়ে। রীতিমত ধর্মচর্চার দিকে মন ঝুঁকে পড়লো।

মনের ভাবান্তরে আহালাদিরও খানিক রূপান্তর ঘটলো। এতদিন মোহনদাস ডিমটাকে মাছ-মাংসের মধ্যে গণ্য করতেন না এবার ডিম খাওয়াও ছেড়ে দিলেন। মশলা খাওয়া বন্ধ করে দিলেন, মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিলেন, শুধু সিদ্ধ তরকারী, কুটি আর কোকোই একমাত্র আহাৰ্য্য হোল।

গুজরাতি লেখক নারায়ণ-হেমচন্দ্রর সঙ্গে মোহনদাসের পরিচয় ঘটলো। বেঁটে ছিপ্‌ছিপে মানুষটা, মুখে বসন্তের দাগ, লম্বা দাড়ী, কথা বলতে বলতে কেবলই দাড়ীতে হাত বুলান। প্রথম পরিচয়েই বলেন—তুমি আমাকে কিছু ইংরাজী শেখাবে? আমি ইংরাজী মোটেই জানি না।

পরদিন থেকেই খাতা বই নিয়ে তিনি মোহনদাসের ছাত্র বনে গেলেন। ব্যাকরণ নিয়ে তিনি মোটেই সাধা ঘামাতেন না, বলতেন—ভাষাটা বুঝতে পারা নিয়ে কথা। ব্যাকরণের জ্ঞান কিছু বাধে না। আমি কোন দিন ইংলিশে পড়িনি, কিন্তু মাতৃভাষা গুজরাটী ছাড়াও হিন্দি, মারাঠী ও বাংলাভাষা আমি জানি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত বাংলা রচনা আমি গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করেছি। তারপর শিখবো করাসী ভাষা, শুনেছি করাসী সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। জার্মান ভাষাও বাদ দেব না। সারা যুরোপটা ঘুরে দেখতে হবে তো!

—আমেরিকা যাবেন না?

—নিশ্চয়। আমেরিকা না দেখলে তো পৃথিবীর আধখানা বাকী রয়ে গেল।

—অতো টাকা পাবেন কোথা?

—টাকার তো খুব বেশী দরকার নেই। সামান্য কিছু খাওয়া আর সাধারণ কাপড় জামা। ব্যাত্যাভ্যন্তর খরচও খুব বেশী পড়বে না—ট্রেনের খার্ড ক্লাশ ও আহালের ডেক। বই লিখে বা ছুঁচরটাকা হবে, তাইতেই চলে যাবে, না চলে বন্ধ বাস্তবের কাছ থেকে কিছু কিছু ধার নোব।

সতাই নারায়ণের খাওয়াপরাহর কোন আড়ম্বর ছিল না, পরনে কলবালে একটি প্যান্ট, আধমকলা কৌচকানো হলদে রঙের একটি পার্সী কোট। একদিন তো দুটি

আমাদের গাড়ী

আর সার্ট পরে সোজা মোহনদাসের বাড়ীতে এসে উঠলেন। মোহনদাস বিস্মিত হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—এই পোষাকে আপনি পথে বেরলেন কেমন করে? রাস্তায় ছেলেরা আপনার পিছু নেয় নি?

—একদল ছোকরা বানিকটা পথ আমার পিছু ধাওয়া করেছিল বটে, কিন্তু যখন দেখলো তাদেরকে আমি গ্রাহ্যই করি না, তখন হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

হেমচন্দ্র ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে ছিলেন বেপরোয়া।

তিনি মাছমাংস খেতেন না, সেইজন্য মোহনদাসের সঙ্গে তাঁর ভাব জমেছিল বেশী। একদিন তো মোহনদাসের জন্য কোথা থেকে তিনি মূগের ডাল জোগাড় করে আনলেন, নিজে রেঁধে মোহনদাসকে খাওয়ালেন।

কিছুদিন বিলাতে থেকে চলনসই ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শিখে নিয়ে হেমচন্দ্র একদিন ভেসে পড়লেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে।

ফরাসী বিপ্লবের লীলাভূমি ফ্রান্স দেখবার আগ্রহ ছিল মোহনদাসের অনেক দিন থেকে, দিন সাতকের জন্য তিনি প্যারিসে গেলেন যেভাবে।

প্যারিসে তখন গ্রেট একজিবিশন হচ্ছে। হাজার ফিট উঁচু ইফেল-টাওয়ারে উঠলেন দু'তিনবার।

টাওয়ারের মাথায় এক রেই রেইন্ট আছে, সওয়া পাঁচটাকা খরচ করলে সেই আকাশের মাঝে বসে খাওয়া যায়, মোহনদাসেরও সখ হোল একবার সেখানে বসে খাবার।

ভারপর দেখলেন নব্রদাম গির্জা। স্থাপত্যে ও কারুকার্যে বিরাট ও মহীয়ান। ইফেল-টাওয়ারের তুলনাই চলে না এর সঙ্গে। ভিতরে ঢুকলে একটি অল্পবয়স্ক ছুতিতে মন ভরে ওঠে, মনে হয় যেন দেবতার সঙ্গে মুখোমুখি এসে ঠাকিয়েছি।

তিনবছরে মোহনদাসের ব্যারিষ্টারী ভোক শেষ হয়ে গেল। রোমক আইন ও ইংরাজী আইনের দুটি পরীক্ষা দিয়ে মোহনদাস ব্যারিষ্টার হলেন। ১০ই জুন পরীক্ষার খবর বেরলো, ১২ই জুন মোহনদাস ভারতগামী জাহাজে উঠে বসলেন।

জাজ-জীবনের উপর বনিকা পড়লো।

জাহাজে বার বার মায়ের কথাই মনে হয়েছে। মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা থেকে আজ অবধি তিনি টলেননি, তুলে না কত খুশি

আবাহনের গাছিকী

হবেন। কতদিন যিনি ভাল ভরকারী খাওয়া হয়নি, যা নিশ্চয়ই কতকর খিটাই করে রেখেছেন, যাওয়া যাত্রাই হয়তো এতো খালা সাজিয়ে দেবেন, যা তিনি খেতেই পারবেন না। খেতে খেতে বিলাতের মেয়েদের পল্ল বলবেন, যা শুনে অবাক হয়ে যাবেন।

বোম্বাইয়ের আহাঙ্গ-বাটার বড়দা এসেছিলেন; আহাঙ্গ থেকে নেবেই মোহনদাস বললেন—চলুন আগে বাকি প্রশ্ন করিগে।—

দাদার দু'চোখ ছিল ছিল করে উঠলো, বললেন—যা তো নেই ভাই।

—যা নেই !!!

—না। তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে তোমাকে এতদিন জানাইনি।

এমনভাবে আবাত পাবার জন্য মোহনদাস প্রস্তুত ছিলেন না, বিলাতের যত ভাইয়ের মুখের পানে চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন, দাদার কোন কথা তিনি শুনতে পাচ্ছেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না। মুহূর্তমধ্যে সব কিছুই তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে উঠলো।

দাদা বুঝলেন, মোহনদাসের হাত ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন ডকের বাইরে।

বাদের আদেশ অমান্য করে মোহনদাস বিলাত গিয়েছিলেন এবার তারা চকল হয়ে উঠলো—বিলাত থেকে যে স্নেহ হয়ে কিরেছে তাকে আবার নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করবে কি করে!

তাদেরকে খুসী করার জন্য দাদা মোহনদাসকে বরাবর নিয়ে এলেন নার্সিকে। সেখানে নর্মদা নদীতে স্নান করে তন্ত্র-মন্ত্র পাঠ করে মোহনদাস আগে শুদ্ধ হলেন, তারপর এলেন রাজকোটে।

দাদা এবার সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের নিয়ন্ত্রণ করলেন, প্রায়শ্চিত্তের পর যেমন আমাদের প্রথা।

কিন্তু স্বজাতির মধ্যে ছুটি দল হয়ে গেল।

একদল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলো, আর একদল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলো না।

ষিভীয়েরাই দলে ভারী ছিল। তাদের রক্ত চক্ষুর ভয়ে শতর, শান্তকী, বোন ও ভগ্নীপতি অবধি ভকাত্তে সরে থাকতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মোহনদাসের দিক থেকে সেক্ষত কোন প্রতিবাদ উঠলো না, রীতিমত আইন ব্যবসায়ের দিকে তিনি মন দিলেন।

রাজকোটে ব্যারিষ্টারী শুরু হোল, কিন্তু একটিও মক্কেল জুটলো না।

ভক্তাক্ষরী বললেন—বোম্বাইয়ে গিয়ে বস গে,—স্ববিধা হবে।

আমাদের বাড়ি

মোহনদাস বোম্বাইয়ে এলেন।

সেখানেও সে-ই অবস্থা। কিছুকাল সাহেবি-আনা ঠিক বজার আছে, খরচ ঠিক চলেছে মাসের পর মাস, রীতিমত কোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন প্রতিদিনই, কিন্তু যত্ন নেই একজনও।

বছরা বলেন—পাঁচ সাত বছর হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারদের এমনিভাবেই কাটে, এতে হতাশ হবার কিছু নেই। বছর তিনেক পরে যদি মাসের খরচটা তুলতে পার তাহলেই নিজেকে ধন্য বলে মানবে।

তিনটি বছর এইভাবে কাটাতে হবে? মোহনদাসের মনে দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিল।

একদিন এক দালাল একটি মামলা নিয়ে এলো তাঁর কাছে। ছোট আদালতের সামান্য মামলা, ব্যারিষ্টারের কী দিল দু'গিনি—ত্রিশ টাকা।

কী'এর টাকা থেকে দালাল কমিশন চাইল।

মোহনদাস বললেন—না, দালালি আমি দেবো না।

—কিন্তু ছোট বড় সব উকিল ব্যারিষ্টারের কাছে থেকেই আমরা দালালি পেয়ে থাকি।

—অন্যেরা দিতে পারেন কিন্তু আমি দেবো না।

দালাল বেচারি আর কি করে, মামলা যখন একবার মোহনদাসের হাত তুলে দিয়েছে, তখন কুরান্ন তো কিছু নেই!

এদিকে মোহনদাস মামলার কাগজপত্র ঠিক করে কোর্টে উপস্থিত হলেন, কিন্তু আদালতে বিচারকের সামনে বাদীকে জেরা করতে উঠেই, তাঁর পা কেঁপে উঠলো, মাথা ঘুরে গেল, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না, কি জিজ্ঞেস করতে হবে জ্ঞান অবশি তিনি ভুলে গেলেন। রূপ করে তিনি বলে পড়লেন। দালালকে বললেন—মামলা তিনি চালাতে পারবেন না, মাথা ঘুরছে।

কী'য়ের ত্রিশ টাকা ফেরৎ দিতে হোল।

বিলেড-কোরং ব্যারিষ্টারের রকম-সকম দেখে, জজ ও উপস্থিত উকিলদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

অক্ষমতার লজ্জার মাথা নীচু করে মোহনদাস ছাড়াছাড়ি আদালত থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

তারপর কিছুদিন মোহনদাসকে আর আদালতে দেখা গেল না।

আমাদের শাক্তিকী

ব্যারিষ্টারী ছাড়া আর কি করা চলে, কি করলে সঙ্গে সঙ্গে দু'দশ টাকার সংস্থান হতে পারে—সেই কথাই মোহনদাস ভাবছেন, এমন সময় একদিন সকালে খবরের কাগজের পাতায় একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো : ‘শিক্ষক চাই, দৈনিক এক ঘণ্টা করে ইংরাজী পড়াতে হবে, মাহিনা পঁচাত্তর টাকা।’

বিজ্ঞাপনটি একটি নামকরা হাই-স্কুলের।

মোহনদাস সেইদিনই দরখাস্ত করলেন।

দরখাস্তের উত্তর এলো—আসুন, দেখা করুন।

মোহনদাস ইন্সুল কতৃপক্ষের সামনে হাজির হলেন—খোপদোস্ত, চোস্ত স্টপরা বিলাত-ফেরৎ এক ব্যারিষ্টার।

অধ্যক্ষ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি বি-এ পাশ করেছেন, গ্রাজুয়েট ?

—না। আমি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বিলাত বাই, সেখানে আবার লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির ম্যাট্রিক দিই, ল্যাটিন আমার দ্বিতীয় ভাষা ছিল।

—কিন্তু আমাদের যে গ্রাজুয়েট চাই, গ্রাজুয়েট না হলে তো আমাদের চলবে না।

অনেক আশা নিয়ে মোহনদাস গিয়েছিলেন, মুখ কালা করে বাহির হয়ে এলেন।

আরো কয়েকটি মাস কেটে গেল।

সারাটি দুপুর মোহনদাস আদালতে চুপ করে বসে থাকেন। সময় সময় তাঁর কিছুনি আসে, বেক্কা বসে বসে তিনি ঢোলেন।

তাঁর মত নিষ্কর্মী উকিল আর ব্যারিষ্টারদের দুপুরটা কাটিয়ে দেবার এই হোল রীতি। চোখ মেলেই দেখেন, তাঁর আশেপাশে আরো কতজন চুলছে। কাকুরই কোন লজ্জা নেই।

প্রতিদিন হাঁটতে হাঁটতে আদালতে যাওয়া ও আসা ক্রমশঃ মোহনদাসের কাছে অর্থহীন হয়ে উঠলো।

ছ' মাসের মধ্যে আয়ের কোন রকম সংস্থান হোলনা।

এদিকে বোম্বাইয়ের মত সহরে ব্যারিষ্টারী চালে চলার খরচ তো আছে।

দাবা রাজকোর্টে ওকালতী করতেন, বললেন—ওখানেই চল, একটা কিছু ব্যয় করা বাবে, তাছাড়া থাকা-খাওয়ার খরচ তো লাগবে না।

কথাটা মোহনদাসের মনে লাগলো, রাজকোর্টে এসে আকিস খুলে বসলেন।

দাবার এক উকিল বন্ধুর ভালো পসার ছিল, তাঁর বত গরীব মকেলকে তিনি

পাঠিয়ে দিতেন মোহনদাসের কাছে। মোহনদাস বসে বসে তাদের আরজী লিখে দিতেন। কী বা পেতেন তা থেকে কিছু দাদার বন্ধুটিকে বখরা দিতেন হোত। প্রথমে তিনি পৌঁ ধরেছিলেন—বখরা মোব কেন?

দাদা বললেন—দাদালি না পেলে ওরা তোমাকে বাবলা দেবে কেন? আরো ব্যারিটার তো রয়েছে, এখানেও তোমাকে তাহলে বোমাইয়ের মত নিরুদ্বী হয়ে বসে থাকতে হবে।

বলে থাকার ইচ্ছা মোহনদাসের ছিল না, দাদার কথাই তিনি মেনে নিলেন। বন্ধুদে মাসে শ' তিনেক টাকা উপায় হতে লাগলো।

মোহনদাসের দাদা ছিলেন পোরবন্দরের যুবরাজের সেক্রেটারী ও উপদেষ্টা। এক অভিযোগ ওঠে যে যুবরাজকে কয়েকটি ব্যাপারে তিনি কুপরামর্শ দিয়েছেন।

কথাটা শেষ অবধি পলিটিক্যাল এজেন্টের কানে ওঠে।

দেশীয় রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্টরা হচ্ছেন রাজারও রাজা। তিনি বড়দার উপর বিরূপ হয়ে উঠেন।

বিলাতে থাকার সময় ইংরাজ অফিসারটির সঙ্গে মোহনদাসের বেশ জানাশুনা ছিল, দাদা বললেন—তুমি একবার পলিটিক্যাল এজেন্টের কাছে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলগে, তাহলে ব্যাপারটা মিটে যায়।

কথাটা মোহনদাসের মনঃপুত হোল না, বললেন—আগে একটা আরজী লিখে দিন না, তারপর কি হয় দেখু যাক।

দাদা বললেন—লেখালেখি করে কিছু হবে না, এখানে ব্যক্তিগত পরিচয়ই সব। জানা-চেনা লোকের উপর যে যতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে ততখানি লাভবান হয়;—এদেশকে তুমি এখনও চিনলে না।

কাজেই মোহনদাসকে যেতে হোল পলিটিক্যাল এজেন্টের বাড়ী, তাঁকে দেখে এজেন্ট চিনতে পারলেন, বললেন—কি খবর, পুরানো পরিচয় ঝালাজে এসেছেন নাকি?

—একটা কথা বলতে এলাম।

—পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে কারু জন্ত কোন সুপারিশ করলে আমি শুনবো না কিন্তু!

—আমার দাদার কথাটা বলতে এসেছিলাম.....

—তার কথা তোমার মূখ থেকে আমি শুনতে চাই না। তিনি অনেক কিছু বড়বড় করেছিলেন। যদি তাঁর কিছু বলার থাকে তিনি লিখিতভাবে আমাকে জানানতে পারেন।

সাহেবের সাক্ষী

সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—আশনি ভাংলে এখন যেতে পারেন, আমি উঠছি।

তবু মোহনদাস ছাড়লেন না, কালেন—আশনি হয় করে আমার কথাটা আগে শুন।

সাহেব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, হাঁক দিলেন—চাপরাশি। বাবুকে দরওজ দেখা গো—

চাপরাশি এসে হাঁকলো—বাবুসাহ, বাহার চলিয়ে—

মোহনদাস তখনও ইতস্ততঃ করছেন দেখে সাহেব ইঙ্গিত করলেন, চাপরাশি এগিয়ে এসে ষাড় ধরে মোহনদাসকে ঘর থেকে বের করে দিল।

এতদূর অপমান মোহনদাস আশা করেন নি। রাগে অপমানে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো, তখনই একটুকরো কাগজে লিখে সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন—তুমি চাপরাশি দিয়ে আমার অপমান করেছে। বখাবোগ্য ক্রটি স্বীকার না করলে, আমি তোমার নামে মানহানির মামলা করবো।

সাহেবও তখনই উত্তর পাঠিয়ে দিলেন—তুমি বা খুশি তাই করতে পার।

রাগে ফুলতে ফুলতে মোহনদাস বাড়ী ফিরলেন; কি ভাবে এই অপমানের শোধ নেওয়া যায়, সেই কথাই কেবল তাঁর মনের মাঝে ঘুরতে লাগলো।

স্ত্রীর ফিরোজ-সা মেটা সেই সময় ক’দিনের জন্য রাজকোটে এসেছিলেন একটি মামলা পরিচালনা করতে। অতো বড়ো ব্যারিষ্টারের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে মোহনদাসের সাহসে কুলালো না, এক উকিল-বন্ধুর যারফতে সব কিছু লিখে-পড়ে ফিরোজ-সার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সব পড়ে শুনে ফিরোজ-সা হেসে বললেন,—গান্ধীকে বলো, উকিল ব্যারিষ্টারের জীবনে এমন ব্যাপার অনেক ঘটে। নতুন বিলেত থেকে এসেছে কিনা তাই মাথাটা এখনও গরম আছে। পসার জমাতে হলে এই অপমান হজম করে নিতে হবে। বয়স কম, জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা এখনও তার বাকী আছে। ব্রিটিশ অফিসাররা কেমন মাছুষ তা সে এখনও জানে না। এই সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করে সে কিছুই করতে পারবে না।

ফিরোজ-সার কথা অবহেলা করা যায় না, মোহনদাস মামলা করতে সাহস পেলেন না।

কিন্তু এখানকার আদালত পলিটিক্যাল এজেন্টের কোর্ট। কোন মামলা-ব্যাপারে কিছু করতে হলেই ওই সাহেবটির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সুবিধা পেয়ে কবে

আবাসের গান্ধিজী

আবার সে আরেকটা কি অপমান করে বসে সেই শকাব্দ মোহনদাস সদাই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর এক চাকরী মিলে গেল : পোরবন্দরের এক ব্যবসায়ীর মন্তবড় এক কারবার আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, সেখানে ছ'লক্ষ টাকা দেনা-পাওনা নিয়ে তাদের এক মাঝলা চলছে। সেই মাঝলা ত্বরিত করার কাজে তারা মোহনদাসের মত একজন লোক চায়। তাদের বড় ব্যারিষ্টার আছে সেখানে, মোহনদাস গিয়ে শুধু তাঁকে সাহায্য করবেন। সেজন্য মোহনদাস মাহিনা পাবেন বোল শত টাকা, বাতায়াত ও থাকা-খাবার খরচ কোম্পানী নিজেই বহন করবে।

মোহনদাস আফ্রিকা যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

নতুন ব্যারিষ্টার প্রথম শ্রেণী ছাড়া চলা-কোরা করা পছন্দ করেন না। এদিকে টিকিট কিনতে গিয়ে লোক ফিরে এলো, জাহাজে ডেক ছাড়া আর কোন টিকিট নেই।

ব্যারিষ্টার ডেকে যাবে ? এদিকে আবার এই জাহাজে যেতে না পারলে একমাস বসে থাকতে হয়। মোহনদাস দেখা করলেন জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। তার কথা-বার্তা শুনে ও চালচলন দেখে ক্যাপ্টেন খুসি হোল, বললে—বেশ, আমার ঘরে একটা উপরি বার্থ আছে, সেটা সাধারণতঃ যাত্রীদেরকে ভাড়া দেওয়া হয় না, সেটাই আমি তোমাকে দোব।

মোহনদাস ক্যাপ্টেনের ঘরেই আশ্রয় নিলেন।

ক্যাপ্টেনের হাতের কাছে একটি লোকের দরকার ছিল। দীর্ঘ আড়াই হাজার মাইল সমুদ্র-পথে পাড়ি জমাতে হবে, দিগন্ত বিস্তারী বৈচিত্র্যহীন নীল আকাশ ও নীল সমুদ্রের মাঝে পুরো দুটি সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে হলে একজন সঙ্গী চাই বৈকি, সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটাবার সঞ্চয়ও ক্যাপ্টেনের ছিল—একটা দাবার ছক আর দু-রঙা ঘুঁটির সারি। অবসর পেলেই তিনি ভাকতেন—ঘিটার পান্ডি, এসো এক হাত খেলা বাক !

মোহনদাস এর আগে আর কোনদিন দাবা খেলেননি, ওই ক্যাপ্টেনের কাছেই তাঁর শিক্ষা। খেলতে বসলেই তিনি হেরে যান। ক্যাপ্টেন খুসি হন। ক্যাপ্টেন নিজেও পাকা খেলোয়াড় নন, তবু মোহনদাসকে হারিয়ে দেবার আনন্দে বার বার তাকে খেলতে ডাকেন, আবার খেলার শেষে মোহনদাসকে বোঝাতে শুরু করেন কি ভাল দিলে মোহনদাস হারতো না।

তবুও মোহনদাস হেরে যান পরের বারে।

আবাহের গাঙ্গী

এই ভাবেই দীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি একটির পর একটি কেটে যায়। রেখাহীন দিবসের নীলিমা আবাহের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে।

ভেরো দিন পরে আবাহ এসে লাগলো আফ্রিকার উপকূলে—লামু বন্দরে।

সেখান থেকে মোম্বাসা...জানজিবার...মোজাম্বিক...তারপর ভারবান।

দাশা আবহুজা শেঠ নিজেই এসেছিলেন আবাহঘাটে। তিনি ওখানকার একজন সেরা ব্যবসায়ী, তাঁরই কাছে মোহনদাসকে কাজ করতে হবে। মোহনদাসের চালচলন দেখে তো তিনি শক্ত হয়ে উঠলেন—এই পুরোদস্তুর সাহেবিয়ানার অভ্যস্ত মাছুষটির স্থখ স্থবিধার জন্য তাঁর কত টাকা খরচ হবে কে জানে!

কিন্তু এখন তো আর সে কথা ভেবে লাভ নেই, মোহনদাসকে তিনি নিয়ে এলেন নিজের বাড়ীতে।

দু একদিন পর দাশা আবহুজা মোহনদাসকে নিয়ে গেলেন ভারবানের কোর্টে, নিজের উকিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, পাশের একখানি চেয়ারে মোহনদাসকে বসিয়ে গেলেন কোর্টের কাজ-কর্ম দেখার জন্য। ম্যাজিস্ট্রেট এতক্ষণ মোহনদাসের পানে তাকিয়েছিলেন, এবার তিনি ছুফু দিলেন—পাগড়ী নামাও!

অকারণে মাথা থেকে পাগড়ী নামানো মানে অপমান। চারিপাশে আর সবার মাথায় যখন টুপি আছে তখন তাঁর মাথাতেই বা পাগড়ী থাকবে না কেন?

মোহনদাস পাগড়ী খুললেন না, আদালত থেকে বেরিয়ে চলে এলেন।

শেঠজী শুনে বললেন—এখানকার রেওয়াজই এই, ভারতীয়রা আদালতে ঢুকলেই মাথার পাগড়ী খুলে রাখতে হবে।

—এতো একটা অপমান!

—সে তো বটেই, কিন্তু এর প্রতিবাদ করে কে।

—আমি এবার থেকে সাহেবী টুপি মাথায় দিয়ে যাব।

—আপনার মত লোকের পক্ষে সেটা কি ঠিক হবে? অপমানটাই কি তাহলে মেনে নেওয়া হবে না? তাছাড়া দেশী পাগড়ীতেই আপনাকে মানার ভালো, ছোট পরলে আপনাকে হোটেলের খানসামা বলে মনে হবে!

শেঠজীর কথাটা মনে লাগলো। কোর্টে কেন পাগড়ী খুলতে হবে সেই সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে মিটার গাঙ্গী এক লম্বা চিঠি লিখে পাঠালেন খবরের কাগজের অফিসে।

চিঠিখানি ছাপা হোল। কয়েকখানি কাগজে এই চিঠি নিয়ে আলোচনাও হোল, কেউ টিপ্পনী কাটলো, আবার কেউ বা মিটার গাঙ্গীকে সমর্থন করলো। কয়েকদিনের

আমাদের গান্ধিজী

মধ্যেই পত্রিকা ও তার পাঠক মহলে অব্যাহিত আগন্তুক (unwelcome visitor) হিসাবে মিটার গান্ধী পরিচিত হয়ে উঠলেন।

শেষের বায়লাটি চলছিল প্রিটোরিয়ায়। সাত-আটদিনের মধ্যেই মিটার গান্ধীকে প্রিটোরিয়ায় বণ্ডনা হতে হোল।

রাত নটার সময় নেতালের রাজধানী মরিৎসবার্গে ট্রেন এসে থামলো। একজন ইংরাজ কামরায় উঠতে এসে মিটার গান্ধীকে দেখে ধমকে দাঁড়ালো—একজন ভারতীয় কালা-আদমি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে আছে! তখনই সে দু' জন রেল-কর্মচারীকে ডেকে আনলো। একজন কর্মচারী বললো—নেমে এসো। তুমি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যাবে।

—কেন আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে।

—তা হোক, তোমাকে তৃতীয় শ্রেণীতেই যেতে হবে।

—আমি ভারবান থেকে এই কামরায় বসে আসছি, এই কামরাতেই আমি শেষ অবধি যাব।

—না, তুমি তা যেতে পাবে না। এই কামরা থেকে ভাল কথায় যদি তুমি না নাবো, পুলিশ ডেকে ঘাড় ধরে বের করে দোব।

—বেশ, তাই দাও। স্বেচ্ছায় আমি নাববো না।

কালা-আদমির এতো বড় ঔজ্জ্বল্য এর আগে আর তারা দেখেনি, রাগে ফিষ্ট হয়ে রেল কর্মচারীটি তখনই পুলিশ ডেকে আনলো। কনষ্টেবলটি মিটার গান্ধীকে ধাক্কা দিয়ে কামরা থেকে নাবিয়ে দিল, এবং সঙ্গে জিনিষপত্র সব প্ল্যাটফর্মের উপর ফেলে দিল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

দুঃখে কোতে অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ মিটার গান্ধী প্ল্যাটফর্মের উপরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কনকনে হাওয়া তাঁর সারা দেহ কাঁপিয়ে দিল। ছোট হাত-ব্যাগটি নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি এসে চুকলেন ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে। সে ঘরে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না, অন্ধকারে পাহাড়ী শীতে মোহনদাস ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। সারা রাত এক মুহূর্ত তিনি স্থির হতে পারলেন না, যনে হোল যেন হিমে সারা দেহ জমে যাবে। অন্তান্ত জিনিষের সঙ্গে একটা ওভারকোটও ছিল, কিন্তু জিনিষপত্র সবই তো এখন রেল কর্তৃপক্ষের জিম্মায়। ওভার-কোটটা চাইতে গেলে আবার হয়তো কি অপমান করে বলবে। আকাশ পাতাল ভাবনা নিয়ে মিটার গান্ধী বসে রইলেন। ষ্টেশনের কর্তারা তাঁর খোঁজ নেওয়া দরকার বলেও যনে করলেন না।

আমাদের গান্ধী

সকাল হলেই মিটার গান্ধী রেলের জেনারেল ম্যানেজার কাছে এক টেলিগ্রাম করলেন, শেঠীকেও সব জানালেন। জেনারেল ম্যানেজার জবাব দিলেন। রেলের পুলিশ অস্ত্রায় কিছু করেনি, ওই অবস্থায় তার আর কিছু করার নেই, তবে বাকী পথটুকু এবার মিটার গান্ধী যাতে ভালোভাবে যেতে পারেন বিস্থা করা হয়েছে।

আর শেঠী মরিৎস্বর্গের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের টেলিগ্রাম করে দিলেন।

শেঠীর টেলিগ্রাম শেরে ওধানকার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ঠেগনে এসে হাজির হোল। গান্ধীজীর দুঃখের কথা শুনে তারা বললো—এ আর নতুন কথা কি? রেল গাড়ীতে আমরা তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া চড়তে পাই না, ঠেগনের সাধারণ দরজা দিয়ে আমরা যাতায়াত করতে পারি না, শত শত অপমানের কাহিনী আমাদের জীবনের পাতায় পাতায় লেখা আছে। পরাধীন দেশের কালো মাছুর আমরা বিদেশে ব্যবসা করতে এসেছি, এ সব তো আমাদের সহিতেই হবে! আপনি নতুন এসেছেন, কিছুদিন থাকলেই সব দেখতে পাবেন।

তাদের দুঃখের কথা আর শেষ নেই, পরাধীন দেশের মাছুরকে স্বাধীন দেশের মাছুর সম্মান দেবে কেন? তার ওপর গায়ের রং যখন কালো! কথায় কথায় সময় কেটে যায়, রাত ২টায় প্রিটোরিয়াম ফ্রেন আসে। আগে থেকেই বার্থ রিজার্ভ করা ছিল, রাতে আর কোন হাঙ্গামা পোহাতে হোল না, তোর বেলা মিটার গান্ধী চার্লস টাউনে এসে নামলেন।

চার্লস টাউন থেকে জেহানেসবার্গ যাবার রেল-পথ নেই, যেতে হয় ঘোড়ার গাড়ীতে। বড় বড় গাড়ী, অনেকটা এখানকার বাসের মত মুখোমুখি দুসারি আসনে খাজীরা বসে আর ছাদের উপর বসে কচোয়ান আর কণ্ডাকটর। মিটার গান্ধী একটি গাড়ীর ভিতর উঠে বসতে বাচ্ছিলেন, এমন সময় কণ্ডাকটর সাহেব বললো—কই দেখি তোমার টিকিট?

গান্ধীজী টিকিট দেখালেন।

সাহেব বললো—এই টিকিট আজকের নয়, কালকের জন্ত।

—কিন্তু আজ আমার না গেলে তো চলবে না।

—নেহাৎ যদি যেতেই চাও, ভিতরে বসে যাওয়া তোমার চলবে না। ও সব সাহেবদের জন্ত, তুমি গাড়ীর ছাদে যাও।

বিতর্ক বাড়িয়ে কোন লাভ নেই, আবার হয়তো এক হাঙ্গামা বেধে যাবে। কাজেই অপমানটুকু নির্বিবাদে মেনে নিয়ে গান্ধীজী গাড়ীর ছাদেই উঠে গেলেন।

আমাদের গান্ধিজী

বেলা তিনটে নাগাদ গাড়ী এসে থামলো ছোট একটি সহরে। কণ্ডাকটরের খেয়াল হোল ছাদে বসে খানিকক্ষণ চুকটানবে। একটুকরো চট পা-দানের উপর বিছিয়ে দিয়ে সে বললো—এই কুলি এইখানে নেবে বস,—আমি জ্বাইভারের পাশে বসবো।

মিষ্টার গান্ধী প্রতিবাদ তুললেন—তুমি গোড়াতেই আমাকে ভিতরে বসতে দাওনি, অপমান করেছ, আমি মুখ বুজে তা সহেছি। কিন্তু তুমি এখন চুকট খাবে বলে এই জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমি তোমার পায়ের কাছে বসবো,—তা আমি বসবো না, তবে ভিতরে গিয়ে বসতে পারি।

কী! একজন কুলির এতো আশ্বর্ষ্য! কণ্ডাকটার মিষ্টার গান্ধীর কান দুটি ধরে আচ্ছা করে মলে দিলে, তারপর ঘাড় ধরে তাঁকে নামিয়ে দিতে গেল। গান্ধিজী প্রাণপণ শক্তিতে কোচ-বাকসের পিতলের রেলিং ধরে বসে রইলেন, হাতের কবজি ডেড়ে যায় তাও স্বীকার, তবু তিনি রেলিং ছাড়বেন না। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে কণ্ডাকটার রীতিমত প্রহার শুরু করে দিল।

গাড়ীর যাত্রীরা এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল, এবার তারা সাড়া তুললো—মিছামিছি মানুষটাকে যারছ কেন বাপু। ওতো অস্তায় কিছু করেনি।

পাঁচজনের কথায় কণ্ডাকটার গান্ধিজীকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু চোখ পাকিয়ে বললো—দাঁড়া, একবার ঠান্ডারটনে গিয়ে পৌঁছাই তারপর তোকে মজা দেখাব।

সন্ধ্যার পর গাড়ী এসে পৌঁছালো ঠান্ডারটনে। এইটিই হোল গাড়ী বদল করার আড্ডা, শেঠজীর টেলিগ্রাম পেয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আগে থেকেই এখানে উপস্থিত ছিলেন; তাদের দেখে গান্ধিজী মনে সাহস গেলেন। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তখনই এক চিঠি লিখলেন গাড়ী-কোম্পানীর এজেন্টের কাছে।

এজেন্ট জবাব দিলেন—অস্তান্ত যাত্রীদের মত এবার তুমি গাড়ীর ভিতরে বসেই যাবে। যে লোকটি তোমাকে মেরেছিল সে এবার তোমার গাড়ীতে থাকবে না।

সেই রাতটা এক শেঠজীর দোকানে কাটলো।

পরদিন আবার সেই ঘোড়ার গাড়ী চড়ে রাত্রি জেহানেলবার্গে এসে পৌঁছলেন।

জেহানেলবার্গ বেশ বড় সহর, গাড়ী থেকে নেমে কোন ভারতীয়ের মুখ দেখতে পেলেন না, মিষ্টার গান্ধী বরাবর গিয়ে গ্রাণ্ড-শাশন্যাল-হোটেলে উঠলেন, বললেন—একদিনের জন্য আমার একখানি ঘর চাই।

আবাদের গাঙ্গী

ব্যান্সেজার মি: গাঙ্গীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার বেঁধে নিলে, তারপর বললে—আবাদের কোন বর থালি নেই।

সঙ্গে এক ভারতীয় দোকানদারের ঠিকানা ছিল, গাঙ্গী বরষর তার দোকানে গিয়ে উঠলেন। সেই দোকানদারই বললো যে, এখানকার কোন হোটেলে কালা-আদমিকে আয়গা দেওয়া হয় না, ভারতীয়রা রেলো প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনতে পারে না। নেতালের চেয়ে এখানে আরো বেশী অসুবিধা...

দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজদের চাষ-আবাদের সুবিধার জন্য মজুরের দরকার হয়। দাসপ্রথা তখন উঠে গেছে, জুলুম করে নিগ্রোদের দিয়ে কাজ করানোর উপায় নেই। আর বাইনে দিয়ে যে কাজ করাবে কাকরীরা তা করতে চায় না। তাদের সকলেরই চাষ-আবাদ আছে, সাহেব-বাড়ীর চাকরী করতে তারা আসবে কেন?

ইংরাজদের তাই দৃষ্টি পড়লো ভারতবর্ষের উপর। ভারত সরকারের সঙ্গে তারা এক চুক্তি করে এদেশে ভারতীয় মজুর আমদানি করতে শুরু করে। সে আঠারো-শো-বার্ট সালের কথা। এই সব মজুরদের ইংরেজরা কুলি বলতো। ক্রমে ক্রমে এই কুলি কথাটি তারা সমস্ত ভারতবাসীর উপরেই প্রয়োগ করতে থাকে—কুলি-উকিল, কুলি-ব্যাপারী, চলতি কথা হয়ে পাড়ায়। ভারতজুমির মানুষগুলিকে কুলির জাত ছাড়া তারা আর কিছুই ভাবে না।

মিটার গাঙ্গী একটি টাইম-টেবিল নিয়ে রেলের সমস্ত নিয়ম-কানুন সেইখানে বসেই পড়ে ফেললেন, তারপর বললেন,—এমন কোন নিয়ম-কানুন তো দেখছি না, যাতে আবাদের কার্ট ক্লাশে যাওয়া কেউ আটকাতে পারে? আমি কার্ট ক্লাশে যাব।

মিটার গাঙ্গীর তখন জিদ চেপে গেছে, নিজে ঠেগুন গেলেন টিকিট কিনতে।

বুকিং ক্লার্ক ছিলেন সাহেব। গাঙ্গীজীর মুখের পানে তাকিয়ে তিনি হাসলেন, বললেন—আপনি কালা-আদমি, কালা-আদমিকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেওয়া হয় না, তবে আমি এখানকার লোক নই; আমি হল্যান্ডবাসী, আপনাদের উপর আমার কোন বিবেচ নেই, আমি আপনাকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেব। তবে একটা কথা, যদি পথে কোথাও গার্ড আপনাকে নেবে যেতে বলে তাহলে আপনাকে নেবে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে হবে কিন্তু। এই টিকিট কেনা নিয়ে পরে আপনি কোন বিতর্ক করতে পারবেন না।

মিটার গাঙ্গী কথা দিলেন। ভাবলেন জোহানেসবার্গ থেকে প্রিটোরিয়া তো রাজ আটজিশ মাইল পথ, এর মধ্যে আর কি এমন গোলযোগ হবে।

আবাহের গান্ধী

মোলযোগ কিন্তু বাথলো : মাঝ পথে আর্মিটোন ট্রেনে গার্ড এসে গান্ধীকে বললো—তুমি প্রথম শ্রেণীতে কেন ? তৃতীয় শ্রেণীতে যাওগে—

—প্রথম শ্রেণীর টিকিট রয়েছে আমার কাছে ।

—তাতে কিছু যায় আসে না ।

গাড়ীতে একজন ইংরাজ বাতী ছিলেন, তিনি এবার কথা বললেন—প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনেছে আর তৃতীয় শ্রেণীতে যাবে ? মিছামিছি ভবলোককে হয়রানি করে লাভ কি ?

—তা বলে আপনার মত একজন সাহেবের সঙ্গে একজন হুলি এক গাড়ীতে বসে যাবে ?

—থাক না, আমি তো কোন অভিযোগ করছি না ।

—আপনি যদি একজন হুলির সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে যেতে চান, আমার বলার কিছু নেই !—বলে গার্ড বিদায় নিল ।

বাকী পথটা আর কোন উপদ্রব হোল না ।

মিটার গান্ধী ভেবেছিলেন শেঠী যখন আগে থেকে জানিয়ে রেখেছেন তখন তাঁর এটনির পক্ষ থেকে কেউ-না-কেউ প্রিটোরিয়া ট্রেনে নিশ্চয়ই হাজির থাকবে । কিন্তু কোথায় কে ?

একে একে সব বাতী ফটক পার হয়ে গেল, সবায় শেষে মিটার গান্ধী টিকিট কালেক্টারের সামনে গিয়ে দাড়াইলেন ; বললেন—আমি এখানে আজ এই প্রথম এলাম, কিছুই চিনি না, আপনার জানাচনা কোন হোটেলের ঠিকানা দিতে পারেন, যেখানে আমি আজকের রাতটা কাটিয়ে দিতে পারি ?

টিকিট কালেক্টার মিটার গান্ধীর মুখের পানে তাকিয়ে মাথা চুলকে বললো—
তাইত !...তাইত !...

পাশেই একজন নিগ্রো দাঁড়িয়েছিল, সে বললো—আপনি আমার সঙ্গে আইন, আমি আপনাকে এক আমেরিকান হোটলে পৌঁছে দিচ্ছি, সেখানে থাকার জায়গা পাবেন ।

নিগ্রোটি তাকে জনটোন ক্যাবিলি হোটলে নিয়ে গেল, সেখানে কালা-খলা নিয়ে কেউ মাথা বায়ালো না । হোটেলের কর্তা বললেন—যতদিন হুসি আপনি এখানে থাকতে পারেন, কোন বাধা নেই ।

আমাদের গান্ধী

দাদা আবদুল্লাহর দাবলা চলছিল প্রিটোরিয়ার আদালতে, এটাবী ছিলেন মিটার বেকার।

প্রথম আলাপেই বেকার সাহেব ধর্মকথা পাড়লেন।

মিটার গান্ধী বললেন—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বটে কিন্তু হিন্দুধর্ম সবচেয়ে আমার বিশেষ কিছুই পড়াশুনা নেই, অস্ত্র ধর্মের উপর কোন বিশেষও আমার নেই।

বেকার খুসি হলেন, বললেন—কেন, প্রতিদিন দুপুর একটার সময় আমরা জনকয়েক বন্ধুবান্ধব মিলে এখানে প্রার্থনা করি, তোমারও নিয়ন্ত্রণ রইল।

পরদিন মিটার গান্ধী যেতেই বেকার সববেত বন্ধু ও বান্ধবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

প্রার্থনা শেষে সেদিন সকলে মিলে মিটার গান্ধীর যত্ন কামনা করলেন—হে প্রভু, আমাদের এই নবাগত বন্ধুটিকে তুমি শান্তি দাও, পাশ থেকে জাণ কর।

এই প্রার্থনা সভাতেই কোর্ট সাহেবের সঙ্গে মিটার গান্ধীর আলাপ হোল। মাহুখাট উংসাহী থুঠান, মিটার গান্ধীকে খুঁট ধর্মের অনেকগুলি বই পড়ালেন। কিন্তু যিভই যে ভগবানের একমাত্র অবতারণা—এ কথা কিছুতেই গান্ধীকে মনোতে পারলেন না।

একদিন কোন কান্ধীকে মিটার গান্ধীর গলায় কঠির মালা দেখে কোর্টসের চোখ তেঁ কপালে উঠলো!—তোমার গলায় আবার ওটা কি? ওই কুসংস্কারের চিক্কাটা তুমি এখনও রেখেছ? ছিঁড়ে ফেলে দাও—

—না, ওটা থাক। ওটা আমার মা নিজের হাতে গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

—কিন্তু তুমি কি ওই-সব কুসংস্কার বিশ্বাস কর?

—আমি হয়তো বিশ্বাস করি না, কিন্তু মা বিশ্বাস করে আমার গলায় বা আবদর করে পরিয়ে দিয়েছিলেন আমি সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারি না।

যুক্তিটা কোর্টসের মনঃপুত হোল না, তিনি অস্ত্র কথা পাড়লেন।

ইন্ডুভালে তখন ভারতীয়দের উপর অনেক কড়া-কড়া আইন জারী হয়েছে।

প্রিটোরিয়া ইন্ডুভালেরই রাজধানী। সেখানে ভারতীয়দের ফুটপাথের উপর দিয়ে চলা নিষেধ, রাত নটার পর কোন ভারতীয় বাঙালি বাইরে থাকতে পারবে না, —রাত নটার পর পথ দিয়ে ‘কুলি’ সেলেই তার পাস চাই! আর সেই পাস জু তায়াই পেতে পারে দাদা সাহেব-গান্ধীর চাকর।

আমাদের গান্ধীজী

মিটার গান্ধী চাকর নন, পাসও নেই।

কিন্তু রাতে বেড়ানো তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস, ছাড়তে পারেন না। তবে অধিকাংশ দিন কোর্টস সাহেব তাঁর সঙ্গে থাকেন, ফুটপাথের উপর দিয়েই দুজনে চলা-ফেরা করেন।

একদিন কোর্টস সঙ্গে নেই, মিটার গান্ধী অভ্যাসমত ফুটপাথের উপর দিয়েই যাচ্ছেন। পথের উপরেই ট্রান্সভালের শাসনকর্তা প্রেসিডেন্ট জুগারের বাড়ী। বাড়ীর দরজার একজন শাস্ত্রী পাহারা দিচ্ছিল। তার নজরে পড়লো একা একজন কুলি ফুটপাথের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সে আর সইতে পারলো না, ছুটে এসে থাকা দিয়ে বুটের ঠোঙর মেরে মিটার গান্ধীকে ফুটপাথ থেকে নাবিয়ে দিল।

মিটার গান্ধী থ' হয়ে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে কোর্টস সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—গান্ধী, আমি সব দেখেছি; তুমি গুর নামে নালিশ কর, আমি সাক্ষ্য দোব।

মিটার গান্ধী বললেন—ওর তো কোন দোষ নেই, কালা-আদমিরের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত, ও তাই করেছে।

—ওর সাজা হওয়া উচিত।

—কিন্তু আমি তো ওর নামে নালিশ করতে যাব না। এদেশে ভারতবাসী যাত্রাই যখন কুলি, এবং আত্মনতঃ খারাপ ব্যবহার পাবার যোগ্য তখন ওই শাস্ত্রী বেচারার দোষ কি বল?

কোর্টস তখন মিটার গান্ধীকে ছেড়ে শাস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। কয়েক মিনিটেই শাস্ত্রী নিজের দোষ বুঝতে পারলো এবং মিটার গান্ধীর কাছে ক্ষমা চাইল।

মিটার গান্ধী কিন্তু সেদিন থেকে সেই পথে চলাই ছেড়ে দিলেন।

প্রিটোরিয়ায় ভারতীয়-বেশী ছিল না। ধারা ছিলেন তাঁদেরকে নিয়ে গান্ধীজী একদিন এক ধরোয়া সভা করলেন। শেঠ হাজি-মুহম্মদ-হাজি-মুসবের বাড়ীতে সভা বসলো। সভায় ট্রান্সভাল রাজ্যে ভারতীয়দের যে সব দুঃখ কষ্ট সইতে হয় তাই নিয়ে আলোচনা হোল। ভারতীয়দের নিয়ে এক সম্মত গড়ে তোলার কথাও হোল।

ওখানকার অধিকাংশ ভারতীয়ই ইংরাজী জানতো না, অথচ ইংরাজী না জানলে বিদেশে নানা অসুবিধা। মিটার গান্ধী বললেন, তোমাদের ইংরাজী শিখতে হবে, যিমা পরলক্ষ্য আমি তোমাদের ইংরাজী শেখাব।

আমাদের গান্ধিজী

সেই সভাতেই তিনজন ছাত্র জুটে গেল : এক নাসিত, এক কেরানী, এক দোকানদার। তবে তারা কেউ গান্ধিজীর কাছে পড়তে আসবে না, গান্ধিজীকে তাদের বাড়ী গিয়ে পড়িয়ে আসতে হবে, তাও আবার তাদের সুবিধামত সময়ে।

গান্ধিজী তাতেই রাজী হলেন।

আটমাস গান্ধিজী তাদের পড়িয়েছিলেন।

এই সভার পক্ষ থেকে গান্ধিজী ভারতীয়দের অবস্থা উন্নত করার জন্ত সচেষ্ট হলেন।

প্রথমেই চিঠি লিখলেন রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে—কেন ভারতীয়দের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়তে দেওয়া হবে না ?

রেল কর্তৃপক্ষ উত্তর দিলেন—ভালো পোষাক-পরিচ্ছদ থাকলে ভারতীয়রা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়তে পারবে।

কিন্তু কোনটে ভালো পোষাক তা ঠিক করবে কে ?

যাক, তবু অধিকারটা যে মানিয়ে নেওয়া গেল সেইটাই বড় কথা।

বছর খানেকের মধ্যেই শেঠজীর মায়ালা মিটে গেল। গান্ধিজী দেশে ফেরার যোগাড় করলেন।

শেঠজী ভারবানে এক ভোজ-সভা করলেন—গান্ধিজীকে বিদায় দেবার জন্ত।

সভার মাঝে একখানি খবরের কাগজ গান্ধিজীর হাতে এসে পড়লো। একটি খবরে ছাপা হয়েছে যে নেতাল ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে ভারতীয়েরা যে ভোট দিতেন, একটি আইন পাস করে সেই অধিকার থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

গান্ধিজী সেই সভার মাঝেই কথা তুললেন। নেতাল রাজ্যে তখন লোকসংখ্যা ছিল—চার লক্ষ জুলু, আশী হাজার ভারতীয় আর চল্লিশ হাজার সাহেব। এই আশী হাজার মানুষের কোন অধিকার থাকবে না, আর চল্লিশ হাজার মানুষ নিজের মনোমত আইন করে বা খুসি তাই করবে। এ ব্যাপারকে কখনো হবেই।

—কিন্তু কখনো কে ?

ভারতীয়রা গান্ধিজীকে বললেন, আমরা তো কিছুই ভালো বুঝি না, আর তুমি তো দেশে চললে। তবে তুমি যদি কিছুদিন এখানে থাকো, তোমার কথামত আমরা কাজ করতে পারি।

সববেত সকলে চারিপাশ থেকে সাড়া তুললো—ঠিক কথা, গান্ধীজীকে এখানে থাকতে হবে।

আমাদের গান্ধী

গান্ধীজী থাকতে রাজী হলেন।

সেই রাতেই ব্যবস্থা-পরিষদে পাঠানোর জন্য এক আবেদন-পত্র লেখা হোল।

পরপর কয়েকটি প্রতিবাদ সভা করা হোল।

শেষে দশ হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষর নিয়ে এক আবেদন পাঠানো হোল বিলাতের
উপনিবেশ-সেক্রেটারী লর্ড রিপনের কাছে।

তথাপি নেতাদের আইন সভায় আইনটি ঠিক পাস হয়ে গেল।

গান্ধীজী বললেন—আর তো করার কিছু নেই, এবার আমি ভারতে ফিরে
যাই!

আবার সেই পুরানো কথা উঠলো—আপনি গেলে কে আমাদের চালাবে?

—কিন্তু এসব করলে আমার খরচ চলবে কেমন করে?

—আপনার খরচ আমরা চালাবো, মাসে মাসে আমাদের সমিতি থেকে আপনি
পঁচিশ পাউণ্ড করে পাবেন।

—তা হয় না, জনসেবার কাজে পরিশ্রম নিতে নেই, আমি বরং এখানে ওকালতি
শুরু করি, আপনারা আমাকে কিছু কিছু কাজ দিন।

সকলে সানন্দে রাজী হোল।

গান্ধীজী ওকালতি করার জন্য আবেদন করলেন।

বার এসোসিয়েশনে সাড়া পড়ে গেল,—একটা কুলি ব্যারিষ্টার এসে বসবে তাদের
মাঝে? একবার একটা কুলিকে চুকতে দিলে আর রক্ষা আছে, কুলি উকিল আর
কুলি ব্যারিষ্টারে আদালত ছেয়ে যাবে! ধলা আইনজীবীরা এক সঙ্গে আপত্তি
জানালো—গান্ধীকে এখানে চেনে কে? যে-গান্ধী ব্যারিষ্টারী পাশ করেছে এই
মাহুখটিই ঠিক সেই-গান্ধী কিনা, কি করে জানা যাবে? ইত্যাদি...

প্রধান বিচারপতির কাছে কিন্তু এ সব কথা টিকলো না, তিনি বললেন—
আইনের চোখে কাল-ধলার কোন পার্থক্য নেই, মিটার গান্ধী এখানে ব্যারিষ্টারী
করতে পারেন।

গান্ধীজী নেতাল কোর্টে ব্যারিষ্টারী শুরু করলেন।

ভিনমাস পরের কথা।—

একদিন সকালে একজন মাদ্রাজী এসে গান্ধীজীর সামনে পাগড়ী খুলে কাঁড়ালো :
জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে, সামনের দুটি দাঁত ভেঙে রক্ত বয়ছে, খর খর করে সে
কাঁপছে ও কাঁদছে।

আমাদের গাঙ্গুলী

—কি হয়েছে ?—বিশ্বের গাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করলেন।

আগন্তুক বিশ্বের দুঃখের কাহিনী বললো। জাতে সে তামিল, নাম তার বলহ্মন্দরম্, ভারবানের এক নামকরা সাহেবের সে গিরমিটিয়া কুলি। সামান্য কি একটা দোষ হয়েছিল, তাতেই সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে এমন মার দিয়েছে যে, তার পাঁচ ডেঙে গেছে। এখন যদি গাঙ্গুলী তার কিছু প্রতিকার করতে পারেন।

—তাতো বুঝলাম, কিন্তু মাথা থেকে পাগড়ী খুললে কেন? পাগড়ী পর—

—আজ্ঞে আপনি মামী লোক.....

—আমি তোমাদেরই বড় একজন।

এমন কথা বলহ্মন্দরম্ আশা করে নি, হিরদিন অন্তলোককেই সে সম্মান দেখিয়েছে। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

গাঙ্গুলী বললেন—কই পাগড়ী বাঁধো।

বলহ্মন্দরম্ পাগড়ী বাঁধলো।

তারপর গাঙ্গুলী তাকে পাঠালেন এক ডাক্তারের কাছে।

বলহ্মন্দরমের জন্তু কতটুকু কি করা যায় সেইটাই হোলো গাঙ্গুলীর ভাবনা।

আফ্রিকার সাহেবেরা ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে গুদেয়ে মজুর আমদানী করতো। সর্ব্ব থাকতো যে পাঁচ বছর করে তারা কাজ করবে তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। চুক্তি কথাটিকে ইংরাজীতে বলে 'এগ্রিমেন্ট', অশিক্ষিত ভারত-বাসীর মুখে-মুখে সেইটাই হয় 'গিরমিটিয়া'।

বলহ্মন্দরম্ এমনি একজন গিরমিটিয়া মজুর।

গাঙ্গুলী বলহ্মন্দরমের মনিবের সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন—আপনি যে ভাবে মারধর করেছেন তাতে আপনার নামে যদি আমরা মাফলা করি, আপনার সাজা হয়ে বাবে, কিন্তু আমি তা চাই না, আপনি বলহ্মন্দরমকে ছেড়ে দিন।

সাহেব দেখলেন বেগতিক, বললেন—বেশ আমি ওকে ছেড়ে দোব, আপনি ব্যবস্থা করুন।

এই ব্যবস্থা করার মধ্যেও আবার আর এক হালান্য আছে। গিরমিটিয়া মজুরেরা এসেলে আসে পাঁচ বছরের চুক্তিতে। এই পাঁচ বছরের আগে তার চুক্তি নেই, এক সাহেব তাকে অন্য সাহেবের কাছে দিতে পারে, কিন্তু যেসব কুরোবান আগে তাকে ছেড়ে দিতে পারে না।

সাহেবের গাফিলত

গাফিলত অনেক খুঁজে-পেতে একজন ভালো সাহেব টিক করলেন, বলহুন্দরম্ হাত পালটালো।

এই গিরিবিটরা মজুরদের উপর নেতাল সরকার বাথা শিল্প বার্ষিক পচিশ পাউণ্ড—প্রায় তিনশো পঁচাত্তর টাকার এক ট্যাক্স বসিয়ে দিলে।

এই ট্যাক্স বসাবার পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। যে মজুরদের ভারতবর্ষ থেকে চুক্তি করে আনা হোত, তারা আর দেশে ফিরতো না। পাঁচ বছর কাজ করার পরে তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ করে তারা স্বাধীনভাবে নেতালে বাস করতে পারতো। দক্ষিণ আফ্রিকার জমি খুব উর্বরা, কম খেটে বেশী ফসল পাওয়া যায়। তারা তখন জায়গা-জমি কিনে চাষ-আবাদ শুরু করতো। নিগ্রোদের সঙ্গে ভারতীয়দের কারবারও রীতিমত জমে উঠলো। সাহেবদের দোকানে নিগ্রোরা ভাল ব্যবহার পেতো না, চায় শিলিংয়ের জিনিষ কিনে সাহেবের হাতে একটি পাউণ্ড দিয়েছে, সাহেব হয়তো খুচরো কিছুই ফেরৎ দিল না, নরতো দয়া করে চায় শিলিং ফেরত দিল। বাকীটা ফেরত চাইলেই লাথি, খাম্বড়, পালাগালি। কিন্তু ভারতীয়দের দোকানে গেলে সে ভয় নেই, সেখানে ভক্ত ব্যবহার পাওয়া যায়, দয়দস্তর করা যায়। নিগ্রোরা সেই জন্য ভারতীয়দেরই বেশী পছন্দ করে।

নিগ্রোদের ব্যবসা খারাপ হতেই সাহেবদের বিষয় বাড়ে, ভারতীয়দের সে-দেশ থেকে তাড়াবার জন্য তারা রীতিমত সচেষ্ট হয়ে উঠলো। নেতাল সরকার আইন পাস করে দিল : ভারতীয় মুলিদের চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই, হয় তারা আবার নতুন করে চুক্তি করবে, আর না হয় মাথাপিছু বছরে পচিশ পাউণ্ড—প্রায় তিনশো পঁচাত্তর টাকা কর দিতে হবে।

এত বড় একটা অভ্যাসকে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। গাফিলত সমস্ত ভারতীয়কে সম্মুখ করে যে সমিতি গড়েছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন—নেতাল ভারতীয় কংগ্রেস। সেই কংগ্রেস এবার এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলো।

এই আন্দোলনের রেশটুকু ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছল। লর্ড এলসিন তখন ভারতের বড়লাট, একটা বাতাবাড়ি তাঁর ভালো মনে হোল না, তিনি প্রতিবাদ করলেন। নেতাল সরকার করের পরিবাণ করিয়ে ডিন পাউণ্ডে নাবালো।

কিন্তু ডিন পাউণ্ড করও তো কম নয়। সাধারণতঃ যদি একটি সংসারে বাপ বা ও দুটি ছেলে বেলে থাকে তাহলেই বাপকে বছরে বারো পাউণ্ড কর দিতে হবে।

আবাহের গাঙ্গিণী

একজন গরীব লোক শুধু ভারতীয় বলেই মিছামিছি একশত আশী টাকা বছরে কর দেবে কেন ? একেবারে কর তুলে দেবার জন্য আন্দোলন চলতে লাগলো ।

এইভাবে তিনটি বছর কেটে গেল, গাঙ্গিণী এবার কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরলেন ।

এই সময় বোম্বাইয়ে প্লেগ দেখা দিল ।

রাজকোটের হান্সবও শঙ্কিত হয়ে উঠলো, স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি গঠিত হোল—
বোম্বাইয়ের প্লেগ রাজকোটে বেন সংক্রামিত না হয় ।

গাঙ্গিণী এই দলে যোগ দিলেন ।

প্রতি গৃহ পৰ্যবেক্ষণ করার কথা উঠলো ।

গাঙ্গিণী বললেন—খালি ঘর দেখলেই হবে না । প্রত্যেক বাড়ীর পায়খানা-
গুলো আগে দেখতে হবে—ওইখান থেকেই তো রোগ ছড়ায় ।

পায়খানা পরিদর্শন শুরু হোল ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্রী, ছত্রী প্রভৃতিদের পায়খানা দেখতে আপত্তি উঠলো না, কিন্তু
চেড়বাড়া অস্পৃশ্য বস্তুতে যাবার সময় সবাই বেকে বসলো—বাদের ঘরে ঢুকলে
জ্ঞান করতে হয়, তাদের পায়খানা দেখতে হবে ?

গাঙ্গিণী বললেন—কেউ না যায় আমি একাই যাব ।

সমিতির আরেকজন সাড়া দিল, বললো—আপনি গেলে আমিও যাব ।

হু'জনে গিয়ে ঢুকলেন অস্পৃশ্য পরীতে । আজ অবধি সে পাড়ায় কোন
ভদ্রলোক ঢোকেনি । তারা তো হু'জনকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না, বাড়ীর
ভিতরে বাহিরে গাঙ্গিণীকে সব দেখিয়ে দেয়—চারিপাশ গোবর দিয়ে নিকানো
ঝকঝকে তক্তকে,—নগরের অনেক বামুন-বাড়ীর চেয়েও ভালো ।

এর আগে গাঙ্গিণী আর কখনও কোন অস্পৃশ্য পাড়ায় ঢোকেননি ।

ইতিবধ্যে গাঙ্গিণী ঠিক করলেন—দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার নিয়ে এদেশে
একটা সাড়া তুলতে হবে ।

রাজকোটে বলে মাসবানেক ধরে তিনি একখানি ছোট বই লিখলেন । তাতে
দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা কি অবস্থায় আছে তাই লিপিবদ্ধ করলেন । লম্বা
হাফার ছেপে বইখানি বিনামূল্যে বিতরণ করলেন বস্ত খবরের কাগজের আশি
আর চিন্তামূল লোকদের কাছে ।

দেশে একটা সাড়া পড়ে গেল ।

স্বাধীনতা গান্ধিজী

বইখানির মলাট ছিল সবুজ, লোকে তার নাম দিল 'সবুজ পুঁথি'।

তারপর দেখা করলেন জঙ্গ মহাসেব গোবিন্দ রাণাজের সঙ্গে। রাণাজে সব শুনে বললেন—জঙ্গ বঙ্গবন্ধু তাকে একবার দেখা কর।

গান্ধিজী গেলেন তায়েবজীর কাছে। তায়েবজী বললেন—বোম্বাইয়ের বাঘ তার বিরোজনা মেটার কাছে একবার বাও।

যেটার সঙ্গে গান্ধিজীর কথা হোল মাত্র দু' মিনিট। সেক্রেটারীকে ডেকে মেটা তখনই বোম্বাইয়ে এক জনসভা করার তারিখ ও সময় ঠিক করে ফেললেন।

এদিকে সভা হবার দু'দিন আগে গান্ধিজীর ভক্তিগতি যারা গেলেন, মনটা বড় বিষন্ন, সভায় কি বলবেন কিছুই ঠিক করেননি, অথচ তিনিই সভার প্রধান বক্তা। বিরোজনার সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বললেন—বাই বল না কেন লিখে বলবে, বক্তৃতা লেখা না থাকলে খবরের কাগজে বা খুসি তাই ছেপে দেবে।

সেই দিন রাত এগারোটা অবধি গান্ধিজীকে বক্তব্যটুকু লিখতে হোল।

পরদিন তার কাওয়াসজী-আহাজীর-ইন্সটিটিউটে সভা বসলো, শত শত ছাত্রের ভীড়। বক্তৃতা পাঠ করতে উঠে গান্ধিজীর মুখ থেকে আর কথা সরে না। বিরোজনা উৎসাহ দিয়ে বললেন—জোরে পড়।

কিন্তু পড়বে কে? গান্ধিজী তখন কাঁপতে শুরু করেছেন।

কেশবরাও দেশপাণ্ডে এগিয়ে এলেন, বললেন—দাও আমি পড়ি—

কাগজখানি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে গান্ধিজী স্বস্তি পেলেন। কিন্তু জনতা চীৎকার করে উঠলো—ওয়াচা পড়ুক! ওয়াচা!

দীনশা এতলজী ওয়াচা বক্তৃতাটা পড়তে শুরু করলেন।

জনতা শুরু হয়ে শেষ অবধি শুনলো। পরদিন বোম্বাইয়ের সব কাগজেই সাড়া পড়ে গেল।

গান্ধিজী বোম্বাই থেকে গেলেন পুণায়। লোকমান্য বালগজাধর তিলকের সঙ্গে দেখা করলেন। তিলক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি গোপাল রাণ্ডের সঙ্গে দেখা করেছেন?

—গোপাল রাণ্ড কে?

—আমি গোপাল কৃষ্ণ গোখলের কথা বলছি। এখানে দুটি দল আছে, একটি আমার দল 'সার্বজনিক সভা'। আরেকটি গোখলের দল 'দাম্পিত্য সভা'। দুই

দলের মধ্যে বেশ বেবারেখিও আছে। যদি আমার দলের কাউকে সভাপতি করেন তাহলে পেশখলের দলের কেউ সেই সভায় আসবে না, আর যদি গোখলের দলের কাউকে সভাপতি করেন তাহলে আমার দলের লোক সেই সভায় যাবে না। সেই জন্যই আপনার সভায় এমন একজন লোককে সভাপতি করতে হবে, যিনি কোন দলের নন। যেমন ধরুন অধ্যাপক ভাণ্ডারকর।

গান্ধিজী গোখলের সঙ্গে দেখা করলেন।

সব কথা শুনে গোখলে বললেন—লোকমান্ন ঠিক কথাই বলেছেন, আপনি ডক্টর ভাণ্ডারকরকে সভাপতি করুন।

ডক্টর ভাণ্ডারকরকে সভাপতি করে পুণায় সভা হোল। এতো লোক সমবেত হয়েছিল যে, সভা-ঘর ছাপিয়ে রাস্তাতেও লোক দাঁড়িয়েছিল।

পুণার পর যাত্রাজ। ‘হিন্দু’র সম্পাদক ডাক্তার হুত্রাকনিয়মের সভাপতিতে যাত্রাজের ‘পাচাইয়ান্না হলে’ বিরাট সভা হোল।

তারপর কলিকাতা।

গান্ধিজী হুরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। হুরেজনাথ সব শুনে বললেন—আমাদের এই দেশেই এতো অসুখ অবিচার ঘটছে তারই কোন প্রতিবিধান হয় না, আর হুদ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় কি হচ্ছে না-হচ্ছে তা নিয়ে সাধারণ লোকের মাঝে সাদা ভোলা খুব কঠিন। হু’দ্র জনের সঙ্গে আগে দেখা-সাক্ষাৎ করুন।

গান্ধিজী গেলেন ‘অমৃত বাজার পত্রিকার’ আফিসে, সেখানে কারুর কোন উৎসাহ দেখা গেল না।

‘বঙ্গবাসীর’ সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গান্ধিজীকে বাইরে বসে থাকতে হোল এক ঘণ্টা। তারপর যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কথা পাড়লেন, সম্পাদক যশাই বললেন—আমার এখন এতটুকু অবসর নেই, আপনার কথা এখন শুনে পায়ছি না, আপনি আর এক সময় আসবেন।

গান্ধিজী ক্রম মনে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

এবার তিনি গেলেন স্টেটসম্যান আর ইংলিশম্যানের আফিসে। সম্পাদক হু’জনেই গান্ধিজীর সঙ্গে অনেক কথার আলোচনা করলেন, শেষে দীর্ঘ দুটি বিবৃতি ছাপলেন তাঁদের দুই কাগজে।

গান্ধিজী এবার উৎসাহ পেলেন, ঠিক করলেন কলকাতার একটা সভা করবেন। সব উত্তোষ-আয়োজন শুরু করেছেন, এমন সময় তারখান থেকে ‘ভার’ এলো—শ্রী

কলিকাতায় আর সভা করা হোল না, তিনি কিরে গেলেন বোম্বাইয়ে এবং সেখান থেকে যাত্রা করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার।

একই দিনে দু'খানি আহাঙ্গ এসে পৌঁছালো ট্রান্সভালে—‘কুরল্যাণ্ড’ ও ‘নাদেরী’। আহাঙ্গ দু'খানিতে যাত্রী ছিল প্রায় আট শো। যাত্রীরা আসছে বোম্বাই থেকে। বোম্বাইয়ে তখনও প্লেগ হচ্ছে। নেতালের সরকারী ডাক্তার হুকুম জারী করলেন—সবাইকে আরো পাঁচ দিন আহাঙ্গে থাকতে হবে, প্লেগের বীজাণু মাহুয়ের মেহে তেইশ দিন অবধি বেঁচে থাকে। বোম্বাই থেকে আসতে লেগেছে আঠারো দিন, আরো পাঁচদিন তাদের দেখা দরকার।

কিন্তু নেতালে তখন অন্ত ব্যাপার চলছে। সাহেবরা শুনেছে গান্ধিজী ‘সবুজ পুঁথি’ লিখে তাদের নিষেধ করেছেন, ভারতবর্ষে বড় বড় সভা করে তাদের গালি দিয়েছেন। এখন আবার দু'আহাঙ্গ ভতি লোক নিয়ে এসেছেন সেই দেশ থেকে। এক সভা করে সাহেবরা ঠিক করলো—আহাঙ্গ থেকে গান্ধীর দলকে নাযতে দেওয়া হবে না।

আহাঙ্গের মালিককে ভয় দেখানো হোল—আহাঙ্গ দু'খানি সে যদি আবার বোম্বাই কিরিয়ে না নিয়ে যায় তাহলে তার ব্যবসায়ের সমুহ ক্ষতি হবে।

আহাঙ্গের যাত্রীদের কাছে ইস্তাহার পাঠানো হোল—যদি কেউ আহাঙ্গ থেকে নামে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ জলে ফেলে দেওয়া হবে।

এই ইস্তাহার দেখে যাত্রীরা কিছু ভয় পেল না, তাদের অনেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার পুরানো বাসিন্দা, এখানে তাদের বাড়ী আছে, ব্যবসা আছে, এখানে তারা রাখেই।

শেষ অবধি যাত্রীদের জয় হোল। তেইশ দিন পরে সরকারী হুকুম পাওয়া গেল—আহাঙ্গ থেকে যাত্রীরা এবার নাযতে পারে।

আহাঙ্গ ডকে এসে লগলো, যাত্রীরা নাযতে শুরু করলো, গান্ধিজীও নাযবার জন্য তৈরী হচ্ছেন এমন সময় সরকার পক্ষের একজন লোক খবর পাঠালেন—সাহেবদের দত্ত রাগ গান্ধিজীর উপর, গান্ধিজীকে গেলে এখনি হয়তো তারা মেয়ে ফেলবে। তিনি যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে আহাঙ্গ থেকে নাযেন, ডক-হুপারিণ্টেণ্ট তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ী পৌঁছে দেবেন।

গান্ধিজী রাজী হলেন।

আহাঙ্গের ক্যাপটেন হাসতে হাসতে বললো—যদি সত্যি ওরা হারপিট করে, আপনাকে জলে চুখিয়ে দেয়—আপনি কি করবেন ?

গাঙ্গী বললেন—কিছুই না। ওদের বিকছে আবাহ ভোঁ করার কিছু নেই।
—ওরা ভাবছে ওরা যা করছে ঠিকই করছে, এই অজ্ঞতার ভঙ্গ ওদের প্রতি
কল্পা করা ছাড়া আর কি করতে পারি? আশা করি ভগবান আবাহকে সকল দুঃখ
সইবার মত শক্তি দেবেন।

কিছুক্ষণ পরে গাঙ্গীজীর উকিল-বন্ধু লাকটন সাহেব এসে বললেন—সন্ধ্যার
অন্ধকারে নাবা আমি ভালো বলে মনে করি না, কার মনে কি আছে কে জানে, দিনে-
দিনে যাওয়াই ভালো।

আবাহে কস্তুরবা ও ছেলেরা ছিলেন, তাঁদেরকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে লাকটনের
সঙ্গে গাঙ্গীজী হাঁটতে শুরু করলেন।

পথে নাকতেই পাগড়ী দেখে একদল ছোকরা গাঙ্গীজীকে চিনতে পারলো।
চীৎকার তুললো—গাঙ্গী যাচ্ছে, গাঙ্গী! মার মার!

কয়েকটি বয়স্ক বালক ঢিল ছুঁড়ে মারলো, হৈ-হৈ পড়ে গেল রাস্তার মাঝে।

সামনে পুরা দু'মাইল পথ, এভাবে হেঁটে যাওয়ার বিপদ আছে, লাকটন একখানি
রিক্সা ডাকলেন। চারিপাশের ছেলেরা রিক্সাওয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—
গাঙ্গীজী উঠলেই তারা রিক্সা ভেঙ্গে দেবে। রিক্সা-ওয়ালা পালিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে গাঙ্গীজীর চারিপাশে শত শত ছেলে বুড়ো জড়ো হয়ে গেল। ভীড়
ঠেলে আর অগ্রসর হবার উপায় রইল না। কয়েকজন সাহেব টেনে লাকটনকে ধরে
সরিয়ে দিল। তারপর শুরু করলো গাঙ্গীজীকে প্রহার—পচা ডিম, ইটপাটকেল,
কিল, চড়, ঘুসি, লাথি, কিছুই বাধ রইল না।

যায়ের চোটে গাঙ্গীজীর মাথা ঘুরে গেল, টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়
হাতের কাছে একটি বাড়ীর রেলিং পেয়ে চেপে ধরলেন। তখনও যায়ের বিরাগ
নেই। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, চোখ অন্ধকার হয়ে এলো, হাতেও আর জোর
পাচ্ছেন না, এবার বুঝি আর জীবনের আশা নেই।

ভারবানের পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের স্ত্রী শ্রীমতী আলেকজান্ডার যাচ্ছিলেন সেই
পথ দিয়ে। গাঙ্গীজীকে তিনি চিনতেন। ভীড়ের মাঝে গাঙ্গীজীকে দেখতে পেয়ে
এগিয়ে এলেন, পাশে এসে হাতা থুলে গাঙ্গীজীকে আড়াল করে ধরলেন। শ্রীমতীকে
আঘাত না করে গাঙ্গীজীকে আঘাত করার উপায় রইলো না। জনতা কান্ড হতে
বাধ্য হোল।

এক ভারতীয় যুবক ব্যাপারটা দেখছিল, এবার সে ছুটে গিয়ে খানায় খবর দিল।

খবর পেয়েই আলেকজান্ডার সাহেব পুলিশ নিয়ে এলেন, চারিপাশে পুলিশ

আমাদের গান্ধী

খেদাও করে গান্ধীজীকে রক্তামজীর বাড়ী পৌছে দিলেন। গান্ধীজীর সারা দেহ তখন কত বিকৃত। আহাঙ্গের ডাক্তার দাবী বরজোর তখন দেখানেই ছিলেন, তিনি গান্ধীজীর গুত্রব্য নিযুক্ত হলেন।

এদিকে রক্তামজীর বাড়ীর সামনে ক্রমশঃই ভীড় জমছে। গোরারা চীৎকার করছে—ভাল চাও তো গান্ধীকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, নাহলে বাড়ীতে আগুন দোব, দোকানে আগুন দোব, গুটীস্ব পুড়িয়ে মারবো...।

আলেকজাণ্ডার সাহেব নিজে রক্তামজীর বাড়ীর কটকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, উন্নত জনতার হালচাল তাঁর কাছে ভালো মনে হলো না। ভিতরে গান্ধীজীর কাছে তিনি খবর পাঠালেন,—জনতাকে আর বেশীক্ষণ সামলে রাখা যাবে না। তারা একবার ভিতরে গিয়ে ঢুকলে কিছুই আর আস্ত থাকবে না। বাড়ীতে আগুন লাগিয়েও দিতে পারে। সবদিক রক্ষা করতে হলে এখানে আর একদণ্ডও আপনার থাকা চলবে না। আপনি তৈরী হলেই আমার লোক আপনার পালাবার ব্যবস্থা করে দেবে।

আত্মীয় বন্ধুদের রক্ষার জন্য গান্ধীজী আর বিমত করলেন না। আলেকজাণ্ডার দু'জন ভিটেকটিভকে ভিতরে পাঠিয়েছিলেন; তাদের একজন মুখে কালো রং মেখে ভারতীয় ব্যবসায়ীর পোষাক পরলো। গান্ধীজীকে পরালো এক কনষ্টেবলের পোষাক। যদি আবার কেউ চিনতে পেরে ঢিল ছোঁড়ে, তাই মাথার উপর একটি হেলমেট রেখে চারিশাশে মাস্তোজী পাগড়ী বাঁধলেন। তারপর রক্তামজীর বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে বাহির হয়ে, একটি সরু গলি পার হয়ে এক দোকানে গিয়ে ঢুকলেন। দোকানের পিছনের গুদামের ভিতর দিয়ে গিয়ে নাবলেন জনতার মাঝে। জনতার তখন সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্বিঘ্নে তিনজনে এক মোটরে গিয়ে উঠলেন এবং থানায় এসে পৌঁছলেন।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট জনতার সঙ্গে একতরফ হাঙ্গি-ভামাসা করছিলেন, এবার...পান ছুড়ে দিলেন :

Hang Old Gandhi

On the sour apple tree...

[বুড়ো গান্ধীকে ঝুলিয়ে দাও, টক আপেল গাছের ওই ডালে।]

গান্ধী চলে গেছেন খবর পেয়েই তিনি এবার জনতাকে মুখোমুখি এর করলেন—
তোমরা কি চাও ?

—আমরা গান্ধীকে চাই।

আমাদের গান্ধীজী

—তাকে নিয়ে কি করবে ?

—পুড়িয়ে মারবো।

—কেন, তিনি কি করেছেন ?

—সে হিন্দুস্থানে সভা-সমিতি করে আমাদের মিছামিছি গালি দিয়েছে, হাজার হাজার ভারতীয়কে এখানে নিয়ে আসছে।

—কিন্তু তিনি যদি এখন বাইরে না আসেন ?

—তাহলে এই বাড়ীটাই জালিয়ে দোব।

—এখানে তার স্ত্রী ও পুত্রেরা আছেন। আরো অনেক মহিলা ও ছেলেমেয়ে আছেন, তাদেরকে পুড়িয়ে মারতে তোমাদের লজ্জা করবে না ?

—সে তো আপনারই দোষ, আপনি তাকে এনে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন, সব মিটে যাক—

আলেকজান্ডার হেসে বললেন—কাকে এনে দোব ? গান্ধীজী এ বাড়ীতে নেই। অনেক আগেই এখান থেকে পালিয়েছেন তিনি।

—মিছে কথা ! মিছে কথা।

—বেশ, আমার কথায় যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তোমরা ক'জন এসে বাড়ীর ভিতর খুঁজে দেখ।

তখনই জনকয়েক বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লো, কন্সটামজীর বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো, তার পর বাইরে এসে জনতাকে বললো—সুপারিন্টেন্ডেন্টের কথাই ঠিক, গান্ধী নেই।

জনতা একে একে প্রস্থান করলো।

বিলাতে এ খবর গেল। চেম্বারলেন তখন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ছিলেন, তিনি নেতাল গবর্নেন্টের কাছে টেলিগ্রাম করলেন—অপরোধীদের সাজা দিতে হবে।

মিষ্টার এসকথ ছিলেন বিচার বিভাগের বড় কর্তা। তিনি গান্ধীজীকে ভেঁকে বললেন—বারা আপনাকে মেরেছে তাদের মধ্যে যাকে-যাকে আপনি চেনেন তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করুন। আমরা আপনাকে সাহায্য করবো।

গান্ধীজী বললেন—তাদের উপর আমার কোন রাগ নেই, দোষ তো তাদের উপরওয়ালাদের। তারা যেমন বুঝিয়েছে এরা তেমন বুঝেছে। আমি কারুর নামে নালিশ করবো না।

—বেশ, আপনি তাহলে এই কথাগুলোই লিখে দিন, আমি চেম্বারলেন সাহেবকে জানাবো।

আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজী তখনই লিখে গিলেন।

কাগজে কাগজে যখন এই ধর বেরলো তখন সাহেবরা সত্যি লজ্জা পেলো। সবাই উন্নত গুণের দলকে নিন্দা করলো। চারদিন পরে গান্ধিজী থানা থেকে বাড়ী ফিরলেন।

ব্যারিষ্টারী করতে হলে ফিটকাট থাকতে হয়। প্রতিদিন কলার পালটাতে হয়, সার্ট বদলাতে হয়। গান্ধিজীর ছুঁতিন ডজন সার্ট ও কলার ছিল। কিন্তু তবু কলার না। খোপা ঠিক সময় কখনও কাপড় আনতো না, এক-এক সময় গান্ধিজী অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করতেন।

শেষে গান্ধিজী খোলাই বিভাড় বই কিনলেন। নিজে কাপড় কাচতে শিখলেন। জীকেও শেখালেন।

প্রথম বারে মে কলারটি কাচলেন, সেটা এতো বিল্ডী হোল যে আদালতে যেতে না যেতেই বন্ধু ব্যারিষ্টারদের নজরে পড়লো, তারা তো হেসেই আকুল, বললো—তোবার কলার থেকে অতো শাদা-শাদা গুঁড়ো পড়ছে কেন?

—কলারটা আমি নিজেই কেচেছি কিনা। সব হাতেখড়ি, ঠিক বুঝতে পারিনি, বেশী মাড় দেওয়া হয়ে গেছে।

—নিজে কাচলে কেন, এদেশে কি খোপা নেই?

—নিজে কেচেছি বলেই তো আপনারা এত আনন্দ পেলেন। আর এবার থেকে আমি নিজেই কাচবো ঠিক করেছি, কারণ খোপারা একটা কলার কাচতে বা বন্ধুরী নেয় তাই দিয়ে একটা নতুন কলার কেনা যায়, তার উপর খোপারা কোন-দিনই ঠিক সময় কাপড় দেয় না। এবার থেকে আর সে ভয় রইল না।

বন্ধুরা কিন্তু সে কথা কান দিল না। হাসি তাদের থামলো না।

আরেকবারের ঘটনা।

প্রিটোরিয়াতে গান্ধিজী এক চুল ছাঁটাইয়ের দোকানে গিয়েছিলেন চুল ছাঁটতে।

নাপিতটি সাহেব। গান্ধিজীকে দেখেই সে ঠোট উল্টে বললো—হুগিলের চুল আমি ছাঁট না।

গান্ধিজী হুগ হলেন। তখনই একখানি কাচি কিনে নিয়ে এলেন। আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুল নিজেই ছাঁটতে শুরু করলেন। সামনের চুলগুলো নেহাৎ খারাপ ছাঁটা হলো না, কিন্তু পিছনের চুলগুলো নিয়েই হোল মুশ্বিল।

স্বাধীনতার গাঙ্গিনী

পরদিন কোর্টে গিয়ে ট্রান্সক্রিপ্টেই, ব্যারিষ্টার মহলে হাঙ্গির ঘুম পড়ে গেল।

—আরে গাঙ্গিনী, তোমার চুলগুলো এখন হোল কেন? রাগে ইচ্ছা করে খেঁচাচ্ছে বুকে।

—সাদা নাপিতে কালো লোকের চুল ছাঁটতে চাইল না। কাঁকেই নিজের চুল নড়েই ছাঁটলাম।

কিন্তু সে কথার কি আর হাসি থাকে।

আঠারো শো নিরানব্বই সালে বাথলো 'বুয়ার বৃদ্ধ'।

দক্ষিণ আফ্রিকায় চারিটি রাজ্য আছে, ট্রান্সভাল, অরিস্ত্রিয়া, নেতাল ও কপকলোনি। এর প্রথম দুইটিতে ডাচদের প্রাধান্য ছিল, আর শেষ দুটি রাজ্যে ছিল ইংরাজ প্রাধান্য। দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজদেরকে বুয়ার বলা হয়। ট্রান্সভালে অনেক সোনার খনি আছে, হীরের খনিও আছে। এই খনিগুলির দখলী বৃদ্ধ উপলব্ধ করেই ইংরাজ ও বুয়ারদের মধ্য লড়াই বাধে।

চারিদিকেই সাজ সাজ রব। উকিল ও ব্যবসায়ী, চাষা ও কেরানী সবাই লড়াইয়ের চললো।

ভারতীয়দের মধ্যে কোন উত্তেজনা দেখা গেল না, তারা বললো—ব্রিটিশ ও বুয়ার দুই আমাদের কাছে সমান, ট্রান্সভালে আমাদের যে দুঃখ নেতালেও সেই দুঃখ—ওদের লড়াইয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

ইংরাজেরা বললো—তাত্তে আমরা জানি, তোমরা এদেশে এসেছ পরস্য লুটতে, আমাদের ক্ষত কিছুই তোমরা করবে না।

সত্যই তো এই সময় একটা কিছু করা উচিত।

গাঙ্গিনী এক 'এম্বলেন্স কোর' সংগঠন করলেন। তাত্তে এগারো-শো ভারতীয় যোগ দিলেন। এদের মধ্যে গিরিখিটিয়া কুলি ছিল লাভ-শো জন।

প্রথমে সেবাদল কাজ শুরু করলো বুকের সীমানার বাইরে। কিন্তু ইংরাজেরা যখন একে একে পরাজিত হতে লাগলো, তখন আহতের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পেল যে, সেনাপতি ব্লার বলে পাঠালেন—বুকের সীমানার ভিতর যেতে আপনারা বাধ্য নন, তবু যদি তার ভিতর থেকে আহতদের উদ্ধার করে আনার ভার নেন, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

সেবাদল বিশদের মধ্যে যাবার কত প্ররোচিত ছিল, গুলিগোনার মুখে গিড়েই তারা কাজ শুরু করলো।

গান্ধীজীর গান্ধীজী

বেথানে লড়াই চলছিল সেখানে কোন পাকা রাস্তা ছিল না, সেখান থেকে হাসপাতাল ছিল শুধি-পঁচিশ মাইল দূরে। আহতদের ট্রেনে করে এই পঁচিশ মাইল মাঠের উপর দিয়ে বাতায়ত করতে হোত। সকাল আটটার বাজা শুরু হোত আর বিকাল পাঁচটার তারা এসে পৌছাত হাসপাতালে। এই সময় ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বর্ণবৈষম্যের ভাব ছিল না, সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। একদিন দুপুর রোদে যখন দু'দলে পাশাপাশি আহতদের নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে, তুফান গলা শুকিয়ে গেছে, এমন সময় এক কর্ণার ধারে এসে তারা থামলো, কোন দল আগে জল পান করবে সেই হোল প্রশ্ন।

ভারতীয়েরা বললো—তোমরা আগে খাও !

ইংরাজেরা বললো—না, তোমরা আগে খাও !

একদলের আগে আরেকদল খাবে না, শেষে দু' দলই একসঙ্গে জলে নাবলো।

যাত্রা ছ'য় সপ্তাহ এই ভাবে কাঙ্ চলল। সকলেই কাজের প্রশংসা করেন। দলের সাইক্লিস জনকে ভালো কাজের জন্য মেডেল দেওয়া হয়। সার্জেন্ট গান্ধীও একখানি মেডেল পান।

গান্ধীজী এবার ভারতে ফেরার উদ্দেশ্য করলেন।

নেতালের বন্ধুরা বিদায় অভিনন্দন জানালো, স্ট্রীতির নিদর্শন হিসাবে অনেক দামী দামী উপহার দিল, সোনা রুপা হীরা অহরত কত কি।

গান্ধীজী সারারাত ভেবে ঠিক করলেন—নিঃস্বার্থ ভাবে তিনি দেশবাসীর সেবা করেছেন, এসব উপহার নিজের জন্য তিনি রাখতে পারেন না। ভারতীয়দের সেবার জন্যই এগুলি তিনি কংগ্রেসের হাতে দিয়ে যাবেন।

কিন্তু কাজটা নেহাৎ সহজ হোল না, কত কথা বললেন—এতো টাকা জিনিষ ছেড়ে দিয়ে চলে যাব, তা হয় না। কাল আমাদের কি অবস্থা হবে কেউ বলতে পারে ? নিজে তো বৈরাগী হয়েছ, ছেলেগুলোকেও বৈরাগী করে তুলেছ, বউমা'রা ধরে এলে তাদের গায় তো কিছু দিতে হবে ?

—যদি আমি তখন বেঁচে থাকি আর বউমা'রা গরনা চায়, আমি নিজের রোজ-গায়ের টাকা থেকেই তখন তাদের গরনা কিনে দোব।

—তুমি আমারই সব গরনা খুলে নিয়েছ, আর বউমা'দের গরনা কিনে দেবে—তুমি বুঝি সেই লোক ! আমি গরনা কিছুতেই দোব না, এ সব আমি খেয়েছি, আমার জিনিষ।

—এসব আদায় কতই ভেদ পেরেছে !

—আর আমাকে যে বিনম্র ভুলি-বন্ধুরের মত ণাটিয়েছ, জ্ঞান বুঝি কোন দায় নেই ?

কিন্তু শেষে গান্ধিজী'র অব হোল, কতরূবা রাজী হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সেবার উদ্দেশ্যে উপহার সামগ্রীগুলি তিনি তাঁদের হাতেই দিয়ে এলেন।

উনিশ-শো-এক সালে কলিকাতায় কংগ্রেস বসলো, সভাপতি হলেন স্ত্রীর দীনশা ওয়াচা।

গান্ধিজী এই প্রথম কংগ্রেসে যোগ দিলেন। রিপন কলেজে গান্ধিজী'র থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কংগ্রেসের আর যে সব কর্মীরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের অপরিচ্ছন্নতা গান্ধিজী'র কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ঘরের মাঝনে বারান্দাতেই তাঁরা প্রস্রাব করতেন, পায়খানা নোংরা করতেন, দুর্গন্ধে সৈদিক দিয়ে চলা যেত না।

গান্ধিজী একদিন একজন বেচ্ছাসেবককে বললেন—এসব সাফ করার কোন ব্যবস্থা করা যায় না ?

বেচ্ছাসেবকটি জবাব দিল—ওতো আর আমাদের কাজ নয়, ও মেথরদের কাজ।

গান্ধিজী তখন নিজেই একটা কাঁটা যোগাড় করে নিয়ে সাফ করতে লেগে গেলেন।

কিন্তু সে আর কতক্ষণের জ্ঞাত ! দেখতে দেখতে আবার বে-কে সেই।

বিকালবেলা গান্ধিজী কংগ্রেস আপিসে হাজির হলেন, বললেন—আপনাদের যদি কিছু কাজ থাকে আমাকে দিন, আমি কাজ চাই।

—চিঠি পত্র লিখিতে পারবে ?

—যা মেবেন তাই পারবো।

—কেন তাহলে এই চিঠিগুলো সব দেখে, বাজেগুলো আলাদা করে রাখবে আর যেগুলো দরকারী বলে মনে করবে আমাকে দেখাবে।

গান্ধিজী কাজ করতে বসে গেলেন।

এই হোল কংগ্রেসের কাজে তাঁর হাতেখড়ি।

মহাত্মা গান্ধী'র সঙ্গে আলোচনা করে গান্ধিজী ঠিক করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে একটা প্রস্তাব তিনি জুলিয়ন এই সভায়। কিন্তু মাঝেমধ্যে কবিতার অধিবেশনে রবী-মহারথীদের মাঝনে তিনি কোন কথাই বলতে পারলেন না,

আমাদের গান্ধী

এদিকে রাত এগারোটা বাজলো। সকলেই উঠে পড়ার জন্য ব্যস্ত। স্ত্রীর বিরোধ শা
বললেন—তাহলে এইখানেই আমাদের সব প্রস্তাব নির্বাচন শেষ হোল।

গোথলে জোর গলায় বললেন—দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্পর্কে গান্ধীর একটা প্রস্তাব
রয়েছে।

স্ত্রীর বিরোধ বললেন—প্রস্তাবটি আপনি দেখেছেন?

—নিশ্চয়।

—আপনি সেটা মনোনীত করেছেন?

—আমার ভালো লেগেছে।

—বেশ, গান্ধী তোমার প্রস্তাবটা আমাদের স্তনিয়ে দাও।

গান্ধী কম্পিত কণ্ঠে প্রস্তাবটি পড়লেন।

গোথলে সমর্থন করলেন।

প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

পরদিন যখন সাধারণ সভার মাঝে স্ত্রীর দীনশা তাঁর নাম ডাকলেন। তখনতো
গান্ধীর মাথা ঘুরে গেল। কোন রকমে প্রস্তাবটি পাঠ করে দক্ষিণ আফ্রিকার
প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে দু'একটা কথা সবে মাত্র বলেছেন এমন সময় বেল বেজে
উঠলো, গান্ধী সচকিত হয়ে উঠলেন, কিছুই বলা হোল না, দ্রুত মনে তিনি বলে
পড়লেন। তবে একটা সাঙ্ঘনা রইল যে কংগ্রেস তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

সেবার গান্ধী মাস খানেক কলকাতায় রয়ে গেলেন। গোথলে ছিলেন
বড়বাজারে, গান্ধী তাঁরই বাড়ীতে অতিথি হলেন।

এই সময় অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে গান্ধী দেখা করেন।

রেভারেন্ড কালীচরণ ব্যানার্জী, জাটিন্দ্রমেশচন্দ্র মিত্র, স্ত্রীর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
রাজা স্ত্রীর প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে গান্ধী দেখা করেন।
স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করার জন্য বড়বাজার থেকে হাটতে হাটতে তিনি
একদিন বেঙ্গল র্তে উপস্থিত হন, কিন্তু সেখানে গিয়ে স্তনলেন—স্বামীর অসুখ,
কলকাতার বাড়ীতে তিনি আছেন, কারুর সঙ্গে দেখা হয় না।

চৌধুরী-ম্যানসনে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু তাঁর জাকজমক
দেখে খতয়ে গেলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে গোথলে একদিন গান্ধীর পরিচয় করিয়ে দিলেন—
ডক্টর রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আটপোকা টাকা হাইনে পান, নিজের

আবাবের গাঙ্গী

জন্ত রাখেন যাজ চম্পি টাকা বাকীটা খরচ করেন বেশের কাজে। বর-কংসার বলে কিছু নেই ;—চিরকুমার।

গাঙ্গীকে তখন ব্যারিটার বলে চেনার উপায় ছিল না : পরশে আখয়লা কাপড়, একটা পাশী কোট, খালি পা, মাথার টিকি। ইনিই যে দক্ষিণ আফ্রিকার হৈ-ঠে বাথিয়েছেন একথা হললেও সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না।

নতুন লোক কলকাতার এসেছেন, পথ চিনতে কষ্ট হতে পারে, গোখলে অনেক সময় গাঙ্গীকে এক একজন সঙ্গী দিতেন।

একদিন এক বাঙালী ভ্রমালোকের সঙ্গে গাঙ্গী বেরিয়েছেন পরেশনাথ-মন্দির আর চিড়িয়াখানা দেখতে। ভ্রমালোক গাঙ্গীর বেশভূষা আর চেহারা দেখেই ধরে নিয়েছেন যে তিনি হিন্দি ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। সবত পথটি তাই ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে তিনি সব কিছুই গাঙ্গীকে বোঝাতে হুক করলেন—পরেশনাথের মন্দিরের ইতিহাস আর চিড়িয়াখানার কোন জন্ত কোন দেশ থেকে এসেছে।

গাঙ্গী শুনে যাচ্ছেন, হ্যাঁ না কিছুই বলেন না।

কিন্তু কেরবার সময় ট্রামে বেথে গেল গোলযোগ।

গাঙ্গীর সামনের বেঞ্চে একজন সাহেব বসে ছিলেন। তিনি ছুতোজন্ত পা তুলে দিলেন গাঙ্গীর বেঞ্চির উপর। গাঙ্গী বারেক সাহেবের ঘুঘর পানে তাকালেন, তারপর এতোটুকুও বিধা না করে পা তুলে দিলেন সাহেবের বেঞ্চির উপর। আর বায় কোথা, সাহেব রীতিমত রেগে উঠে গাঙ্গীকে হারলেন এক জাতি।

আশে পাশে যে সব বাঙালীরা বসেছিল তারা লাকিয়ে উঠলো, সাহেবের সঙ্গে তাদের মারামারি বাধে আর কি। গাঙ্গী হাসিমুখে সবাইকে নিরস্ত করলেন, ইংরাজীতে বললেন—কমাই পরম ধর্ম। মাদকে ভালবাসা দিয়ে জয় করতে হবে। সাহেবটিকে আপনারা ছেড়ে দিন।

ট্রামের মধ্যে দু'চারজন এবার চিনতে পারলো, বললো—আপনিই কি গাঙ্গী ?

গাঙ্গী হাসলেন।

অন্তর ব্যবহারের জন্ত সাহেবকে কমাই চাইতে হোল।

আর যে সঙ্গীটি এতকণ হিন্দি ভাষায় গাঙ্গীকে সব কিছু বোঝাচ্ছিলেন তাঁর লজ্জা রাখার আর আরগা রইল না।

গাঙ্গী একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গেলেন। পশু বলির রক্তাক্তি ব্যাপার তাঁর মনে অত্যন্ত বেদনার সঞ্চার করলো। তিনি আর বেশীকণ টাড়াতে পারলেন না। গাঙ্গী বললেন—সে নৃত্ত তিনি আজ অবধি ভুলতে পারেন নি।

আমাদের গান্ধী

কলিকাতার হরীশ্চন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা কলম্বো, বারসেলোনা, বের্লিন করে কয়েক দিনের জন্য গান্ধীজী কলম্বোতে বসেন। সেখানে থেকে বিয়ে এসেই তিনি প্রাচ্যের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

সেখানে এক আচার্য্য হার তাঁকে গান্ধীজী বলে ডাকেন।

গান্ধীজী দ্বির করেছিলেন সারাশরী, আঞ্জা ও কলম্বোয় ঘুরে সারসকোটে ফিরলেন। সেখানে গিয়েছিলেন বারো আনা দামের একটি কয়লিয়ার ব্যাগ আর কাল ভিড়র একটি উলের কোট, একখানি কাপড়, একটি শাট আর একখানি বাম্বা। আর সেখানে সঙ্গে নিয়েছিলেন একটি ধারারের কোটা,—পুঁরী আর রসগোল্লায় ভরা।

খার্ড ক্লাশে চড়াই গান্ধীজীর জীবনের একটা ব্রহ্ম। তিনি বলতেন—খার্ড ক্লাশে চড়াই দেশের জনসাধারণের অবস্থা ভালো করে বোঝা যায়, তাদের চেনা যায়।

সাধারণতঃ মেলু ট্রেনের চেয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনেরই তিনি ছিলেন পক্ষপাতী, ভীড় কম হয়। তবু খার্ড ক্লাশে চাপার হুর্ভোগ তাঁকে কম ভুগতে হয় নি। যখন এদেশে বেশী লোক তাঁকে চিনতো না, তখন অনেক সময় বস্তার পর বস্টা তাঁকে স্থানান্তরে পাড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

গান্ধীজী বলেছেন—ইউরোপে খার্ডক্লাস ট্রেনে আমি চড়েছি, সেখানে ফার্ট ক্লাস আর খার্ড ক্লাশে এতো বিভেদ নেই। দক্ষিণ আমেরিকার খার্ড ক্লাসে শুধু নিগ্রোরাই চড়ে কিন্তু সেখান ক্লাশ এ দেশের চেয়ে অনেক ভালো—গরী-মোড়া আসন আছে, ঘুমবার ব্যাগ আছে, কোন কামরায় অতিরিক্ত যাত্রীকে উঠতে দেওয়া হয় না। আর এদেশের খার্ড ক্লাশ তেড়ার গাড়ী, গরু ছাগলকে সেটুকু স্বাক্ষর ছিল চলে এখানকার যাত্রীকে সেটুকু দিলেই ধস্ত হয়ে যায়। একে ত অতিরিক্ত ভীড়, তার উপর যাত্রীরাও অশেষ নোংরা,—কেউ এখানে পানের পিক বেললো, কেউ ওখানে সিগারেট ধরালো, চীৎকার, ছড়োছড়ি, কেউ কাকের স্থবিধা দেখে না।

কান্টতে নেবে গন্ধান্ন করে গান্ধীজী বিশ্বনাথের পূজা করলেন।

অমন বেশবিশ্রুত মন্দিরে যে শাস্ত্র সমাহিত গান্ধীজী থাকা উচিত ছিল, গান্ধীজী কোথাও তা দেখতে পেলেন না। সর্বাঙ্গ জলসিক্ত পিচ্ছিল গলিতে মানুষের ভীড়, হুঁপাশের মোকানীদের হুটগোল, মন্দির প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ ছড়ানো ফুলের রাশি, সবায় উপর কোন ধনীর টাকা দিয়ে চক্কর বাঁধিয়ে দেবার অহঙ্কার যেন ভারাক্রান্ত করে।

গান্ধীজী জ্ঞান-বাণি দেখলেন। (ঐরকমের বিশ্বনাথের মন্দির যখন জেতে কেন

গান্ধীজীর গান্ধীজী

তখন এই কুপের মধ্যে নিরাস্থের নিমিত্ত গান্ধীজীর দাবা হয়েছিল।) এমনকার
পাকার সঙ্গে গান্ধীজীর বিতর্ক বাড়ে। পাকার দাবার লইলে গান্ধীজী কাকে একটি
পাই দেন।

—পাইট দুই জনের মিত্র পাকার দাবার করে ওঠে—তুই নাকি না।

—আপনি কাকার দাবার, আপনাকে কুই কি পাকার দাবার পাই। পাইট
বহি না দেন, আপনি নিয়ে বাব।

—না না এখানে থেকে কুই হয়ে না। তোর একটা পাইয়ের আমি তোমাকে
দানি জেবেজি।

গান্ধীজী পাইট দুইয়ের নিয়ে চলে আসছেন, এমন সময় পাকার দাবার ডাকলো,
বললো—তোমার অকল্যাণ করার ইচ্ছা আমার নেই, দেবতার নামে বন্ধন দিয়েছিল,
ওই খালার রেখে যা, তুই ছোট বলে তো আর আমি ছোট হতে পারি না।

সামান্য একটা পাইয়ের লোভ পুরোহিত ছাড়তে পারলেন না দেখে লীলানিধান
কলে গান্ধীজী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন।

সেখান থেকে গান্ধীজী আনি-বেশান্তের বাড়ী গেলেন।

বোম্বাইয়ের গান্ধীজীর মেজো ছেলে মণিলালের হোল টাইকরেড। নিউয়োনিয়ার
একটু বেশ ছিল। সারারাত বিকারে ছেলোট প্রলাপ বকে। ডাক্তার একদিন
বললেন—ক্রমশঃ শরীর দুর্বল হয়ে আসছে, শুধু তুখে আর চলবে না, রোগীকে
বলকারক কিছু খেতে দিন—ডিম, মুরশীর হুঙ্কা...

—কিন্তু আমরা যে বৈষ্ণব, নিরামিষ খাই।

—তার ছাড়ে কি, ওটাকে ওখু বলে ধরুন না, অল্প সেয়ে গেলে না-হর একটা
প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দেবেন।

—না ডাক্তারবাবু সে আমি পারব না। খর্ব নিয়ে লুকোচুরি খেলা চলে না।

—কিন্তু রোগী দুভাবে কিসের জোরে?

—আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি একবার জল-চিকিৎসা করে দেখতে
পারি। আপনি বিন-করেক কোন ওখু দেখেন না, প্রতিদিন এসে সেবে থাকেন,
অবস্থা ভালো হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে।.....

ডাক্তার সম্মত হলেন। ছেলের একশো চার ডিগ্রী জ্বর উত্তর গান্ধীজী জল-
চিকিৎসা শুরু করলেন। মণিলালকে কোমর অবধি ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখলেন তিন-
মিনিট করে। শুধু কমলা দেহের রস ছাড়া কিছুই খেতে দেন না। কিন্তু তিনদিনেও

গান্ধীজীর গান্ধীজী

অরু কনসালো না, হাতে বিকারের বোতল টিক থাকে। গান্ধীজীর মন ব্যাহত হয়ে উঠলো, নিজেকে কি শেষে মশ কব্বরের ছেলেটির মতই কাগজ হবেন?

শেষে গান্ধীজী ভগবানের নাম নিয়ে মণিলালকে ভিজা কাপড় দিয়ে গান্ধীজীর রাখলেন। তার উপর ছুখানা কল ঢাপা দিলেন। ভিজা জোড়ালে একখানি রাখলেন মাখার উপর। গানের উত্তাপে মণিলালের সারা দেহ পুকে যাচ্ছে, আর গান্ধীজী মনে মনে রাম নাম জপছেন।

ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে মনের মাঝে অবসাদ ঘনিয়ে এলো, কতরূপীবাঈকে ছেলের কাছে বসিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, চৌপাটির সাগর সৈকতে এসে দাঁড়ালেন, ছেলের কল্যাণ কাখনার বুকের মাঝে তখন ছর ছর করছে।

অধির চিন্তে তখনই তিনি আবার খাড়ী কিরলেন। ঘরে ঢুকতেই মণিলাল বলে উঠলো—বাবা, আবার গা জলে যাচ্ছে, বামে সপ্‌সপ্‌ করছে, কলসটি খুলে দাও।

গান্ধীজী মণিলালের সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিলেন, বেচারি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

সেদিন থেকে মণিলালের অরু কমতে শুরু করলো।

চল্লিশ দিন এই ভাবে অস্থির সঙ্গে যুদ্ধ করার পর মণিলাল নিরাময় হোল। এই ক'দিন সামান্য ছুখ আর কলের রস ছাড়া গান্ধীজী তাকে আর কিছুই খেতে দেননি।

বোম্বাইয়ে রীতিমত পসার জমে উঠেছে এমন সময় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে টেলিগ্রাম এলো—অবস্থা গুরুতর, চেম্বারলেন এখানে আসছেন, আপনিও আসুন।

গান্ধীজী কয়েকদিনের মধ্যেই আহাজে চড়ে বসলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে দেখলেন ভারতীয়দের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক শোচনীয় হয়েছে। বুয়োর যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের সেনাকার্যে খুলী হয়ে গভর্নেন্ট যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে সবই ভুলে গেছে। এই সম্পর্কে গান্ধীজী নেতৃত্বে চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করলেন। চেম্বারলেন বললেন—আপনার অভিযোগ সবই সত্যি, কিন্তু আমি আপনাদের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারবো বলে মনে হয় না। এখানে আপনাদের থাকতে হলে এখানকার সাহেবদের খুলী রাখতে হবে।

গান্ধীজী তবুও আশা ছাড়লেন না। চেম্বারলেনের শিল্প শিল্প এসেন প্রিন্ট-রিজার, কিন্তু চেম্বারলেন আর গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন না।

গান্ধীজীও গ্রীক করলেন, ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা কিছু নিশ্চিতি না করে

আফ্রিকা থেকে নকশের না। জোহানেসবার্গের একটো জিনি ডায়েরী হুক করলেন এক ভারতীয়ের করে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ দেয়। কলসেন—‘ইণ্ডিয়ান পাবলিশার’।

চারটি ভাবার কাগজখানি লেখা হোত—ভন্দারী, হিন্দী, আর্মিল ও ইংরাজী। (পরে হিন্দী ও ভন্দিল বাব বেওয়া হয়।) এই কাগজখানির করে গান্ধীজীকে মাসে মাসে প্রায় বারোশো টাকা নিজেব পকেট থেকে খরচ করতে হোত।

এবার গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধী-ভাই নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন।

গান্ধীজীর মনের মাঝে এই সময় একটি বিষয় চলছিল। বিবেকানন্দের ‘রাজবোগ’, পাতকলির ‘যোগসূত্র’ প্রভৃতি বই তাঁর মনের মধ্যে তীব্র ভগবৎপ্রীতি জাগিয়ে তোলে। তিনি নতুন করে গীতা পাঠ করতে শুরু করলেন।

অবশর কয়, কিন্তু আগ্রহ তো কয় নয়। গীতার একটু-দুটি শ্লোক কাগজে লিখে মনের স্বরের রেয়ালে লটকে দিতেন, যতক্ষণ দাঁতে মাঝতেন আর জান করতেন সেই শ্লোকটি মুখস্থ করতেন।

এইভাবে গীতার তেরোটি অধ্যায় তিনি মুখস্থ করেন।

গীতার ‘অপরিশ্রব’ ও ‘সমভাব’ গান্ধীজীর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা দমন করার চেষ্টা করলেন। বোম্বাইয়ে থাকার সময় এক বন্ধুর পাতায় পড়ে দশহাজার টাকার জীবন-বীমা করেছিলেন, সেই বীমার পলিসি রদ করার জন্য চিঠি লিখে দিলেন। ভগবানের উপরেই যখন একান্ত নির্ভর তখন স্ত্রীপুত্রকে ভগবানই দেখবেন, লোকের সঞ্চয়ের কোন প্রয়োজন তো নেই!

আত্মীয় ও পরকে সমভাবে দেখার চেষ্টা করলেন।

বড় ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখলেন—আবার উপর আর ভরসা রাখবেন না। এতদিন রোজগার করে যা বাঁচাতে পেরেছি তা আপনার কাছে পাঠিয়েছি, এবার থেকে আর তা গাঁথবো না, এখন থেকে যা বাঁচবে জনসেবার খরচ করবো।

বড় ভাই গান্ধী-ভাইকে ভুল বুঝলেন। তিনি বেশ কড়া উত্তর দিলেন। এবং ভাইয়ের খোঁজ-খবর নেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন।

জোহানেসবার্গে এক জার্মান সাহেবের নিরাশ্রিত রেইকেট ছিল, গান্ধীজী সেখানে গিয়ে প্রায়ই আহার করতেন। কিন্তু হুঁ-কণ অনেক আহার জুগিয়ে একটি রেইকেট চলে না, জার্মান সাহেবটিকে শেষে পাত-তাড়ি গুটাতে হোল। গান্ধীজী তাকে হুঁ-একবার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বটে, কিন্তু তাকে কী করে।

আবাহের গান্ধীজী

ভারতবর্ষে এক বিশিষ্ট মহিলা এসে গান্ধীজীকে ধরলেন—নিরামিষ ভোজীদের জন্য এক রেটুরেট করবো, টাকা চাই।

গান্ধীজীর মন টললো, নিজের কাছে টাকা ছিল না, এক মফেলের কাছ থেকে নিয়ে যেমতাহেবকে বেড় হাজার টাকা ধার দিলেন।

ছ-তিন মাস পরেই সে রেটুরেট উঠে গেল। গান্ধীজীকে নিজের পকেট থেকে বেড় হাজার টাকা মফেলকে পোধ দিতে হোল।

এই সময় গান্ধীজী নিজের কয়েকটি সাধারণ অস্থির নিজেই চিকিৎসা করেন। সারা দিন লেখাপড়ার কাজ করতে করতে গান্ধীজীর রীতিমত মাথা ধরতে শুরু করলো, তখন তিনি দিনে চারবার আহার করতেন। তাঁর ধারণা, হোল এই মাথা ব্যথার প্রধান কারণ অধিক আহার। একবার করে আহার তিনি কমিয়ে দিলেন, মাথা ধরাও সেরে গেল।

তারপর সেখা দিল কোঠ-কাঠি। কত জন কত রকম রেকের ব্যবস্থা দিল। গান্ধীজী কিন্তু রাতে শেটের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে শয়ন করার অভ্যাস করলেন, কদিনের মধ্যেই কোঠ-কাঠি অস্তহিত হোল।

সেবাই গান্ধীজীর আদর্শ। সেজন্য সকলকেই তিনি সমভাবে সেবার চেষ্টা করতেন, জাতের কি ধর্মের বিচার করতেন না। তাঁর বাড়ী সকল যাহ্নবের জন্যই খোলা থাকতো।

সাহেবি ধরনের বাড়ী, রাতে ঘরের ভিতরেই বলমুখ ত্যাগের 'কমোড' থাকত।

সকালে ঘুম থেকে উঠে এতদ্যেক নিজ নিজ কমোড পরিষ্কার করতো।

একবার পক্ষমা জাতের একজন ক্রীতদাস গান্ধীজীর বাড়ীতে এসে উঠলো, নিজেকে কমোড পরিষ্কার করতে হবে বোঝার তা জানতো না। 'পক্ষমার' অশুশ্রু। কল্পুরবা হিন্দু ধরের মেয়ে, তখনও তিনি পুরোপুরি দাস্যের বৃত্ত হতে পারেন নি। তিনি অশুশ্রুের কমোড সাব করতে রাগি হলেন না। গান্ধীজী নিজেই সাব করলেন। কিন্তু অশুশ্রুের বলমুখ স্বামী সাব করবেন এও কল্পুরবা সহ্যে পারলেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিতর্ক বেধে গেল।

গান্ধীজী বললেন—আবার বাড়ীতে থাকতে গেলে এসব কাজ হাসিমুখে করতে হবে।

কল্পুরবা বললেন—বেশ, তোবার বাড়ী থেকে চলই যাব।

আবাকের গাছিকী

—চলে বাব কেন, এখনি বাও—কত রবার হাত ধরে গাছিকী দরজা অবনি টেনে নিয়ে গেলেন, এখনি পথে বের করে দের আর কি।

কত রবার কেঁমে কেলসেন, বললেন—এখানে আমি এখন কোথায় বাব ? এখানে কি আমার বাপ-মা আছেন, না কোন আত্মীয় আছে ? তোমার জী হয়েছি বলে তোমার সব অস্ত্রের অস্ত্রাচার আমাকে সহিতে হবে ! তোমার লজ্জা করে না, দরজা খোলা, রাস্তার লোক দেখলে কি বলবে ?

গাছিকী এবার সভাই লজ্জা পেলেন, দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

পরে অবশ্য গাছিকী নিজের আদর্শের মূল কথা কত রবারকে বুঝিয়ে দেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা সাহেবদের কাছে অশুশ্য। সহরের বাইরে এসে থাকতে দেওয়া হয়, তাকে বলে কুলি-বস্তি।

জোহানেসবার্গে এমনি একটা কুলি-বস্তি ছিল। মিউনিসিপ্যালিটি সেই বস্তির দিকে ঘোটেই নজর রাখতো না, বাসিন্দারাও স্বাস্থ্যরক্ষার কোন কথাই জানতো না। বস্তিটি ক্রমশঃ খোঁজি ও নোংরা হয়ে উঠেছিল।

দেখে-শুনে সাহেবেরা একদিন বললো—ভারতীয়েরা এই বস্তিটাকে নোংরা করে রাখে সমগ্র নগরের স্বাস্থ্য বিধিরে দেবার ক্ষত এবং সাহেবদের জন্ম করার ক্ষত। এখান থেকে বস্তি তুলে দেওয়া হোক।

মিউনিসিপ্যালিটি নোটিশ দিল—বস্তি ছেড়ে বাও।

নিরানকুই বছরের লীজ নিয়ে অনেক ভারতীয় সেখানে বাড়ী করেছিল, তারা বাড়ী-ঘর ছেড়ে দেবে কেন ? গাছিকীকে ধরে তারা যামলা জ্বক করলো।

গাছিকী পরপর লতরটি যামলা করলেন। একটি ছাড়া সবগুলিই জিতলেন, ভারতীয়েরা বাড়ীর কত কতিপূরণ পেল।

কিন্তু অতো লোক হঠাৎ ঘর বাড়ী ছেড়ে বায় কোথা ? নতুন কোন জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত তারা সেইখানেই রয়ে গেল।

এই সময় হঠাৎ একদিন সেখানে মেগ দেখা দিল।

ইতিহাস 'ওপিনিয়নের সুপ্রাকর শ্রীমন্ত দরনজিৎ' সেখানে চাঁদা আদায় করতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে একটুকরো কাগজে লিখে গাছিকীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন—ঈশ্বরী আছেন, ডেইশবনের মেগ হয়েছে।

গাছিকী অবিসের চারজন কর্মচারীকে নিয়ে সাইকেল চড়ে তখনই ছুটলেন কুলি-বস্তিতে। একজন সাহেব ভাকারও এসে উপস্থিত হলেন। ডেইশবন রোগীকে একখানি

সাহেবের গাছিকী

সকালে ঘরিরে আসা হোল। তারপর চললো ভাবের জগৎ। সাহায্য রাত চার জনের কেউ এক মিনিট ছুপ করে বসতে পেলেন না, ডাক্তারও হিম্মত দিয়ে গেল।

পরদিন সকালে মিউনিসিপ্যালিটি একজন নার্স পাঠিয়ে দিল।

একজন রোগী বারা গেল, দু'জন রক্ষা পেল। এই দু'জনকে গাছিকী দিচ্ছে চিকিৎসা করেছিলেন; এলোপ্যাথি ঘতে দ্রাণ্ডি না খাইয়ে সাধার ও বুকে মাসীর প্রলেপ দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে কতৃপক রোগীদের জন্ত সহর থেকে সাত মাইল দূরে এক সেবাকেন্দ্র খুললেন। এবং নতুন রোগীদের সেইখানে সরিয়ে দিলেন। সমস্ত বস্তির লোকদের সহর থেকে তেরো মাইল দূরে এক মাঠে তাঁবু ফেলে থাকার ব্যবস্থা করলেন। তারপর মেগের বীজাঙ্ক সমূলে নাশ করার জন্ত সমস্ত বস্তি পুড়িয়ে শাক করে দেওয়া হোল।

এই সময় গাছিকী ছুটি সাহেবের সম্পর্কে আসেন—ব্রীজু এলবার্ট ওয়েট ও ব্রীজু পোলক।

ওয়েট সাহেবের সঙ্গে গাছিকীর প্রায়ই দেখা হোত নিয়ামিষ রেইরেটে। মেগের সময় গাছিকী সন্ধ্যাবেলায় রেইরেটে যাওয়া বন্ধ করে দেন। ওয়েটের সঙ্গে কদিন আর দেখা হয় নি। তার উপর সাহেব তনেছিলেন গাছিকী বস্তিতে গেছেন মেগের সেবা কুরতে। একদিন প্রভাতে সাহেব তো বরাবর গাছিকীর বাড়ী এসে হাজির হলেন, বললেন—কদিন আর তোমাকে দেখতে পাই না, আজ তাই শুবর নিতে এলাম।

সাহেবের সঙ্গে সেইদিনই গাছিকীর দিবা বন্ধুত্ব জন্মে উঠলো, একেই গাছিকী পরে ইণ্ডিয়ান ওশিনিয়ন 'চালাবার' ভায় দেন।

আর পোলক সাহেব ছিলেন 'ক্রিটিক' কাগজের সহ-সম্পাদক। মেগের সময় গাছিকীর সঙ্গে তাঁর দেখা, বললেন—আপনার নাম শুনেছি, অনেকদিন থেকেই আলাপ করার ইচ্ছা ছিল, আজ চাক্ষুষ দেখা হয়ে গেল।

আলাপ আলোচনায় বন্ধুত্ব জন্মে উঠলো।

ইনিই গাছিকীকে রাসবিনের লেখা 'আনটু দি লাইট' বইখানি পড়ান। এই বইখানি গাছিকীর মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই বইখানিতে গাছিকী জীবনের তিনটি সভ্য খুঁজে পান—

সবার ভালোই আমার ভালো।

সবাইকার কাজের মূল্যই সমান।

চাষী-বন্ধুর জীবনই সত্যিকারের স্ব-জীবন।

গাঙ্গুলী উনিশশো-চল্লিশ সনে ভারতীয় থেকে চৌকি বাইল হয়ে 'কিনিবুসে' গ্রামে গিয়ে বেশ কিছুদিন কিনিবুসে গেলেন। একটি ছোট গ্রাম ছিল সেই গ্রামে আর ভারতীয় চারি পাশে ছিল অসংখ্য কবল। সেই গ্রামে আবেশ হার।

এক বারের মধ্যেই ছাপাখানা খাবার বসে একটি প্রকাণ্ড বস তৈরী হোল, প্রবন্ধের সরঞ্জাম এসে গেল। টিক হোল ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন কান্ট্রাবানি সেখানে থেকেই বেরবে।

গাঙ্গুলী অনেক জানা-চেনা ভারতীয় বন্ধুকে ডেকে আনলেন, কিনিবুসে থাকার জন্য। তখনও বাঙালী-বর কিছুই তৈরী হয় নি, বাস-কন সাফ করে তাঁর খাটেরে থাকার ব্যবস্থা হোল।

কিনিবুস আশ্রম ধীরে ধীরে একটি গ্রাম হয়ে উঠলো।

কিন্তু কিনিবুসে গাঙ্গুলী বেশীদিন থাকতে পারলেন না। কাজের চাপে তাঁকে জোহাননেসবার্গে ফিরে আসতে হোল। বাঙালীতে চালচলনের ধারাও তিনি বলতে ফেললেন। বাজার থেকে কুটি কেনা বন্ধ করে দিলেন। খ' খানেক টাকা দিয়ে একটি বাতা আনিতে গয় পেশাই করে কুটি খাবার ব্যবস্থা হোল। গাঙ্গুলী কত রুখা, ছেলেরা, এক সময় সময় গোলক সাহেবও বাতা চালাতেন।

বাঙালীতে একজনমাত্র চাকর ছিল, সে একা সব কাজ করতে পারতো না, বাঙালী ছেলেরাই তার কাজ করে নিত।

সকালবেলা বাড়ু হার এসে পাখানার ময়লা সাফ করে নিয়ে যেত, কিন্তু পাখানার আশপাশটা গাঙ্গুলী ও বাঙালীর ছেলেরা নিজেরাই সাফ করতো।

নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য ছেলেরা রীতিমত লেখা-পড়া শেখাতে পারতেন না। বাঙালী থেকে আকিস ছিল আড়াই বাইল দূরে। প্রতিদিন ছেলেরা সঙ্গে নিয়ে আগিস যেতেন, আগিসে তাদের পড়াভন্ডার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবে ওই পথটুকু বেতে যে সময়টা পেতেন, ছেলেরা মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। সে জন্যই গাঙ্গুলীর কোন ছেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ছাপ কিছু পান নি, তবে সেজন্য গাঙ্গুলী কি ছেলেরা যেন কোন ক্ষোভ নেই। (বড়-ছেলে হীরাদাল একতর অভিব্যাপ ভোলে বটে, কিন্তু গাঙ্গুলীর কাছে সে বাছব হয় নি। তাঁর প্রথম জীবন কান্ট ভারতে কাটা ও অ্যাটার কাছে।)

একদিন কাগজে খবর বেরলো যেভালে জুলুর বিরোধ করেছে। সেই বিরোধ গঙ্গুলীর জন্য সাহেবের রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে।

আবাহনের গাভিরা

গাভিরা সেবা করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন।

কুয়ার ঘরের সমস্ত তাঁর কাজ দেখে গভর্নেন্ট খুশি হয়েছিলেন, এবার তাঁকে সার্জেন্ট-মেজর করে দিলেন। মেজর-গাভী খেজালসেবক দল নিয়ে এলেন নেতালে।

ব্যাপারটা বিজ্ঞান নয়। যারা জীবনে যত্ন দেখেনি, তাদের নিজস্বের কোন যত্ন নেই, তারা শিক্ষিত গোরা সৈন্যের সাহায্যে পাড়াবে কোন সাহসে? আসল ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। জুলু অত্যন্ত শান্তিপ্ৰিয়, সভ্যতার বিলাস তাদের মধ্যে এখনও সংক্রামিত হয়নি। আফ্রিকা উর্বরা দেশ, সামান্য পরিশ্রম করলেই সেখানে প্রচুর খাবার পাওয়া যায়। সামান্য মকাহয়ের জাউ একটু মুন দিয়ে খেয়েই তারা খুশি। কিন্তু সাহেবদের লোকের দরকার—বাড়ীর কাজ করার জন্য চাকর চাই, সোনার খনিতে কাজ করার জন্য যত্ন চাই, কিন্তু তাদের খণ্ড-পারার অভাব নেই তারা পরের চাকরী করতে আসবে কেন? কাজেই খুটান মিশনারীরা বেরিয়ে পড়লো জুলুদের সভ্য করতে। আর গভর্নেন্ট জুলুদের মাথা পিছু আর ঘর পিছু এখন একটা ট্যাক্স বসিয়ে দিল, যা সেবার জন্য বেচারাদের চাকরী না করে উপায় রইলো না। সম্রাতি জুলুদের উপর আবার এক নতুন কর বসানো হয়েছে, একজন জুলু সর্দার তার প্রতিবাদ করেছেন এবং যে কর্মচারীটি কর আদায় করতে গিয়েছিল তাকে বন্ডন ছুড়ে মেরেছেন। এই ঘটনাটিকে কল্যাণ করে বিজ্ঞান বলে প্রচার করা হোল, এবং সৈন্য গেল সেই বিজ্ঞান তাঁড়া করতে। একদল লোককে ধরে এনে রীতিমত চাবুক মেরে বস্তাক্ত মেহে কেলো রাখা হোল, আরেকদল লোকের উপর ইচ্ছামত গুলি চালানো হোল।

মেজর-গাভী দলবল নিয়ে এই জুলুদের মাঝে এসে পাড়ালেন দেবজ্ঞান প্রচারের মত। অনেক নিগ্রোর মত তখন পচে দুর্গন্ধ বেগতে শুরু করেছে। কোন সাহেব নাস তাদের সেবা করতে চায় নি। গাভিরা তাদের সেবা করছেন দেখে অনেক সময় গোরা সৈনিকেরা দূর থেকে টিটকারিও দিতে লাগলো।

একদল মানুষকে এইভাবে সম্রাট করে তোলার নীতি তাঁর ভালো লাগেনি, কিন্তু সরকারের জো সে বিচার করা চলবে না।

গোরা সৈনিকদল যে গাঁবে বেত গাভিরা-কেও বেতে হোত তাদের সঙ্গে, নাহলে আহত জুলুদের দেখবে কে? অনেক সময় একতরফা চালিশ বাইল অবধি মেজর গাভিকে দলবল নিয়ে ঘাঁট করে বেতে হয়েছে।

জুলুদের শাসন করা পর গভর্নেন্ট এবার তাঁর সৈন্যদের শাসন করা

আবাসের গাঙ্গী

বিকে বন গিলেন। নতুন এক আইন করা হোল : ইন্ডাস্ত্রালে যে সব ভারতীয় আছে, তাদের বয়স আট বছরের বেশী হলেই তাদের সরকারী দপ্তরে নাম লিখিয়ে পাস নিতে হবে। বারা পরোয়ানা সেবে না তারা সেদেশে থাকতে পাবে না, থাকলে জেল বা ক্রিয়ানা হবে। পাস নেবার সময় লশআড়লের ছাপ দিতে হবে, সকলের এই পাস আছে কি না দেখার জন্ত সরকারী শেরায়া যে কোন বাড়ীর ভিতর ঢুকে তল্লাসী করতে পারবে, এক ভারতীয়েরা কোন কাজে সরকারী আপিয়ে গেলে সর্বাঙ্গে এই পাস দেখাতে হবে।

ভারতীয়েরা প্রতিবাদ করলো। নানা স্থানে সভা করলো, মজীর সঙ্গে দেখা করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না।

গাঙ্গী বিলাতে গেলেন। দাদাভাই নওরোজীর সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর উপদেশ মত উপনিবেশ-সেক্রেটারী লর্ড এলগিন, ভারতবর্ষের সেক্রেটারী লর্ড মর্ফি, আইরিশ পক্ষের নেতা লর্ড রেগুয়ণ্ড এবং পার্লামেন্টের অনেক বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে দেখা করলেন। সকলের কাছেই অনেক ভাল কথা শুনে ছ' সপ্তাহ ইংলণ্ডে কাটিয়ে গাঙ্গী আকরিকার কীরে এলেন।

কিন্তু ইংরাজরা শেষ অবধি কোন কিছুই করলো না।

গাঙ্গী সত্যাত্মক হুক করলেন।

পাস দেওয়ার আপিসের সামনে রীতিমত পিকেটিং হুক হোল। দাদা আটকাবার অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হোল, কিন্তু কোন অপরাধ প্রমাণ করতে না পারার আদালত তাদের ছেড়ে দিল।

এদিকে দু-একজন করে চুপি চুপি প্রায় পাঁচ শো লোক পাস নিল। কিন্তু দশ বারো হাজার বাসিন্দার মধ্যে পাঁচ শো জন জো নগণ্য।

এবার ধরপাকড় হুক হোল।

প্রথম গ্রেপ্তার হোল বাবুসুন্দর। বিচারে তার একমাস জেল হোল, কিন্তু তাতে ভারতীয়েরা ভয় পেলে না।

এবার গাঙ্গী আর তাঁর দলবলের উপর হুকুম হোল, আদালতে হাজির হবার জন্ত।

উনিশ-শো-আটসালের ১০ই জানুয়ারী গাঙ্গীকে দু'মাসের জন্ত জেল দেওয়া হোল।

গান্ধীজী

জোহাননেসবার্গের জেলখানা। গান্ধীজীর প্রথম কারাবাস।

নিগ্রো ওয়ার্ড। নির্দেহ লোহার দরজা। উপরে একটি হুকর ছাড়া বসে একটি জানালা অবধি নেই। দরজাটি বন্ধ করে দিলে মনে হয় যেন একটি সিঁদুকের মধ্যে তাদের বন্ধ করা হয়েছে।

সকালেবেলা খাবার এলো—মকাইয়ের জাউ আর একটু নুন।

দুপুরবেলা দু'ছটাক ভাত, দু'ছটাক পাউরুটি, আধছটাক ঘি আর একটু নুন।

সন্ধ্যাবেলা মকাইয়ের জাউ আর একটা বড় আলু সিদ্ধ।

অল্প খাদ, কোন রকমে সে খাওয়া মুখে তোলা যায় না। একদিন গান্ধীজী জেলের ডাক্তারকে বললেন—আমরা কিছু মশলা পেতে পারি না ?

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—জেলখানার কয়েদীদের কোথায় মশলা দেওয়া হয় ?

—ভারতবর্ষে দেওয়া হয়।

—এটা ভারতবর্ষ নয়। এখানে মশলা দেওয়া হবে না।

বেশ তাহলে ভাল দিন, স্নায়ু পুষ্টিকর কিছুই তো আমরা পাই না।

—কয়েদীদের ডাক্তারী তর্ক করতে নেই। সপ্তাহে দুবার নিম্ন সিদ্ধ পাও, তাতেই স্নায়ু পুষ্ট হবে। বেশী আবদার ভাল নয়।

ডাক্তারের কাছে হুবিধা হবে না দেখে গান্ধীজী সুপারিনটেন্ডেন্টকে জানালেন। সুপার বললেন—আপনারা ইচ্ছামত রেঁধে খেতে পারেন, তবে দিনে একবারের বেশী দুবার রান্না করা চলবে না।

রান্না করা তো হুক হোল, কিন্তু সে আর এক হাকামা, তরকারী ওজনে কম পাওয়া যেত, তাই নিয়ে প্রতিদিন বগড়া।

ওদিকে গান্ধীজীকে ধরতেই ভারতীয়দের মাঝে ভিন্ন চেপে গেছে, তারা বলে বলে জেলে আসতে শুরু করলো। ক্রমশঃই সত্যগ্রহীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

দ্বিতীয় সপ্তাহে সরকার আপোষের কথা বলতে শুরু করলেন। গান্ধীজীকে প্রিটোরিয়ায় জেনারেল স্মার্টসের কাছে নিয়ে যাওয়া হোল, স্মার্টস বললেন—এখনকার সাহেবরা এমন এক আইন চাইছে বলে এই আইনটি পাস করানো হয়েছে। তবে অস্বীকার ভারতীয় যদি খেছায় এই পরোয়ানা গ্রহণ করে, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি যে এই আইন রদ হয়ে যাবে। আপনাদের সম্মান বজায় থাকবে।

এর পর আর আপত্তি করার কিছু থাকে না। গান্ধীজী রাজী হলেন। তাঁকে তখনই ছেড়ে দেওয়া হোল।

আমাদের গাঙ্কিজী

গাঙ্কিজীর কাছে তখন একটিও পয়সা নেই। জেনারেল স্মার্টসের সেক্রেটারীর কাছ থেকে গাঙ্কিজীভাড়া নিয়ে তিনি সেই ট্রেনেই গ্রিটোরিয়া থেকে জোহাননেসবার্গে ফিরলেন।

রাত এগারোটায় সময় জোহাননেসবার্গে সভা ডাকা হোল, অতো রাত্রেও সভার প্রায় হাজার খানেক লোক হোল। গাঙ্কিজী সবাইকে বুঝিয়ে বললেন আপোষের কথাটা। কিন্তু মীর আলম নামে এক পাঠান প্রতিবাদ তুললো,—আপনিই তো এতদিন বলছিলেন যে দশ আঙুলের ছাপ দিয়ে পাস নেওয়া পাপ।

—এখন আর সেই অবস্থা নেই, এখন আমরা দশ আঙুলের ছাপ দিয়ে পরোয়ানা নিতে পারি।

—অবস্থা কিছুই বদলায় নি, আপনিই শুধু বদলে গেছেন। আমরা ভনেছি জেনারেল স্মার্টসের কাছ থেকে পনেরো হাজার পাউণ্ড খুব নিয়ে আপনি আমাদের স্বার্থ বিক্রী করেছেন। আমরা দশ আঙুলের ছাপ দোব না, পাসও দোব না। আমাদের মধ্যে যে প্রথম দশ আঙুলের ছাপ দিতে বাবে তাকে আমি খুন করে ফেলবো।

গাঙ্কিজী বললেন—এই মিটমাটের জন্ত আমিই দারী, আমিই সবার আগে যাব পাস আনতে। সেজন্ত যদি পাঠান ভাইয়ের হাতে আমাকে বরতে হয়, আমি দুঃখ করবো না। রোগে মরার চেয়ে আমারই এক ভাইয়ের হাতে খুন হওয়া অনেক ভালো। আমাকে মারার পর সে বুঝতে পারবে আমি কোন অস্ত্রায় করিনি।

রাত তিনটের সময় সভা শেষ করে গাঙ্কিজী বাড়ী ফিরলেন।

দেড়শো জন সত্যাগ্রহীর জেল হয়েছিল, পরদিন সকালে জেনারেল স্মার্টসের আদেশে তারা মুক্তি পেল।

উনিশ-শো-আট সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী।

সত্যাগ্রহী নেতাদের আজ পাস নেবার দিন।

গাঙ্কিজীর আপিসের সামনে মীর আলম দাঁড়িয়েছিল, গাঙ্কিজীকে দেখে সে সেলাম করলো না। সেলাম না করা তার রীতি নয়। গাঙ্কিজীর কেমন বেন বিসদৃশ ঠেকলো, তবু তিনি বললেন—কেমন আছ ?

মীর আলম কটকট করে একবার মুখের পানে তাকালো শুধু, কথার কোন জবাব দিল না।

ইতিবসো, ইহুক মিঞা, বাঘি নাইডু প্রভৃতি এসে পড়লেন, তাদের সঙ্গে গাঙ্কিজী বেরিয়ে পড়লেন।

আমাদের গান্ধী

বীর আলম ও তার সঙ্গীরাও কিছু কিছু চললো।

রেজেন্ট আপিস মাইল বানেকের পথ।

আর কয়েক পা গেলেই আপিসের দরজায় এসে পৌঁছাবেন এমন সময় লম্বা ছ'ফুট মেহ নিয়ে বীর আলম সামনে এসে দাঁড়ালো, বললে—কোথায় বাজেন ?

—রেজেন্ট আপিস থেকে পাস আনতে। তুমিও এসো তোমার পাস নিয়ে যাবে।...

তুম্ব করে লাঠির এক দ্বা এসে পড়লো মাথার উপর। 'হে রায়'—বলে গান্ধীজী ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন—জানহীন। তার উপরেই চললো লাঠি আর লাথি মারা। সঙ্গীরা বার আটকাতে গেল, পাঠানরা তাদেরকেও রীতিমত পিটিয়ে দিল। একটা সোরগোল পড়ে গেল। পথচারী গোরারা পাঠানদের ধরে ফেললো।

পাশেই ছিল এক সাহেবের আপিস, সেখানে গান্ধীজীকে তুলে নিয়ে বাওয়া হোল।

জান হতেই গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন—বীর আলম কোথায় ?

—তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

—তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

—সে সব হবে, আপনি আগে সেরে উঠুন।

পাত্রী রেজারেও ডোক গাড়ীতে করে গান্ধীজীকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন।

ডাক্তার এসে। পাঁজরায় চোট লেগেছিল, মলম দিল, মালিশ করে দিল, ঠোঁট কেটে গিয়েছিল, সেলাই করে দিল; কথা বলতে বারণ করে দিল। জলীয় খাদ্য ছাড়া আর কিছু খেতে নিষেধ করলো। হাতের ইসারায় আর প্লোটে লিখে কাজ চালাতে হোল দিন কয়েক।

গান্ধীজী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—ভারতীয়দের পক্ষ থেকে তিনিই প্রথম দশ-আঙুলের ছাপ দিয়ে সার্টিকিফিকেট নেবেন। ডোক সাহেবের বাড়ীতে শুয়ে শুয়েই তিনি পরোয়ানা গই করলেন।

ভারপর এটর্নি-জেনারেলের কাছে টেলিগ্রাম করলেন,—বীর আলমের বিরুদ্ধে আমি মোকদ্দমা চালাতে চাই না, আশা করি আপনি তাকে ছেড়ে দেবেন।

সরকার বীর আলম ও তার সঙ্গীদের ছেড়ে দিল।

জোহান্সবার্গের সাহেবরা প্রতিবাদ তুললো—গান্ধী নিষে অপরাধীকে যাপ করতে পারেন, কিন্তু পথের উপর দিনছপুয়ে শুভাষি করা এ বন্ধকে চলবে না। অপরাধীদেরকে সাজা দিতে হবে।

আবাহের গাঙ্গী

বীর আলমের বলাকে পুলিশ আবাহ গাঙ্গীও করলে, যে সব সাহেব দায়পিত
 দেখেছিল তারা সাক্ষ্য দিল, বিচারে ওদের ছ'বাস করে জেল হোল।

দিন বেশেক গাঙ্গী ভোক সাহেবের বাড়ীতে ছিলেন। এই কদিন তাঁর বাড়ী
 খরশালা হয়েছিল। কত লোক আসতেন গাঙ্গীকে দেখতে। কখন যদলা কাগড়-
 চোপড়-পরা, হাঁটু অবধি ঘুলো বেখে, পোটলা-পুটনি কাখে আসতো ভারতীয়
 কেরীওলা, আবাহ কখনো বাসতো ইত্নি-চোত শোবাক-পরা সরকারের প্রধান য়ী।
 ভোক সাহেব ও তাঁর স্ত্রী উভয়তঃ সমান সমাদর জানাতেন। গাঙ্গীকে পরিচয়
 করতে কখনও তাঁদের কোন ক্রান্তি দেখা যায় নি, সারাক্ষণ কেউ না কেউ গাঙ্গীকে
 কাছে বসে থাকতেন। রাতে ভোক চুপি চুপি ছ'তিনবার এসে দেখে যেতেন।
 তাঁর মেয়ে অলিভ সময় সময় গাঙ্গীকে ইংরাজী ভজন গেয়ে শোনাতেন।
 নিজের বাড়ীতেও বোধ হয় গাঙ্গী এর চেয়ে বেশী যত্ন পেতেন না।

একটু স্থব্ব হলে গাঙ্গী নেতালে এলেন।

সেখানকার ভারতীয়েরা এক সভা ডাকলো। সভার মাঝে নানাভাবে নানা প্রশ্ন
 করলো। কি ভাবে জেনারেল স্মার্টসের সঙ্গে মিটমাট হোল গাঙ্গীকে সে সব
 বুঝিয়ে বলতে হোল। সবাই তাঁর কথা বিশ্বাস করলো না। সভার মাঝে গোলমাল
 শুরু হয়ে গেল।

বক্তার মঞ্চের উপর এক পাঠান লাকিয়ে উঠলো, তার হাতে এক যন্ত লাঠি।

হেঁচোছড়ি করে ক'জনে সভার আলো নিভিয়ে দিল।

বিপদ বুঝে গাঙ্গীকে শুভাকাঙ্ক্ষীরা চারিপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরলেন।
 সভাপতি শেঠ দাউদ মহম্মদ টেবিলের উপর উঠে সবাইকে বোঝাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কে একজন রিভলভারের একটা ফাঁকা আওয়াজ করলো। পার্শ্ব
 কন্ডামজী ছুটে গেলেন পুলিশে ধব্ব দিতে।

তখনই পুলিশ এসে পড়লো, গাঙ্গীকে তারা কন্ডামজীর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে
 গেল।

পরদিন গাঙ্গী কিনিক্সে কিয়ে গেলেন, ভারতীয়েরা তাঁকে একা ছাড়লো
 না। তখনকার বিখ্যাত ভারতীয় ব্রুইম্যান জ্যাক মুনালী সবলে তাঁকে সঙ্গে করে
 কিনিক্সে নিয়ে এলেন এক দিনে রাতে গাঙ্গীকে চোখে চোখে রাখলেন।

স্বাধীনতার আন্দোলন

কেনারেল স্মার্টস্‌ কিছ কথ্য রাখলেন না। এশিয়াটিক আইন বল না করে, বাধ্যতামূলক করে দিলেন।

গাঙ্গুলী চিঠি লিখলেন, স্মার্টস্‌ তার উত্তর দিলেন না।

গাঙ্গুলী ইন্সভালেনের সর্বশেষের কাছে চিঠি লিখলেন—বাব 'কাল-কাল' রব করা না হয়, তাহলে সমস্ত পরোয়ানা জালিয়ে দোব।

সর্বশেষ উত্তর দিল—সরকার মন্ত বদলাতে অক্ষম।

ভারতীয়েরা এক বসন্তের প্রাঙ্কলে সমবেত হোল। পরোয়ানা তারা সঙ্গে এনেছিল, প্রায় দু'হাজার পরোয়ানা সেই সভায় পুড়িয়ে ছাই করা হোল। যতক্ষণ পরোয়ানাগুলি জললো ততক্ষণ সভার লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল।

এককে কেনারেল স্মার্টস্‌ এশিয়াটিক আইনের সঙ্গে আরেক নতুন আইন পাস করিয়ে নিলেন—ইবিগ্রেসন্‌ রেজিক্সন্‌ এক্ট। যাতে কোন নতুন ভারতীয় ইন্সভালে আর প্রবেশ করতে না পারে তারই ব্যবস্থা করা হোল। স্মার্টস্‌ বললেন—আমি গাঙ্গুলীকে বতটা চিনেছি আর কেউ এমন চেনে না। বসতে গেলে তিনি গুতে চান। তাঁর চালাকি আয়রা বরদাস্ত করবো না, তাঁর বা শক্তি থাকে কখন, ভারতীয়দের সম্পর্কে আমরা যে নীতি গ্রহণ করেছি, তাই চালু থাকবে।

গাঙ্গুলী এই চ্যালেঞ্জ যেনে নিলেন, সত্যগ্রহ শুরু হোল।

প্রথম সত্যগ্রহী সোয়াবজী-সাপুরজী আড়াকনীয়া প্রকাশ ভাবে ইন্সভালে প্রবেশ করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা কলু হোল, ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিলেন—এক সপ্তাহের মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যাও।

সোয়াবজী সে-আদেশ মানলেন না, আদেশ অমান্তের অপরাধে তাঁর একমাস জেল হোল।

ভারতীয়েরা এবার বিনা লাইসেন্সে কিরি করতে লাগলো, বিনা সার্টিফিকেটে ইন্সভালে আসতে লাগলো,—রীতিমত আইন অমান্ত শুরু হয়ে গেল।

পুলিশ ধরে, ধরে, জেল দেয়, কিন্তু আন্দোলন কবে না। চৌদ্দ বছরের ছেলে থেকে বাট বছরের বুড়ো পর্যন্ত, ধনী গরীব নির্বিচারে জেলে যেতে শুরু করলো। জেলে তাদের কব কই সেওয়া হোত না—পায়খানা সাফ করা, পাখর কাটা, পুতুর কাটা, বাজী কোশানো, কিছুই বাধ ছিল না। হাতে কোড়া পড়েছে, অসহ্য পরিশ্রমে দুর্জা গেছে, নাপান্ন নামে একজন সত্যগ্রহী জেলের কটে মরে গেল, তবু ভারতীয়েরা পরাক্রম বানলো না।

সত্যগ্রহীতাদের

কত লোককে আর জেলে ভরে রাখা যায় ? সেসে সত্যগ্রহীদের ঐক্য দেখাই করে ইন্সপেক্টর সত্যের সীমানা পাঁচ করে ছেকে দিবে আশা হোক ।

তবু ভারতীয়দের উৎসাহ কমে না ।

সরকার এবার বাক্য করে তাকেই জাহাজ তুলে দেয়, একবারে সমুদ্র পার করে ভারতবর্ষে ফেল দিয়ে আসে । তাদের ছেলে-মেয়ে, কোত-জমি ব্যবসা দেখানোই পড়ে থাকে । তার উপর জাহাজের কষ্ট অনশ্রীত—খাওয়ার কোন হু-হু-হু-হু-হু নেই, সবাই ডেকেয় বাজী, এই কষ্ট সহিতে না পেরে নারায়ণ স্বামী বাবে এক সত্য-গ্রহী মারা যায় ।

এই নিঃশব্দ আগন্তুকদের সম্পর্কে ভারতবর্ষেও আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, এবং শেষ অবধি ইন্সপেক্টরকে এই কৌশল বন্ধ করতে হোল ।

এদিকে আবার জেলের ভিতরেও নানা রকম জুলুম শুরু হোল । ভারাক্রমিক জেল-খানার সত্যগ্রহীদের জেলার একদিন বা তা অপহরণ করলো । প্রতিবাদে সত্যগ্রহীরাও উপবাস শুরু করলো, বললো—হয় এই জেলারকে এখান থেকে বদল করা হোক, না-হয় আমাদের অস্ত্র জেলে পাঠানো হোক ।

সাতদিনেও সরকার তাদের খাওয়াতে পারলো না । শেষ অবধি গভর্নেন্টকেই হার মানতে হোল, সত্যগ্রহীদের অস্ত্র জেলে পাঠানো হোল ।

ইতিমধ্যে ভারতীয়েরা ঠিক করলো বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাতে হবে ।

গান্ধিজী ও শেঠ হাজি হাবিব বিলাতে গেলেন । পার্লামেন্টের সভাপতি ও প্রত্যেকটি সদস্যের সঙ্গে দেখা করলেন । কিন্তু বিশেষ কোন লাভ হোল না ।

হাজার হাজার মানুষের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে গান্ধিজী জাহাজ থেকে নামলেন । একদিকে জেনারেল আর্টস ও জেনারেল বোথার পৌ, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপুল রাজস্ব, আইন কাহন ও পুলিশ, আরেকদিকে কয়েকহাজার ভারতীয়ের মরণপণ সত্যগ্রহ । কতদিন এই সংগ্রাম চলবে কে জানে ! বারা জেল খাটবে তাদের ছেলেমেয়েদের কে খাওয়াবে ? তাদের বাড়ী ভাড়া দেবে কে ? তা বলে কি শুধু অর্থের জন্যই পরাজয় মানতে হবে ?

চিন্তাচ্ছন্ন গান্ধিজী কেগটাউনে নেবেই 'ভার' গেলেন—তার রতন টাটা বিলাত থেকে পশ্চিম হাজার টাকা পাঠিয়েছেন ।

টাকা তো হোল, কিন্তু এই টাকা থেকে যদি প্রত্যেকটি পরিবারকে প্রয়োজন মত সাহায্য করতে হয় তাহলে এ টাকার আর কতদিন বাবে ? সব কটি গৃহস্থকে

আবাবের গাছিকী

একজ রাখতে পারলে বাই-ধরচ কম পড়ে, বাড়ী ভাড়াও কম লাগে। কিন্তু অতোগুলো মানুষকে এক সঙ্গে রাখার দত্ত আরগা কই? ফিনিক্সে রাখা চলে, কিন্তু, ফিনিক্স জোহানেসবার্গ থেকে অনেক দূর, তিনশো মাইল পথ। খ্রিশ যতীর রাজ্য। কাছাকাছি কোথাও কিছু পাওয়া যায় না?

জার্মান স্থপতি হার্মান কলেনবেক বললেন—কোন ভাবনা নেই আমি দোব।

জোহানেসবার্গ থেকে একশ মাইল দূরে কলেনবেকের ৩৩০০ বিঘা জমি কেনা ছিল, সত্যগ্রহীদের জন্য তিনি সেটা ছেড়ে দিলেন।

এখানেই গাছিকীর নতুন আশ্রম গড়ে উঠলো—টলটয় কার্ম।

যতদূর চোখ যায় কমলালেবু, আখরোট আর কুলের গাছ, ফলভারে নত হয়ে পড়েছে। ছোট একটি টিলাকে পাশ কাটিয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে এক শীর্ণা বর্ণার ধারা, চারিপাশে শান্ত প্রকৃতির সমাহিত শ্রাবণিয়া। বাতাসে পাতায় বর্মর আগে, সমীরণে ছোঁয়া লাগে প্রকৃতির অনন্ত মেহের।

আশ্রমের সম্বল কয়েকটি টিনের ঘর মাত্র। আশ্রমবাসী প্রায় শ'খানেক। হিন্দু মুসলমান পাশী ও খৃষ্টান। ছেলে বুড়ো স্ত্রী ও পুরুষ। কিন্তু সেজন্য খাওয়া-পন্নায় কোন বাচ-বিচার ছিল না। সকলেই নিরাশ্রিত খেতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় ঘরে পেবাই-করা গমের 'আটা' থেকে পাউরুটি তৈরী হোত, তার সঙ্গে থাকতো তাজা চিনাবাদামের গুঁড়া, আর নারান্দী ছালের মোরকা, দুধ ও কফি। ছপুয়ে ভাত তরকারীর ব্যবস্থা ছিল।

আশ্রমের কোন ঝি-চাকর ছিল না, নিজের কাজ নিজেই করতে হোত। পারখানা সাক করা থেকে রান্না করা পর্যন্ত সবই আশ্রমিকদের করণীয় ছিল, বাদের জীবনের একটি ঘটনাও চাকর ছাড়া চলেনি এমন সব লোক—গ্রাগজী, রায়গন, কলেনবেক প্রভৃতিও সামনে এই নীতি যেনে নিয়েছিলেন। গ্রাগজী তো একদিন ক্রান্তি ও গরমে অজ্ঞান হয়ে পড়েন, তবু তিনি আশ্রম ছাড়েন নি।

ছপুয়ে আশ্রমিকেরা ছুতোয়ের কাজ করতো। গ্রামে ফেসব কাঠের জিনিষ বরকার হোত তা আশ্রমবাসীরাই তৈরী করে দিত।

আজ্ঞে চামড়ার কাজ হোত। কলেনবেক ছুতো তৈরী করা শিখেছিলেন, গাছিকী ও আর কয়েকজন রীতিমত স্রাওল তৈরী করা শুরু করে দিলেন। বস্ত্রের কাছে সেই ছুতো বিক্রী করা হোত।

সন্ধ্যাবেলা খোলা হাটে পাঠশালা বসতো। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর বেধা-পড়া আর জমতো না, আন্তিতে শিকক ও ছাত্র সবাই বিরক্তো। গাছিকী

আশ্রমের গান্ধিনী

ও কলেনবেক বারবার চোখে জল দিয়ে আনতেন, কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে সাদা তোলা মুকিল হয়ে পড়তো। অনেক সময় এই তত্ত্বা কর করার কত তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে খেলাখুলা শুরু করে দিতেন।

আশ্রম থেকে জোহানেসবার্গ ছিল একশ মাইল দূর। বরচ কমানার জন্য নিয়ম করা হয়েছিল, এই একশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাতায়ন করতে হবে। বারা শহরে যাবার, তারা রাত আড়াইটার সময় বেরিয়ে পড়তো, সকাল আটটা-নটা নাগাত পৌছে যেত জোহানেসবার্গে, কাজ শেষ করে আবার হেঁটে ফিরে আসতো সেই দিনই। তবে আশ্রমের নেহাৎ জরুরী কোন কাজ থাকলে ঐশে বাওয়া চলতো,—অবশ্য তৃতীয় শ্রেণীতে।

আশ্রমিকদের পোষাক ছিল গুণানকার মজুরদের যত—আস্‌মানী রঙের পাখলুন আর সার্ট।

টলটয় কার্যে সাপের জয় ছিল। কিন্তু গান্ধিনীর নীতি অহিংসা, বললেন—সাপ যারা চলবে না।

কলেনবেক বললেন—বেশ সাপের সঙ্গে তা'হলে বন্ধুত্ব করবো।

সাপ সম্পর্কে যতগুলি বই আছে তিনি বোগাড় করলেন ও পড়ে শেষ করলেন। সব রকমের সাপ চিনতে শুরু করলেন, শেষে এক প্রকাণ্ড অজগর ধরে গৃহে লাগলেন। তার চালচলন দেখেন। তাকে নিজের হাতে ধাওয়ান। ছেলেমেয়েরা দেখে খুশি হয়, গান্ধিনীও আনন্দ পান। তবু তিনি মাঝে মাঝে বলেন—ওকে ছেড়ে দাও, একটা প্রাণীকে এভাবে আটকে রাখা অজ্ঞার।

কলেনবেক বললেন—কদিন বাক, তারপর ছেড়ে দেবো।

কিন্তু বেশীদিন গেল না, একদিন খাঁচার বরজা খোলা পেয়ে অজগর কখন কোথায় পালিয়ে গেল।

আশ্রমে যে একেবারেই সাপ যারা হোত না, তা নয়। একদিন কলেনবেকের ঘরে এমন আয়গায় এক বিষধর সাপ দেখা গেল, যেখান থেকে তাকে তাড়ানো যাবে না, ধরাও যাবে না। ছেলেরা সিরে তখনই বাপুজীকে ডেকে আনলো, অবস্থা দেখে বাপুজীই আদেশ দিলেন—মেরে ফেল।

আশ্রমে গান্ধিনী নিজেই রোগীদের চিকিৎসা করতেন।

মুটামুটের বয়স প্রায় সত্তর বছর, অনেক দিন ধরে বেচারী হাঁপানি কান্ডিতে কট

আমাদের গান্ধী

পাছে। ভাতার খতি বড় কম দেখার নি। কিন্তু কল কিছুই হয় নি। শেষে টলটির কার্বে এসে বাপুজীকে ধরলো—আমাকে আপনি সারিয়ে দিন।

গান্ধীজী বললেন—এখানে এসে তাহলে দিন কতক থাক, দেখি কি করতে পারি।

প্রতিদিন দুপুরে লুটাবনের রৌত্র-বানের ব্যবস্থা করলেন, তার ব্যবস্থার মধ্যে অন্ন ভাত ও জলপাইয়ের তেল, মধু, নারেলী, আঙ্গুর আর কফি। ছন ও মশলা একেবারে বাদ।

সাতদিনের মধ্যে কোন উপকার হোল না। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন—লুটাবন, তুমি কি বিড়ি খাও?

—আগে খেতাম, এ-ই ক’দিন তো খাইনি।

তবু বাপুজীর সন্দেহ যায় না, একদিন রাত্রে সমাগ হ’য়ে থাকেন। দুপুর রাত্রে লুটাবনের কাসি ওঠে। খানিকক্ষণ কাসির পর একটি বিড়ি ধরিয়ে সে খেতে শুরু করলো। গান্ধীজী বাইরের বারান্দায় শুয়েছিলেন, ভিতরে গিয়ে টর্চের আলো ফেললেন লুটাবনের উপর। লুটাবন চমকে উঠলো, বিড়ি ফেলে দিয়ে বাপুজীর পায় ধরলো—আমি আর কখনো বিড়ি খাব না, আপনাকে ঠকিয়েছি, মাফ করুন।

সেইদিন থেকে লুটাবন বিড়ি ছাড়লো।

এক মাসের মধ্যে তার হাঁপানিও সেরে গেল।

ষ্টোন-মাটারের একটি ছেলের টাইফয়েড হোল। ছেলেটির বয়স বছর দুয়েক। মাটার মশাই খুব ভয় পেয়ে গেলেন, বাপুজীর কাছে এলেন—তিনি কিছু করতে পারেন কি না?

গান্ধীজী প্রথমদিন ছেলেটিকে একেবারে অনাহারে রাখলেন।

দ্বিতীয় দিনে মাত্র অর্ধেকটা কলা, আধ চামচ অলিভ-অয়েল আর একটু লেবুর রস দিয়ে মেড়ে খেতে দিলেন। রাত্রে ছেলেটির পেটে মাটির পুলটিশ বেধে দিলেন।

এইতেই ছেলেটি ক্রমশঃ আরাম হ’য়ে গেল।

এই সময় কস্তুরবাবু খুব অসুস্থ করে, ভাতার বললো—আমাদের স্বকর খেতে হবে।

কস্তুরবাবু আগতি তুললেন, গান্ধীজী বললেন—ভাতারবাবু আপনি অন্ন কোন ব্যবস্থা দিন।

গান্ধীজীর স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের মূল্য—আমি শুধু ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যের স্বকীয় শেখা নিয়েছি।
গান্ধীজী চমকে উঠলেন, বসলেন—আমনি স্বাস্থ্যই বসেছেন, যেবার আমি
স্বাস্থ্যের মূল্য নি কেন ?

—রোগীকে বাঁচাবার জন্য বা কিছু করা সরকার, স্বাস্থ্য, নিজের স্বাস্থ্যেই
করি। যেখানে রোগীর মজামতের কোন সুব্যবস্থা আদ্যের কাছে নেই। আপনারা
বাই বলুন না কেন প্রয়োজন বসত মাংসের স্বকীয় আমি দেখেছি।

তখন ডাক্তারের বাড়ী থেকে বাপুজী কস্তুরবাকে নিয়ে এলেন। বাইরে
বিম্ব বিম্ব করে বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে ওই রকম রোগীকে নিয়ে রিক্সা ও ট্রেনে
করে আশ্রমে ফিরে আসা বড় সহজ ব্যাপার নয়। কস্তুরবা তখন উঠে পড়তে
পারেন না, ট্রেনের প্ল্যাটফর্মটি গান্ধীজী তো তাঁকে কোলে করেই পার হইলেন।
কেবলই ভয় হয় হয়তো এই পরিস্থিতিতে রোগী হার্টফেল করবেন।

আশ্রমে এনে জল-চিকিৎসায় গান্ধীজী কস্তুরবাকে আশ্রম করেন।

বাপুজীর চিকিৎসার ধারা ছিল অভিনব। একবার কস্তুরবার এক অপারেশন
হয়, কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসায় শরীর সারে না, শেষে বাপুজী কোন ওষুধ না
খাইয়ে শুধু ভাল আর দুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে কস্তুরবাকে সম্পূর্ণ নিরাময়
করে তোলেন।

এই আশ্রমে থাকার সময় গান্ধীজী দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। রান্না-করা
কিনিব খাওয়া ছেড়ে দেন। শুধু ফল ছাড়া আর কিছুই তিনি খেতেন না।
একাদিক্রমে ছ'-বছর পর্বন্ত তিনি ফল খেয়েই ছিলেন, তাতে তাঁর শরীর এতো
সবল ছিল যে দৈনিক চল্লিশ বাইল ইঁট ঠাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ ছিল, একদিন
অনারাসে একবার বাইল অবধি হেঁটে গিয়েছিলেন।

টলষ্টয় কার্ফ হুক করে গান্ধীজী যে কিনিক্সের আশ্রম ছেড়ে দিয়েছিলেন
তা নয়, দুটোতেই তিনি বোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। এই দুটি আশ্রমেই
তাঁর সব চেয়ে বড় কথা ছিল বাহুব তৈরী করা। একজন আশ্রম-বাসীরের ক্রটি-
বিজ্ঞানটি তাঁর মনে বড় লাগতো। একবার টলষ্টয় কার্ফে এক ছুই ছেলেকে তিনি
কিছুতেই বশে আনতে পারলেন না। সফেবো বছরের জোয়ান ছেলে, কোন
কথাতেই কান পাতে না, কাকর না কাকর, শুধু প্রতিদিন বগড়া বাধাবেই।
একদিন গান্ধীজী আর সইতে পারলেন না, হাতের কাছে একটি কল-কাঠ

আব্বাসের গাফিলত

ছিল, ফুলে নিয়ে ঘনিবে দিলেন এক বা। গাফিলতী কখনো কাকর গাফ হাত তোলেন না। আর খেয়ে ছেলোট কেমন যেন হয়ে গেল, বাপুজীর হুখের পানে তাকিয়ে সে বর বর করে কেঁদে কেললো, বললে—আবার অজ্ঞার হয়েছ, আবি আর কোনদিন কাকর সঙ্গে বগড়া করবো না।

ছেলেটির চরিত্র যে তারপর একেবারে বদলে গিয়েছিল, তা নয়। কিন্তু বাপুজীর মনে একটা খাঙ্কা লাগলো, জীবনে তিনি কাউকে প্রহার করেননি, প্রহার যে করলেন তার বিশেষ কোন কলও হোল না, মনের সবমটাই নষ্ট হোল শুধু।

কিছুদিন পরে ফিনিক্সের আশ্রমে দুটি ছেলের ছুটামির কথা তাঁর কানে এলো। এবার বাপুজী ছেলেদুটিকে কোন শাস্তি দিলেন না, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নিষ্কেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান করলেন,—আশ্রমের যত কিছু দোষ তার জন্ত, তিনিই তো দায়ী। তিনি সাতদিন উপোস করলেন, তারপর দিনে একবার যাত্রা আহার করে কাটালেন সাড়ে চার মাস।

আশ্রমের মাঝে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল কিন্তু যতদূর আশা করা গিয়েছিল, ততটা ফল পাওয়া গেল না। দিনকয়েক বাদে আবার ছেলেদের মাঝে গোলযোগ দেখা দিল, এবং এবার বাপুজী আবার উপবাস শুরু করলেন।

এবার পুরো দু'সপ্তাহ।

এবার আশাতীত ফল পাওয়া গেল, সমস্ত আশ্রমের আবহাওয়া বদলে গেল একেবারে। তবে এবার গাফিলতী খুব দুর্বল হয়ে পড়লেন।

গোথলে এলেন আফ্রিকায়। বড় বড় রেল ট্রেনগুলি লাজানো হোল। বড় বড় হুম্বর কাক-কার্খচিত্ত তোরণ তৈরী হোল। গোথলেকে এমন সম্মান দেখানো হোল, বা অনেক রাজার ভাগ্যেও সব সময় জোটে না।

প্রথম সভা হোল কেপ্টাউনে।

তারপর জার্কসডপ ও জোহানেসবার্গ। সহরের হাজার হাজার লোক সভায় এসেছিলেন। কিন্তু কোথাও কোন গোলমাল হয়নি।

জোহানেসবার্গের এক সভায় এক গিনি করে টিকিট করা হয়েছিল। তাতেও একখানি চোরার খালি যায় নি।

গাফিলতী গোথলের সেক্রেটারীর কাজ করছিলেন, তিনি বললেন—আপনি দায়িত্বকে বনুন, আবি এদের হিম্মিতে স্তম্ভিত করে পোব।

গোথলে জেনারেল স্মার্টস্ বললেন—একবার বাহুবল প্রদর্শন করি, আর ভূমি যারাও সৈন্যে হিন্দিতে অগ্রবর্তী করবে। এতো কালের যারাও আর হিন্দি ভূমি শিল্পে কোথায় বলত ?

গান্ধীজী বললেন—যারাও আমি ভালো জানি না যুক্তি, কিন্তু যারাও আমি বুঝতে পারি, আপনি বা বলবেন তার মোটামুটি তর্জমা আমি ঠিক করে দোব, আপনি দেখবেন। আমরা শুধু আপনার মুখ থেকে সেক্টর জাতি জনতে চাই, ইংরাজী জনতে চাই না।

কাজেই গোথলে যাত্ৰাযাতেই বক্তৃতা করলেন।

তারপর ভারতীয়দের যতগুলি সভা হয়েছিল সবক'টিতেই গোথলে যাত্রাঠাতে বক্তৃতা করেন।

গোথলে জেনারেল স্মার্টস্ ও জেনারেল বোধার সঙ্গে দেখা করেন। অনেক কথাবার্তা হয়। গোথলে শেষ অবধি তাঁদের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন—এক বছরের মধ্যে এসিয়াটিক আইন রদ করা হবে, এবং তিন পাউণ্ড করও তুলে দেওয়া হবে।

কিন্তু গোথলে চলে যাবার পর জেনারেল স্মার্টস্ তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন না, তার উপর এক মামলায় আদালতের জজেরা ঠিক করলেন—জীটান বিয়েই ঠিক, আর হিন্দু মুসলমান পার্শ্বদের বিয়ে ভুল। এবং তাহলে হিন্দু মুসলমান ও পার্শ্বদের ছেলে-মেয়েরা আইনভুক্ত পিতার সম্পত্তি দাবী করতে পারে না।

ভারতীয়দের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল,—এ কি ?

গবর্নেন্ট বললো—ঠিক জায় !

মেয়েরা এবার সত্যগ্রহ শুরু করলো।

প্রথমে সাড়া দিলেন টেলিগ্রাফ কার্খের এগারো জন মহিলা—তাঁদের দুকনের কোলে দুধের শিশু ছিল।

তারপর এগিয়ে এলো কিনিক্সের মেয়েরা।

কিন্তু 'বাবা'ও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। বললেন—আমিও বাব।

গান্ধীজী বললেন বেশ কথা, কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে যদি কাপতে থাক, কিংবা জেলের কষ্ট সহিতে না পারো তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখো।

—যদি আমি হার মেনে থালিয়ে আসি তাহলে ভূমি আমাকে বাঁধী দুকতে দিও

আমাদের গান্ধী

না! তুমি কি ভাব যে তুমি বা সহিতে পারো, আমার ছেলেরা বা সহিতে পারে
আমি তা সহিতে পারি না!

—কিন্তু যাবার আগে ভালোমত না ভেবে...

—আমি ভেবে নিয়েছি।

সভ্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেল।

একদল মেয়ে পাস না নিয়ে ট্রান্সভালে ঢুকলো, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে
তিন মাস করে জেল দিল।

মেয়েদের জেলে অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হয়। সেখানকার খাবার কেউ মুখে
ভুলতে পারতো না, কতরুবা একবার আপত্তি জানালে, জেল-স্থপার তাঁকে জবাব
দিল—এটা হোটেল নয় যে খুসি মত খাওয়া পাবে!

এর উপর ছিল ধোপার কাজ।

তিন মাস পরে যখন মেয়েরা জেল থেকে বেরুলো তখন তাদের চেনা যায় না।

আঠারো বছরের মেয়ে ভালিয়ামা, জর নিয়েই বেরিয়েছিলেন, কদিন পরেই মারা
গেলেন। মারা যাবার আগে ভালিয়ামা বলেন—আমি আবার জেলে যেতে রাজী
আছি। যদি মরতে হয় দেশের জন্মেই মরবো!

এই সব অসুস্থ মেয়েদের অনেক সময় বাপুজী একাই ঠেলা-গাড়ী করে ষ্টেশন
থেকে আশ্রয় অবধি নিয়ে আসতেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজের সম্পাদক স্বামী
ভবানীদয়াল লিখেছেন : আমার স্ত্রী জগরাণীকে নিয়ে যখন ষ্টেশনে পৌঁছালাম, দেখি
চটের সার্ট আর চটের হাক্‌ প্যান্ট পরে বাপুজী একটা ঠেলা-গাড়ী নিয়ে ষাড়িয়ে
আছেন। গাড়ীতে বিছানা পাতাই ছিল, জগরাণীকে এনে তো ওইখানে বসলাম।
বাপুজী একাই আড়াই মাইল পথ গাড়ী ঠেলে নিয়ে এলেন কিনিক্স্ আশ্রমে।

নিউকাসলের কমলা খনির ভারতীয় মজুরেরা কাজ ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে
মালিকেরা তাদের কোয়ার্টার্স থেকে বের করে দিল, জল বন্ধ করে দিল, জিনিষ-
ছুঁড়ে কেলে দিল পথে। বারা প্রতিবাদ তুললো তাঁদের বীতিমত গ্রহণ দিল।
এক পাঠান মজুর গান্ধীজীকে শিঠি লেখিয়ে বললো—এই দেখুন, আমাকে কি রকম
হয়রেছে। আপনি ব্যরণ করেছেন বলেই আমি ছেড়ে দিয়েছি, নাহলে পাঠান
কখনও হুশ করে বার যায় না।

গান্ধীজী বললেন—তুমি ভাই ঠিক করেছ, অমনি মনের জোর থাকলে আমরা
ঠিক জিতবো।

আমাদের গান্ধী

যুগে জে সাহস দিলেন, কিন্তু হাজার হাজার সর্বহারা মজুরকে রাখেন কোথায় ?
খাওয়াবেন কি ? টাকা কোথায় ?

টাকা মাঠে হাজার হাজার মজুর এসে জমায়েৎ হোল ।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা রাস্তা করার বাসন দিল, চাল ডালের বস্তা পাঠিয়ে দিল ।
যারা কিছু দিতে পারলো না, তারা এলো বেচ্ছাসেবক হয়ে সেবা করতে ।

গান্ধীজী ঠিক করলেন এদের নিয়েই আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু করবেন ।
মজুরদের ডেকে বললেন—এই সব অজ্ঞাতের প্রতিকার করার অস্ত্র জেলে বেঁচে হবে ।
যারা এগিয়ে যাবে তাদের পিছিয়ে আসা চলবে না । যাদের ভয় করে তারা আগেই
কিরে যাও ।

পাঁচ ছ' হাজার হরতালিয়া এক সঙ্গে সাড়া তুললো—আমরা জেলে যাব !

গান্ধীজী তাদের নিয়ে প্রস্তুত হলেন ।

মালিকেরা গান্ধীজীকে ডেকে বললেন—হরতাল বন্ধ করুন ।

—আপনারা মাথা পিছু তিন পাউণ্ড কর তুলে নিন্ ।

—আমরা কি গবর্নেন্ট ?

—গবর্নেন্ট আপনারা হাতে, আপনারা অহরোধ করলে গবর্নেন্টের না শোনার
কোন কারণ নেই ।

—এই হরতালের পরিণাম কি আপনি জানেন ?

গান্ধীজী হাসলেন ।

—এই মূর্থ নিবোধ মজুরদের যে কতি হবে, তা কি আপনি দেখেন ?

—কতি হবে জেনেই তো তারা হরতাল করেছে । আত্মমর্দা না হওয়ার
চেয়ে আর যে কি বড় কতি আছে তাতো জানি না ।

গান্ধীজী ভয় পাবার মানুষ নন, সন্ধি হোল না ।

হাজার হাজার মজুর পায়ে হেঁটে বাজা শুরু করলো, তাদের পথ দেখিয়ে চললেন
গান্ধীজী ।

দৈনিক হুড়ি পঁচিল মাইল ষাঁট ।

মাথা পিছু পোরা তিনেক কটা আরকিছু শুড় । রাজে মূক আকাশের নীচে বিদ্রোহ ।

কদিনের মধ্যেই হলটি ট্রান্সভালের প্রান্তে এসে পৌছালো ।

গান্ধীজী কেনারেল স্ট্রাসের কাছে টেলিফোন করলেন—আমরা ট্রান্সভালে

আমাদের গাঙ্গিঙ্গী

চুকাও, সার্টিফিকেট নোহ না, আইন ভাঙবো। আশনি বহি তিন্ন পাউণ্ড কর রদ করেন তবেই আমরা থামতে পারি, নতুবা আমরা নিকপার।

উত্তর এলো—জেনারেল সার্টিস্ আশনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না, আপনার বা ইচ্ছা হয় করতে পারেন।

আর বিধা রইল না, গাঙ্গিঙ্গী সদলে ডোকশ্রুটের অর্থা পার হয়ে ইনসুতালের সীমানার পা দিলেন। তাঁর পিছনে এলো হরতালিয়াদের সারি—তু' হাজার সাইক্রিন জন পুরুষ, একশো সাতাশ জন স্ত্রীলোক, আর সাতাশটি বালক বালিকা।

সামনেই ছিল অশারোহী পুলিশ, জনতাকে রুখে দেবার জন্য তারা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলো, কিন্তু তুখ সহ করার দৃঢ়তা নিয়ে যারা এগুচ্ছে তাদের পথ রোধ করা তো সহজ নয়! হরতালিয়ারা ঠিক এগিয়ে চললো।

ডোকশ্রুটের আট মাইল দূরে সেদিন তাঁবু পড়লো। গভীর রাতে সবাই ঘুমুচ্ছে এমন সময় শোনা গেল খটখট শব্দ। গাঙ্গিঙ্গীর ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন : লণ্ঠন হাতে নিয়ে সিপাই আসছে।

গাঙ্গিঙ্গী উঠে বসলেন।

পুলিশ অফিসার এসে বললেন—আপনাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি!

—আমি প্রস্তুত। কোথায় যেতে হবে বলুন?

—এটেশনে।

—বেশ চলুন।

পাশেই শুয়ে ছিলেন পি, কে, নাইডু, তাকে জাগিয়ে গাঙ্গিঙ্গী বললেন—হেঁ চৈ করার কোন দরকার নেই। তোমাদের অগ্রগতি সমানে চলতে থাকবে। পুলিশ যাকে ধরবে সে ধরা দেবে, বাকী সবাই এগিয়ে চলবে। তুমিই এখন বলের নায়ক!

ডোকশ্রুটের আদালতে পরদিন গাঙ্গিঙ্গীকে হাজির করা হোল, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে লকাশ পাউণ্ডের জামিনে মুক্তি দিলেন। কলেনবেক মোটার নিয়ে আদালতের দরজায় তৈরী ছিলেন। মোটার ছুটিয়ে গাঙ্গিঙ্গীকে নিয়ে এলেন হরতালিয়াদের মাঝে!

আবার গাঙ্গিঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা হোল ইন্ডার্টন গাঁয়ে।

দুপুরে গাঙ্গিঙ্গী তখন হরতালিয়াদের মাঝে কুটি বিলুচ্ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট এসে বললেন—আপনি আমায় করেরী।

গাঙ্গিঙ্গী হেসে বললেন—আমার তাহলে পবোরতি হয়েছে, দারোগার বদলে এখান ম্যাজিস্ট্রেট বিকেই এসেছেন।

দিনের গাঙ্গী

আমালত কখনও চলাছিল, গাঙ্গীকে আমালতে নিয়ে গিয়ে এবারও গাঙ্গীকেই আধিন ছিলেন।

এবারও খোঁজার তৈরী ছিল। গাঙ্গী কিরে এলেন তাঁর গলে।

পরদিন বেলাকোটে এবার গাঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা হোল।

ভাঙিতে গাঙ্গীর বিচার হোল : ন'মাস সশ্রম কারাবাস।

ওদিকে গাঙ্গীর সঙ্গীদেরও পুলিশ গ্রেপ্তার করলো বেলাকোটে। সেখানে দুখানি স্পেশাল ট্রেন তৈরী ছিল। সেই ট্রেনে হরতালিয়ারদের ভর্তি করে নেতালে কিরিয়ে নিয়ে বাওয়া হোল।

তারা তো প্রথমে ট্রেনে উঠতেই চায় নি, বললো—গাঙ্গী-ডাইকে আনো, তিনি যদি বলেন তবেই ট্রেনে উঠবো।

মিটার পোসক ছিলেন তাদের সঙ্গে, তিনি অনেক বুঝিয়ে বলবার পর তবে তারা ট্রেনে ওঠে।

ভারতীয়দের মধ্যে এবার সাড়া পড়ে গেল, অনেকেই এবার নেতাল থেকে বিনা পাসে ট্রান্সভালে ঢুকতে লাগলো, এবং পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে লাগলো।

এদেরই মধ্যে একজন ছিলেন, পাঁচাত্তর বয়সের বুড়ো,—হরবৎ সিং। গাঙ্গী একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি জেলে এলেন কেন? আপনার মত বুড়ো লোককে তো আমি জেলে আসতে বলিনি?

হরবৎ বললেন—আপনি ত্রীপুত্র নিয়ে জেলে আসতে পারেন, আর আমরা বাইরে পড়ে থাকবো?

—কিন্তু জেলের কষ্ট কি আপনি সহিতে পারবেন? আমি বরং আপনাকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করি।

—না আমি সেভাবে মুক্তি চাই না, একদিন তো মরতেই হবে, না হয় জেলেই মরবো!

মাসখানেক পরে জেলেই হরবতের মৃত্যু ঘটে।

তাঁর শব নিয়ে ভোকশট সহরে বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল।

ওদিকে নিউক্যাসলে হরতালিয়ারদের পুলিশ কিরিয়ে আনলো। যজুরদের কোয়ার্টারের চারিপাশে বেড়া লাগিয়ে জেলখানা তৈরী করলো। এবং সেখানে তাদের কয়েদ করে রেখে জোর করে তাদের দ্বিগুণ বনির কাজ করিয়ে নিতে লাগলো।

যারা কাজ করতে চাইল না, তাদের পিঠে বেত পড়লো। কাউকে এবার

আমাদের গাছিকী

হুটহুট লাথিও সহিতে হোল। আর গালাগালি তো উপরি পাওনা।

এই অত্যাচারের কাহিনী অত্যন্ত ধনি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। ইসিপিও, ডেকলাম, ফিনিক্স, তোবট প্রভৃতি অঞ্চলের উমজিঙো মজুরেরা কাছ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

মোট বাট হাজার মজুর ধর্ষঘট করলো।

ধনি থেকে বেরিয়ে আবার সময় খোঁড় সওয়ার তাগের বাধা মিল।

তারা ফিরে যেতে অস্বীকার করলো।

পুলিশ গুলি চালালো।

অনেকে অধম হোল, দু'চার জন মরলো।

তথাপি হরতাল বন্ধ হোল না। অনেকে ধনিত্তে ফিরলো না, অনেকে ভয়ে পালিয়ে গেল।

এই অত্যাচারের খবর পৌছালো ভারতবর্ষে।

সারা হিন্দুস্থান জলে উঠলো। *

বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এক ক্ষড়া বক্তৃতা করলেন। বিলাতে ইংরাজদের এবার দৃষ্ট পড়লো দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষাবস্থার দিকে। মুখরকার জন্ত জেনারেল স্মার্টস্ এক ভ্রমস্থ কমিশন বসালেন।

ভারতীয়েরা বললো—সত্যগ্রহীদের মুক্তি না দিলে তারা কমিশন বরকট করলেন।

কর্তৃপক্ষ গান্ধিজী, পোলক ও কলেনবেককে ছেড়ে দিলেন।

গান্ধিজী বেরিয়ে এসেই স্মার্টস্কে লিখলেন—কমিশনের তিনজন সদস্যের মধ্যে একজন ভারতীয়কে নিতে হবে।

স্মার্টস্ অস্বীকার করলেন।

গান্ধিজী লিখলেন—তাহলে আমরা আবার জেলে ফিরে যাব এক পন্থা আহুয়ারী আমাদের ঘাট জুক হবে।

* এই কথা অনুভবালার পরিকা ও বাংলার অত্যন্ত কাশ্মিরে গান্ধিজীর সভাপতিত্বের কাহিনী পূর্ণ আকারে প্রকাশ করা হয়। কলিকাতায় এক বিশিষ্ট সভা হয়। বিশিষ্ট পাল সভাপতি হন। সভায় অনেক অধ্যক্ষী প্রোডা থাকার 'স্মার্টস্'-সম্পাদক পাটকড়ি মনোমোহন সিংহিত্তে বক্তৃতা করেন। সিন্ধুভাষায় বাহারী এবং আরো অনেক বক্তৃতা গ্রন্থে গান্ধিজীর প্রকাশ্য করেন। যির হয় আনুষ্ঠানিকর আদ্য ভারতীয় কৃষিকার ক্ষেত্র দেখা হয় না, বড় লর্ড হার্ডিঞ্জ কিছু করছেন বা কলে এক প্রকাশ্য জার ফিল্ম করা হয়।

আমাদের গান্ধী

গোথলে ভারতবর্ষ থেকে টেলিগ্রাম করলেন—বরকট করো না, কমিশনে সাক্ষ্য দাও, তাতে আমাদের মুখরক্ষা হবে।

গান্ধী ও বীনবন্ধু এণ্ডরুজ জেনারেল আর্টসের সঙ্গে দেখা করলেন। আর্টস বললেন—আপনারা বা চান তাই দোব বলে আমরা ঠিক করেছি, কিন্তু কমিশনের দায়িত্ব ছাড়া তা দিতে পারবো না।

কাজেই মার্চ ক’দিনের জন্য স্থগিত রাখা হোল।

কমিশন ভারতীয়দের পক্ষে মত দিলেন। তার উপর নতুন আইন তৈরী হোল : ভারতীয়দের মাথা পিছু তিন পাউণ্ড কর থাকবে না, ভারতীয়দের বিবাহ আইনতঃ মনে নেওয়া হবে, এবং দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে আর পাস নিতে হবে না।

আট বছর লড়াই চালিয়ে গান্ধী জয়যুক্ত হলেন, জেনারেল আর্টস ভারতীয়দের ধারদা স্বীকার করে নিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজও শেষ হোল।

গোথলে লিখলেন—বিলাতে এসো।

প্রথম মহা-যুদ্ধ শুরু হবার মুখে গান্ধী বিলাতে এসে পৌঁছলেন। বিলাতে তখন হুকের বিপুল আয়োজন চলছে। এমন দিনে চূপ করে বসে থাকার মত মানুষ তিনি না, সমস্ত ভারতীয় ছাত্রদের ডেকে এক সভা করলেন। আশী জন ভারতীয় যুবককে নিয়ে তৈরী হোল এক স্বেচ্ছাসেবকের দল। কর্ণেল ব্যাংকার হলেন তাদের অধিনায়ক আর গান্ধী তাদের সভাপতি। ছ’মাসের মধ্যে রীতিমত প্রাথমিক চিকিৎসার ক্লাশ বসলো, কস্তুরবাকেও এই ক্লাশে যোগ দিতে হোল। আশী জন স্বেচ্ছাসেবক রীতিমত একটি এম্বুলেন্স ইউনিট গড়ে তুললো।

এদিকে বিলাতে তখন শীত পড়তে শুরু করেছে। গান্ধী সে খাফা সহ্য করতে পারলেন না, ভিসেসের ঘাসে তাঁর পুরিসি দেখা দিল। প্রথমে চিকিৎসা করলেন ডাক্তার জীবরাজ মেহেতা। বিলাতে তিনি তখন দ্রাবাক-উত্তর পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন। গান্ধীর খাওয়া-দাওয়ার অনেক গোড়ামি ছিল, সেই জন্য মেহেতার চিকিৎসায় বিশেষ কোন উপকার হোল না। গান্ধী তখন দেখালেন ডাক্তার অলিসনকে। তিনি সব দেখে শুনে পরামর্শ দিলেন—দেশে ফিরে বাওয়াই ভালো, সামনে জাহ্নুয়ারী মাস, ইংলেণ্ডে বরফ পড়তে শুরু করবে, তখন গান্ধী আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ভারতের আবহাওয়া এখানকার চেয়ে অনেক গরম, সেখানে পুরিসি তেমন মারাত্মক ভাবে আতঙ্কপ্রকাশ করতে পারবে না।

কথাটি গান্ধীর মনে লাগলো। তিনি দেশে ফেরার উদ্ভোগ করলেন।

আবাহকের গান্ধিজী

এই সময় ক্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে গান্ধিজীর প্রথম পরিচয় হয়। ক্রীমতী সরোজিনী তখন মিসিরাম নামে এক মহিলা সেবা সমিতিতে খেজারসেবিকার কাজ করতেন। সৈনিকদের জন্য পোষাক তৈরী করা, ব্যাণ্ডেজ করা, প্রভৃতি কাজে ক্রীমতী তখন প্রবাসী ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে অগ্রণী। প্রথম পরিচয়েরই তিনি গান্ধিজীর সামনে এক গাঢ় কাপড় এনে ফেলে দিলেন, বললেন—সৈনিকদের জামা হবে সব হাটকাট কাটা আছে, আপনি আপনার খেজারসেবিকদের দিয়ে একটো সব সেলাই করিয়ে দিন।

সেই থেকেই ক্রীমতী সঙ্গে গান্ধিজীর বন্ধুত্ব পাকা হয়ে গেল, সরোজিনী তখন ইংরেজী কবিতা লিখে দেশে বিশেষে খুব নাম করেছিলেন, কথা বলার ধরণও ছিল চমৎকার। মহাত্মাজী রহস্য করে তাঁর নাম দিলেন—বুলবুল।

গান্ধিজী দেশে ফিরিলেন।

বোম্বাইয়ের নাগরিকেরা দুটি বড় সভায় গান্ধিজীকে অভিনন্দিত করলো। এক সভায় সভাপতি হন স্তার ফিরোজ শা যেটা অপর সভায় সভাপতি হলেন মহম্মদ আলি জিন্না।

শরীর অসুস্থ, দিন কয়েক গোখলের আশ্রমে বিশ্রাম করার জন্য গান্ধিজী পুণায় এলেন। মহামতি গোখলের সঙ্গে গান্ধিজীর অন্তরের একটা যোগ ছিল।

পুণায় গোখলের আশ্রম—ভারত ভ্রমণ সমিতি। অসুস্থ গোখলে তখন আশ্রমেই ছিলেন। গান্ধিজীকে তিনি জানালেন সাদর অভ্যর্থনা।

সেখানে কয়েকটি দিন ভালোভাবেই কেটে গেল। নাম করা কত শরীর সঙ্গে সেখানে আলাপ হোল। কত কথা, কত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হোল। ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের দুঃখ ও দৈন্তের কত কারণ, কত কাহিনী। গোখলের একান্ত ইচ্ছা ছিল গান্ধিজীকে নিজের আশ্রমে রাখতে। কিন্তু আশ্রমের সকলের সঙ্গে গান্ধিজীর মতের মিল হোল না, গান্ধিজী বললেন—আপনি অসুস্থতাই দিলে, আপনার আশ্রম পেলো, আমি গুজর দেশে এমনি এক আশ্রম করি।

গোখলে গান্ধিজীর মনের কথাটা বুঝলেন, বললেন—বেশ, আপনি তাই করুন, যেসকল যে টাকা দরকার হবে, আমি সংগ্রহ করে দোব!

গান্ধিজী গোখলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। গোখলের শরীর ভালো ছিল না, গান্ধিজীকে ছেড়ে দিতে মনে বড় ব্যথা পেলেন, বিদায় বেলায় গান্ধিজীর সঙ্গে কথা বাড়ী বলতে বলতে সভার মাঝেই হৃদিত হয়ে পড়লেন। পাঁচজন ধারাবাহি করে

আমাদের গান্ধিজী

নিরে গিয়ে তাঁকে সিঁদানায় জড়িয়ে ধিলেন। বিদ্রোহ বনে গান্ধিজী আশ্রয় থেকে বাহির হলেন। মহাত্মার শেষ কথাটা তাঁর মনে গভীর হয়ে গেল—সারা দেশটা আমার ঘুরে-বিরে গ্রাসে লাগে, তারপর সত্যগ্রহের কথা।

গান্ধিজী ভারত পরিত্যক্ত করতেনই বেললেন।

বোম্বাইয়ের লাট গান্ধিজীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—আপনি যদি এখানে কোন আন্দোলন শুরু করেন, তাহলে তার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন।

গান্ধিজী বললেন—নিশ্চয়ই। আমি সত্যগ্রহ করার আগে বিরোধী শক্তির সঙ্গে একটা বোঝাপাড়া করার চেষ্টা করি।

বড়লাট বললেন—আপনি যখনই যেন করবেন তখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

তখন গান্ধিজী ভাবেননি যে, কয়েকদিনের মধ্যেই এই সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন যে পড়বে।

গান্ধিজী পুনা থেকে রাজকোট যাচ্ছেন, খুব অল্প, ট্রেনের মধ্যে বলে বলে কাঁপছেন। বিরামগাঁয়ে ট্রেন এসে থামলো। মতিলাল নামে এক দরজী এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলো। বললো—এখানে শুধু আদারের জন্ত সরকারী লোকেরা বাজীনের উপর অত্যাচার করে, মারপিট করে, ঘুষ নেয়, হায়রানি করিয়ে অনেক সময় ট্রেন ফল করিয়ে দেয়, আপনি এর একটা কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।

গান্ধিজী কাঁপতে কাঁপতে বললেন—প্রতিকার আমি করতে পারি, জোয়ার জলে যেতে পারবে ?

আপনি যদি বলেন যেতে হবে বৈকি।

মতিলাল বা বললো, কাথিয়াবাড়ের গাঁয়ে আরো কয়েক জনের মুখে গান্ধিজী সেই অনাচারেরই পুনরাবৃত্তি শুনলেন।

একটু স্থব্ধ হয়ে গান্ধিজী সকল তথ্য সংগ্রহ করে দেখা করলেন বোম্বাইয়ের লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে। সেক্রেটারী সাহেব বললেন—এসব বড়লাটের কার্যের ব্যাপার, আমাদের করার কিছু নেই। আপনি দিল্লীর মন্ত্রকের সঙ্গে কথা-গাফী চালান। আপনি তো এরই মধ্যে কাথিয়াবাড়ের এক সভায় সত্যগ্রহ চালাতে বলে আমাদের ভয় দেখিয়েছেন।

সভায় সেখানে কথা কিছু নয়, নিজেদের বর্বালা সম্পর্কে বাস্তবজনিক সঙ্গীত শুনা আমাদের কর্তব্য, তাই করছি।

আমাদের গান্ধী

—আপনার কি ধারণা, শক্তিশালী সরকারকে ভয় দেখিয়ে কাজ করিয়ে দেবেন ?

—ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের শক্তি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু অভ্যাসকে আঘাত করতে হলে সত্যায়ত তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী।

—দেখা যাক, কলেন পরিচয়তে—

গান্ধীজী বিতর্ক তুললেন না, সবিনয়ে বিদায় নিয়ে পরদিনই দিল্লীতে লিখলেন।

ক'দিন পরেই দিল্লীতে গিয়ে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজীর মুখে সব কথা শুনে লর্ড চেমসফোর্ড তখনই দিল্লী থেকে টেলিফোন করলেন।—বড়লাটের হুকুমে, বিরাম গাঁও থেকে শুকু অফিস উঠে গেল।

গান্ধীজী এলেন শান্তিনিকেতনে।

নিজের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার আগে অসংখ্য আশ্রমগুলি একবার দেখে নেবার ইচ্ছা ছিল। সবার উপর ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার ঐকান্তিক আগ্রহ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বয়সে আট বছরের বড়।

গান্ধীজী কবিকে বলতেন—গুরুদেব।

গুরুদেবের বড় ভাই জিজেন্দ্রনাথ তখন বেঁচে ছিলেন, প্রথম পরিচয় হতেই তিনি গান্ধীজীকে নমস্কার জানালেন।

গান্ধীজী সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন, তাড়াতাড়ি প্রণাম করলেন।

বৃদ্ধ জিজেন্দ্রনাথ আবার নমস্কার করলেন।

গান্ধীজী বিব্রত হয়ে আবার প্রণাম জানালেন।

জিজেন্দ্রনাথ আবার নমস্কার করলেন।

গান্ধীজী আরো বিব্রত হয়ে পড়লেন, বললেন—এ আপনি কি করছেন বড়দাদা!

জিজেন্দ্রনাথ হাসলেন, বললেন—আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি, আপনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

উনিশ-শো-পনেরো সালে জিজেন্দ্রনাথ যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, পরবর্তী ব্রিটিশ বছর ধরে তার সত্যতা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে গান্ধীজী অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে বিশেষ গেলেন, বললেন,—কোন কাজই তো ছোট নয়, আমাদের নিজস্বের কাজ আমরা নিজেস্বাই করবো।

ছেলে খেয়েরা দলে দলে ভাগ হয়ে গেল। কেউ রান্না করে, কেউ জল তোলে, কেউ বাসন ধোজে, কেউ-বা পায়খানা সাফ করে। গান্ধীজীও তাদের মধ্যে আছেন।

স্বপ্নের বাসিন্দা

শুক্রবার ভো ভায়ী খুসি, কলেন—চব্ব্বার, এনিভাবে আশ্বিনিতরঙ্গ হতে
শিখলে স্বরাক আপনি আসবে।

শুক্রবারের সন্ধ্যায় গান্ধিজী নিজেকে হারিয়ে কেলেকিলেন, দুটি প্রথর বেগবতী
নদী সঙ্গমে এসে বিশেকিল। কিন্তু এ আনন্দ গান্ধিজীর কণ্ঠে মইল না, অকস্মাৎ
বজ্রপাত হোল—ধবর এলো—গোথলে বারা গেছেন।

সেইদিনই গান্ধিজী ছুটলেন পুণায়।

গোথলের মৃত্যুতে গান্ধিজী মুহুড়ে পড়লেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার কথাটা
কিছুদিনের মত চাপা পড়ে গেল, ভারতের পথে-প্রান্তরে, তীর্থ ও জনপদে কয়েকটি
দিন তিনি এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ালেন উদাস মনে।

প্রথমে এলেন কলিকাতায়।

অনামধন্য বারিষ্টার ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে তিনি অতিথি হলেন।

গান্ধিজী তখন ফল ছাড়া আর কিছুই খেতেন না। বাড়ীর মেয়েরাও সেজন্ত
বাজারের সব সেবা ফলটি গান্ধিজীকে খাওয়াতে না পারলে মনে তৃপ্তি পেতেন না।
প্রতিদিন মেয়েরা বাজারে গিয়ে দেখে শুনে ফল কিনে আনতেন। তারপর অনেক
সময় গভীর রাত অবধি জেগে সেই সব ফল কেটে ছুটে ঠিক করে রাখতেন গান্ধিজীর
পরদিনকার প্রাতঃরাশের জন্ত।

দেখে শুনে গান্ধিজী বড়ই বিব্রত বোধ করতেন, প্রতিবাদ তুলতেন, কিন্তু মেহের
দাবী প্রতিবাদ মানবে কেন ?

কলিকাতা থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লেন হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখবার জন্ত।

সেবার কুম্ভমেলায় সতেরো লাখ তীর্থিকের সমাবেশ হয়েছিল। ট্রেনে সেজন্ত
ভীড় কম হয়নি। কোন যাত্রী-গাড়ীতে উঠতে না পেরে সাহারাণপুরে গান্ধিজী
মালগাড়ীতে ওঠেন। তাতে বসবার মত একটু আয়গা হয়েছিল বটে, কিন্তু নড়াচড়ার
জো ছিল না।

গরু ছাগলের গাড়ী। মাথার উপর ছাদ নেই। দুপুরের চড়চড়ে রোদ সর্বদা
আলিয়ে দেয়, ডাকায় বুক শুকিয়ে ওঠে, কিন্তু জল খাবার জন্ত একবার নাওলে আর
বন্ধা নাই, আর ওঠবার সুবিধা হবে না। কোন রকমে দুপুরটা কাটিয়ে যখন তিনি
হরিদ্বার এসে পৌছান তখন মাথা তুলে ঝাঁড়াবার মত শক্তি নেই।

আমাদের গান্ধিজী

সত্তেরো লাখ লোকের ভীড়, চারিপাশ অপরিচ্ছন্নতায় সংক্রামক হয়ে উঠেছে। গান্ধিজী দলবল নিয়ে পায়খানা সাফ করতে শুরু করে দিলেন।

কিন্তু তার আগেই গান্ধিজীর ভারতজোড়া নাম হয়ে গেছে, তাঁর বাড়ু হাতে পথে বেকরবার উপায় কই? 'গান্ধি-মহারাজ'কে দেখার জন্য দর্শনার্থীরা সদাসর্বদা তাঁর চারিপাশে ভীড় করে থাকে, স্থান আহ্বারের সময় অবধি তিনি তাদের সঙ্গ থেকে রেহাই পান না।

তার শুধুই দেখে চলে যায় না, কেউ পায়ের ধুলো কামনা করে, আবার কেউবা দু-চারটে প্রশ্নও তোলে।

হৃষিকেশে এক সন্ন্যাসী গান্ধিজীকে বললেন—আপনি হিন্দু, আপনার মত মানুষের শিখা ও উপবীত না দেখলে দুঃখ হয়! হিন্দু বৈশ্বেরাও তো পৈতা রাখে!

গান্ধিজীরও ছেলেবেলায় পৈতা ছিল। সেই পৈতায় সকল সময় তিনি একটি চাবি কুলিয়ে রাখতেন। রাখতে রাখতে পৈতাটি একদিন ছিঁড়ে গেল, সেই থেকে আর নতুন পৈতা কেনাও হয়নি, পরাও হয়নি।

গান্ধিজী বললেন—পৈতা আমি নোব না, যে পৈতা সব হিন্দু ধারণ করতে পারে না, তা আমি আর পরবো না।

সন্ন্যাসী বললেন—বেশ শিখা রাখুন।

গান্ধিজীর মাথায় শিখা ছিল। বিলাত যাবার সময় সেই শিখা তিনি ছেঁটে ফেলেন—সেদেশের সাহেবরা দেখে পাছে হাসে।

গান্ধিজী বললেন—শিখা রাখতে আমার কোন বাধা নেই, যে লজ্জায় একদিন শিখা কেটে ফেলেছিলেন, সে লজ্জাকে আজ আমি জয় করেছি।

সেইদিন থেকে গান্ধিজী আবার শিখা রাখতে শুরু করলেন।

হরিদ্বার থেকে ফিরে এসে আবার গান্ধিজী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার দিকে হুকু পড়লেন, স্থান নির্বাচন করা নিয়েই উঠলো সমস্যা, সকলেই তাঁকে ভালবাসেন, সকলেই তাঁকে নিজের কাছে টানতে চান।

বাঘী প্রদানন্দ আনালেন—হরিদ্বারে আশ্রম করুন।

বাদালী বহুরা বললেন—বৈতানাথ ধামে আশ্রম করুন।

গুজরাটী বহুরা বললেন—রাজকোট আশ্রম করুন।

আমেরিকা

কিন্তু অনেক বিচার বিতর্ক করে গান্ধীশ্রী শেষে আমেরিকাবাসে আশ্রম করলেন। আমেরিকাবাসে ধর্মীয় অভাব নেই, প্রয়োজনমত টাকা সংগ্রহের সুবিধা হবে।

কোচরাবে ব্যারিষ্টার জীবনলাল দেশাইয়ের বাংলাটি ভাড়া নিয়ে ১৯১৫ সালের ২৪শে মে আশ্রম শুরু হোল, নাম দেওয়া হোল—সত্যাপ্রহ আশ্রম।

কিছুদিন পরে পুন্ড্রাভাই হীরাচাঁদ নামে আমেরিকাবাসের এক ব্যবসায়ী গান্ধীজীকে সবরমজীর তীরে খানিকটা জমি কিনে দিলেন। নদীর তীর থেকে রাজমাটির যে পথটা বরাবর সেন্ট্রাল জেলের সামনে দিয়ে গিয়ে দিগন্তে হারিয়ে গেছে, সেই পথের পাশে নতুন করে আবার আশ্রমের পত্তন করলেন। এটি সবরমজী আশ্রম নামেই জগতে পরিচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতীয়দের জয়হালা নিয়ে গান্ধীজী ফিরেছিলেন। ওখানে আইন করে হিন্দুদের উপর যেসব অনাচার হচ্ছিল তার একটি স্ট্রী প্রতিবিধান করে এসেছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিবিধান পাকাপোক্ত করতে হলে এদেশের আইনও কিছুটা বদলানো দরকার—এদেশ থেকে তখনও দক্ষিণ আফ্রিকার কুলি পাঠানো ছিল, আইন করে সেই প্রথাটি বন্ধ করা দরকার।

কিন্তু তেমন কিছু করতে গিয়ে প্রথমেই বাধা এলো বড়লাটের কাছ থেকে—'ড হার্ভি ও লর্ড চেমসফোর্ড তেমন আইন করতে রাজী হলেন না।

বিদেশী বড়লাটের মুখের পানে তাকিয়ে জাতির সম্মানকে বিপন্ন করা যায় না। নেতারা বোম্বাই-এ এক সভা ডাকলেন, সবাই মিলে স্থির করলেন—১৯১৫ সালের ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে এই প্রথা উঠিয়ে না দিলে, ভারতবাসী আন্দোলন জাগাতে হবে।

জনমত গঠনের দায়িত্ব নিলেন গান্ধীজী।

ভারত পরিক্রমা শুরু হোল—বোম্বাই থেকে কলিকাতা, লাহোর থেকে মাদ্রাস।

সি, আই, ডি'রা সজাগ হয়ে উঠলো, সর্বত্র গোয়েন্দাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হোল এই যাত্রাবটির উপর। প্রত্যেক ট্রেনেই এক একজন নতুন চেকার গাড়ীতে ওঠে আর জিজ্ঞাসা করে—কই, আপনার টিকিটটা দেখি ?

গান্ধীজী টিকিট দেখান, তারা নম্রতা টুকে নেয়। সব সবয়েই তাদের শঙ্কা, আসল যাত্রাটি কোন্ কাকে তাদের চোখকে ঝাঁকি দিয়ে কোথার নেবে যায়।

কয়েকটি ট্রেনে পরপর এমনি হত্বেই সহবাসীরা বিরক্ত হয়ে উঠলো, প্রতিবাদ

আমাদের গান্ধিজী

করে বললো—এ কি ব্যাপার, একজন ভালোমানুষ লোককে আপনারা এভাবে বিরক্ত করছেন কেন ?

গান্ধিজীকে তখনও সবাই চিনতো না। সাক্ষ-পোষাক দেখে ভেবেছিল, কোন নিরীহ গরীব লোক, তাই উপদেশ দিয়ে বললো—দেখুন মশাই, টিকিট দেখতে চাইলেও আপনি আর কাউকে টিকিট দেখাবেন না।

গান্ধিজী হেসে উত্তর দিলেন—টিকিটটা একবার দেখাতে দোষ কি ? ওদের তো কোন অপরাধ নেই, ওদের উপর যেমন হকুম হয়েছে ওরা তাই করবে তো !

এদেশে এতদিন গান্ধিজী কাপড় কোট ও পাগড়ী পরতেন—গুজরাটী ভদ্রলোকের পোষাক। এবার তিনি পরিচ্ছদকে আরো সংক্ষেপ করলেন : কোট ছেড়ে শার্ট খরলেন আর পাগড়ীর বদলে আট আনা দামের এক কাশ্মিরী টুপি মাথায় চড়ালেন, এবারকার বেশভূষা হোল অতি গরীব এক গুজরাটী চাষার মত। এই পোষাকে কারুর আর জানবার উপায় রইল না যে এই মানুষটি বিলাত-ফেরৎ পাকা ব্যারিষ্টার।

সেবার সবচেয়ে কষ্ট হয়েছিল লাহোর থেকে দিল্লী যাবার পথে।

ট্রেনে ওঠার উপায় নেই। থার্ড ক্লাশে মানুষ গিস গিস করছে, অথচ সেই ট্রেনে না গেলেও নয়। গান্ধিজী প্রতিটি কামরার দরজায় দরজায় ফেরেন, কিন্তু একটি পা রাখার স্থান পান না কোথাও !

তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন এমন সময় একটি কুলি বললো—বাবুজী যদি বারো আনা রকশি দেন, তো আপনাকে উঠিয়ে দিতে পারি !

গান্ধিজী রাজী হলেন, বললেন—বেশ দোব !

কুলিটি তখনই ছুটোছুটি করে ট্রেনের গোড়া থেকে শেষ অবধি বার ~~দেখতে~~ দেখে নিল—গান্ধিজীকে যদি কোথাও কোন রকমে তুলে দিতে পারে !

এদিকে তো ট্রেন ছাড়ার বাঁশী বাজলো।

এবার এক কামরার কয়েকজন যাত্রীর দয়া হোল। একজন বললো—যদি সারা পথ দাঁড়িয়ে ধাক্কাতে রাজী হন, তাহলে আমরা দিয়ে ভিতরে লাঙ্কিয়ে পড়ুন, কোন রকমে দাঁড়াবার স্থান করে দোব !

কুলিটি সাহায্য করলো, গান্ধিজী জানলা টপকে ভিতরে গেলেন।

তারপর বাৎসরিক শিকল ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন পাকা ছ' মটা। ট্রেনের বাঁকুনিতে সাম্না নেহ কিম খিয় করতে লাগলো, মাথা টলতে লাগলো, আর একটু বাদে ঘুরে পড়ে যাবেন হয়তো।

আমাদের গান্ধিজী

উপরের বাংকে একটি লোক এতক্ষণ শুয়ে ছিল, তার বোধ হয় এবার একটু করুণা হোল, সে কথা পাড়লো—আপনি বহন না সাধুজী, গাড়িরে আছেন কেন ?

—কোথায় বসি বলুন ?

—কতক্ষণ এভাবে গাড়িরে থাকবেন ?

—গাড়িরে থাকবো বলেই তো উঠেছি—তাছাড়া বসার আরগাই বা কোথায় ?

বসার আরগা বে গতাই ছিল না তা নয়, কিন্তু নিজেকে সন্তুচিত করার মত ইচ্ছা ছিল না কারুই।

কথায় কথায় আর একজন জিজ্ঞাসা করলো—আপনার নাম কি সাধুজী ?

—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

সকলে চমকে উঠলো—কি বললেন, আপনিই গান্ধিজী ?

গান্ধিজী স্বল্প হাসলেন।

যারা এতক্ষণ ভিনভনের স্থান দখল করে গুয়েছিল তারা এবার ঘড়মড় করে উঠে বসলো, তাড়াতাড়ি গান্ধিজীর বসার স্থান করে দিল, বললো—আপনি আমাদের কমা করুন, আমাদের অগ্রায় হয়েছে।

সেবার দিল্লী ও করাচী হয়ে গান্ধিজী আসেন কলিকাতায়। কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর গৃহে তিনি অতিথি হন।

প্রত্যেকটি সভাতেই দক্ষিণ আফ্রিকায় কুলি পাঠানোর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে লাড়া পড়ে যায়।

শেষে ভারত সরকার ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ৩১শে জুলাইয়ের আগেই তাঁরা ঘোষণা করলেন—দক্ষিণ আফ্রিকায় চুক্তি করে আর মজুর পাঠানো হবে না।

গান্ধিজীর সত্যায়নের সাফল্য এতদিনে সম্পূর্ণ হোল।

কথাটা প্রচারিত হতে দেরী হোল না। ১৯১৬ সালে লুন্ডোঁ কংগ্রেসে রাজকুমার শুকলা নামে এক চাষা এসে গান্ধিজীকে ধরলো। বললো—আপনাকে একবার চম্পারণ বেতে হবে। আমাদের দুঃখ আপনাকে নিজের চোখে দেখতে হবে।

চম্পারণ কোথায় গান্ধিজী ভাবনও তা জানতেন না। ভাবনকার মত রেহাই পারার ভরত বললেন—আচ্ছা, সুবিধাবত একদিন গিয়ে দেখবোঁধন।

রাজকুমার সহজে ছাড়বার পাত্র নয়, বললো—আপনি একদিনের ভরত গেলেই হবে।

সাহেবের গাঙ্কিজী

গাঙ্কিজী থাক নেড়ে বললেন—আচ্ছা! আচ্ছা!

কিন্তু বত সহজে নিষ্কৃতি পাবার আশা তিনি করেছিলেন তত সহজে রাজকুমার তাঁকে ছাড়লো না। গাঙ্কিজী লক্কো থেকে গেলেন কানপুরে। রাজকুমার সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলো, বললো—এখান থেকে চম্পারণ বেক্সের নয়, আপনি চলুন।

কলকাতা থেকে পাটনা হয়ে গাঙ্কিজী এলেন মজফেরপুরে। সেখানকার সরকারী কলেজের অধ্যাপক আচার্য কৃপালনী দিনকয়েক আগে নীলকর সাহেবদের অভ্যাতারের প্রতিবাদে চাকুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি এসে গাঙ্কিজীর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর মুখ থেকে গাঙ্কিজী নীলকর সাহেবদের অভ্যাতারের কথা সব শুনলেন : চম্পারণ জেলার চাষীদের দিয়ে প্রতি বিঘা জমি পিছু তিনকাঠা জমিতে জোর করে নীলের চাষ করিয়ে নেওয়া হয়। এর অশ্রুতা হলে নীলকুমার সাহেবদের হাতে তাদের নানা লাঞ্ছনা সহিতে হয়। এই প্রথার নাম ছিল 'তিন কাঠিয়া'।

ব্রজকিশোর প্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রামনবমী প্রসাদ, গয়া প্রসাদ প্রভৃতি উকিলদের সঙ্গে গাঙ্কিজীর দেখা হোল মজফেরপুরে। কথাবার্তা হোল। গাঙ্কিজী সব শুনলেন, নীলকুমার সাহেবদের অভ্যাতার কি ভাবে চরম সীমায় এসে পৌছেছে। তারপর তার প্রতিকারের জন্ত নিজেই গেলেন নীলকুমার সমিতির সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে।

সাহেব সম্পাদক বললেন—আমরা জমিদার। চাষারা আমাদের প্রজা। নীল-কুমার ব্যাপার আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। আপনি বাইরের লোক, আমাদের এই ব্যাপারে আপনি মাথা ঘামাবেন না। তবে আপনার যদি কিছু বলার থাকে আদালতী লিখে আনাতে পারেন।

কমিশনার সাহেবের সঙ্গে গাঙ্কিজী দেখা করলেন। সাহেব ধমক দিলেন, বললেন—আপনি বত শিগগীর পারেন জিহত বিভাগ ছেড়ে চলে যান।

গাঙ্কিজী হাসলেন। ভয় পাবার মাহুত ত তিনি নন। হাতীর পিঠে চড়ে পরদিনই তিনি মতিহারি রওনা হলেন।

মাকপথে পুলিশ ইন্সপেক্টরেন্ট এসে দেখা করলেন। এক নোটশ জারী করলেন গাঙ্কিজীর উপর—আপনি চম্পারণ ছেড়ে চলে যান।

গাঙ্কিজী লিখে দিলেন—আমি তদন্ত শেষ না করে এখান থেকে যেতে পারবো না।

আদেশ অব্যাহতের অপরাধে পরদিন আদালতে হাজির হবার জন্ত গাঙ্কিজীকে গমন দেওয়া হোল।

আবাহের খাতিরী

গাভিরা আদালতে হাজির হলেন। বিচারকের কাছে বললেন—আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি, আইনের চেয়ে বিবেক বড়, সেই বিবেকের ডাকে আমি এখানে এসেছি, কাজ শেষ না করে আমি এখান থেকে যেতে পারি না, তার জন্য যদি আমাকে কোন সাজা পেতে হয়, আমি প্রস্তুত আছি।

সাজা কিছুই পেতে হোল না। পরদিনই লাটসাহেবের কাছ থেকে আদেশ এলো—গাভিরাবীর বিরুদ্ধে যামলা তুলে নেওয়া হোক, এক তদন্তের কার্যে গাভিরাবীর সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হোক।

তদন্ত শুরু হোল। আফিস বসলো। অত্যাচারিত কিষাণদের অবদানবন্দী নেওয়া শুরু হোল। শত শত কিষাণ প্রতিদিন আসে নিজের কথা বলতে। পাঁচ-সাত জন উকিল অবিরাম লিখে যান, তবু কাজের শেষ হয় না। সাবনে একজন পুলিশের গোয়েন্দা সব সময় কাজের তদারক করে।

অত্যাচারের প্রমাণপত্র দিনের পর দিন বেড়ে চললো। নীলকুঠার খালিকেরা কল আক্রোশে ফুলে উঠতে লাগলো। নানা দিক থেকে তারা গাভিরাবীর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো।

কিছুদিন পরে লাটসাহেবের এক চিঠি এলো : অনেক দিন ভেটা হোল, এবার তদন্ত শেষ করুন।

গাভিরা লিখলেন—আরো সময় লাগবে। কিষাণদের দুঃখ যতদিন না দূর হয়, ততদিন আমি এখানেই থাকবো।

লাটসাহেব এবার গাভিরাবীর ভেঁকে পাঠালেন। বললেন—আমরা এক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করতে মনস্থ করেছি, আপনাকে তার সদস্য হতে হবে।

গাভিরা রাজী হলেন।

কমিটি বসলো।

কমিটি কিষাণদের সমস্ত অভিযোগ সত্য বলে যেনে নিল। লাটসাহেব 'তিন কাঠিয়া' প্রথা তুলে দিলেন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের রাজস্ব শেষ হোল। সত্যপ্রাঙ্গীর জয় হোল।

১৯১০ সালের নববর্ষ উৎসব। রাজার নামে বড়লাট বাহাদুর নিজের প্রিয়-পাক্ষকের নানা বৈভব্য দিচ্ছেন, তার মধ্যে মেসেজ জাদী, গুপী ও কনপ্রিয়দের অন্তর্গত 'ই' একটা পুরস্কার ছুটে—মেহাৎ চক্ লজ্জার খাতিরে। সে বছর গাভিরা হলেন তেমনি এক ব্যক্তিকথ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

লর্ড হার্ডিগ গান্ধীজীকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক দিলেন।

স্ববীজনাথ এর অনেক আগেই এক চিঠিতে গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করেন।

কিন্তু কবিগুরুর মত সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি তখন এদেশে আর কারও ছিল না, মহাত্মাজীকে তখনও আমরা চিনতে পারিনি, সেইজন্যই 'সত্যগ্রহ আশ্রম' নিয়ে বাথলো সংঘাত।

আশ্রমে জাতির বিচার ছিল না। অবতলাল ঠাকুর—ঠাকুর বাপা—এক অস্পৃশ্য পরিবারকে পাঠালেন আশ্রমে থাকার জন্য—বাবী, স্ত্রী আর একটি মেয়ে—দুদাভাই, দানিবেন ও লক্ষ্মী।

আশ্রমে অচুৎ! প্রথমেই বাথলো বাড়ীওলার সঙ্গে বিবাদ। আশ্রমে কুয়া ছিল একটি, সেই কুয়া থেকে বাড়ীওলাও জল নিত, সেই জল তোলা নিয়েই উঠলো আপত্তি—অস্পৃশ্যের ছোঁয়া লাগলে কুয়ার জল নষ্ট হয়ে যাবে যে! বাড়ীওলা গালাগালি শুরু করলো, ভয় দেখালো—দুদাভাই কুয়ার কাছে এলেই প্রহার দেবে।

• আশ্রমে অচুৎ! সব একাকার। যারা আশ্রমে টাকা দিয়ে সাহায্য করতো, তাঁরা মাথা নেড়ে বললো—না, এসব চলবে না, এ আশ্রমে আর টাকা দোর না!

কিন্তু সত্যগ্রহী যে-সত্যকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেন তা' থেকে, অতো সহজে তাঁরা বিচ্যুত হন না। মহাত্মাজী এতটুকু বিচলিত হলেন না। শেষে একদিন আশ্রমের কর্মকর্তা যগনলাল এসে বললেন—টাকা নেই, আগছে ঝালে ধরচ চলবে না!

গান্ধীজী বললেন—বেশ, সেজন্য চিন্তা কি, এখান থেকে আজ্ঞাম ফুলে নিয়ে চল হরিজন মহাজায়, সেখানে আমরা সবাই মিলে দিন-মজুরী করবো, ~~অন্ত~~ চলবে যাবে!

আশ্রমের বাসিন্দা ছিলেন পঁচিশ জন। তাঁদের সবাইকে নিয়ে গান্ধীজী হরিজন মহাজায় উঠে বাবার যোগাড় করলেন। কথাটা জানাকানি হয়ে গেল। বারা ভেবেছিল যে একঘরে করে গান্ধীজীকে জব্দ করবে তারা আসল বাহুবটির পরিচয় তখনও পারিনি। গান্ধীজীর বরষ যখন সবোমাত্র বারো বছর তখন একদিন বাড়ীর মেথর উকাকে তিনি ছুঁয়ে ফেলেছিলেন, যা বলেছিলেন—জান করতে হবে।

গান্ধীজী জান করলেন, কিন্তু একজন বাহুব আরেকজন বাহুবকে ছুঁয়ে কেলে কেন জান করতে হবে, তার বথার্থ কারণ কিছু হুঁজে শেলেন না। জান সেরে এসে তিনি যাকে বললেন—উকাকে ছুঁলে অন্তায় হয় একথা আমি জানি না!

বারো বছরের ছেলে, যে-সত্য উপলব্ধি করে শুধু বৌদ্ধিক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন,

আমাদের গান্ধিজী

আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় সেই সভ্যকে কাছে ক্লান্তিত করে তুলছেন, সাহসে জনকর লোকের প্রতিবাদে তিনি ভেঙে পড়বেন কেন !

কিন্তু আশ্রয় ছাড়তে হোল না, ইঠাৎ একদিন দেবতার আশীর্বাদের যত আশীর্কৃত হলেন এক শেঠজী, নিঃস্বার্থভাবে মহাত্মাজীর হাতে দিয়ে গেলেন—নগদ ভেঙে হাজার টাকা, শুধনকার যত আশ্রয়ের খরচ চালাবার জন্য । দাতা নিজের পরিচয়-টুকুও মহাত্মাজীকে জানালেন না ।

মহাত্মা গোখলের দ্ব্যত্না সংবাদ শুনে মহাত্মাজী বেদিন শান্তি-নিকেতন থেকে বিদায় নিলেন, সেদিন দীনবন্ধু চাট্টার এগুরুজ বর্ষমান অবধি তাঁর সঙ্গে এলেন । দেশের নানা সমস্যা নিয়ে দুজনের মাঝে নানা আলোচনা হোল, শেষে দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন—এদেশে আগনি কবে সত্যগ্রহ শুরু করবেন ?

—এখন কিছু বলা শক্ত—গান্ধিজী বললেন—তবে গোখলে আমাকে বলেছিলেন ‘বহুরথানেক ধরে ঘুরে ফিরে সারা দেশটাকে আগে ভালো করে দেখে নাও, তারপর সত্যগ্রহের কথা’, ইতিমধ্যে যেটুকু আমি দেখেছি তাতে আগামী বছর পাঠকের মধ্যে কোন আন্দোলন শুরু করা যাবে বলে তো আমার মনে হয় না ।

কিন্তু পাঁচ বছরের অনেক আগেই গান্ধিজীকে তিনটি আন্দোলনের নেতৃত্ব নিতে হয়েছিল—চম্পারণ সত্যগ্রহ, আমেরাবাদের শ্রমিক সত্যগ্রহ ও বেড়া জেলার কিষাণ সত্যগ্রহ ।

আমেরাবাদে মিলের মজদুরদের মাহিনা ছিল বড় কম । তারা খেয়ে-পরে ঝাঁচতে পারে মালিকের কাছে এমন মাহিনা দাবী করণো । মালিকেরা তা দিতে রাজী হোল না, শেষে মজদুরদের জব্ব করার জন্য তারা মিল বন্ধ করে দিল । তিনচার দিন ধরে চেষ্টা করেও গান্ধিজী কোন ধীরাঙ্গা করতে পারলেন না, নিকশায় হয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার নির্দেশ দিলেন । সবারমতীর তীরে বহু প্রাচীন এক গাছের নীচে মিলের স্ত্রীতীদের এক সভা বসলো, গান্ধিজী সেই সভায় চারটি নির্দেশ দিলেন :

কোন অবস্থাতেই শান্তিভঙ্গ করা চলবে না ।

যদি কেউ ধর্মঘট না করতে চায় তার উপর জুলুম করা চলবে না ।

লোকের কাছে যাক্ষা করা চলবে না ।

বেশীদিন ধর্মঘট চললে, অন্য কাজ করে রোজকার করা চলবে ।

মজদুররা প্রতিজ্ঞা করলো,—ধর্মঘট শুরু হোল ।

আমাদের গাঙ্কিত্তী

মিল-মালিকদের পক্ষে বাঁড়ালেন বিরাট ধনী আমালাল সন্নাতাই, আর বজুরদের পক্ষ নিলেন তাঁরই বোন অননুয়া বেন। পথে পথে শ্রমিকদের খুব মিছিল বেরলো, মিছিলের পুরোভাগে দেখা গেল বরভভাই প্যাটেল, শংকরলাল ব্যাংকার আর অননুয়াবেনকে। সারাদিন ধরে নগর প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যাবেলা মিছিল এসে বাবজো সেই পুরাণো অশথ তলায়, গাঙ্কিত্তীর সামনে বজুরেরা তাদের পুরাণো প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করতো, লাড়া তুলতো—এক টেক—এক কথা, প্রতিজ্ঞাতি ঘেরে চলবো।

সন্ধ্যা হুয়েক কেটে গেল, মিলের মালিকেরা বললো—‘চলুক ধর্মঘট, আমাদের কর্মচারীদের সঙ্গে আমরা বোকাপড়া করবো, বাইরের লোকের মাতব্বরি আমরা জানবো না।’ এখিকে বজুরদের দিন চলা কঠিন হয়ে পড়লো, ঘরে বাবার নেই, হাজার হাজার লোক যে অস্ত্র কোথাও চাকরী করবে ত্রা-ও জোটানো সম্ভব নয়; ধর্মঘট শেষ অবধি ভেঙে বাবার উপক্রম করলো। গাঙ্কিত্তী নিরুপার হয়ে অনশন শুরু করলেন।

একদিন, দুদিন, তিনদিন অনশন চললো। আমেদাবাদের উৎকর্ষ প্রতিক্ষণি তুললো সারা ভারতে। মালিকেরা এবার মাথা নত করলো, একটি মিটবাট করে ফেললো। বজুরদের মাহিনা বাড়াতে তারা রাজী হোল। গাঙ্কিত্তী আহাৰ গ্রহণ করলেন।

মালিক ও বজুরের মাঝে সন্তীতি কিরিয়ে আনার জন্ত, মালিকেরা একদিন শ্রমিকদের মাঝে সন্দেশ বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। সেই ‘এক-টেক’ গাঙ্কের নীচে বজুরেরা সমবেত হয়েছিল, চাঙারী ভরা লাড্ডু আসতেই তাদের মাঝে ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—প্রত্যেকেই আগে সন্দেশ পাবার জন্ত সামনে এগিয়ে আসতে চায়। সেই গোলযোগে ধাক্কাধাক্কিতে কত সন্দেশ পায়ের নীচে পড়ে বাকি হয়ে গেল। একুশ দিন ধর্মঘট করেও যারা এতটুকু গোলমাল করেনি, দুটো লাড্ডুর লোভ তারা সামলাতে পারলো না। গাঙ্কিত্তী দেখলেন, বুঝলেন যে এরা কত গরীব, জীবনে কোনদিনই এরা একটি লাড্ডু খেতে পারনি।

সে বছর খেড়া জেলায় ডালো ফসল হয় নি। গরখেরটের আইন আছে, জমিতে সিকি ভাণের চেয়ে কম ফসল হলে খাজনা মকুব করতে হবে। খেড়ার চাষীরা বললো—এবার সিকি ফসলও হয়নি, আমরা খাজনা দিতে পারবো না।

কালেক্টর সাহেব চোখ রাঙিয়ে বললো—বাজে কথা, সিকি ভাণের চেয়ে অনেক বেশী ফসল হয়েছে, খাজনা দিতে হবে।

গান্ধীজীর গান্ধীজী

এই থেকেই বিতর্ক, এই থেকেই বিরোধ। মোহনলাল পাণ্ডে ও শংকরলাল পারিষ গান্ধীজীকে খেড়া জেলার নিয়ে এলেন, সব দেখে শুনে গান্ধীজী বললেন—কিবাণদের কথাই ঠিক।

লটি সাহেবের কাছে আবেদন করা হোল, কিন্তু কোন ফল হোল না, সরকারী পিরাযা এসে খাজনা উত্থল করার জন্য কিবাণদের জিনিস-পত্র ক্রোক করলো, হালের বলহ নীলামে চড়াণো, ক্ষেতের বত কসল আটক করলো। গান্ধীজী প্রতিবাদ তুললেন—এসব বে-আইনী।

সত্যগ্রহ শুরু হোল। গান্ধীজীর নির্দেশে সাত আট জন খেচ্ছাসেবক নিয়ে মোহনলাল পাণ্ডে মাঠ থেকে পিরাজের কসল করে তুলে আনলেন, পুলিশ মোহনলালকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে হাজির করলো। পিরাজ চুরির অভিযোগে মোহনলালের জেল হোল। চাষীদের মাঝে বিপুল উদ্বীপনা দেখা দিল, বিরাট মিছিল করে তারা 'ডুংলি চোর' মোহনলালকে আদালত থেকে জেলের ফটক অবধি পৌঁছে দিল। মোহনলালের অস্থগামী হলেন—বল্লভভাই প্যাটেল, শংকরলাল ব্যাংকার, ইন্সুলান যাজিক, মহাদেব দেশাই ও অননুয়া বেন।

আন্দোলন ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে দেখা দিল। অবস্থা সুবিধাজনক নয় দেখে, সরকার এবার একটি নিশাতি করে ফেললেন—যেসব কিবাণের অবস্থা ভালো, তারা যদি খাজনা দেয় তাহলে যারা সত্যিকারের গরীব তাদের খাজনা যত্ন করা হবে।

গান্ধীজী এই সন্তে সন্তুষ্ট হলেন, খেড়া জেলার সত্যগ্রহ মিটে গেল।

ইউরোপে তখনও আর্মীনার সঙ্গে লড়াই চলছে। বড়লাট দিল্লীতে মাতব্বরদের এক সভা ডাকলেন—যুদ্ধ সম্মেলন। বড়লাট বললেন—আজ সবগ্র বৃষ্টি সাম্রাজ্য বিপন্ন, এই বিপদের দিনে নিজেদের ভিতরের সব বিরোধ তুলে নিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করাই ভারতবাসীর কর্তব্য।

গান্ধীজীও সেই সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বড়লাটের কথাটি তাঁর মনে লাগলো, সৈন্ত সংগ্রহ করে দিতে তিনি রাজী হলেন। বেরিয়ে পড়লেন পথে।

প্রথমেই গেলেন খেড়া জেলায়। চাষারা তাঁর কথা শুনে প্রসন্ন করলো—আপনি তো অহিংসায় বিশ্বাস করেন, তাহলে আমাদেরকে লড়াইয়ে যেতে বলছেন কেনন করে? যুদ্ধ তো অহিংসা নয়। ইংরাজ সরকার আমাদের জন্য এমন কি ভালো করেছে যে তাদের জন্য আমরা প্রাণ দিতে বাব?

গাঙ্গুলীর গাঙ্গুলী

গাঙ্গুলী বোঝালেন—এই ছদ্মবেশে সাহায্য করলে ইরাকলের জটিল আঘাত পান, তাড়াতাড়ি অস্ত্র ব্যবহার করতেও শিখবে, আত্মরক্ষার জন্য তা প্রয়োজন।

কিন্তু এই মুহুর্তে কোথাও তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু গাঙ্গুলী যা সভ্য বলে গ্রহণ করেছেন, তার জন্য প্রাণপাত করতেও তিনি প্রস্তুত। প্রতিদিন কুড়ি মাইল করে তিনি ঘুরতেন,—এক সভ্য থেকে আরেক সভ্য, এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ঘুরতে ঘুরতে শাস্ত্র একেবারে ভেঙে পড়লো। মাঝে মাঝে আশাশয় হতে লাগলো। তার উপর হোল ষাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম। গাঙ্গুলী মূগের ডাল খেতে খুব ভালবাসতেন, একদিন কত্‌রবা একবাটি মূগের ডাল দিলেন তাঁকে খেতে। আশাশয়ের উপর মূগের ডাল। খাবার দটা খানেক পর থেকেই পেটের যন্ত্রণা শুরু হোল। তারপরেই দেখা দিল দাঙ্গ। গায়ে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, গাঙ্গুলী তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন শহরে। কিন্তু তখন আর তাঁর উঠে ঠাড়াবারও সামর্থ্য নেই,—দিনে ত্রিশ চল্লিশবার করে দাঙ্গ হচ্ছে।

ডাক্তার বললেন—ইঞ্জেকশন দিই।

গাঙ্গুলী বললেন—না, আমি এই ধরনের চিকিৎসা পছন্দ করি না, ইঞ্জেকশন দেওয়া চলবে না।

ডাক্তার আর কি করেন, গুাবার গুণ্য দিয়েই চিকিৎসা চালাতে লাগলেন, কিন্তু রোগ-উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকেই চললো। শেষে দুর্বলতা একদিন এমন অবস্থায় এলে পৌছালো যে সকলেই তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। আত্মীয় বন্ধুদের খবর দেওয়া হোল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাখার কাছে পীড়াপাঠ শুরু করলেন।

এক বন্ধুর কি খেয়াল হোল, তিনি ডাক্তার কেলকারকে নিয়ে এলেন। কেলকার তুম্ব বরফ বুলিয়েই অনেক রোগ সারাতেন, তাই লোকে তাঁকে বরফের 'বরফের ডাক্তার'। কেলকার সব মেখে শুনে বললেন—বেশ, আমি তুম্ব বরফ বুলিয়েই আপনাকে সারিয়ে দোব।

গাঙ্গুলীর সর্বাঙ্গে বরফ বুলানো শুরু হোল। শরীর শিথল হোল। হাতনা বেন অনেকটা উপশম হয়েছে বলে মনে হোল। কয়েক দিনের মধ্যেই দুর্বলতা বেটে গেল, গাঙ্গুলী বিছানা থেকে উঠে, পাচ দশ মিনিট চলাকেরা করতে পারলেন। ডাক্তার কেলকার বললেন—এবার আপনি দু-একটা করে ভিন্ন খান, দেখে বল পাচ্ছেন, তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে উঠলেন।

গাঙ্গুলী বললেন—আমি তো আমি খাই না।

কেলকার বললেন—ভিন্ন তো কলের মত।

আশ্রমের গাঙ্গিনী

কিন্তু যে হুঁত গাঙ্গিনীর কাছে পুরাণো হয়ে গেছে।

গাঙ্গিনী বাবু-পরিবর্তনের ভক্ত হাথেরান্নে গিয়ে হইলেন দিন নাভেক। ভাতার মালাল ছিলেন সবে, বললেন—হুঁ না খেলে একেবারে হুঁ সবল হতে পারবেন না।

গাঙ্গিনী বললেন—হুঁ আমি খাই না, বেশী হুঁ পাবার ভক্ত গরু মোককে হুঁকা দেওয়া হয়, তার প্রতিবাদে আমি হুঁ খাওয়া বন্ধ করেছি।

—বেশ, গরুর হুঁ না খান, ছাগলের হুঁ খান, ছাগলকে তো হুঁকা দেওয়া হয় না।

ছাগল হুঁতে আশপ্তি করার কিছু নেই, গাঙ্গিনী ছাগ-হুঁ খাওয়া শুরু করলেন। ক্রমে সেহে একটু সামর্থ্য হোল, সম্পূর্ণ নিরাসর করার ভক্ত ভাতার মালাল গাঙ্গিনীর সেহে একটি অন্ত্রোপচার করলেন। অবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানের ভক্ত গাঙ্গিনী এলেন সবরমতী আশ্রমে।

সবরমতীর তীরে সত্যগ্রহ আশ্রম।

আমোদাবাদ ট্রেন থেকে হু-ক্রেশ পথ। সবরমতী নদী পার হয়ে বরাবর উত্তর ঘূষে যে পথটি চলে গেছে, সেই পথের হু'পাশে মাড়ে তিনশো বিঘা জমি নিয়ে এই আশ্রম। আশ্রমের পূর্বে সবরমতী নদী। এই নদীর তীরেই একটি বড় কুটীরে মহাস্বামী থাকতেন।

এখানে প্রথমে সামান্ত একটি তাঁবু কেলে মহাস্বামী সর্বপ্রথম আশ্রমের পত্তন করেন, আজ সেখানে লোকজন বাড়ীঘরে ভরে গেছে।

এই আশ্রমটি সম্পর্কে মহাস্বামীর বাঙালী সেক্রেটারী কৃষ্ণাসমী লিখেছেন :

‘মহাস্বামীর কুটীরের সমুখে একটি বড় খোলা বারান্দা। রাত্তিতে তিনি (গাঙ্গিনী) বার মাস ঐ খোলা বারান্দায় শয়ন করিয়া থাকেন। শীতকালেও রাত্তিতে তিনি সেই উষ্ণ স্থানে নিত্রা বান। তাঁহার মুখে জনিরাছি রাত্তিতে লম্বা হইতে যদি তিনি আকাশ দেখিতে না পান তাহা হইলে তাঁহার নিত্রা হয় না এক গজীর নিশীথে আকাশের তারার দিকে চাহিয়া থাকা, তাঁহার এক বহু পুরাতন অভ্যাস। বারান্দার দক্ষিণ পার্বে মহাস্বামীর বসিবার ঘর। দিনের বেলা তিনি এই ঘরে বসিয়া কাজকর্ম করেন...কুটীরে আরও চারিখানি ঘর আছে।

‘মহাস্বামীর কুটীরের ঈশ্বর দক্ষিণে নদীকূলে কিছু উষ্ণ পরিষ্কার স্থান খোলা পড়িয়া আছে। সেখানে প্রত্যহ প্রাতে ভ্রাম্য হুর্ভে এক লম্বার লম্বা আশ্রমের সকল নরনারী ও বালক-বালিকা একত্রিত হইয়া জ্ঞান-শর-সংযোগে হুঁহুঁর ভবন-নাথ-কীর্জন ও সবধরে হুঁ করিয়া শীতের জোক আতুতি করিয়া থাকেন।

আশ্রমের পাখিবী

...সমুখে বরষোতা নদী এবং উপরে নিম্নবিস্তৃত আকাশ, তাহাতে কক-
পক্ষের বা জগপক্ষের চর কখনও প্রাতে কখনও সন্ধ্যায় সেই প্রার্থনার স্থান
জ্যোৎস্নাবৃত্তি করিয়া প্রার্থনার আভাবিক স্বার্থ ও দীর্ঘ আয়ত শতভুগ
বিস্তৃত করিয়া দেয়।...

‘আশ্রমের পূর্বভাগে আশ্রমবাসীদের বাসোপযোগী অত্যন্ত সুন্দর কিছুইর অন্তর
অন্তর আছে। তদব্যতীত তাঁতশালা, চরকা বিভাগ, গোশালা এবং অনেক
কুখিজিও আছে।...

‘আশ্রমের সকলকেই শরীর যাত্রার নিমিত্ত কিছু না কিছু শারীরিক কাজ
করিতে হয়। এখানকার সুপণ্ডিত শিক্কেরাও ইদারা হইতে জল তুলিয়া কাঁধে
ভার বাধিয়া সেই জল নিজদের ঘরে লইয়া যান। ধোপার কাজ, বাসন মাজা
ইত্যাদি সমস্ত নিজদের হাতে সকলকে করিতে হয়। এদিকে ভোর চারিটার
সময় নিত্রাভঙ্গের ঘণ্টা বাজিলে শয্যাভ্যাগ করিয়া প্রাতের প্রার্থনার এবং সন্ধ্যার
সময় ঘণ্টা বাজিলে সন্ধ্যার প্রার্থনার যোগ দিতে হয়।...

‘ব্রাহ্মসমাজে নিত্রাভঙ্গের ঘণ্টা বাজিয়াছে...উদারগী তখনও যাত্রির কোলে
নিমিত্ত...বরষোতা নদীর কুলকুল শব্দ অস্পষ্ট সঙ্গীত ধ্বনির দ্বার শোনাইতেছে।
সহসা সেই ধ্বনির তালে তাল টুলাইয়া শতকণ্ঠে প্রার্থনার গান ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

প্রাতর্ভজামি মনসো বচনায়গম্যম্।

বাচো বিভক্তি নিখিলো বদন্তগ্রহণম্।

যগ্নেতি নেতি বচনৈর্নিগম্য অবোচুম্।

তং দেবদেবমজম্যচ্যুতমাহুরগ্রাম্।

[যিনি মন এবং বাক্যের অগোচর, বাহার অগ্রগ্রে সমস্ত বাক্য একতীত হয় ;
‘নেতি’ ‘নেতি’ বলিয়া বেদসকল বাহার বর্ণনা করে ; বাহাকে দেবতাদিগেরও দেবতা,
অস্বরহিত, অচ্যুত এবং আদিপুরুষ আখ্যা দেওয়া হয় তাহাকে আমি এই প্রাতঃকালে
ভজনা করিতেছি।]

ইহার পর গান করিয়া পৃথী বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, শুক বন্দনা, বিষ্ণু বন্দনা ও
শিব বন্দনা করা হইলে নিজের শুদ্ধ কায়না...‘আমি রাজ্যও চাহি না, স্বর্গও চাহি না,
মুক্তি চাহি না, কেবল হৃৎকল প্রাণীদিগের আর্তিনাশ কায়না করি। প্রজাগণের
কল্যাণ হউক। পৃথিবীর রাজত্ববর্গ জায়মার্গ অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পরিণালন করুন,
সর্বস্বই গো-জাতদের শুদ্ধ হউক, এবং সমস্ত লোক সুখী হউক, ইহাই কায়না
করি।’

অগতির ব্যক্তি

নমস্কে সতে ভে জগৎকারণ ।

নমস্কে চিতে সর্বলোকপ্রায় ।

নমোহৈবতত্বায় মুক্তিপ্রদায় ।

নমো ব্রহ্মণে ব্যাপ্তি শাখতার ।

স্বয়ং পরণ্য স্বয়ং বরণ্যম্ ।

স্বয়ং জগৎকারণ স্বপ্রকাশম্ ।

স্বয়ং জগৎকর্তৃপাত্ত প্রবৃত্ত ।

স্বয়ং পর নিশ্চল নির্বিকল্পম্ ।

[সং স্বরূপ জগতের কারণ যিনি, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। চিৎস্বরূপ সর্বলোকের আশ্রয় যিনি, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। মুক্তিদাতা অবৈততত্ত্ব যিনি, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। সর্বব্যাপী শাখত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিতেছি।

‘তুমিই একমাত্র শরণের পাত্র, তুমিই একমাত্র বরণ্য; তুমিই জগতের পালক এবং স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের একমাত্র সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহারকর্তা, তুমিই একমাত্র সৃষ্টির অতীত, নির্বিকল্প পুরুষ।]

‘ইহার পর গায়ক তোমাকে সুনাইয়া দিবে—‘হে যানব। তুমি একাকী এ জগতে বিচরণ করিতেছ না; সমস্ত জগতের সহিত তোমার একত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। সে একত্ব কি করিয়া তুমি জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে তাহার চেষ্টা কর। কর্মের সূত্র দিয়া জীবন পবিত্র করিতে হইবে, এবং পবিত্রতা অর্জন করিলেই জীবনের স্বয়ং যিষ্টিয়া যাইবে। ভিতরে স্বয়ংসূত্র হইলেই বহুত: তুমি জগতের সহিত এক হইয়া যাইবে। সেইকল্প শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তোমাকে সাংখ্যিক, রাজনিক ও তাত্ত্বিক কর্মের ব্যাখ্যা সুনাইয়া দেওয়া হইল। এই শিক্ষালাভ করিয়া যাও, সমস্ত দিন কর্মে ব্যাপৃত থাক এবং ঐ শিক্ষা জীবনে প্রতিকলিত করিতে চেষ্টা কর। কর্ম ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত তুমি অবস্থান করিতে পার না ও পারিবে না। কর্মই তোমাকে উদ্ধার করিবে; আবার কর্মই তোমাকে নিরয়গামী করিতে পারে। বিভিন্ন কর্মের বোঝণ তোমাকে সুনাইয়া দেওয়া হইল। এই উপদেশ দ্বয়ে ধারণ করিয়া দিবসের কর্মকে নিরঞ্জন কর।’

‘এইভাবে আশ্রমের দিনের কার্য আরম্ভ হইয়া গেল।.....

‘দিনান্তে...আবার প্রার্থনার আহ্বান জনিতে পাইবে।.....অঙ্গপতির গুণবর্ণনা ব্যক্তিরা উঠিল: জগতের যিনি অধিপতি, যিনি সকলেরই আশ্রয়, তাঁহার বিহনে

আমাদের বাড়িঘর

কিছুই বর্তমান থাকিতে পারে না—আমাদের সকলের জন্ম, বৃদ্ধি, আকর্ষণ ও ভালবাসা তাঁহারই চরণে অর্পিত হউক। ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, কুব্জ, মরু প্রভৃতি দিব্য জন্মের দ্বারা বাহার ভব করেন; সমস্ত উপনিষৎ নামগানের দ্বারা বাহার গুণগান করেন; ধ্যানাবহিত ও তদগত মন বোগীরা বাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন এক হুয়াহুরেরাও বাহার অন্ত জানেন না, সেই দেবতা তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি।

‘অতঃপর শাস্ত্রের পবিত্র শ্লোক মধুর কণ্ঠে সম্বরে আবৃত্তি করিয়া তোমাকে শুভাইয়া দেওয়া হইবে : যদি শাস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাকে বাসনা ও কামনা জয় করিতে হইবে, সমস্ত বাসনাকে অন্তরে সমাহিত করিতে হইবে।... শাস্তি কেবল নিদ্রাতেই নিবাসিত হইবে না। কারণ শারীরিক শাস্তিই একমাত্র শাস্তি নয়। দিবসের কর্মের ভিতর দিয়া তুমি কত ব্যাঘ্রবস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াছ। তাহাতে তোমার চিত্ত কত প্রকারে উদ্বেলিত হইয়াছে; সেই সমস্ত ঝড়িয়া মূছিয়া যদি তুমি শুভ হইতে পার, তবেই তোমার খাটি বিশ্রাম লাভ হইবে। দ্বিতপ্রজ্ঞের আদর্শ সম্মুখে রক্ষা করিয়া তোমাকে কার্ণে ব্রতী হইতে হইবে এক উন্নয়নগামী বহির্জগতের সকলকে সংযত করিয়া ‘প্রজ্ঞা’ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সমুদ্র মধ্যে যেমন সমস্ত নদনদীর জল প্রবেশ করে, সেইরূপ বাহার বাসনা ও কামনা বহির্জগতী না হইয়া নিজের অন্তরেই সমাহিত হয়, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হন, কামনাংশ লোক তাহা লাভ করিতে পারে না।

‘আমরা যদি সকাল ও সন্ধ্যায় এই উপাসনা, প্রার্থনা ও শিলা বাদ দেই, তাহা হইলে মহাত্মার জীবনের স্বপ্ন... তাঁহার সমস্ত কার্যের গুঢ় অর্থাদির কিছুতেই কোন সম্ভাবনা পাইব না।’ *

আশ্রমে গান্ধিজীর দৈনিক কর্মসূচী ছিল :

রাত চারটের আগে গান্ধোখান।

পাঁচটা থেকে ছ’টা অবধি প্রার্থনা।

লাড়ে ছটার সময় প্রাতঃরোজ—আমাদের ছাগলের দুধ ও ফল, ২০টি বনাক বা আমের ও দুটা কমলা লেবু।

লাড়ে আটটা অবধি চিঠিপত্র লেখা।

লাড়ে এগারোটায় সময় স্নান।

* গান্ধীজীর মতে লাভ বাস

গান্ধীজীর গান্ধীজী

সারোটার সময় জোজন—আবদের হাঙ্গলের হুখ, কিছু কল, হাঙ্গল-হুদের খিয়ে
ভাঙ্গা ছোট ছোট পাচ হুখানি তুফরি (শুকরাটা কটি) ।

আধ কটা খবরের কাগজ পাঠ ।

বেড়টার সময় খিশ চল্লিশ মিনিট নিদ্রা ।

বিকাল ডিনটা থেকে কর্ণারবারী তীড় । চরকা কাটা ও আলোচনা ।

সুখ্যাত্তের পূর্বে জোজন—হুখ ও কল ।

সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত প্রার্থনা । প্রার্থনা শেষে আশ্রমিকদের দৈনিক কাজের হিসাব গ্রহণ ।

সন্ধ্যা প্রার্থনার শেষে ভিনহাত লম্বা একগাছি বাঁশের লাঠি নিয়ে হন হন করে খানিকটা পথ ভিনি ঘুরে আসতেন । ঘুরতে ঘুরতে কখন-বা এসে দাঁড়াতেন জানা-চেনা প্রতিবেশীর ঘারে, হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করতেন কে কেমন আছে, ছোট ছেলেটির পিঠে একটি বৃহৎ চাপড় মেরে শিশুর মত আনন্দে উপহুছে পড়তেন—কবে অতীতের কোন দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হয়তো একদিন বিহুয়ের ঘারে এসে এমনি হাসি মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এ বেন তারই প্রতিবিম্ব, যুগযুগান্তরের কাল-সমুদ্র পায়ে আবার তার প্রতিচ্ছায়া পড়েছে ।

বৃহৎ শেষ হোল । ভারতবাসীকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া ঘুরের কথা, ইংরাজ-সরকার নতুন আইন করে সাম্রাজ্য গঠনে মন দিলেন, নতুন আইন তৈরী করলেন—রাউলট আইন । আইনের খসড়া পড়েই গান্ধীজী চমকে উঠলেন,—বে কোন লোককে সাম্রাজ্য সম্বোধন হলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করবে, নির্বাসন দেবে, কর্তৃত্বা ইচ্ছা করলে যে কোন জায়গায় সৈন্ত বসিয়ে অত্যাচার চালাতে পারবে ।

তখনই গান্ধীজী চিঠি লিখলেন বড়লাটের কাছে, কিন্তু বড়লাট তার কোন উত্তর দিলেন না । মন ভারী হয়ে উঠলো, ইংরাজদের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু আশা করেছিলেন, সেই আশা-ভঙ্গের বেদনা চিত্তকে উষেল করে তুললো । গান্ধীজী চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না । শরীর তখনও ভালো করে সারেনি, বৈকল্য দাঁড়িয়ে থাকলে পা কাঁপে, জোরে কথা বললে বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করতে থাকে । সেই অবস্থাতেই গান্ধীজী গেলেন দিল্লীতে ।

ভারতীয় ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন করণের আশনে এসে বসলেন, রাউলট আইনের বিতর্ক শুনলেন, জোটের জোরে আইন পালন হয়ে গেলে দেখলেন, একটি কথাও বললেন না, দীর মন্থর পথে বাহির হয়ে এলেন । মাথায় মাথো তখন চিন্তার কড়কইছে ।

আমাদের গান্ধিজী

সেইদিনই তিনি রওনা হলেন যাত্রাকার ট্রেনে।

সাহারাত ভালো করে ঘুমুতে পারলেন না, জানালা দিয়ে বাইরের দূর কালো অন্ধকারের পানে তাকিয়ে তিনি আশায় আলো খুঁজছিলেন ইচ্ছা? তাকতে-তাকতে শেষ রাত্রেই ঠাণ্ডা হাওয়ার কখন বেন চোখে তত্ৰা নেবে এলোছিল, কত কি স্বপ্ন দেখে সে ঘুম টুটে গেল। যাত্রাজে নেবে রাজাগোপালাচারীকে কথান-কথান তিনি বললেন—কাল রাত্রে ট্রেনে একটা স্বপ্ন দেখলাম, কি দেখলাম জানো? কে যেন আমাকে বলছে—‘এই আইনের প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে এক হরতাল কর’। আমিও ভেবে দেখলাম, প্রতিবাদ করতেই হবে।

গান্ধিজী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, নেতারা তাঁকে সমর্থন করলেন, দেশবাসীর কাছে গান্ধিজী নির্দেশ জানালেন—রাউলার্ট আইনের প্রতিবাদে ৩০শে মার্চ হরতাল করতে হবে। সেদিন সবাই উপবাস করে আত্মত্যাগ করবে এবং সমস্ত করণীয় কাজ বন্ধ রাখবে।

৩০শে মার্চ দিল্লীতে সাড়ী পড়ে গেল, জুম্মা মসজিদ থেকে এক বিরাট মিছিল বেরলো। স্বামী প্রহ্মানন্দ মিছিলের আগে-আগে যাচ্ছিলেন, কোন্স এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। গোরা সৈন্য বেয়োনেন্ট ভুলে ধরলো স্বামীজীর বুকের উপর, কিন্তু স্বামীজী অত্যা সহজে ভয় পাবার মত মানুষ ছিলেন না। নেপোলিয়নের মত আমার বোতামগুলি খুলে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। পুলিশ মিছিলের উপর গুলি চালালো, পাঁচজন গুলি খেয়ে মরলো।

ভারপূর গুলি চললো লাহোরে।

গুলি চললো অমৃতসরহরে।

গান্ধিজী এলেন বোম্বাইয়ে, সেখানে স্বয়ং হুক করলেন আইন প্রত্যাহার আন্দোলন। তাঁরই লেখা ‘হিন্দু-স্বরাজ’ ও ‘সর্বোত্তম’ বই দু’খানি পঞ্চমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেছিল, সেই বই দু’খানি ছানিয়ে প্রকাশ্যে বিক্রী করতে বেরলেন গান্ধিজী, সরোজিনী নাইডু ও আরো অনেকে। এক একখানি বইয়ের দাম চার আনা, কিন্তু কেউ কেউ পঞ্চাশ টাকা দিয়েও এক একখানি বই কিনেছে। পকেটে বা খাকডো তা-ই সে দিয়ে দিত।

কিন্তু পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করলো না। কৈকিরং ফিল—বই দু’খানির যে সংস্করণ পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছিল, এটি সে সংস্করণ নয়, এ সংস্করণ অনুবাদ করে ছাপা হয়েছে, এ বই যেখানে আইন অমান্য হয় না।

গান্ধিজী রওনা হলেন অমৃতসরহরে।

গান্ধীজী-গান্ধীজী

দ্বিতীয় পলাশ হাইল আসে পালওয়ার ষ্টেশনে পুলিশ এসে হুকুম জারী করলো—
—বাঁধরা চলবে না, কিরে বান!

গান্ধীজী বললেন—জা হর না, আমাকে বেঁচেই হবে!

পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলো। মথুরার এসে সাক্ষাৎ তাঁকে হাফতে আটকে রাখলো। তারপর তাঁকে বোম্বাইয়ে এনে ছেড়ে দিল। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শিবুনীতে তখন এক সভা বসেছে, এমন সময় সভার বাহকে গান্ধীজী এসে দাঁড়ালেন, জনতা সোলাসে সাড়া তুললো—বন্ধেবাতরম্! মহাত্মাজীকে পুরোভাগে রেখে তারা সই প্রদর্শন করতে বেরলো।

ক্রকোর্ড বাজারের কাছে অঝোরোহী পুলিশ এসে দাঁড়ালো, বললো—জীক হঠাও। কিন্তু জনতা তখন পুলিশের সে হুকুম মানার ক্ষমতা ছিল না। বল্লম হাতে ঘোড়-সওয়ার জীড়ের ডিঙির দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বল্লমের খোঁচায় ও ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে বহু লোক আহত হোল। হুড়াহুড়ি ও আতঁনায়ে চারিপাশ বীভৎস হয়ে উঠলো।

গান্ধীজী এমন ব্যাপার কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি খোলা মোটারে বসে ছিলেন ঠনঠন করে পুলিশের বল্লম তাঁর মোটারের গারে এসেও লাগলো, তিনি বিমূঢ় হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু মুহূর্তেকেই তাঁর সন্ধি কীরে এলো, তিনি তখনই ছুটলেন পুলিশ কমিশনারের কাছে। কমিশনার সাহেব সহজাত অহঙ্কারে বললেন—আমি যা করেছি, কিছুই অজ্ঞায় করিনি।

কিরে এসে গান্ধীজী চৌপাটীতে এক সভা করলেন, বললেন—অহিংস থাকাই সত্যগ্রহের প্রধান নীতি। জনসাধারণ কথায় ও কাজে যেন অহিংস থাকে, না হলে দেশব্যাপী সত্যগ্রহ চালানো আবার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কিন্তু জনগণ রক্ত আক্রোশ সঞ্চিত করতে পারলো না, আমেদাবাদে গোলযোগ ঘটলো। নড়িরাডে জনতা রেল-লাইন উপড়ে ফেললো, বিরাগ পায়ে একজন সরকারী কর্মচারী খুন হোল। সরকার আমেদাবাদে সামরিক আইন জারি করলো। গান্ধীজী হুটে এলেন আমেদাবাদে, সবরমতী আশ্রমে সভা ডাকলেন, সভ্যগ্রহীদের ঘোষ কাখার বুঝিয়ে দিলেন, বারা হাঙ্গামা বাধিয়েছে তাদের পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বললেন, আর শত্রু-বিজয়ের সমস্ত যোদ্ধাদের প্ররোচিত করার ক্ষমতা একদিন উপবাস করার নির্দেশ দিলেন। নিজে উপবাস করলেন তিন দিন। আমেদাবাদে শান্তি কীরে এলো।

বোম্বাইয়ের নামকর পৈনিক পত্রিকা 'স্টোকে কনিক্স'। সভ্যগ্রহের সংবাদ

আমাদের গান্ধী

জাপান অর্থাৎ যোমাই সরকারি কাগজখানির প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। সম্পাদক হনিয়ানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। কাগজখানি যে কোম্পানী থেকে বেরতো তাদের আরো দু'খানি কাগজ ছিল, মাসিক 'নবজীবন' আর সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'। যৌথ কোম্পানী, পরিচালকবর্গ এই সরকারী অফিসকে সেনে নিজে পারলেন না, তাঁরা গান্ধীজীর কাছে এসে বললেন—কাগজ দু'খানি আপনাকে চালাতে হবে।

গান্ধীজী বললেন—কিন্তু ব্যবসায়ীরা কাগজ আমি চালাবো না, বিজ্ঞাপন আমি ছাপাবো না।

পরিচালকদের তখন জিদ চেপে গেছে, বললেন—আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম, আপনি যা করবেন তাতেই আমরা রাজী।

গান্ধীজী সম্পাদক হলেন। গুজরাতী 'মাসিক নবজীবন' সাপ্তাহিক হয়ে গেল, ইংরাজী 'সাপ্তাহিক ইয়ং ইণ্ডিয়া' পাক্ষিক পত্রিকা হোল। কাগজ দু'খানি হোল গান্ধীবাদের মূখপত্র। বিপ্লবী ভারত ইয়ং ইণ্ডিয়ার প্রত্যেকটি শব্দ আগ্রহ সহকারে প্রসিধান করতে লাগলো।

হিন্দুদের নববর্ষের উৎসব ১লা বৈশাখ, পাঞ্জাবের পথ প্রান্তর রক্তে লাল হয়ে গেল। অমৃতসরহরের জলিয়ানওয়ালা বাগের এক সভায় মিলিটারী গুলি চালিয়ে নরনারী শিশু ও বৃদ্ধকে নির্বিচারে হত্যা করলো। গুজরানওয়ালায় প্লেন থেকে বোমা কেলা হোল, চাষাদের উপর প্লেন থেকে মেশিন গান চার্জ করলো। পথে উপর নাগরিকদের বুকে ইটানো হোল, মেয়েদের নঙ্গ করে পথ দিয়ে বাঁচ করানো হোল। ধবর শুনে গান্ধীজী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দীনবন্ধু এগুৎক পাঞ্জাবে বাবার পাখে গ্রেপ্তার হলেন, বড়লাট বাহাদুরের পরোয়ানা জারী হোল—কোন কংগ্রেসী নেতার পাঞ্জাবে বাওয়া চলবে না।

ববীন্দ্রনাথ আর সইতে পারলেন না, 'ভার' উপাধির সনদ বড়লাটের কাছে কেন্দ্র পাঠালেন।

গান্ধীজীও তাঁর 'কাইজারই-হিন্দ' পদক কেন্দ্র দিলেন।

দু' মাস পরে গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের পাঞ্জাবে বাবার অহুসি মিললো। কংগ্রেসীরা তবক্ত-সভা বসালেন। মিলিটারীদের অত্যাচারের কথা সেখানে গান্ধীজী হতবাক হয়ে গেলেন। সব চেয়ে বেশী মর্যাদিক হোল সরকারী সীলিত। সে সব কর্তৃত্বীয় অকথ্য অনাচার করেছিল, পাঞ্জাব সরকারি তাদের মর অপরাধের দায়

আমাদের গান্ধিজী

থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, পাঠ্যবই লিখতে তাদের প্রণয়ন করে বলেছেন—
'তোমরা ঠিক করেছে, আবার পূর্ণ সমর্থন আছে!'

সব দেখে শুনে গান্ধিজী বললেন—অহিংসার পথে স্বাধীনতা পেতে হলে, ভারতকে
এক সহস্র কেন, বহু সহস্র নরনারীর হত্যাকে নিগিষ্টভাবে গ্রহণ করতে হবে, ফাঁসী
বাঁওরাকে প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার বলে গ্রহণ করতে হবে।

তদন্ত সভার বিবৃতি পড়ে সারা ভারত চকল হয়ে উঠলো।

কংগ্রেসীরা আলিয়ানওয়ারাভাগের স্মৃতিরক্ষার কথা তুললেন, চাঁদা জেলার ভার
পড়লো গান্ধিজীর উপর। চাঁদা তুলতে গান্ধিজী ছিলেন অস্বীকার, অনেক টাকা তিনি
তুললেন কিন্তু শেষ অবধি বাধলো মতামতের সংঘাত—হিন্দুরা স্মৃতিরক্ষার জন্য বা
করতে চায়, মুসলমানদের তা পছন্দ হয় না, শিখেরা আবার বলে অন্তরকম। টাকাটা
শেষ অবধি ব্যাঙ্কেই রয়ে গেল। *

ভারতের আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিল। গান্ধিজী বললেন—ভারত-
সরকারের মাথা ঠিক নেই। আমাদেরও চিন্তের স্থিরতা নষ্ট হবার উপক্রম করেছে।
কিন্তু আমি আপনাদের বলছি হিংসাকে প্রতিহিংসা দিয়ে জয় করা যায় না,
অহিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করতে হবে। আমরা যদি মাথা ঠিক রেখে চলতে
পারি তাহলে আমরাই পরিণামে জয়ী হব। 'জুলুম করতে করতে জালিম খুদ বেখুদ
থক যায়গা'—অত্যাচার করতে করতে অত্যাচারী নিজেই একদিন পরিশ্রান্ত হয়ে
পড়বে।

গান্ধিজী কংগ্রেসের কর্মসূচী তৈরী করলেন :

সরকারী খেতাব বর্জন করতে হবে।

সরকারী ভোজসভায় যাওয়া চলবে না।

সরকারী চাকরী করা চলবে না।

সরকারী ইন্সলকলেজ বর্জন করতে হবে।

সরকারী আদালত ছাড়তে হবে।

ব্যবস্থা পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বিশেষী জিনিষ বর্জন করতে হবে।

অস্পৃশ্যতা ছাড়তে হবে।

জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দেশী জিনিষ ব্যবহার করতে হবে।

সালিশি আদালত বসাতে হবে।

আমাদের গান্ধিজী

মানক সেবন বন্ধ করতে হবে।

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ছাড়তে হবে।

ঘরে ঘরে চরকা চালাতে হবে।

—তাহলেই একবছরের মধ্যে আমাদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠিত হবে।

সারা ভারতে সাড়া পড়ে গেল—বাংলা থেকে বোম্বাই, পাঞ্জাব থেকে মাদ্রাস—
শতশত কংগ্রেসকর্মী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পল্লীর নিভৃত কোণে জীর্ণ কুটিরে
অনাহারগ্রস্ত শীর্ণ হাতে চরকা তুলে দিলেন, যত্নমুখী পল্লুর মনে এসে জাগলো নব-
জীবনের আকাঙ্ক্ষা, নতুন দিনের আলো এসে লাগলো মুমূর্ষুর চোখে; কুড়ি লাখ
চরকা ঘুরতে লাগলো ভারতের নরনারীর হাতে।

এই চরকার একটা ইতিহাস আছে।

আমাদের নির্মম দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা গান্ধিজী সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করেন চম্পারণে।
নীলকুটির মজুরদের দৈনিক আয় : পুরুষদের দশ পয়সা, বেয়েদের ছ'পয়সা, আর
বালকের তিন পয়সা। যে, দিনে যাত্র চার-আনা পয়সা রোজগার করতে পারে সে
তো নিজেকে রীতিমত একজন ভাগ্যবান বলে মনে করে। অনেকেই একখানির
বেশী ছ'খানি কাপড় নেই। একবার এক গায়ে গান্ধিজীর চোখে পড়লো কয়েকটি
রমণী অত্যন্ত ময়লা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে, কল্প রুবা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন
—তোমরা কাপড় কাচো না কেন? এমন কাপড় পরলে অস্বস্তি হবে যে?

বেয়েরা উত্তর দিল—আমাদের আর তো কাপড় নেই, এটা যে কাপড় পরবো
কি?

তাদের অবস্থা ভালো করে দেখার জন্য কল্প রুবা তাদের বাকী গেলেন,—তাদের
কাপড় তো ঘরের কথা, দ্বিতীয় জিনিসটি অবধি নেই।

এই বাস্তবগুলির অন্ন-বস্ত্রের জন্য সত্যিই কিছু করা যায় কি না, সেই কথা ভাবতে
ভাবতে গান্ধিজীর মনে চরকার কথা উঠলো, কিন্তু তখন চরকা সম্বন্ধে গান্ধিজীর কোন
স্পষ্ট ধারণা ছিল না। চম্পারণ থেকে কিরে এসে পল্লবাকেন নামে এক মহিলা কর্মীর
সঙ্গে এই সম্পর্কে তিনি আলোচনা করলেন। গল্লাবেন ছিলেন সত্যিকারের সমাজ-
সেবিকা। পড়াশুনা বেশী হয় করেননি, কিন্তু মন ছিল সত্যিকারের নিম্নস্তরের মত
সম্মান যুক্ত। অস্পৃশ্যতা তিনি মানতেন না, রোগে পোড়া, জলে ডুবে গ্রাস করতেন
না, পর্বত নির্ভয়ে চলাফেরা করতেন, প্রয়োজনমত বোকার দিঠেও চড়তেন।

আমাদের গান্ধী

গন্ধারেন প্রতিশ্রুতি দিলেন—চরকা সম্পর্কে সঠিক খোজ খবর নিয়ে তিনি গান্ধীজীকে জানাবেন।

কদিন পরে গন্ধারেন খবর দিলেন—বরোদা রাজ্যের বিজাপুরে তিনি চরকার সন্ধান পেয়েছেন, তুলোর পাখ পেলে কাটুনিয়া সূতা কেটে দিতে পারে।

গান্ধীজী মাসিক পয়ত্রিশ টাকা বাহিনা দিয়ে দুইরী রাখলেন, তুলো ধুনে পাখ তৈরী করে সূতা কাটা চললো, তাঁতীরা কাপড় বুনতে লাগলো। বিজাপুরের খাদি অল্প দিনেই সারা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করলো।

ইতিমধ্যে মগনলাল গান্ধী চরকা কাটার কারিকুরী সব শিখে নিলেন, তারপর চরকা চালাবার ব্যবস্থা করলেন সবরমতী আশ্রমে। মগনলাল প্রথম যে খন্দর বোনালেন, তার খরচ পড়লো গজ প্রতি পনেরো আনা। মোটা চটের মত কাপড়। এই কাপড়কে মিহি ও সর্বজন গ্রাহ্য করার জন্য গান্ধীজী বোম্বাই থেকে দু'জন ভালো চরকা-চালিয়েকে খুঁজে বের করলেন। তারা বললো—মিহি সূতা আমরা কেটে দোব, কিন্তু আটাশ তোলায় এক সের বলে ধরতে হবে।

আটাশ তোলা সেড় পোয়ার চেয়ে কম, সেড় পোয়াকে এক সের বলে ধরা চলে না। গান্ধীজী বুঝলেন ঠকছেন, তবু তিনি তাইতেই রাজী হলেন। গান্ধীজীর ঘরে চরকা চলতে শুরু করলো। চরকার ঘবর গুনতে গুনতে গান্ধীজীর মনে নতুন আশা জেগে উঠলো, দারিদ্র্য-মুক্ত আবলম্বী ভারতের দূরগত সম্বন্ধ তাঁর কানে বজার তুললো। গান্ধীজী গন্ধারেনকে চিঠি লিখলেন—পয়তাল্লিশ ইঞ্চি বহরের একঝোড়া খন্দরের কাপড় বুনো আমাকে পাঠিয়ে দাও, মিলের কাপড় আমি আর পরবো না।

গন্ধাবাই কাপড় বুনো নিয়ে নিজেই এলেন গান্ধীজীর কাছে, সঙ্গে এলেন তাঁর বাবী লক্ষ্মীদাস।

গান্ধীজী সেইদিন থেকে খন্দর ধরলেন। কাটুনিদের কাছে বলে বসে শিখে নিলেন চরকা কাটতে, বললেন—আমি সবাইকে চরকা কাটতে বলছি, এই চরকা কোটি কোটি ভারতবাসীকে অল্পের সংস্থান করে দেবে।

মোটা খন্দর দেখে সৌখীন উজ্জলোকেরা নাক সিটকালো। গান্ধীজী বললেন—আমরা যদি আমাদের বুড়ো অকেজো বাপ-মাকে বা আমাদের অকর্মণ্য ছেলেকেরকে ঘরে কেলি তবে তো আমাদের অনেক খরচ বেঁচে যায়। কিন্তু তাকে আমরা মারিই না, বরং বখাসভব খরচ পত্র করে তাদের আমরা পালন করি।...খন্দরের কাপড় হয়তো একটু মোটা হয়, কিন্তু ক্রমশঃ সূতা কাটতে কাটতে আমাদের হাত দিয়েই খুব মিহি সূতা বের হবে। চাকার মসলিনের মত পাতলা কাপড় আজ

আমাদের গান্ধীজী

অবধি পৃথিবীতে তৈরী হয়নি, মনে রেখো সেই সূতা আমাদের দেশের লোকের হাতেই কাটা।

বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা গান্ধীজীকে ডেকে বললো—বিলিভী কাপড়ের আমদানী বন্ধ করতে হলে এদেশের দরকার মত আরো বেশী কাপড় তৈরী করতে হবে, কেননা লোকে দিশি কাপড় না পেলে বিলিভী কাপড় কিনবেই। সেইজন্য বিলিভী কাপড় বয়কট করার আগে, স্বদেশী কাপড় তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে, আপনি এদেশে আরো কাপড়ের মিল বাড়াবার ব্যবস্থা করুন।

গান্ধীজী ছিলেন মিল ও বড় কারখানার বিরোধী। মিলে কম লোক বেশী লোকের কাজ করে, তাতে অনেক লোক বেকার হয়ে যায়, উপরন্তু যারা কারখানায় কাজ করে তাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায়। গান্ধীজী মিল-মালিকদের বললেন—মিল-বাড়ানো আমার কাজ নয়, আমি চাই বেকার গরীবদের হাতে কাজ দিতে, আমি চরকা ও তাঁত চালাবার ব্যবস্থা করছি।

—চরকা!—মিলওয়ার দুখ বিক্রপের হাসি ফুটে উঠলো—এই যন্ত্রের যুগে আপনার চরকা চলবে তো? দেখুন চেষ্টা করে।

গান্ধীজীও হাসলেন, বাজে লোকের বাজে কথায় টলবার মত মানুষ তিনি নন।

১৯২১ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসলো। গান্ধীজী অসহযোগের কথা তুললেন। কথাটা সকলের মনঃপূত হোল, তিনমাস ধরে এই সম্পর্কে নেতারা ভাবলেন, আলোচনা করলেন, বিতর্ক তুললেন, শেষে তিনমাস পরে নাগপুর কংগ্রেসে সারা ভারতের নেতারা গান্ধীজীর প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন। সর্বত্র অসহযোগের সাড়া পড়ে গেল :

বাংলায় কাজ শুরু করলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র বোষ, মোলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি।

বিহারে কাজ শুরু করলেন—ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ...

উৎকলে কাজ শুরু করলেন—গোপবন্ধু দাস, গোপবন্ধু চৌধুরী...

বুজপ্রদেশে কাজ শুরু করলেন—পণ্ডিত মতিলাল, পণ্ডিত অহরলাল, গণেশশঙ্কর বিজয়ারী, রবি আশের কিসোরাই...

কাশ্মীরে কাজ শুরু করলেন—ডাক্তার জগদান দাস, শিবপ্রসাদ...

দিল্লীতে কাজ শুরু করলেন—হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার আমনলারী...

আমাদের গাঙ্কিজী

পান্নাবে কাজ শুরু করলেন—লালা লক্ষণ্য রায়, ডাক্তার কিলু, ডাক্তার
সত্যপাল, বামী প্রদানন্দ, ডাই পরমানন্দ...

করাচীতে কাজ শুরু করলেন—চৈত্রান গিনোয়ালী, অরায়মাস দৌলভরায়...

বোম্বাইয়ে কাজ শুরু করলেন—ওমর শোভানী, শেখ ছোটানী...

গুজরাটে কাজ শুরু করলেন—বিঠলভাই প্যাটেল, বলভভাই প্যাটেল...

মহারাষ্ট্রে কাজ শুরু করলেন,—ডাক্তার কেলকার, শঙ্কররাও মেণ্ডে, ভোপৎকার,
সেনাপতি বাপাং...

মধ্যপ্রদেশে কাজ শুরু করলেন—ডাক্তার নারায়ণ ডাক্তার খারে, মাধব শ্রীহরি
আনে, অভয়ধর...

মাদ্রাজে কাজ শুরু করলেন—চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী, ডক্টর পট্টি
নীতারামিয়া, ইয়াকুব হাসান...

মহিলাদের মধ্যে কাজ শুরু করলেন—কন্তু রবার্ট, বরুণরানী নেহেরু, সরোজিনী
নাইডু, বাসন্তী দেবী...

গাঙ্কিজী তাঁর সংগ্রামের নীতি ব্যাখ্যা করে লিখলেন—এই পৃথিবীতে প্রত্যেক
সংগ্রাম ছাড়া কিছুই সফল হয় নাই, ...বুড় তুঁহার সংগ্রাম শত্রুর শিবিরেও সঞ্চারিত
করেছিলেন, ফলে ব্রাহ্মণের আধিপত্য মাথা নত করেছিল। যুদ্ধের দ্বারা বেসাতি
করছিল খুঁট ভাদেবকে তাড়িয়ে দিলেন, ভগ্নামির নিন্দা করলেন... ইহাই হোল প্রত্যেক
সংগ্রামের রূপ। এঁদের প্রত্যেকের সংগ্রামের পশ্চাতে ছিল অপার কল্পণা। ...বল-
প্রয়োগে পাপকে পরাক্রান্ত করার কোন অধিকার আমাদের নেই। সকল বিপদ তুচ্ছ
করে পাণের সংসর্গ ত্যাগের দ্বারাই আমাদের পাণের প্রতিরোধ করতে হবে। এবং
শত্রুর মধ্যে যখন অহুতাপের লক্ষণ দেখা যাবে, তখনই তাকে সঙ্গেহে বুকে জড়াবার
জন্তু তুঁহাত মেলে ধরতে হবে...

ইংরাজদের উদ্দেশ্যে গাঙ্কিজী লিখলেন—ইংরাজ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা
সরকারের প্রতি আমাদের সকল বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশের সংসাহসের
উপর আমার এখনও বিশ্বাস আছে। ভারতবর্ষ এখন কেবল মানসিক বলই দেখাতে
পারে, দেখাতে পারে অসহযোগ আন্দোলন। আমি যত্নসহ আপনাদের
জর করতে পারি।...

ভারতের নগরে নগরে গাঙ্কিজী ঘোষণা করলেন—সবাই এক হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে
কাজ করলে, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে।

ভারতবাসীর মনে কে কেন সোনার জ্বালি জ্বলছে, উৎসব চকল ভাঙল কয়ীর

আমাদের গান্ধিজী

দল ছাঁমালের মতো সারা দেশে পকাশ লাগ সজা করে ফেললো। ধরে ধরে ঘুরতে লাগলো চরকা, হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো তক্দি। বিলিভী কাপড়ের বহুতসব হুক হোল, লবঙ্গ হরতাল ও ঘরের দোকান গিকেটিং নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। দিকে দিকে আগুন জ্বলে উঠলো।

বিলিভী কাপড়ের বহুতসব হুক করলেন গান্ধিজী স্বয়ং। দীনবন্ধু এগুরুজ গান্ধিজীকে লিখলেন—ধ্বংসকে জাতীয়তাবাদের নীতি বলে গ্রহণ করলে অন্তায় হবে। যাহুকের শ্রমের ফসলকে ধ্বংস করা পাপ। এই কাপড়গুলো ভস্মীভূত না করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করলেই বোধ হয় ভালো হোত। আমি নিজে খদ্দর পরি, কিন্তু আপনার এই নীতিকে সমর্থন করা সংগত হবে কি না তাই ভেবে বিব্রত হয়ে পড়েছি।

গান্ধিজী উত্তর দিলেন—বৃটিশ শাসকদের ভারতীয়েরা ইতিপূর্বেই ঘৃণা করতে শুরু করেছে। সেই ঘৃণাকে আমি অন্তদিকে সরিয়ে দিয়েছি, —ইংরাজ থেকে ইংরাজী জবো। ইংলণ্ডের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য মালগুলি গোড়ানো হয়নি, ভারত যে ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে, তারই সংকেত হিসাবে এগুলি গোড়ানো হয়েছে। এই বিবাক্ত জিনিষগুলি গরীব দুঃখীদের দিলে ভাল হোত। গরীবদেরও আত্মসন্মান-জ্ঞান আছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলাতে, তিনি ইস্কুল কলেজ বর্জন সমর্থন করতে পারলেন না, লিখলেন—ছাত্রেরা ত্যাগ স্বীকার করিবে, কিন্তু কিসের জন্য? পূর্বতর কোন শিক্ষার জন্য নয়, অশিক্ষার জন্য।...আমি আমার গৃহের চারিদিকে প্রাচীর স্থাপনের সময় গৃহের বাতায়ন পথগুলি রুদ্ধ করিতে চাই না। সকল দেশের সত্যজিৎ হাওয়া যথাসম্ভব মুক্তভাবে আমার গৃহে বহিয়া আসুক, আমি তাহাই চাই।...কিন্তু এই বাড়ি আমি উড়িয়া বাইতে রাজী নই।...কারাগারের ধর্ম আমার নহে।...জাতির বিভিন্ন-শক্তির কেবল নিজেদের মধ্যেই সহযোগিতা করিলে চলিবে না, সহযোগিতা করিতে হইবে আভিতে আভিতে, দেশে দেশে। ভারতের জাগরণ সমগ্র বিশ্বের জাগরণের সহিত একই সূত্রে আবদ্ধ।...

গান্ধিজী উত্তর দিলেন—আমার চারিদিকে যখন খাজের অভাবে বাহুর মরছে, তখন আমার কর্তব্য হোল বুকুকে অন্ন দান করা। ভারতবর্ষ সেই গৃহ, যাতে আগুন লেগেছে। এ ক্ষুধার মরছে, কারণ বাত কিনিবার মত বাহুর মরছে তাহলে কান দেই।...আমি যে লাশ লাশ বাহুর পতনও অর্থন হয়ে মরছে, তাদের কথা আমাদের

সসারামের গাঙ্গুলী

ভাবতেই হবে। কুশাই একমাত্র যুক্তি বা তারতম্যকে চরকার বিকে টেনে এনেছে।... আমি কবীরের গান গেয়েও গীড়িত হুহুদের বিলুপ্ত স্বক্তি দিতে পারিনি।... প্রত্যেককেই সূতা কাটতে হবে। অন্তের বস্ত্র রবীন্দ্রনাথও সূতা কাটুন, তিনি তাঁর বিলিভী পোষাক পুড়িয়ে ফেলুন। তা-ই আজ কর্তব্য। আগামী কালের ব্যবস্থা বিধাতা করবেন। যেমন গীতা বলেছে—স্তু্য পালন কর।

কিন্তু মানবতার দিক থেকে কবিগুরু সর্বে গাঙ্গুলীর আদর্শের কোন অঙ্গ ছিল না। গাঙ্গুলী বলেন—আমার কাছে দেশপ্রীতি হোল মানবপ্রীতি। যাহুকে ভালবাসি তাই আমি দেশকেও ভালবাসি। অস্ত্র দেশকে বাদ দিয়ে আনার দেশপ্রীতি নয়, ভারতের মজলের অস্ত্র ইংলও কিংবা জার্মানীকে আমি আঘাত করতে পারি না।

গাঙ্গুলী ভারত পরিক্রমা করতে বেরলেন। পাটনা, এলাহাবাদ, বেনারস গৌহাটী, তেজপুর, নগরী, ঘোড়হাট, ডিক্রগড়, শিলচর, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কলিকাতা, যেমিনীপুর, মাদ্রাজ, কুন্তকোণম, ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা, কয়ম্বটোর, বোম্বাই,...সর্বত্রই শত সহস্র জনতার সমাবেশ, একস্থানে তিনটি চারটি করে সভা, মানপত্রদান, তিলক স্বরাজ্য কাণ্ডের অস্ত্র ঢাকা সংগ্রহ...কখনো ট্রেনে, কোথাও বা মোটোরে। পথের দু'পাশে ছুটন্ত মোটোরে গম্যমান গাঙ্গুলীর একবার দর্শন পাবার অস্ত্র ঘটীর পর ঘটী অপেক্ষ্যমান নরনারী, আবার কোথাও-বা যে লাইন দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে সেই লাইনের দু'পাশে দুপুর রাতেও অস্ত্রধনি উঠছে—মহাত্মা গাঙ্গুলী জয়।

বাহার বছরের বুকের কাজের বিরাম নেই, সভার পর সভায় তিনি ঘোষণা করছেন—চরকা চালাও, অস্পৃশ্যতা ভুলে যাও, মদ খাওয়া ছাড়া, বদেস্তী জিনিষ ব্যবহার কর, এক বছরের মধ্যেই স্বাধীনতা আসবে।

ঈর্ষ বুকের কীণ কণ্ঠে কি অমোঘ উদ্দীপনা ছিল জানি না, প্রতিটি সভায় হাজার হাজার বিলিভী কাপড়ের বহু সংসব হোল, স্বন্দরের বিজয়-রথ এগিয়ে চললো শহর থেকে গ্রামে, ধর্মীর প্রাসাদে ও শতভয় চাবীর গৃহকোণে।

সসারামের পথে মোটোর ছুটছিল।

সহসা এক ঘাটের মাঝখানে গাঙ্গুলীর মোটোরের চারার কেটে গেল। গাঙ্গুলীকে মোটোর থেকে নামতে হোল। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, মহাত্মা সন্ন্যাসের নিয়ে এক গাছতলায় এসে গাঙ্গুলী বসলেন।

আটদশ হাত হুবে আরেক গাছ তলার ছাড়া আবার নিয়ে এক কুলা বাড়িয়েছিলেন,

আমাদের গান্ধী

কোন রকমে লাঠিভেদ ভর দিয়ে ধীরে ধীরে বুড়ী এগিয়ে এলেন দলটির সামনে, জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, মহাত্মা গান্ধী কে? এই পথ দিয়ে তাঁর যাবার কথা ছিল, তিনি কি আপনারদের মধ্যে আছেন?

গান্ধীজী নিজেই তাঁর কথার জবাব দিলেন—কেন ভূমি তাঁকে খুঁজছ?

বুড়ী বললেন—বাবা, আমার বয়স হয়েছে ১০৪ বছর। চোখে ভাল দেখতে পাই না। সমস্ত তীর্থ পর্যটন করেছি, বদরিকাশ্রমেও গেছি, বাড়ীতে নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা দেবতার পূজা অর্চনা করি। কিন্তু বাবা সাক্ষাৎ দেবতার দেখা কখনো পাইনি! শুনেছি আমাদের যেমন রাম-অবতার কৃষ্ণ-অবতার হয়ে গেছেন তেমনি গান্ধীঅবতার হয়েছেন, তাঁর এই পথ দিয়ে আজ যাবার কথা, তাঁকে দেখে একবার জীবন সার্থক করতে চাই!

বৃদ্ধার চোখ ছল ছল করে উঠলো। অস্পষ্ট দৃষ্টি তিনি তুলে ধরলেন গান্ধীজীর মুখের পানে। সে মুখে বুড়ী কি দেখলেন কি জানি, আর কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার হোল না, আকাঙ্ক্ষিতকে তিনি চিনে নিলেন, আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে নিরীক্ষণ করে দেখে শ্রান্ত কণ্ঠে বুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, ভোগের তৃষ্ণা দূর হবে কি?!

—তৃষ্ণা?—গান্ধীজী হেসে বললেন—ভোগের তৃষ্ণা থাকলে মুক্তি হবে কি করে?

বুড়ী হয়তো আরো দু-একটি তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করতো, কিন্তু গান্ধীজী কথার মোড় কিরিয়ে দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার যে এতো বয়স, কি আহ্বার করেন?

বুড়ী বললেন—বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছি, তখন থেকেই হবিজ্জি আর উপবাসের নিয়ম মেনে চলছি, আগে দিনে একবার কলমূল খেতাম, আজকাল আর তা'ও খাইনা, দিনে একবার শুধু দুর্বাঘাসের সরবৎ খাই। এখন আর কষ্টলো করে চলতে পারি না, শুধু আপনার দর্শন পাবার জন্য কোন রকমে এখানে এসে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু এই মাঠের মাঝখানে গান্ধীজীর সঙ্গে এই বৃদ্ধার দেখা হবার কথা নয়, মোটার থামবার কোন কারণই ছিল না—শুধু টায়ার কাটার জন্যই। তাও টায়ার কাটলো এই অপেক্ষামান বৃদ্ধার দশ বারো হাত দূরে। আরেকটু দূরে হলে তো বৃদ্ধা ততটা এগিয়ে যেতে পারতেন না। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দেখাও হোত না। একি তাহলে বিনয়িতার নির্দেশ? ভক্তের অন্তরের একান্ত আকর্ষণ! কতবছর আগে জামি না, পশুপা সরোবরের তীরে অনাধ-কন্ডা শবরী এমনভাবেই একদিন শ্রীমদ্ভক্তের পথের পানে ডাকিয়েছিলেন, একবার মাত্র মহাপুরুষের দর্শনমানসে। গান্ধীজীও কি তবে মতাই দৃষ্ট-আনিত পুরুষ—এই দুগের শ্রীমদ্ভক্ত!

আমাদের গান্ধিজী

বুদ্ধার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলার পর পিছনের মোটার এসে পড়লো, গান্ধিজী সেই মোটারে চলে গেলেন। মাঠের সীমান্তে অপস্থায়মান মোটারখানির পানে বুদ্ধা ছলছল চোখে তাকিয়ে রইলেন, তারপর দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন গান্ধিজীর উদ্দেশে।

দক্ষিণ ভারতে তখনও খন্দরের তেমন প্রচার হয়নি। এ সম্পর্কে গান্ধিজীদের মধ্যে রীতিমত সাড়া তোলার জন্য গান্ধিজী একমাস শোকের বেশ ধারণ করার সিদ্ধান্ত করেন।

মাদ্রাসায় তিনি মস্তক মুগুন করলেন।

পরদিন প্রত্যুষে কড়াইকুড়িতে টুপী ও জামা কাপড় ছেড়ে একহাত বহরের সামান্য একটুকরো খন্দর পরলেন, আর জামার পকেটে যে জিনিষগুলি রাখতেন তা রাখার জন্য একটি ছোট খন্দরের বোলা করে নিলেন। আর গায়ে দিলেন একখানি ছোট খন্দরের চাদর।

যারা মহাত্মাজীকে একান্ত আপনার জন বলে মনে করতেন তাঁদের চোখে এই অর্ধ-নগ্ন বেশ অত্যন্ত বেদনা-দায়ক হয়ে উঠলো।

বুদ্ধ মৌলানা আজাদ সোবানী মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন, তিনিও আচকান-ফেলে ফতুয়া গায় দিলেন, পায়জামা বদলে পরলেন জাম্বু অবধি এক খাটো লুঙ্গি, টুপী পরা ছেড়ে দিলেন।

বরোদার প্রাক্তন দেওয়ান বুদ্ধ আব্বাস ভায়েবজী বোম্বাইয়ে গান্ধিজীকে এই বেশে দেখে বললেন—মহাত্মাজী এবার নিজেও পাগল হয়েছেন, অপরকেও পাগল করার বেশ কন্দী বের করেছেন।

বিহারের মৌলানা আবদুল বারি বললেন—জাম্বু এইরূপ নয় রাখা আমাদের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

গান্ধিজী চাদর দিয়ে পা ঢেকে হেসে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, আভি তো হ্যা।

মালব্যাজী হুঃখ করে বললেন—আপনে এ কেয়া সুরু কিয়া।

মাসখানেক পরে অধ্যাপক কুপালনী তাঁর আশ্রম থেকে একখানি খন্দরের ধুতি বুনিয়ে এনে গান্ধিজীকে উপহার দিলেন, বললেন—এইখানি আপনি পরকেন।

সবাই আশা করেছিল একমাস পরে আবার গান্ধিজী বড় কাপড় পরবেন।

গান্ধিজী কাপড়ের হুতাগুলি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে হেসে উত্তর দিলেন—আমার খাট কোটি টাকার কাপড়ের ব্যবসায়, একখানি ধুতিতে কি হবে? বত-

আমাদের গান্ধিজী

কপ সে-ই কাপড় না হয়, ততক্ষণ আমি এতো বড় কাপড় কি করে পরি ? আমাকে এখানি ছিঁড়ে নেটি করে পরতে হবে !

মহাত্মাজী কি চান তা এই কথাটি থেকেই বুঝতে পারা যায়।

বোম্বাইয়ের ক'জন অধ্যাপক গান্ধিজীকে এসে জিজ্ঞাসা করেন—ছুটির দিনে তাঁরা করবেন ?

গান্ধিজী বললেন—ধুনো, কাটো, বুনো,

কাটো, বুনো, ধুনো

বুনো, ধুনো, কাটো !

গান্ধিজী শুধু উপদেশই দেননি, নিজেও প্রতিজ্ঞা করলেন—দিনে অন্ততঃ আধঘণ্টা করে তিনি চরকা কাটবেন। স্বত্ব্যর দিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করে গেছেন।

অন্ধকার রাত। জোড়হাট থেকে ডিক্রগড় যাবার লাইন, বিকি বিকি করে এগিয়ে চলেছে ছোট গাড়ী—গান্ধিজীর স্পেশাল।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঝা খেয়ে থর থর করে ট্রেনখানি কেঁপে উঠলো, থমকে দাঁড়ালো। লাইনের উপর দু'খানি বগী দাঁড়িয়েছিল, স্পেশাল ট্রেনের সঙ্গে তার ঝাঝা লেগেছে। তেমন গুরুতর কিছু হয়নি, বগী দু'খানি সামনে রেখেই ইঞ্জিন আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হোল।

মাইল দুয়েক যাবার পরে, আবার ট্রেন থেমে গেল। গার্ড ছুটে এসে জ্বাই-ভারকে বললো—গান্ধিজীর কামরাখানি ছিল সবার শেষে, কোন এক সময় পথের মাঝেই সেখানি ছেড়ে গেছে।

যার জন্ত স্পেশাল তিনিই গাড়ীতে নেই !

তখনই ট্রেনখানি আবার পিছন দিকে ছুটলো।

মাইলখানেক যাবার পর গান্ধিজীর বগীখানি চোখে পড়লো। অন্তরকেন্দ্রা দৌড়ে গিয়ে উঠলেন তাঁর কামরায়। গান্ধিজী সবাইকার উদ্বেগ দেখে খিল খিল করে হেসে উঠলেন, বললেন—তোমরা যে আবার কিরে আসবে তা ভাবিনি। আমি ভাবছিলাম হয়তো পিছন থেকে আর এক খানি ট্রেন এসে ঝাঝা মেয়ে আমার কামরাখানি কেলে দেবে।

অথচ সেজন্য যে গান্ধিজীর মনে কোন দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তাঁর মুখ দেখে জ্ঞান মনে হোল না, তিনি পরম নিশ্চিন্তমনে ভগবানের চরণে সব কিছু সমর্পণ করে, একান্ত নির্বিকল্পের মত কামরার একপাশে শুয়েছিলেন।

আমাদের গান্ধিজী

ভিলক স্বরাজ্য ঘাণের টাকা ভোলায় ভার ছিল, গান্ধিজীর উপর। কথা ছিল অন্ততঃ এক কোটি টাকা তুলে দিতে হবে। গান্ধিজী সেজন্য প্রত্যেক সভাতেই হাত পাততেন—টাকা দাও !

গান্ধিজী তখন দক্ষিণ ভারতের এক ছোট শহর গেলেন। ডাক্তার বরদারাজুলু এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে সাত আট বছরের একটি ছোট মেয়ে। মেয়েটির হাতে ছিল কয়েকগাছি সোণার চুড়ী। কথায় কথায় রহস্য করে গান্ধিজী ডাক্তারকে বললেন—যে দেশের লোকেরা খেতে পায় না, সেই দেশের মেয়ের হাতে অতোগুলি সোণার চুড়ী কেন ?

মেয়েটি ইংরাজী জানে না, ডাক্তার তাকে গান্ধিজীর কথা বুঝিয়ে দিলেন। মেয়েটি চুপ করে এতক্ষণ গান্ধিজীর মুখের পানে তাকিয়েছিল, এবার হাসিমুখে হাতের চুড়ী ক'গাছি খুলে মহাস্বামীজীর হাতে তুলে দিল। মহাস্বামীজী হেসে সেগুলি ফেরৎ দিলেন। মেয়েটি কিন্তু তা আর ফেরৎ নিলে না, বললো—বাপুজী, ও-গুলো আপনার কাছেই রাখুন।

আট বছরের ছোট্ট একটি মেয়ের মনে গান্ধিজীর মুখের সামান্য একটি কথা এমন গভীর ভাবের স্বাক্ষর তুলেছিল যে, সোণার কয়েক গাছি চুড়ী মাটির ঢেলার যত বিলিয়ে দিতে তার এতটুকু দ্বিধা হয়নি।

ট্রেন কোন ষ্টেশনে এসে থামলেই গান্ধিজী জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিতেন, বলতেন—টাকা দাও ! ভিক্ষা চাই !

বার পকেটে যা থাকতো মহাস্বামীজীর হাতে তুলে দিত, এক হাত ভরে গেলে গান্ধিজী আরেক হাত বাড়িয়ে দিতেন।

অনেক সভায় উন্মোক্তারা নিজেরাই টাকার তোড়া তাঁকে উপহার দিত। কলিকাতায় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক সভায় দশ হাজার টাকার একটি তোড়া তাঁকে দেয়।

সভার মানপত্রগুলিও তিনি সভার মাঝেই নীলাম করে বিক্রী করে দিতেন।

কোন ছেলে তাঁর স্বাক্ষর পাবার জন্য অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে ধরলেই গান্ধিজী হাত পাততেন—আগে পাঁচটি টাকা চাই !

এইভাবেই কয়েক মাসের মধ্যে গান্ধিজী এক কোটি পনেরো লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।

বরিশালে একদল পতিতা এলো গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করতে, গান্ধিজী তাদের

আমাদের গান্ধিজী

জিজ্ঞাসা করলেন—বরিশাল একটি ছোট নগর, এখানে আর কতজন পতিতা আছে ?
আট দশ জন হবে ?

—আজ্ঞে না, সাড়ে তিনশো ঘর পতিতা থাকে এই শহরে ।

—সাড়ে তিনশো ঘর !—মহাস্বামী চমকে উঠলেন, বললেন—ছি ছি, বরিশালকে ধিক !

হু' ঘণ্টা তিনি পতিতাদের সঙ্গে কথা বললেন, পরে এদের সম্বন্ধে তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখলেন—বরিশালের অল্পপাতে হিসাব করলে সারা ভারতে পতিতার সংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে দশ লাখ । দেশের অল্প এরা যদি সন্ন্যাসিনী হয়, এবং চরকা কাটতে ও তাঁত বুনতে শুরু করে, তাহলে মাথা পিছু একটাকা হিসাবে ভারতে দৈনিক সাড়ে দশ লাখ টাকা আয় হতে পারে । কিন্তু কে এদের উদ্ধারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ?

অনেক সভায় স্বৈচ্ছাসেবকেরা জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো না । “ উন্নতি জনতা অনেক সময় তাঁর পায়েই ধূলা নেবার জন্য এমন তৎপর হয়ে উঠতো যে গান্ধিজীর বক্তৃতা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, হু' এক স্থানে তাঁর পা অবধি রক্তাক্ত হয়ে যায় তিনি অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করেন । আবার অনেক সভা শেষ করে জনতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য গান্ধিজীকে রীতিমত দৌড়াতে হয় ।

এবারকার ভারত পরিক্রমায় গান্ধিজী সব চেয়ে খুশি হন চট্টগ্রামে এসে । চট্টগ্রামে তখন ব্যাপক ধর্মঘট চলছিল । আসামের চা বাগানের কুলিরা ধর্মঘট করে, চাঁদপুরে তাদের উপর সৈন্ত দিয়ে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়, তার প্রতিবাদে ওখানকার সমস্ত রেল ও ষ্টীমার কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে । গান্ধিজী একটা মীমাংসা করার চেষ্টা করেন । এখানকার কর্মীদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠা তাঁর চোখে পড়ে সারা ভারতে আর কোথাও তেমনটি দেখেননি ।

অহিংসা নীতি ভারতে সর্বজন গ্রাহ্য করে তোলার জন্য গান্ধিজীকে কম কষ্ট পেতে হয়নি । সারা ভারতের নেতারা একটার পর একটা সভা করেছেন । রাজি এগারোটা-বারোটা অবধি একাদিক্রমে আলোচনা চলে, দুর্বল দেহ নিয়ে মাঝে মাঝে গান্ধিজী শ্রান্ত হয়ে পড়েন, রাতে শোবার সময় সেক্রেটারীকে বলেন—বুকে ভেল মালিশ করে দাও ।

ভেল মালিশ করলে অনেকটা সুস্থ বোধ করেন, শ্রান্ত কষ্টে বলেন—একদম থক গিয়া, কেতনা বরদাস্ত কর ।

আমাদের গান্ধিজী

কিন্তু সংগ্রামের শেষ না হলে তো সেনাপতির বিশ্রাম নেই।

কখন-বা তজ্জ্বাচ্ছন্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করতেন—শ্রীয়ায ! শ্রীয়ায !!

গীতাখানি মাথার কাছে থাকে, আর তারই সঙ্গে থাকে এক ঝোলার মধ্যে একটি কুস্তাকের মালা। সকাল বেলা বিছানা তোলার সময় দেখা যায় কুস্তাকের মালাটি বালিশের পাশে পড়ে আছে, কিন্তু কেউ কখনও তাঁকে ত্রুণ করতে দেখেননি।

অহিংসার নীতি পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব। অহিংসা প্রয়োগ করে কোন জাতি যে স্বাধীনতা চাইতে পারে তা অতীব বিশ্বয়কর। এই সম্পর্কে গুজরাট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক গান্ধিজীকে জিজ্ঞাসা করেন—বাপুজী, আপনি অহিংসা প্রতিরোধের পন্থা কি করে আবিষ্কার করলেন? জগতের ইতিহাসে কোথাও তো অহিংস-সংগ্রামের কথা নেই।

গান্ধিজী বললেন—দক্ষিণ আফ্রিকায় মীর আলম যখন আমাকে প্রহার করে তখনই এই কথা আমার মনে প্রথম উদয় হয়।

—আশ্চর্য! কেউ যারলে আমারও তাকে প্রহার করতে ইচ্ছা করে। কেউ অনিষ্ট করলে আমি কি করে তার ইষ্ট চিন্তা করবো, তখন তো প্রতিশোধ নিয়েই আমার আনন্দ।

গান্ধিজী বললেন—তোমার সে রকম মনে হয়, তার কারণ তোমার বড় অভিমান। আমার সে অভিমান নেই, তাই আমার চিন্তাধারা ভিন্ন।

এতবু তখনকার দিনে এদেশবাসী সাহেবেরা গান্ধিজীকে কি চোখে দেখতো তার পরিচয় পাওয়া যায় ট্রেনের ছুটি কাহিনী থেকে :

গান্ধিজী লাহোর যাচ্ছেন।

রাত নটার সময় দিল্লীতে এসে ট্রেন থেমেছে। পাশের কামরায় ছিলেন গান্ধিজীর সেক্রেটারী কৃষ্ণদাস এবং অন্তরঙ্গ কয়েকজন। হঠাৎ কোথা থেকে এক ইংরাজ রাজপুরুষ সঙ্গে এক গুপ্তা সৈনিক নিয়ে এসে চড়া গলায় হুকুম দিল—তোমরা সব এ কামরা থেকে নেবে যাও!

কৃষ্ণদাস আপত্তি তুললেন।

সাহেব তো রেগে লাল, বললো—নাব্বে না, আচ্ছা নাবো কি না দেখাচ্ছি।

কিন্তু গান্ধিজীর সেক্রেটারী লালমুখ দেখে ভয় পাবার মাহুষ নন। সাহেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি চললো। সাহেব কথায় না পেরে উঠে রেলের এক সাহেব অফিসারকে ডেকে আনলো। এবার হয়তো রেলের পুলিশ ডাকবে।

আমাদের গান্ধিজী

এমস সময় দেবীদাস গান্ধী এসে পড়লেন। কামরার মধ্যে উঠে তিনি বললেন—
আমরা গান্ধিজীর চাকর।

সাহেব দু'জন চমকে উঠলো। রেলের অফিসারটি জিজ্ঞাসা করলো—মিটার গান্ধী
কি এই ট্রেনেই ভ্রমণ করছেন?

দেবীদাস মাথা নাড়লেন।

সাহেবের কথার স্বর বদলে গেল, বললো—তাহলে সব ঠিক আছে, আর কোন
গোল নেই, আপনারা বসুন।

সাহেব দু'জন আর দাঁড়ালেন না, তখনই সরে পড়লেন।

মনে মনে গান্ধিজীকে সাহেবরা কতটা ভয় করতো এই ঘটনাটি থেকেই তা বোঝা
যায়।

আরেক দিনের কথা—

লামডিং থেকে চট্টগ্রাম—অহিংসা ও অসহযোগের বাণী প্রচার করতে করতে
গান্ধিজী ভারত পরিক্রমা শুরু করেছেন।

গান্ধিজীর বগীখানি একটি মালগাড়ীর পিছনে জোড়া। যে ট্রেনে যাবার কথা
ছিল সে গাড়ী আগেই চলে গেছে, তাই এই ব্যবস্থা। আগের গাড়ীতে বারা তাঁকে
দেখতে পায়নি, পরের গাড়ীর জন্য তারা অপেক্ষা করছে। চারিপাশের জঙ্গল আর
ভূভেদ্য পাহাড়ের মাঝে প্লাটফর্মের উপর এতো জনতার ভীড় দেখলে বিষয় জাগে।
মহাত্মাজীকে একবার দর্শন করতে পেলেই তারা খুসি, সানন্দে তারা জয়ধ্বনি তোলে
—মহাত্মা গান্ধিজী জয়!

লাট সাহেবের স্পেস্কাইল দাঁড়িয়েছিল এক ষ্টেশনে—আসামের লাট স্যার হুগ্গিন্স যচ্ছেন
লামডিং। চকচকে বকবকে ট্রেনখানি, চারিপাশে বন্ধুধারী সিপাহী। কিন্তু মাল্লুষ
সে দিকে ফিরেও তাকায় না, সবাই তাকিয়ে আছে মালগাড়ীর পিছনে কদম্ব তৃতীয়
শ্রেণীর কামরাখানির পানে।

লাট সাহেবের আর কত সহ হয়, অল্প সময় হলে হয়তো সিপাহীকে হুকুম দিয়েই
বসতেন—গুলি চালিয়ে ভীড় হঠাৎ! গান্ধিজীর সামনে তো তা করা সম্ভব
নয়, তিনি নিজের গাড়ীখানিই ষ্টেশন থেকে খানিক দূরে রাখার আদেশ দিলেন।
গান্ধিজীর জয়ধ্বনি তার বুক এসে বাজছে প্রতি মুহূর্তে। জনগণের সঙ্গে বাদের
মনের যোগ নেই, জনগণকে তাঁরা সইতে পারবেন কেন!

লাট সাহেবের ট্রেন দূরে সরে গেল, গান্ধিজী তখন কামরার সামনে দাঁড়িয়ে
জনতাকে হাসি মুখে নমস্কার করছেন।

আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজী নির্দেশ দিলেন—যুবরাজ ভারতে আসছেন, সেদিন তাঁকে বয়কট করতে হবে। যেদিন যে শহরে তিনি যাবেন সেদিন সে শহরে হরতাল করা হবে।

কিন্তু বোম্বাইয়ের ধনী পাশাঁরা ও সরকারী কর্মচারীরা এই নির্দেশ মানলো না। যুবরাজকে তারা সম্বর্ধনা জানালো। জনসাধারণ ক্ষেপে গেল, উৎপীড়ন শুরু করলো—টুপি কেড়ে নিল, ট্রায় পুড়িয়ে দিল, মোটার ভেঙ্গে দিল।

শেষে রীতিমত দাঙ্গা বেধে গেল।

বেলা একটা নাগাদ গান্ধিজী নিজে বেরলেন—দ্রোড়াপুকুরে তখন প্রচণ্ড হাঙ্গামা চলছিল, গান্ধিজী সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন, জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দু'জন পুলিশ পথের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, গান্ধিজী তাদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

বেলা পাঁচটার সময় আবার গান্ধিজীকে বেরতে হোল। ভিণ্ডি বাজারে প্রায় হুড়ি হাজার লোক জড়ো হয়েছে। কাকর গায়ে সাহেবী পোষাক দেখলেই তারা তাকে প্রহার করছে। গান্ধিজী সেখানে উপস্থিত হতেই ভীড় সরে গেল, চারিপাশের অবস্থা দেখে গান্ধিজী বিচলিত হয়ে পড়লেন।

পরদিন হাংগামা চরমে গিয়ে উঠলো। কংগ্রেসকর্মী ও নেতারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো হাংগামা থামাবার জন্য। যেখানে ভীড় সেখানেই দেখা গেল গান্ধী-টুপি। কর্মীরা শান্তির জন্য জীবন বিপন্ন করতেও কিন্তু বোধ করলেন না। কতজন জনতার মার খেয়ে ক্ষত বিক্ষত হোল, দু'জন কর্মী প্রাণ বিসর্জন দিল। কিন্তু তথাপি শহর শান্ত হোল না।

গান্ধিজী সারারাত ঘুমতে পারলেন না। চিন্তার ঝড় বহে যাচ্ছে। হিংসার বীভৎসতা অহিংস চিন্তকে আলোড়িত করছে। চারিপাশের দুর্বোধ্য অন্ধকারের মাঝে তিনি শান্তির আলো খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন। অন্ধকারের মাঝে চোখ মেলে তিনি তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ কি যেন মনে হোল, রাত তিনটের সময় বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি লিখতে শুরু করলেন—গত দু'দিন স্বরাজের যে নমুনা আমি দেখলাম, তার পুতিগন্ধ আমি আর সহিতে পারছি না...ঐক্য স্থাপনের উপরেই ভারতের স্বাধীন জীবন নির্ভর করছে।...হিন্দু মুসলমান যদি পরস্পরকে শত্রুরূপে দেখে তাহলে তারা পরস্পরের অস্তিত্ব অস্বীকার করছে বলে বুঝতে হবে।...এই দু'দিনের বিরীট হত্যাকাণ্ডে মুসলমানরাই অগ্রণী ছিল, এতে আমার প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে।...বতদিন না আবার সদ্ভাব স্থাপিত হয় ততদিন আমি খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করলাম; যাত্রা জলগ্রহণ করে জীবন ধারণ করবো।

আমাদের গান্ধিজী

সকাল হতে না হতেই গান্ধিজীর অনশনের খবর বোম্বাইয়ে ছড়িয়ে পড়লো। গান্ধিজীর জীবন রক্ষার জন্য কর্মী ও নেতারা অবিশ্রান্তভাবে ঘুরতে লাগলেন শহরের সর্বত্র। মহাত্মাজীর কাছে খবর আসতে লাগলো—পরমুখী শান্ত...মোবিতলাও শান্ত...মদনপুরা শান্ত...ভিণ্ডিবাজার শান্ত...

শংকরলাল ব্যাংকার হাত জোড় করে কাদতে কাদতে অশ্রু নয় করলেন—বাপুজী, দোহাই তোমার, আমরা প্রাণপণে দাঁড়া থামাবার চেষ্টা করছি, তুমি আহার গ্রহণ কর!

দলে দলে যুবক এসে বাড়ীর সামনে ভীড় করলো, সাড়া তুললো—মহাত্মাজী, উপবাস ভঙ্গ করুন!

উপবাসের তৃতীয় দিনে শহরে শান্তি ফিরে এলো।

আরো ছদিন দেখে, পঞ্চম দিনে চৌপাটীর এক সর্বদলীয় সভার মাঝে সকাল সাড়ে আটটার সময় গান্ধিজী আহার গ্রহণ করলেন—কয়েকটি আঙুর আর একটিমাত্র কমলা লেবু।

কংগ্রেসের বৈঠক বসলো।

আমোদাবাদের কংগ্রেসীরা গান্ধিজীকে সার্বভৌম ক্ষমতা দিল—অসহযোগ আন্দোলন চালাবার পূর্ণ নেতৃত্ব।

সভা শেষে গান্ধিজী প্রত্যেকটি কর্মীর শিবিরে শিবিরে গিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—কি ভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কি হবে আন্দোলনের ধারা...

তারপর গান্ধিজী বড়লাটকে জানালেন—সাতদিনের মধ্যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মীর মুক্তি চাই, জরিমানার টাকা ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরৎ দিতে হবে। ইচ্ছাকৃত প্রকাশ করার স্বাধীনতা চাই, দমন-নীতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে, অগ্রথা সরকারী নীতির প্রতিবাদে বোম্বাই প্রদেশের বরদৌলি তালুকে তিনি আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু করবেন। (১৪০খানি গ্রাম ও ৮৭০০০ বাসিন্দা নিয়ে এই জেলা)।

বড়লাট উত্তর দিলেন—শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা সকল দেশের গবর্নেন্টেরই অবশ্য কর্তব্য। আইন অমান্ত করার ফলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হবে তা দমন করতে ব্রিটিশ গবর্নেন্ট বদ্ধ পরিকর।

গান্ধিজী লিখলেন—আমরা চাই স্বরাজ। আমরা চাই সরকার জনসাধারণের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করুক, আমরা আর অশান্তি চাই না।

লর্ড বার্কেনহেড বিলাত থেকে চোখ রাঙালেন—যদি আমাদের সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর

গান্ধীজীর গান্ধীজী

এক বুড়ি কল আর একটি চরকা ছিল গান্ধীজীর সঙ্গে।

জেল হুশারিনটেণ্টে বললো—চরকা আর মনের বুড়ি কাছে রাখা চলবে না।

গান্ধীজী বললেন—হতো কাটা আহার একটি ব্রত। সম্বরমতী জেলে আমাকে হতো কাটতে দেওয়া হয়েছে।

হুশার বললো—যেরোড়া সম্বরমতী নয়।

ওয়ার্ডাররা চরকা নিয়ে গেল, মহাত্মাজীও আহার ত্যাগ করলেন।

গান্ধীজী বললেন—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি প্রতিদিন অন্ততঃ আশুপট্টা করে হতো কাটবো, হতো কাটা বন্ধ করতে হলে খাওয়াও বন্ধ করতে হবে, কাজেই আমাকে আহার ছাড়তে হয়েছে।

একদিন গান্ধীজী উপবাসেই রইলেন। হুশার দেখলেন ব্যাপার সহজ নয়। তখনই চরকা ফেরৎ দেবার আদেশ দিলেন।

জেলে একটা পরিদর্শক কমিটি থাকে, সপ্তাহে একদিন তারা কয়েদীদের হাল-চাল দেখতে আসে। যেরোড়া জেলের কমিটি একদিন গান্ধীজীকে দেখতে এলেন। তাদের মধ্যে একজন পাদরী ছিলেন, গান্ধীজী তাঁকে বললেন—আমার সহকর্মী শঙ্করলাল ব্যাংকারকেও আমারই সঙ্গে গ্রেপ্তার করে এই জেলেই এনে রাখা হয়েছে। বেচারী অসুস্থ, প্রায়বিক দুর্বলতায় ভুগছে। তাকে আমার কাছে থাকতে দিলে ভালো হয়, বেচারাকে আমি দেখাশুনা করতে পারি।

পাদরী অবজ্ঞাসহচক মুখস্তকী করলো, গান্ধীজীর কথার জবাব দেওয়া নরকার বলে মনে করলো না।

একজন পরিদর্শক আবার টিপ্পনি কাটলো—যত সব আহম্মুখির কথা!

মহাত্মাজী মনে বড় আখাত পেলেন। মনে পড়লো শঙ্করলালের বাক্য। ক'মাস আগে তিনি যারা গেছেন। মৃত্যুকালে গান্ধীজীর হাতে ছেলেটিকে সঁপে দিয়ে তিনি বলেছিলেন—আপনার যত বাহুবীর হাতে ছেলেটিকে রেখে যাক্ছি, বিদায় বলার এইটাই আমার সব চেয়ে বড় সাহস।

কিন্তু আজ! দুর্বল, ক্লান্ত শঙ্করলালের মত তিনি এতটুকু বাহুবীর্য ব্যবহা করতে পারলেন না। বাহুবীর্য কত অক্ষয়! তার সামর্থ্য কত সীমাবদ্ধ! রৌদ্রদগ্ধ মাকারের পানে তাকিয়ে গান্ধীজী শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

জেলের জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই:

ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠেন।

আমাদের দেশে হ'ল আরও ভাল করে আনুষ্ঠানিক।

একজনী আলো লাইট হয়ে উঠলে বন্ধ করেন পড়ানো। পড়ো হ'ল কী করে
পড়ানো। পরে অবশ্য খাবার অল্প খানিকটা লবন দায়।

তারপর চার কটা চলে ফুলো খোনা, পাঁচ তৈরী করা আর হুতো কাটা।

তারপর কোন এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিগাশ কালো করে দেয়। তিপায়
বহরের বৃষ্টি চশমা খুলে হাত গুটিয়ে বসেন। কেউ তাঁর কক্ষে একটা আলো
দেয় না। নিঃশব্দ রাষ্ট্রনায়ক অন্ধকার কারাগারে বসে কত কি ভাবেন। জানা চেনা
কত মুখ ভেসে উঠে চারিগাশের কালো ঘনিকার ওপর। চল্লিশ কোটি নর-
নারীর দুঃখ ভীড় করে আসে তাঁর মনে। সীমাহীন অন্ধকারের মাঝে বসে
মহাভারতের মহাযুগের আলোর দিশা খোঁজেন হ্রস্বতঃ।

ঢং ঢং করে রাত্রি আটটার ঘণ্টা পড়ে, মহাস্বাক্ষরী সমাধি টুটে যায়। ধীরে ধীরে
তিনি রাত্রির প্রার্থনা আবৃত্তি করে শুয়ে পড়েন।

মহাস্বাক্ষরী যতই আত্মস্থ ও নির্বিরোধী হোন না, জেলের ব্যবহার মাঝে মাঝে
তাঁকে উত্তাক্ত করে তোলে।

একবারকার ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন :

‘সকল কয়েদীর মত আমারও কাপড় চোপড় বাড়িয়া কোন দ্রব্য দেহে লুকানো
আছে কিনা দেখিয়া লওয়া হইত। প্রতি সন্ধ্যায় এই প্রকার নিয়ম মত ‘বাড়তি’
লওয়া হইত। আমি কখনও আপত্তি করি নাই। তখন আমার দেহে ‘কচ্ছ’ (ছোট
বস্ত্র) ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবু জেলার আমার কোমর ও কোমরের
নীচের ভাগ স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিতেন। একবার তো তিনি আমার কবল ও
অঙ্গুলি জিনিষ উঠিয়ে উপর নীচে করিয়া দেখিলেন। জুতা পায়ে দিয়া আমার
জলের বাসন স্পর্শ করিলেন। আমার অসহবোধ হইল। তাঁহার সম্পর্কে রিপোর্ট
করিব কি না সে বিষয়ে ভাবিতে লাগিলাম। রিপোর্ট করিলে তিনি খুব বহুনি
খাইতেন। কিন্তু আমি রিপোর্ট না করাই স্থির করিলাম।’

আরেকবার গাছিকীর একখানি ছুরির দরকার—কটি কাটতে হবে, নেবু কাটতে
হবে। তিনি সুপারিটেণ্ডেন্টকে জানালেন—একখানি ছুরি দিন, নাহলে কটি খাওয়া
ও নেবু খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

কিন্তু জেলের আইনে ছুরি এক যারাজক অল্প এক-কয়েদীর কাছে ছুরি রাখা
বিশদজনক।

বিশ্ব হয়ে উঠে, যদি আমরা ভারত ছেড়ে চলে আসতাম এই ভারত স্বাধীনতা হতে নানারূপ দাবী করা হতে পারে, তবে ভারতবর্ষ ইংরেজের সঙ্গে লোকে উঠবে না, কারণ ইংরেজের স্বাধীনতার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছে। তারা আমার একবার ভারতের জবাব দেবার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি ও সংস্কৃতি নিরোপ করবে।

গান্ধিজীও তার শপথ জবাব দিলেন—বুটিং সিংহ যদি আমাদের উপর তার হস্তাক্ষর রাখতে থাকে, তবে তার সঙ্গে আমাদের আপোষ বীৰ্য্যশো কি করে সম্ভব? বুটিং সাম্রাজ্য শোষণ ও গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিধাতা বলে যদি কেউ থাকেন তবে তা কখনও টিকে থাকতে পারে না।...১৯২০ খৃষ্টাব্দে যে বুক আরম্ভ হয়েছে সে বুক শেষ পর্যন্ত চলবে। আমি কেবল তগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকবার মত প্রচুর দীনতা ও পরীক্ষা শক্তি যেন ভারতের থাকে।

কর্মীদের কাছে গান্ধিজী সোনাগেন মহন্তর সংগ্রামের রণ-কৌশল—অহিংসা ও ছেবহীন অস্ত্রের শত্রুর আঘাতকে বুক পেতে নিতে হবে, কিন্তু প্রতিবাদ হানা চলবে না। দুর্বল চিন্তা লোকের জন্য এ সংগ্রাম নয়।

ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিল, সারা ভারতের আকাশ খম্ খম করতে লাগলো।

বৃহত্তর সংগ্রাম কিন্তু এলো না। যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় এক বীভৎস ঘটনা ঘটে গেল। চৌরীচৌরায় এক শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। পুলিশ শোভা-যাত্রীদের উপর গুলি চালায়। জনতা ছেপে ওঠে। পুলিশের গুলি বাকদ ফুরিয়ে যাবার পর তারা পুলিশের পিছনে তাড়া করে, খানা ঘেরাও করে আগুন লাগিয়ে দেয়। দারোগা ও একুশজন পুলিশ জীবন্ত দগ্ধ হোল। গান্ধিজী মুহূর্তেই হয়ে পড়লেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে লিখলেন—শয়তান বাধা দিল,...আমার মাথা হেঁট হোল...বর-দৌলিতে অবিলম্বে যে ব্যাপক আইন অমান্ত হবার কথা ছিল, আমি তা বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলাম।

চৌরীচৌরার জন্য গান্ধিজী নিজেকেই দায়ী করলেন, আত্মতন্ত্রির জন্য পাঁচদিন উপবাস করলেন। ভারতের জন-সমাজ বিক্ষিত হোল, দুঃস্থ হোল। লাল লালপৎ রায়, পণ্ডিত মতিলাল, হরদয়াল নাগ, ভাস্কর মুন্সে প্রভৃতি নেতারা নির্বয় সমালোচনা করলেন। গান্ধিজী উত্তরে বললেন—এ আমার অস্ত্রের উপলব্ধি, অন্তর্দ্বায়ীর নির্দেশ।

দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা বসলো। গান্ধিজী নিজের নীতির ব্যাখ্যা করে বললেন—যদি বলপ্রয়োগের দ্বারা আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে চাই, তবে আহুদ, আমরা অহিংসা ত্যাগ করে স্বাধীনতা হিংসাত্মক উপায় গ্রহণ করি, তাই

আবাবের গাঙ্গী

সুন্দর রত্ন, সন্তের রত্ন, এক প্রকৃতির রত্ন হবে, তখন কেউ আবাবের ভণ্ড
কলে অভিযোগ করতে পারবে না !

সাধারণ কিন্তু গাঙ্গীর চিত্তের গভীরতা বুঝলো না, গাঙ্গীর অনপ্রিয়তা কমে
গেল। গাঙ্গী কিরে গেলেন সবরমতী আশ্রমে।

বড়লটি দেখলেন গাঙ্গীকে গ্রেপ্তার করার এই সুযোগ।

১৯২২ সালের ১০ই মার্চ গবর্নেন্ট গাঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে। আটদিন পরে
আদালতে তাঁর ক্রিম হয। সরকার পক্ষের উকিল মহাস্বামীজীর বিরুদ্ধে যে সব
অভিযোগ করেন, তার মধ্যে ইং-ইণ্ডিয়া কাগজে তিনটি রাজদ্রোহ মূলক প্রবন্ধই
অন্ততম : Tampering with loyalty

The puzzle and its solution

Shaking the manes.

সরকার পক্ষ বা বললো গাঙ্গী সে সবই মনে নিলেন, বললেন—আমি একজন তাঁতি,
কাপড় বোনাই আমার পেশা...তবে যে অপরাধের জন্ত আমাকে ধরেছে, মুক্তি পেলে
সেই অপরাধই আমি আবার করবো। ততরাং আমাকে যেন সর্বোচ্চ দণ্ড দেওয়া হয়।

আমোদাবাদের সেন্স জজ, মিটার ক্রমফিল্ড বিচারক ছিলেন। মহাস্বামীজীকে
ছ'বছর জেল দিয়ে তিনি বললেন—আমার জীবনে আপনার রত্ন লোককে কখনও
বিচার করিনি ভবিষ্যতে আর কখনও করবো না। আপনার দেশের লোকের কাছে
আপনি একজন বরণ্য দেশপ্রেমিক, আপনার শত্রু পক্ষও আপনাকে উচ্চ আদর্শের
মহৎ সজ্জন বলে বিশ্বাস করে। তবু আমি আপনাকে সাধারণ মানুষ হিসাবেই
বিচার করতে বসেছি। আপনি নিজেই আপনার অপরাধ প্রমাণ করেছেন।
আপনাকে যদি তিলকের প্রতীকিত্ত করি, তাহলে আমার মনে হয় আপনি
তা অর্থোক্তিক বলে মনে করবেন না...যদি ভারতবর্ষে ঘটনার স্রোত কোনদিন
এমনভাবে বললে যায়, যার ফলে ছ'বছর পূর্ণ হবার আগেই আপনি মুক্তি পান,
তাহলে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী খুশি হবে না।

গাঙ্গী হেসে বললেন—লোকমান্ত তিলকের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত হওয়ায়
আমি স্রেষ্ঠ সন্মান ও অতুল গৌরবের অধিকারী হলাম। এই দণ্ডাধেশ আমি লম্বু
বলে মনে করি।

যেদিন শনিবার, দু'দিন মহাস্বামীজীকে সবরমতী কোলেই রাখা হোল। সোমবার
দিন সোমবারেই কোলে নিয়ে যাওয়া হোল কোলেই কোলে।

আমাদের গান্ধিজী

একবার দেখা করতে চাই। আমার বিশ্বাস, বুঝিয়ে বললে ওরা বুঝতে পারবে এবং ওদের চাবুক মারার আর দরকার হবে না। আমি কয়েকটা হিসাবে এই অহিংসতা চাইছি না, মানুষ হিসাবে মানুষকে সেবা করার জন্য এই অহিংসতা চাইছি। আপা করি কতৃপক্ষ এতে আপত্তি করবেন না।

কিন্তু কতৃপক্ষ আপত্তি জানালো।

তবু সহজে হাল ছেড়ে দেবার মানুষ মহাত্মাজী নন। কদিন ধরে শুধুই লেখালেখি চললো। শেষে গান্ধিজী জানালেন—অহিংসতা না পেলে আমি এখন কোন একটা কর্মপথ গ্রহণ করতে বাধ্য হব যার কলে কতৃপক্ষ নানা ঝগড়াতে পড়বেন। তবে তেমন কিছু না করাই আমার ইচ্ছা।

এমিকে কয়েকটাও অল্পজল গ্রহণের কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না।

কতৃপক্ষ এবার অহিংসতা দিলেন।

জেলের সুপার, মেজর জেজ ও ইনসপেক্টর জেনারেল মিটার গ্রিকিথ গান্ধিজীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাদের ওয়ার্ডে। দীর্ঘ তেরোদিন উপবাস করে মূলসিপেক্টর কয়েকটা তখন শীর্ণ ও স্তান হয়ে গেছে। মুখ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মন দুর্বল হয়নি। তাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন গান্ধিজীর সহকর্মী : দেব ও দত্তানে। তারা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে গান্ধিজীকে প্রণাম করলো। মহাত্মাজী দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাদের মাঝে বসে স্বাক্ষর করলেন তাদের বোঝাতে।

দেব ও দত্তানে বললো—সুপার আমাদের উপর অস্ত্রার করেছেন তিনি কখনো না চাওয়া পর্যন্ত আমরা অল্পজল গ্রহণ করবো না।

মেজর জেজ বললেন—বেশ, আপনারা যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে আমার অস্ত্রার হয়েছে তাহলে আমি অবশ্যই ক্ষমা চাইব।

মহাত্মাজী দু'পক্ষের মাঝে একটা বোঝাপড়া করে দিলেন, কয়েকটা অনশন ত্যাগ করলো। জেল কতৃপক্ষও এক নতুন আদেশ জারী করলেন যে জেল-কর্মচারীকে আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন দোষে কোন কয়েদীকে বেত মারা চলবে না।

মনটা নিশ্চিন্ত হলো, আবার ঝটিন যতো পড়াতো স্বাক্ষর করলেন মহাত্মাজী।

এই সময়কার কথা নিয়ে মহাত্মাজী লিখেছেন : চুয়াং বছরের ভর দেখ নিয়ে চম্পক বছরের জোয়ানের মত পড়তে বলে মেলায়... প্রতিটি মিনিটের হিসাব রাখতাম।

গান্ধিজী আর দু'বছর জেলে ছিলেন। এই সময়ে তিনি ৮৪ খামি ইংরাজি বই,

আমাদের গান্ধী

৩১ খানি গুজরাটি বই, ৬ খানি হিন্দি বই, ৫ খানি উর্দু বই এবং ২৬ খানি মারাঠি বই পড়েন। ধর্মের বই পড়তেই তিনি বেশী ভালবাসেন, হিন্দি ও গুজরাটী ভাষার রামায়ণ পড়লেন তিনখানি : বাম্বিকী রামায়ণ, তুলসীদাসী রামায়ণ ও গিরিশরকৃত রামায়ণ। গীতা পড়লেন তিনখানি : লোকমাত্তের গীতা-রহস্য, শঙ্করাচার্যের গীতা ও শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ২৪ খানি উপনিষদের মারাঠি ভাষা পড়লেন। তারপর পড়লেন ম্যাক্সমুলারের উপনিষদ ও শ্রীঅরবিন্দের উপনিষদ। তাছাড়া, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ, বক্রিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, বিবেকানন্দের রাজযোগ, বাইবেল প্রভৃতিও পড়লেন। গভীর ধর্মগুণ্ডকগুলির মাঝে মহাত্মাজী যখন অন্তরের উপলব্ধিকে স্বচ্ছ করে তুলছিলেন, তখন আবার ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী অনেক হাঙ্গা বইও তিনি পড়েছিলেন। লুসিয়ানের লেখা 'ট্রিপ-টু-দি মুন,' 'টম ব্রাউন্স ইন্থল ডেজ্,' 'ডাক্তার জেকিল এণ্ড মিষ্টার হাইড,' কিপলিংয়ের 'জঙ্গল বুক' জুলভার্নের 'ড্রপ ক্রম দি ক্লাইড্‌স্' একদিকে পড়েছেন, আরেকদিকে পড়েছেন এইচ-জি-ওয়েলসের 'আউটলাইন্স অফ হিষ্ট্রি,' রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য,' মুক্তাধারা, নৌকা ডুবি, আবার মিশরকুমারীর গুজরাটী অন্নবাদ।

ইতিহাস, প্রবন্ধ ও জীবনী সম্পর্কে ভালো বই যা তিনি হাতের কাছে পেয়েছেন, তাই পড়েছেন।

হিন্দি মাসিকপত্র 'সরস্বতী' তাঁর কাছে নিয়মিত ভাবে পৌঁছাতো, বোধের 'টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া', কলকাতার 'মডার্ন রিভিউ', গুজরাটী 'বসন্ত' ও 'সমালোচক' প্রভৃতি পত্রিকা পাবার জন্য তিনি আবেদন করেন। কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। মহাত্মাজী বলেন—কয়েদীদের কতকগুলি অধিকার আছে—হাঙ্গা, জল, খাদ্য ও বস্ত্রের অধিকার। মনের খোরাক পাবার অধিকারও আমাদের আছে। সেই দিক থেকে এই পত্রিকাগুলি পাওয়াটা আমি উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া বলে মনে করি।

জেলের কর্তারা উত্তর দিলেন—আমরা কিছুই করতে পারি না, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

গান্ধীজী এ সম্পর্কে আর বেশী ঔৎসুক্য দেখাননি।

মহাত্মাজী শুধুই পড়তেন না, অবসর যত কিছু কিছু লিখতেনও, কয়েক মাসের মধ্যে ছেলেদের জন্য গুজরাটী ভাষায় তিনি একখানি সাঠাপুস্তক শেষ করলেন, সেখান থেকে ছাপবার জন্য বইখানি তিনি পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু বইখানি শেষ অবধি জেল ফটক পার হতে পারলো না। ইনসপেক্টার জেনারেল কর্ণেল ডাবলিউয়েন বইখানি গান্ধীজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জানালেন,—

মহাত্মার গাছিকী

হুগার অনেক ভেবে চিন্তে শেষে একখানি পেনসিল-কাটা ছুরি দিলেন। তবে কথা রইল যে ছুরিখানি গাছিকীর কাছে থাকবে না, থাকবে ওয়ার্ডারের কাছে, দরকার নত ছুরিখানি চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন এক প্রতিদিন। সন্ধ্যাবেলা ওয়ার্ডার ছুরিখানি জেলারের কাছে জমা দেবেন, আবার সকালবেলা চেয়ে আনবেন আপিস থেকে।

এখানকার জেলের সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছিল মূলসিপেটার কয়েদীদেরকে নিয়ে।

তখন কেক্সারী যাম। শ্রুতির আমেজ প্রভাতী দীপ্তিকে কুয়াসাম্বর করে রেখেছে। গাছিকী উপাসনা শেষ করে সবেমাত্র তাঁর পুঁথি-পত্র পেতে বসেছেন এমন সময় একটা আর্ড চীৎকার কানে এসে বিধ্বলো; গাছিকী ঢকল হয়ে উঠলেন, কান পেতে শুনলেন—চাবুক মারা হচ্ছে! চাবুক মারছে!!

মহাত্মাজী ডাকিয়ে রইলেন বাইরের পানে। তাঁর আঁধার কুঠরীর সামনে দিয়েই কয়েদীদের যাতায়াতের পথ। কিছুক্ষণ পরেই সেই পথ দিয়ে ওয়ার্ডাররা ফিরলো, সঙ্গে চার পাঁচজন কয়েদী। বয়স কম, পরণে চটের পোষাক। শিঠ খোলা। সামনের দিকে হুকুঁ পড়ে ধীরে ধীরে তারা চলেছে, প্রতিটি পদক্ষেপ বাধা-কাতর।

মহাত্মাজীকে তারা নমস্কার করলো।

গাছিকী প্রতি-নমস্কার জানালেন।

তাদের পিছনে দেখা দিল আরেকজন, তার পায়ে আবার বেড়ী লাগানো, পা টেনে টেনে সে চলছে। সে-ও মহাত্মাজীকে নমস্কার করলো।

মহাত্মাজী আর থাকতে পারলেন না, কয়েদীর সঙ্গে কথা বলা জেলের নিয়ম নয়, তবু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে?

—আমি মূলসিপেটার লোক।

—যাদের চাবুক মারা হোল তাদের আপনি জানেন?

—সকলকেই জানি। তারা সবাই মূলসিপেটার লোক।

পদে পদে কয়েদী ক'জন দেয়ালের আড়ালে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। গাছিকী কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করতে পারলেন না।

জেলের ভিতরকার কোন খবরই চাপা থাকে না। ওয়ার্ডার আসতেই তার যে গাছিকী সব কথা শুনলেন: মূলসিপেটার সব কজনই স্বদেশী করে জেলে গেছে। প্রত্যেকেই বেপরোয়া, কর্তাদের আদেশমত সব সময় মাথা নত করতে রাই না, কথার কথার কর্তাদের সঙ্গে তাদের দ্রোণাত্মক বাধে। কর্তারা সব সময়েই

আব্বাসের গাঙ্গি

তাদের উপর বিরূপ। এবার তারা রীতিমত কাজ করতে চায় না। এই অজুহাতে জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট মেজর জোল তাঁদের বেত মারার হুকুম দিয়েছেন।

বিকাল বেলা খবর এলো এই আদেশের প্রতিবাদে আব্বাসকুহুরীর সমস্ত কয়েদীরা হরতাল করেছে।

তখনই গাঙ্গিজী মেজর জোলের কাছে লিখলেন : ওদের সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করার অজুহতি দিন, ওদের বুঝিয়ে ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করবো।

সুপার জানালেন : আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু কয়েদীদের মধ্যে পরস্পরে দেখা করতে দেওয়া জেল-আইনের বিরোধী।

মহাত্মাজী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর ওয়ার্ডারের মুখে জয়রামদাসের কাছে খবর পাঠালেন—মুন্সিপেটার কয়েদীদের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, যে সত্যিকারের সত্যগ্রহীরা জেলে এসে দৈনিক কাজ করতে অস্বীকার করতে পারেন না।

মহাত্মাজীর অনুরোধ জয়রামদাসের কাছে আদেশ। তিনি মুন্সিপেটার কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করে গাঙ্গিজীর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু জেলের আইন ভাঙার জন্য জয়রামদাসকে সাজা দেওয়া হোল।

মহাত্মাজী সুপারকে লিখলেন—আমিই জয়রামদাসকে জানিয়েছিলাম, শাস্তি আমায়িই প্রাপ্য।

সুপার উত্তর দিলেন—আপনি আইন অমান্য করেননি। সে জন্য আপনাকে সাজা দিতে পারি না। যিনি বে-আইনী কাজ করেছেন তাকেই শাস্তি দিয়েছি।

কিন্তু এর পরেই মহাত্মাজীকে জেলের এক প্রান্তে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে বদলী করা হোল। এখানকার ঘরগুলি বেশ বড় বড়। বেশী আলো হাওয়ারও ব্যবস্থা আছে। ঘরের সামনে এক টুকরো বাগানও আছে। তবে এখানে আর কোন কয়েদীর মুখ দেখার উপায় নেই। ওয়ার্ডার আর ফালতু (চাকর) ছাড়া একেবারেই নিঃসঙ্গ।

তবে জেলে কোন খবরই চাপা থাকে না। ওয়ার্ডার এসে একদিন বললো—আজ আবার মুন্সিপেটার একজন কয়েদীকে বেত মারা হয়েছে।

কদিন পরে আবার ছ'জনকে বেত মারা হোল। এবার মুন্সিপেটার সব কয়েদী একযোগে উপবাস শুরু করলো।

গাঙ্গিজী আবার সুপারকে লিখলেন—আমায় বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি ওদের সঙ্গে

গান্ধীজীর কাহিনী

কয়েদীরা যখন জেল ঘাটে সেই সময় জামের কোন বই প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না।

যেরোডা জেলে গান্ধীজী ছিলেন ১৯১৭ নং কয়েদী। একজন কয়েদী ওয়ার্ডার, আর একজন কালতু (চাকর) সারাদিন তাঁর কাছে থাকতো। গান্ধীজীর ওপর নজর রাখা আর সেবা করা এই দুই ছিল তাদের কাজ।

দু'তিন মাস পর ওয়ার্ডার ও কালতু বদল হোত। যে যেমন লোকই আহুক, মহাশয়জী তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। মহাশয়জী কাজকে চলনসই লেখাপড়া শেখান, কেউ শেখে ভালো করে শ্রুতো কাটতে, আবার কেউ বা প্রার্থনার সময় গান্ধীজীর সামনে বসে রাম নাম শুনতো।

সন্ধ্যাবেলা এদের সঙ্গে বসে বসে গান্ধীজী গল্প করতেন। কয়েদী জীবনের নানা সুখদুঃখের কাহিনী ওরা বলে যেত। এক এক জন দশবারো বছর করে জেল খাটছে, জেলের ভিতরকার অনেক তথ্যই তাদের নথ্যদর্পণে। এই সম্পর্কে গান্ধীজী লিখেছেন : যদি জেলের সমস্ত মাটি ছুঁছুঁ খুঁড়ে ফেলা হয়। তাহলে, বহুসংখ্য কয়েদীদের অনেক গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করে দেবেন—অনেক চামচ, ছুরি, বাসন, সাবান, সিগারেট বেরিয়ে পড়বে...

গান্ধীজীর মত মানুষ সরল ভাবে চাইলে 'মডার্ন রিভিউ'এর মত একখানি মাসিক পত্রিকা পাবেন না। কিন্তু ছুটি কয়েদী গোপনে সিগারেট অবধি সংগ্রহ করতে পারে।

গান্ধীজী ছিলেন বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী, প্রতি তিনমাসে একখানি করে চিঠি জেলের বাইরে পাঠাতে পারতেন আর একবার দেখা করতে পারতেন বাইরের দোকানের সঙ্গে।

কিন্তু জেলের কর্তারা সব সময় এই নীতি মানতেন না। অনেক সময় গান্ধীজীর চিঠি বাইরে পাঠাতে তারা অস্বীকার করতেন।

দেখা করার ব্যাপারেও কতৃপক্ষ খামখেয়ালীর পরিচয় দিতেন। একবার কল্লুরবাক জেলের দরজা থেকে কিরিয়ে দেওয়া হয়...পণ্ডিত মতিলাল ও হাকিম আজমল খাঁ দেখা করার অস্বস্তি পাননি।

তবে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী বলে আহাঙ্গারদির কিছু সুবিধা গান্ধীজী পেয়েছিলেন। হালের ছাগলের দুধ, কমলা লেবু, কিসমিস প্রভৃতি তাঁকে দেওয়া হোত।

কিন্তু অস্বস্তি যে সব সহকর্মীরা জেলে আছেন তাঁরা যখন আহাঙ্গারদির কোন সুবিধা পান না, শুধু গান্ধীজীকে এই সুবিধা দেওয়া হয়, কেনে শুনে মহাশয়জী তো,

গান্ধীজীর জীবনী

হুঁস্বরে কীক্তি বারম্বার পারেন না। তিনি আশঙ্কিত আনিয়ে কমলা সেতু ও কিসুদিত খাতরা ছেড়ে দিলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ওই সব খাবার প্রয়োজন ছিল। ভাগ্য কবীর বলে উত্তরোত্তর তাঁর শরীর কাহিল হয়ে পড়লো। হুঁস্বাসের মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অল্পের পাড়া, সামান্য কিছু আহার করলেই পেটে ব্যথা ধরে, কোন রকমেই এতটুকু স্থির হতে পারেন না; দেখে শুনে ডাক্তাররা বললেন—এপেনডিসাইটিস।

একদিন ব্যথা এতই অসহ্য হয়ে উঠলো যে সেই রাতেই পুনর সেতুন হাসপাতালে মহাস্বাস্থীকে স্থানান্তরিত করতে হোল।

কর্ণেল ম্যাডক বললেন—এখনই অপারেশন করতে হবে।

সবে অপারেশন আরম্ভ হয়েছে এমন সময় হাসপাতালের ইলেকট্রিক গেল বিগড়ে—অপারেশন থিয়েটার অন্ধকার হয়ে গেল।

কখন আলো জ্বলবে ঠিক নেই, চুয়াব বছরের এক বৃদ্ধকে অপারেশন টেবিলের উপর বেশীকণ ফেলে রাখাও যায় না। একেই তিনি দুর্বল তার উপর বেশী রক্তপাত হলে হয়তো আর জ্ঞান কিরে আসবে না।

ডাক্তাররা তখনই হারিকেনের ব্যবস্থা করলেন। সেই স্তিমিত আলোকে কর্ণেল ম্যাডক অপারেশন শেষ করলেন।

ইলেকট্রিক আবার যখন জ্বললো তার অনেক আগেই কাজ শেষ হয়ে গেছে, ততক্ষণ ফেলে রাখলে সে যাত্রা মহাস্বাস্থী রক্ষা পেতেন না।

দুর্বল গান্ধীজী আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন। কদিন পরে ৭ই ফেব্রুয়ারী গডবোর্ট তাঁকে মুক্তি দিল। তখনও কারাবাসের হুঁবছর পূর্ণ হয়নি।

গান্ধীজী তখন চলতে পারেন না, জোরে কথা বললে কষ্ট হয়।

গান্ধীজী এলেন জুহর সমুদ্রতীরে। সেই শরীরেই তিনি স্বক করলেন নবজীবন ও ইন্ন ইণ্ডিয়ার সম্পাদনা। পত্রিকা হুঁখানিতে ধারাবাহিকভাবে তাঁর আত্মজীবনী থেকে শুরু হোল—‘সত্যের পরীক্ষা’। এই আত্মকথা তিনি জেলে বসে লিখেছিলেন গুজরাটী ভাষায়, তার ইংরাজী অনুবাদ করেন মহাদেব দেশাই ও শ্যারীলাল, তার উপর চোখ বুলিয়ে নেন মীরা বেন [মিস্ স্লেভ]।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসী নেতাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল, একদল বললেন যেমন অসহযোগ চলছে চলুক, আরেকদল বললেন—বড়লারের হরবারে (কাউন্সিল) চুকে গডবোর্টকে সব কাজে বিভ্রান্ত করে তুলতে হবে। হুঁদলই এলেন গান্ধীজীর কাছে। অনেক বিচার বিতর্ক করেও মতের মিল হোল না। শেষে গান্ধীজী

বললেন—এতদূরই যেন নিজ নিজ বিষয়ে পরস্পরী বিনীত হোক এবং কাজ করে চলেন।

হিন্দু মুসলমান একত্রে অসহযোগ শুরু করেছিল, গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন—
হিন্দু পার্শী বুর্জান ইহুদী আমরা বাই হই না কেন, আমরা যদি একত্রে 'দেশ' হিসাবে বেঁচে থাকতে চাই, তবে আমাদের একত্বের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ করে তুলতে হবে। কেবলমাত্র শুক্লবর্ণের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে দাবীটি ভ্রাসবদ্ধ কিনা।

কিন্তু এই একা বৈশী দিন স্থায়ী হোল না, ১৯২৪ এর শেষ দিকে দেশের সর্বত্র হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বেধে গেল—জব্বলপুর, নাগপুর, গুলবর্গা, এলাহাবাদ, লখনৌ, সাহাঝানাবাদ, দিল্লী, কোহাট...সর্বত্র। কোহাটের দাঙ্গা চরমে গিয়ে উঠলো। চার হাজার হিন্দুকে ভিথরীর বেশে কোহাট ছেড়ে পালাতে হোল। গান্ধীজী এই দুর্ভাগের জন্ত নিজেকে দায়ী করলেন, বললেন—আমি যদি ভালো হই, তাহলে আমার কাছে যারা আছে তারা কোন অস্ত্রায় করতে পারে না। যদি কেউ অস্ত্রায় করে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমার ভালবাসার এমন জোর নেই যে তাকে অস্ত্রায় থেকে দূরে রাখি। সেই দোষ আমার মনের। মন থেকে সেই দোষ দূর করতে হলে প্রায়শ্চিত্ত করে মনকে পবিত্র করতে হবে। উপবাস করাই হোল সেইদিন থেকে সব চেয়ে ভালো উপায়।

গান্ধীজী একুশ দিনের জন্ত উপবাস শুরু করলেন। সেই দুর্বল দেহে তিন সপ্তাহ উপবাস সম্ব হব কি করে তাই ভেবে সমগ্র দেশে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা দিল। ভারতের চারি প্রান্ত থেকে সকল ধর্মের নেতারা দিল্লীতে সমবেত হলেন, সৌখ্যনা মোহনদাস আলির বাড়ীতে একা সম্মেলন বসলো, সাতদিন ধরে আলাপ আলোচনা করে তাঁরা গান্ধীজীর কাছে প্রতিক্রিয়া দিলেন—সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষার জন্ত তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করবেন। দেশবাসীর কাছে তাঁরা আবেদন জানালেন—প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্মকাজ করার অধিকার আছে, লেজন্ত বিরোধ করার কিছু নেই।

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসলো বেলগাঁওয়ে। গান্ধীজী হলেন সভাপতি। অতি অল্প কথায় জাতিকে নির্দেশ দিলেন কি করতে হবে—স্বরাষ্ট্র পেতে হলে তিন দিকে আমাদের কাজ করতে হবে : চরকা প্রবর্তন, হিন্দু মুসলমানের ঐক্য স্থাপন ও অশ্রুততা বর্জন। পরাজয়ের মূলকথা হবে : কাবালকদের ভোট দেবার অধিকার থাকবে, মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হবে, উচ্চ কর্মচারীদের বেতন কমানো, জায়া

আমাদের গান্ধিজী

জিহ্মিতে প্রবেশ গঠন করা, বিদেশীদের একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার খর্ব করা, সরকারী কাজে বর্ণভেদ দূর করা, ধর্মের স্বাধীনতা, মাতৃভাষায় প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের কাজ চালানো ও হিন্দী হবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা।

কংগ্রেসের এই নীতি জনগণের মনে পৌঁছে দেবার জন্য গান্ধিজী আবার ভারত পরিভ্রম্য করতে বেরলেন। পথে ও প্রান্তরে, পল্লী ও নগরে গান্ধিজীর বাণী ধ্বনিত হোল—অস্পৃশ্যতা ছাড়তে হবে, ধর্মের বিরোধ ভুলতে হবে।

দক্ষিণ ভারত। ধর্মের চেয়ে এখানে জাতি বড়। ব্রাহ্মণেরা ‘পারিয়ার’ ছায়া ছুঁলে মান করে।

গান্ধিজী বললেন—অস্পৃশ্যতা জয় করতে হবে, আমাদের ভাইদের আমাদের মাঝে গ্রহণ করতে হবে, তবেই জগতের সঙ্গে প্রীতি স্থাপনের শক্তি জন্মাবে, জগতের সেবা করার অধিকার জন্মাবে, একাজে স্বার্থ বা লাভের কথা কিছু নেই, এটি ধর্ম। ছেলোবেলার বধন উকাকে ছুঁয়ে মান করেছি, তখন বার বার একটি কথাই মাকে জিজ্ঞাসা করেছি—‘উকাকে ছুঁলে কি অশ্রায় হবে? উকাকে ছুঁতে বারণ কর কেন?’ অস্পৃশ্যতা বলে হিন্দু ধর্মে কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না, হিন্দুরা অস্পৃশ্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে মহাপাপ করেছে। যতদিন হিন্দুরা মনে করবে যে, আরেকজন হিন্দুকে স্পর্শ করলে পাপ হয় ততদিন স্বরাজ আসবে না। যুধিষ্ঠির সঙ্গী কুরুজটিকে ছেড়ে অর্গে যেতে রাজী হননি, যুধিষ্ঠিরের বংশধরেরা অস্পৃশ্যদের বাদ দিয়ে স্বরাজ পাবার আশা করে কেমন করে? আমরা আমাদের ভাইয়ের উপর অবিচার করছি, চোখ রাঙিয়ে তাদের প্রণাম করতে বাধ্য করছি, কোন বৈধ ধর্মে উঠলে তাকে কামরা থেকে বের করে দিচ্ছি, ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গে এক চেয়ে বেশী আর কি করেছে। এই দুর্নীতি থেকে এখনই আমাদের মুক্ত হওয়া দরকার—একজনকে বধন আমরা আঘাত করছি, তখন আরেকজনের কাছ থেকে আঘাতের প্রতিকার চাওয়া যায় না। অস্পৃশ্যতা বজায় থাকতে স্বরাজের কথা ভাবা চলে না।

ভাইকনে ছোটজাতের হিন্দুরা রাজপথ দিয়ে চলতে পারতো না। গান্ধিজী বললেন—যাহুয সবাই সমান, এপথ সবাইকার পথ, সবাই এই পথ দিয়ে চলতে পারবে।

হরিজনদেরা সেই পথ দিয়ে হুক করলো অভিবান।

পুলিশ পথের মুখে অস্পৃশ্যদের রুখে দিল।

আমাদের গান্ধিজী

অতুংরা হাতজোড় করে বললো—আমাদের এই পথ দিয়ে যেতে দিন।

পুলিশ তার উত্তর দিল লাঠি চালিয়ে।

কিন্তু অস্পৃহেরা পিছু হটলো না, ভয় পেলো না, শাস্তভাবে হাতজোড় করে আবার বললো—আমাদের যেতে দিন।

কিন্তু পুলিশ তাদের পথ ছাড়লো না। সত্যাগ্রহীরাও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রচণ্ড রোদ মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, বম্ বম্ করে বৃষ্টি মাঝলো, পথে হাঁটু সমান জল জমে গেল, পূর্বের সূর্য পশ্চিমে অস্ত গেল, তখনও সত্যাগ্রহীরা পুলিশের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, শাস্তকণ্ঠে তাদের সেই এক মিনতি—আমাদের যেতে দিন।

অবশেষে পুলিশ পথ ছেড়ে দিল, ধৈর্য, বিনয় ও অহিংসা দিয়ে সত্যাগ্রহীরা জয়ী হোল।

গাঁয়ে সভা বসেছে। হাজার হাজার মানুষের ভীড় গিন্ গিন্ করছে।

গান্ধিজী এলেন বক্তৃতা করতে। যেকের উপর উঠে দেখলেন—ভীড়ের বাইরে এক কোণে একদল লোক বসে আছে, জনতা থেকে খানিক তফাতে, খানিক দূরে। সভার এক যাত্রাবরকে ডেকে গান্ধিজী জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা কারা? ওরা ওখানে বসে কেন?

—আজ্ঞে ওরা অস্পৃহ—মেথর।

—মেথর বলে ওরা তোমাদের কাছে বসতেও পাবে না?

যাত্রাবরদের মুখে কোন উত্তর জোগালো না।

—এই সভায় যদি ওদের জায়গা না হয়, তাহলে আমারও জায়গা হবে না—বলে গান্ধিজী যত্ন থেকে নেবে এলেন, সভা পার হয়ে বরাবর গিয়ে বসলেন সেই মেথরদের মাঝে।

গান্ধিজী বললেন—আবার যদি আমার এই পৃথিবীতে জন্ম হয়, তাহলে যেন এই হরিজনদের মাঝেই জন্মাই। সাত কোটি লোককে শত শত বছর ধরে অত্যাচার করে বে পাগ আমরা করেছি, সেই দৃশ্য ও অত্যাচার নিজের জীবনে ভোগ করে আমি সেই লাগের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

বাঁদা বঁটা করে অস্পৃহদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল সেদিন তাদের মুখে আর কথা জোগালো না।

স্বাধীনতার গান্ধী

আরেক দিনের কথা।

মহাত্মা জীবন। টেনে আসছেন জী। ঠিক থেকে নাহাযাই হাজ
হাজার কঠে চীৎকার উঠলো—মহাত্মা গান্ধী কী জয়! স্বাধীন ভারত কি জয়
বন্দেমাভরম্।

গান্ধীজীকে প্রণাম জানাবার জন্য সবাই উৎসুক—ঠেলাঠেলি। একপাশে গান্ধী
ছিল এক মেথর, জীড়ের চাপে মাছুবাটি পড়ে যায় আর কি। ঝাঁটাটি হাফ
থেকে পড়ে গেল, কোন রকমে সে আত্মরক্ষা করলো। মেথর সে, সবাই
তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে, একান্ত অপরাধীর মত সে ভয়ে জড়সড়।

গান্ধীজীর চোখ সব দিকে। ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে এলেন মেথরটির পাশে,
ঝাঁটাটি কুড়িয়ে দিলেন তার হাতে। মেথরটির ছুঁচোখ সেদিন অশ্রুসিক্ত হয়ে
উঠেছিল কি না কে জানে।

আড়াই হাজার বছর আগে এক তথাগত তাদেরই কোন পূর্বপুরুষকে মানব সেবার
'মহত্তর' ধর্মে বীক্ষিত করেছিলেন, সেই অপরাধে শত শত বছর সনাতনীরা তাদের
'মেথর' নামে অবজ্ঞা করেছে, আরেক তথাগত সেই ঝাঁটাই আবার তার হাতে
তুলে দিলেন। তার মনের উপর থেকে মুছে গেল সব ম্লানি, সেবার মহত্তম রূপ নতুন
করে ধরা পড়লো তার চোখে। সার্থক হোল সে।

সবাই সমান, সবাই ভাই—মহাত্মাজী এই সত্য উপলব্ধি করতেন অন্তর দিয়ে।
এ যে তাঁর কত বড় বিশ্বাস তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় পুরীতে।

পুরীর মন্দির, জগন্নাথ দেবের মন্দির। পুরীধাম শ্রীক্ষেত্র। এখানে স্নানের বিচার
নেই, কেউ কান্নার উজ্জিষ্ট খেলে জাত যায় না। মন্দির দ্বারে দর্শনার্থকে ঝাঁটা যারা
হয়—দেবদর্শনের আগে সমস্ত আত্মাভিমান ত্যাগ করে আসতে হবে! কিন্তু
সামান্যবাহী শ্রীক্ষেত্রেও অস্পৃশ্যদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। গান্ধীজী মনে বড়
বাখা পেলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন—যতদিন না মন্দিরের ভিতর হরিজনদের ঢুকতে
দেওয়া হয় ততদিন তিনি নিজেও ঢুকবেন না।

কঙ্করবাঁ ছিলেন সঙ্গে। হিন্দু ঘরের ঘরে, মন্দিরের পাশে থেকে দেবদর্শনের
লোভ সংযত করা তাঁর পক্ষে সহজ নয়। একদিন তিনি লুকিয়ে জগন্নাথদেবকে
দেখে এলেন।

কেনম করে জানিবা, কঁথাটা মহাত্মাজীর কানে উঠলো, তিনি অভিযুক্ত হলেন,
কঙ্করবার সঙ্গে বাক্যলাপ অবধি বন্ধ করে দিলেন। তিনি যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে

আমাদের গান্ধিজী

প্রতিবাদ করেছেন, তাঁর সহধর্মিণীও ভাঙে পূর্ণ সমর্থন থাকা উচিত! স্বরূপ আবেগে গান্ধিজীর দুখানি কালো হাতি উঠলো। কস্তুরবা' নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারলেন, পায়ীর কাছে কমা চাইলেন, গান্ধিজীর বুকে হানি ফুটে উঠলো।

ভারতের সাত কোটি অস্পৃশ্যকে মহাত্মাজী নতুন নাম দিয়েছেন—হরিজন—গবানের আপনার জন। এদের জন্ত সত্যিকারের ভালো কিছু করার চেষ্টায় মহাত্মাজী ১৯৩০ সালে 'হরিজন-সেবক-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'হরিজন' নামে এক নি কাগজও প্রকাশ করেন, তিনবার উপবাস করেন এবং সবরমতী আশ্রমটি রজনদের সেবাতেই উৎসর্গ করেন। এক মেথরের মেয়েকে গান্ধিজী নিজের মেয়ের সবরমতী আশ্রমে প্রতিপালন করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারত থেকে গান্ধিজী কলিকাতায় এসেন।

রোটারী ক্লাবের সভায় গান্ধিজী বললেন—যজ্ঞকে আমি ঘৃণা করিনা। যে চরকা তে আমি সবাইকে বলি, সে-ই চরকাও তো একটি যজ্ঞ। তবে যে যজ্ঞ অনেককে গায়ে মাজ কয়েকজনকে বড়লোক করে তোলে, সে যজ্ঞকে আমি চাই না। কোটি কোটি ভারতবাসীকে যে যজ্ঞ খেতে দেবে, সে যজ্ঞকে আমি নিশ্চয়ই চাইব।...বড় বড় কয়েকটি যজ্ঞের সাহায্যে কয়েকজন মাজ লোক সমস্ত লোকের পিঠে তেপে গেছে। যজ্ঞ যেমন কাজ করে সেই কাজগুলি মানুষকে নিজের হাতে করে নিতে হবে। আর এইভাবে সেই কয়েকজন লোককে পিঠ থেকে নাড়িয়ে দিয়ে সকলের পিঠে সমান করে দিতে হবে। নিজেকে নিজে গড়ে তুললে বককলের দল আপনা থেকেই সরে যাবে।

লেনিন ও গান্ধিজী জনসাধারণের জীবনধারা একই পরিণতিতে পৌঁছে দিতে ন, তবে দারিদ্র্যলুপ্তির পথ দু'জনের ভিন্ন। লেনিন দেখেছেন রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ, আর গান্ধিজী দেখেছেন অহিংস স্বাবলম্বনের পথ। লেনিন বিপ্লবকে প্ররোচিত করেছেন সমষ্টিগত অত্যাচারের দ্বারা, আর গান্ধিজী বিপ্লবকে প্ররোচিত করেছেন স্টিমিত ভাবে আত্মীয় উপলব্ধির দ্বারা, চরকা চালিয়ে জনগণের সামান্য বিধান করা নিরীক্ষার কাছে হাত্তর, গুলি চালিয়ে বিপ্লবকে স্তম্ভিত করা গান্ধিজীর কাছে নব-ধর্ম বিরোধী। কিন্তু দু'জনেই নিজ পরিধির মধ্যে অসামান্য সাক্ষ্য অর্জন করেছেন।

আমাদের গাঙ্কিজী

গাঙ্কিজী গেলেন দুর্জয়লিঙ্গ। অসহ দেশবন্ধু তখন 'ট্রেপ্‌ এসাইডে' বাস্তু পুনরুদ্ধারের আশায় নিরবচ্ছিন্ন বিগ্রাম করছিলেন, গাঙ্কিজী সেইখানেই কয়েকটি দিন কাটালেন। কাজের গুরুভার আর রইল না, হাত পরিহাসের ভিতর দিয়ে দিনগুলি লম্বু হয়ে উঠলো।

দেশবন্ধু গাঙ্কিজীকে প্রত্যা করতেন, তাঁর নীতির উপর যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন, কিন্তু শুধু গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়েই যে ইংরাজদের করায়ত্ত করতে পারা যাবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না, সংগ্রামকে সর্বাঙ্গক করার জন্য তিনি স্বরাজ্যদল প্রতিষ্ঠা করেন, এদের উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সিলে ঢুকে গবর্নমেন্টকে সব কাজে বিরত করা। গোঁড়া গান্ধীবাদীরা এই মন্তকে স্বীকার করতে রাজী হননি। এই নিয়ে ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে কর্মীদের মতামত নেওয়া হয়, তাতে গান্ধীবাদীরা পান ১৭৪০ ভোট আর দেশবন্ধুর দল পান ৯৮০ ভোট। দেশবন্ধু হেরে গেলেন কিন্তু পরাজয় মানলেন না, গাঙ্কিজী জেল থেকে বেরবামাত্র, তিনি জুহুতে গিয়ে এই সম্পর্কে গাঙ্কিজীর সঙ্গে আলোচনা করলেন, দেশবন্ধু বললেন—আমি জানি কোনসিলে ঢুকলেই স্বরাজ আসবে না, কিন্তু যা আমাদের অগ্রগতিককে ব্যাহত করছে তা ধরুস করতে হবে। স্বরাজ্যদল সেই ধরুসকার্য সম্পূর্ণ করবে।

গাঙ্কিজী অস্বমতি দিলেন, স্বরাজ্যদল কাজ শুরু করলো। দেশবন্ধু জাতির কাছে আবেদন জানানলেন—স্বরাজ্যদলের জন্য নিজ নামে আমি চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ করেছি, আপনারা জানেন আজ আমি কপর্দকহীন। বারবার ঋণ করা যায় না, আর বিনা অর্থে জাতীয় সংগ্রামও পরিচালনা করা যায় না। কত অর্থ আপনারা বিয়েটার, বায়োডোপ বোড়দোড়, সিগারেটে ব্যয় করেন, সেই পরসা কতকটা কিছু বাঁচাতে পারেন, দান করলে আপনাদের কোন অসচ্ছলতা হবে না,.....আমেরিকা চীন জাপান প্রভৃতি দেশে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচারিত হচ্ছে, আমাদেরও সেইরূপ সংগঠন দরকার। কিন্তু সমস্ত কাজ চালাবার অর্থ কোথায়। আপনারা যদি সকলে মিলে সেই ভার বহন না করেন, আমি একা কি করে পারি। যাবনা না ছাড়লে আমিই সমস্ত অর্থ দিতে পারতাম, কিন্তু আজ যে আমি দরিদ্র অক্ষম কপর্দকহীন। আমি তো ভিকার খুলি নিয়ে আপনারদের সামনে উপস্থিত হইনি, আমি চাই ভারতের স্বক্তির জন্য আপনারদের এদের শুক। এ কাজ তে আমায় একার নয়।

কিন্তু কাজ বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যাবার আগেই দেশবন্ধুকে কর্মক্ষেত্র থেকে বিদ্যা নিতে হোল।

আবাবের গাঙ্গিনী

দুর্জয়শিখ থেকে চলে আসার সাতদিন পরেই গাঙ্গিনীর কাছে 'ভার' এলো—
দেশবন্ধু নেই !

গাঙ্গিনী মুহূর্তমান হয়ে পড়লেন, চোখের সামনে জেসে উঠলো দেশবন্ধুর উজ্জল ছুটি চোখ, বিশ্বাসদৃষ্ট কথা—বহাদুরজী, আমার মন বলছে, আমার বিরাট কিছু করতে পারবো—উই আর ইন ফর সামুখিং বিগ্ !

মনে পড়লো কদিন আগের হাস্তমুখর দেশবন্ধুকে। দু'জনে মুখোমুখি বসে আছেন, বাসন্তী দেবী এসে বললেন—'ছাগল দুধ দিচ্ছে না !'

গাঙ্গিনী বললেন—ছাগলের আত্মসম্মান জ্ঞান দেখে আমি খুশি হয়েছি !

দেশবন্ধু হেসে টিপ্তনী করলেন—ছাগলেরা আপনার সঙ্গে অসহযোগ করছে !

অন্তরে নতুন করে প্রতিধ্বনি তুললো বিদায় বেলায় শেষ কথাগুলি (২ই জুন '২৫), ইজিচেয়ারে শুয়ে দেশবন্ধু বলছেন—সকল জাতির মধ্যে সমভাব রাখতে হলে, এক অহিংসা ছাড়া উপায় নেই। এ জাতি অহিংসা ছাড়া কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না। আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, শাঠ্যের বা মিথ্যার সাহায্যে কোন বড় কাজ হয় না, হতে পারে না।...গঙ্গার তীরে একটি আশ্রম করে থাকার ইচ্ছে আমার বরাবরই; দেখি কি হয় !...

দেশবন্ধু চলে গেলেন, তাঁর সেই আশ্রম করার ইচ্ছা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। আশ্রমে বহুমান চিতার পানে তাকিয়ে গাঙ্গিনী শুক হয়ে বসেছিলেন, দেশবন্ধুর এই কথাগুলিই তাঁর মনের মাঝে দোলা দিচ্ছিল হয়তো, হয়তো একনিষ্ঠ অন্তরেজকে হারিয়ে মন উদ্বেল হয়ে উঠছিল, ব্যথায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল। সর্বত্র লেলিহান বহ্নিশিখার পানে তাকিয়ে মহাকালের নির্মম বিলুপ্তিকে তিনি উপলব্ধি করতে চাই-ছিলেন হয়তো !

চিতাঘ্নি নিভে গেল, গাঙ্গিনী বন্ধু-কৃত্য স্থির করে কেলেছেন, দুর্বীর কর্মক্ষমতা নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন বাংলার জনসাধারণের কাছে, ভিক্ষার কুলি পেতে বললেন—টাকা দাও ! দেশবন্ধুর ত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখার—তাঁর স্মৃতিকে অঙ্কাজানাবার দায়িত্ব যে আমাদের !

ভিনমাসের মধ্যে গাঙ্গিনী দশ লাখ টাকা সংগ্রহ করলেন, সেই টাকা দিয়ে দেশবন্ধুর বাড়ীতে বিরাট চিত্তরঞ্জন সেবা-সমন্বয়ের ভিত্তি স্থাপিত হোল।

গাঙ্গিনী বাংলাদেশ ছাড়লেন। কিন্তু এই বিরাট প্রয়াসের হ'কোটি অধিবাসীর কল্যাণ নিরন্তরের ভার দিয়ে যাবেন কার উপর ? দেশবন্ধুর আদর্শকে কে সাক্ষর পথে নির্ভর লক্ষে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ? স্বাধীন নেতৃবলিসীমার জীভ থেকে

আমাদের গান্ধিজী

একনিষ্ঠ ত্যাগী দেশ-হিত ত্রুতী স্বতীন্দ্রমোহনকে চিনে নিতে গান্ধিজীর দেবী হোল না। চাঁদপুর ধর্মঘটের সময় দেশপ্রিয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁকে তিনি মনোনয়ন করলেন প্রদেশের নেতৃত্বে—প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলের নেতা, এবং কলিকাতার মেয়র। এই ত্রিধর্মী কণ্টক-মুকুটের মর্যাদা দেশপ্রিয় আমরণ রক্ষা করেছিলেন।

স্বরাজ্যদলে মতভেদ দেখা দিল। কেউ বা দলত্যাগ করলেন, কেউ বা হলেন লাট সাহেবের মন্ত্রী।

গান্ধিজী প্রত্যেককে ভেকে পাঠালেন আশ্রমে। সভা বললো, কিন্তু মতের মিল হোল না।

গান্ধিজী কংগ্রেসকর্মীদের জন্য আঠারো দফা কর্মসূচী স্থির করলেন :

১। স্বতন্ত্র : গান্ধিজী বলেন—‘স্বতন্ত্র আমার কাছে একতার, অর্ধ-উপার্জনের স্বাধীনতার ও সকল মাহুষের সমান অধিকারের প্রতীক। ‘চরকা কাটার মূল কথা হচ্ছে দেশকে স্বাবলম্বী করে তোলা। আমাদের দেশে বছরে ১০০০ কোটি গজ কাপড়ের দরকার, আগে এর সবটাই আমাদের দেশে তৈরী হোত, কিন্তু ইংরাজেরা এদেশে চরকা নষ্ট করে দেয়। তখন তাঁতীরা দিশী সূতা না পেয়ে বিলিভী সূতার কাপড় বুনতে শুরু করে, কোটি কোটি টাকার সূতা বিলাত থেকে কেনা হয়। শেষে তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়ে তাঁত চালাবার ব্যবস্থাও নষ্ট করা হোল, বাধ্য হয়ে তখন এদেশের লোক বিলিভী কলে বোনা কাপড় কিনতে শুরু করলো। কিন্তু নিয়ে দেখা গেল, ১০০০ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে আমাদের দেশে তৈরী হচ্ছে মাত্র ২৫০ কোটি গজ—মিলে ১৫০ কোটি গজ আর তাঁতে ১০০ কোটি গজ। বাকী ৭৫০ কোটি গজ কাপড় আমরা কিনছি বিলাত থেকে। এই কিনতে গিয়েই আমাদের গরীব দেশ বছরে বছরে আরো বেশী গরীব হয়ে পড়ছে। এই টাকার দেশে রাখার জন্য মহাত্মাজী দেশবাসীর হাতে চরকা তুলে দিলেন, বললেন—‘প্রত্যেক লোকেরই দিনে অন্ততঃ আশি খণ্ড চরকা কাটা উচিত।’ সকলকেই তিনি বছর পরতে অহুসে করলেন। বছরের দাম যদি মিলের কাপড়ের চেয়ে বেশী হয়, তবু। এক টাকার মিলের কাপড় কিনলে টাকার বেশীর ভাগ মিলওয়ালার পায়, কিন্তু এক টাকার দরদ কিনলে টাকার বেশীর ভাগ পায় চাষী, কাটুনী আর তাঁতী। তাতে দরদ লোকেরা কিছু পয়সা পায়, অনাহারের হাত থেকে বাচে। গান্ধিজী নিজেও দিনে

আমাদের গান্ধিজী

অন্ততঃ আধকর্ষী চরকা কাটতেন। নিজের হাতে কাটা সূতায় কাপড় বুনে তিনি পরতেন।

২। বন্ধিয়াদি শিক্ষা: আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা বদলাতে হবে। তাদের হাতে কলায়ে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে বড় হলে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। (এই নিয়ে গান্ধিজী হরিজন পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন; তা নিয়ে এদেশের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদদের মাঝে আলোচনা হয়। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় শিক্ষাবিদদের এক সম্মেলন ডেকে গান্ধিজী তাঁর পরিকল্পনার কথা তাঁদের কাছে পেশ করলেন। শিক্ষাবিদেরা সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য এক কমিটি করলেন—ডক্টর জাকির হোসেন হলেন তার সভাপতি, আহম্মদ হলেম আর্থনায়কম, আর আট জন সদস্য রইলেন—গুলাম সেইদাই, কে টি শা, বিনোবা ভাবে, কাকা কালেলকার, কিশোরলাল মশরুওয়ালা, জে সি কুমারস্বামী, শ্রীকৃষ্ণ দাস জাজু ও শ্রীমতী আশা দেবী। এঁরা ছ' মাস আলোচনা করে শিক্ষা পদ্ধতির খুঁটিনাটি সব ব্যাপার পরিষ্কার করে খসড়া তৈরী করে ফেললেন। গান্ধিজী সেই খসড়া দেখে খুসি হলেন, বললেন—এই শিক্ষাপদ্ধতি গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের মাঝে একটা বিপ্লব এনে দেবে। এ শিক্ষাধারা পশ্চিম থেকে ধার করা নয়।... ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ অনন্তমনা হয়ে এই শিক্ষাপদ্ধতি তৈরী করেছেন। সাত বছর মাত্র ছাত্রদের ইচ্ছুলে রাখা হবে, তার মধ্যে তারা পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবে, মাতৃভাষা রীতিমত লিখতে, পড়তে ও বুঝতে শিখবে, ইংরাজী শেখার বালাই নেই, গাঁয়ের ভেলেমেয়েরা মাতৃভাষা মারকম লেখাপড়া শিখবে, এবং তারই সঙ্গে দেশের সমাজ ও রাজনীতি আর নিজের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে। উদ্ভিদতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকবে। পাঠ্য পুস্তক শেষ করেই চাকরী খুঁজতে না বেরোয় সেজন্য হাতের কাজ শিখতে হবে প্রত্যেককেই—সূতাকাটা, স্কাঁত বোনা, ছুতোরের কাজ, চাষের কাজ, বাসান ও ফলের আবাদ, চামড়ার কাজ, কাগজ তৈরী করা প্রভৃতি... গাছতলায় বসে পড়ানো চলবে। ইচ্ছুলের কোন খরচ থাকবে না, মাটির মশাইও হবেন গাঁয়ের লোক, ছেলেরা হাতের কাজ করে যে সব জিনিষ তৈরী করবে তাই বাজারে বেচে যা পাওয়া যাবে তা থেকেই মাটির মশায়ের বাইনে দেওয়া হবে, গবর্নমেন্টের পানে টাকা আর অন্য জিনিসের আশা করতে হবে না। পড়তে পড়তে তারা রোজগার করবে। সাত বছরে এক একটা ছাত্র উপার্জন করবে ৬০৬/১০। এক একজন শিক্ষকের কাছে জিশ জমের বেশী ছাত্রছাত্রী থাকবে না। জিশজন ছাত্র সাত বছরে উপার্জন করবে—৬০৬/১০ × ৩০ = ১৮২৫০।

আমাদের গান্ধিজী

মাটির অশাইয়ের মাইনে হবে মাসিক ২৫, বছরে ৩০০, সাত বছরে ২১০০ টাকা।

আর ১৮২৫ টাকা, ব্যয় ২১০০, বাকী ২১৫ টাকা বেশী খরচ পড়বে। সাত বছরে ত্রিশজন ছেলেকে লেখা পড়া শেখাতে ২১৫ টাকা খরচ করা এমন বেশী কিছু নয়। দিনে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ইস্কুল বসবে তার মধ্যে তিন ঘণ্টা হুড়ি মিনিট শেখানো হবে হাতের কাজ। ইস্কুলের রুটিন হবে :

হাতের কাজ	৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট
গান বাজনা, ছবি আঁকা ও অঙ্ক	৪০ মিনিট
মাতৃভাষা	৪০ মিনিট
সমাজ বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান ...	৩০ মিনিট
ব্যায়াম	১০ মিনিট
বিরাম	১০ মিনিট
ইস্কুল বসবে	মোট ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

হাতের কাজ বলতে ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চরকা কাটার দিকেই গান্ধিজী বেশী আগ্রহ দেখান।

পরীক্ষার ব্যাপারটাও ভালো, সাত বছর বাদে এক একটি ছাত্র দিনে ৮ ঘণ্টা করে দু'মাস কাজ করে, দৈনিক চার আনা করে রোজগার দেখাতে পারবে সে-ই পাস, তার সঙ্গে অবশ্য লেখাপড়ার কথাটাও দেখতে হবে।

ওয়ার্শায় বসে এই পরিকল্পনা করা হয় বলে এর নাম 'ওয়ার্শা শিক্ষা পদ্ধতি'। হরিপুরায় কংগ্রেসের বৈঠকে এই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। কংগ্রেসের প্রস্তাব গৃহীত হয় :

- (১) বিনা ব্যয়ে জাতির মাঝে ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রচার করতে হবে।
- (২) মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন।
- (৩) পারিশার্খিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজ শেখানো হবে, ইহা বিজ্ঞা অর্থকরী হবে।

১৯৩৯ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ব্যাপকভাবে এদিকে আন্দোলন শুরু করেন, আটটি প্রদেশে এই পদ্ধতির ইস্কুল খোলা হয়। সব চেয়ে বেশী শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়, বিহারে — ১৪,২৪০ টি। তারপরেই মাত্রাজে ৬৬০ টি। কিন্তু কাজ ভালো হয় হুজু প্রদেশে সেখানে ২,৩০,০০০ অশিক্ষিতকে লেখাপড়া শেখানো হয়।

এই বিকালয়গুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে গান্ধিজী বলেন—“গায়ের ছেলেরা গায়ের

আমাদের গাছিকী

ইহুসে গাঁয়ের শিক্ষকদের কাছেই শিক্ষা লাভ করবে, বাইরের কোন কৃত্রিম বন্ধন তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের প্রতিবন্ধক হবে না।*)

৩। বয়স্কদের শিক্ষা : আমাদের দেশে একশো জনের মধ্যে দশজন মাত্র কোন রকমে নাম সই করতে পারে। বয়স্কেরা অধিকাংশই অশিক্ষিত। তাদেরকে শেখাতে হবে লেখাপড়া, জানাতে হবে আমাদের কি ছিল, বিদেশীরা আমাদের তাত কাপড় হুশশাস্তি কিভাবে লুটে নিচ্ছে, কিভাবে আবার আমরা আমাদের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে পারি।

৪। কুটীর শিল্প : গাঁয়ের ঘরে ঘরে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গাঁয়ে সাবান তৈরী হবে, কাগজ তৈরী হবে, দেশলাই তৈরী হবে, চামড়া পাকানো (ট্যানিং) হবে, বানিতে তেল তৈরী হবে, ঘি তৈরী হবে, গম ভাঙতে হবে খাতার, ধান ভাঙতে হবে ঢেঁকীতে। সব কিছুর জন্ত বেন শহরের পানে তাকিয়ে থাকতে না হয়। গাঁয়ের লোকেরা নিজ নিজ গাঁয়ের তৈরী জিনিষই যথাসম্ভব কিনবে। প্রত্যেকটি গ্রাম স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

৫। ছাত্র : ছাত্রেরা সূতা কাটবে, খন্দর পরবে, দলাদলি করবে না, দেশের উন্নতি সম্পর্কে পড়াশুনা করবে, রোগীর সেবা করবে, অশিক্ষিতদের লেখাপড়া শেখাবে, ছোট জাতিকে ভাই বলে মনে করবে, অন্তর্ধর্মের লোককে বন্ধু বলে ভাববে, রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে হিন্দী শিখবে, ছাত্রীদের বোনের মত দেখবে, সময় ঠিক রেখে চলতে শিখবে।

৬। জাতি ও ধর্ম : হিন্দু মুসলমান খৃস্টান পার্শ্বী—সব মিলেমিশে থাকতে হবে।

৭। অপসৃক্ততা : ছোট জাতের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের উন্নতি করতে হবে, তাদের ভাই বলে নিজেদের মাঝে ডেকে নিতে হবে।

৮। নেশা : মদ, তড়ি, আফিং, গাঁজা প্রভৃতি নেশা দেশ থেকে একেবারে বিদায় করতে হবে।

৯। গ্রাম : ভারতে সাত লাখ গ্রাম আছে, প্রত্যেকটি গ্রামকে স্বাস্থ্যকর করে তুলতে হবে।

১০। স্বাস্থ্য : সং চিন্তা, উপযুক্ত পরিশ্রম, মুক্ত বায়ু সেবন, স্বচ্ছ হয়ে দাঁড়ানো, সোজা হয়ে বসা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হবে।

১১। নারী : মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হবে।

গান্ধীজীর স্বাধীনতা

১২। **কিষাণ :** এদেশে গ্রিন-ব্রিশ কোটি মানুষ চাষ পান্যাদ করে, তাঁদের ঠিকমত শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদের স্বাধীনতার কথাটি ঠিকমত বুঝিয়ে দিতে হবে।

১৩। **বল্লভর :** যারা কারখানায় কাজ করে তাদের সম্বন্ধে করতে হবে, সম্মত তাদের জন্য পাঠশালা খুলবে, হাসপাতাল করবে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং প্রয়োজন হলে মালিকদের বিরুদ্ধে লড়বে।

১৪। **আদিবাসী :** এদেশে কোল-ভীল গোণ্ড সাওতাল প্রভৃতি পাহাড়ী জাতির মানুষ আছে প্রায় দু'কোটি, তাদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

১৫। **কৃষ্ট ও বন্দা :** এদেশে লাখ লাখ লোক কৃষ্ট ও বন্দায় ভোগে, তাদের নিরাময় করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬। **টাকা পয়সা :** সকলের টাকা পয়সা সমান হওয়া দরকার। অহিংস কার্য-ধারার ভিত্তি দিয়ে বড়লোকদের সকলের সাথে সমান করে দেবার চেষ্টা করতে হবে, ধনীদের মন বদলে দেবার চেষ্টা করতে হবে।

১৭। **রাষ্ট্রভাষা :** ভারতের সব লোক যাতে সব লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে সেজন্য একটি রাষ্ট্রভাষার দরকার, হিন্দী হবে সেই রাষ্ট্রভাষা। এই ভাষা শেখবার ও সকলকে শেখাবার চেষ্টা করতে হবে।

১৮। **মাতৃভাষা :** প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভাষা ভালো করে শিখবে। মাতৃভাষার উন্নতি করতে হবে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

গান্ধীজী বলেন এই আঠারো দফা নীতি দেশের সর্বত্র কার্যকরী করতে পারলেই সত্যিকারের স্বাধীনতা আমাদের হাতে এসে পড়বে।

গান্ধীজী ছিলেন সবরমতী আশ্রমে।

তাঁর দীর্ঘদিন অবর্তমানে আশ্রমিকদের মধ্যে কিছু কিছু শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল, গান্ধীজীর কাছে তা ধরা পড়তে দেবী হোল না, কিন্তু ঘোষণা করলেন অপারকে বকাবকি করা গান্ধীজীর নীতিবিরুদ্ধ। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যারা তাঁর আশেপাশে থেকেও সত্য ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারে না, তাদের দুর্বলতার জন্য তিনিই দায়ী, কারণ শ্রীতি ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। নিজের এই অক্ষমতাকে জয় করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন, আত্মশুদ্ধি হলে পরিবেশও শুদ্ধ হবে।

আশ্রমিকদের চিন্তা শুদ্ধির জন্য গান্ধীজী সাতদিন অবশন করলেন।

আমাদের গান্ধী

নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজী যাত্র পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করলেন, তিনি বলেন— জনগণের মধ্যে বিপ্লবের উৎসাহ বর্ধনই দেখবো, তখনই আমি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবো !

কংগ্রেসের অধিবেশন দেখতে এসেছিলেন মার্কিন শাস্ত্রী রেভারেন্ড হোমস্, মাথায় ছিল শঙ্করের লাক্ষী টুপী, বক্তৃতায় উঠে তিনি বললেন—গান্ধীজীকে আমি কোন বিশেষ দেশের বালিন্দা বলে মানতে রাজী নই, গান্ধীজীকে আমি বিশ্বের মানবতার প্রতিভূ বলে মনে করি ! পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ তুলপথে অগ্রসর হচ্ছে, অর্থ ও শক্তির সাধনায় আজ আমরা কলুষিত। বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠ করার জন্য যুদ্ধের পর যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে, এইভাবেই হয়তো সভ্যতা একদিন ধ্বংস পাবে। এমন দিনে গান্ধীজী এক নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীতি ও সত্যের যে ইঙ্গিত তিনি দিচ্ছেন, অগতের কল্যাণের জন্য তা অমূল্যবর্ণ করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য !

যুহন্তর সংগ্রামের উদ্দেশ্যে জাতিকে সংঘঠন করার জন্য গান্ধীজী প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছেড়ে সংগঠনের কাজে মন দিলেন।

কিন্তু শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কাজ করার যত অবসর তিনি পেলেন না, ভারতের অনেকস্থানে এলোমেলোভাবে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হতে লাগলো। মনের দুখে কলিকাতার অন্ধানন্দ পার্কের এক সভায় তিনি বলেছিলেন—দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খুনোখুনি করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা যেন তা মাহুষের মতই করি, সেজন্য যেন কান্নার কাছে কোন সহ্যহুতীর আশা না রাখি !

কিন্তু দাঙ্গা যারা করে তাদের কাছ থেকে মহুগ্ৰহ আশা করা যায় না, তার প্রকট উদাহরণ দেখা যায় স্বামী অন্ধানন্দ ও গণেশধর বিজ্ঞার্থীর হত্যা ব্যাপার।

স্বামী অন্ধানন্দ ছিলেন, শুদ্ধি-আন্দোলনের প্রবর্তক। রোগে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, এক যুবক এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইল, পরক্ষণেই অহুযতির অপেক্ষা না রেখেই তাঁর সেবককে গুলি করে, রোগীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো, এবং রক্ত স্বামিজীকে গুলি করে হত্যা করলো। হত্যাকারী এই মুসলমান যুবকটি সম্পর্কে গোহাটি কংগ্রেসে গান্ধীজী বলেন—তাকে আমি খুনী বলবো না, খুনী হচ্ছে তারা যারা পিছনে ঢুকে এদের যত লোককে উত্তেজিত করে !

কিন্তু তবু এই ধরনের কাণ্ডকথতা বন্ধ হয়নি। দু'বছর বাদে কানপুরের দাঙ্গা মাতে গিয়ে গণেশধর বিজ্ঞার্থী নিখোঁজ হন। ইনি ছিলেন যুক্ত প্রদেশের প্রেস সভাপতি। দাঙ্গার বন্ধ পরিবারকে তিনি রক্ষা করেন, সেইজন্যই দাঙ্গাকারীরা

এক জন বুন করে। পাঁচদিন পরে বুনন এর স্বত্বের উদ্ধার হয় তখন আর কোনওর
উদ্ধার নেই, হাতের উকি ও পকেটের কামড়ান্ন বেয়ে জবে জীকে চেনা যায়।

এই সব ঘটনার বীভৎসতা নবগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করে কেবলো, কিন্তু ভখনও
গান্ধিজীনের 'জাত্যক সংগ্রামের' রূপ দেখবাসীর কাছে অপ্রত্যক্ষ ছিল।

১৯২৬ সালে চীনারা গান্ধিজীকে আমন্ত্রণ করলো, মহাচীন সম্মেলনের জন্য।

গান্ধিজী বললেন—যাবার আমার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে
পারছি না।

গান্ধিজী সিংহল যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

সিংহলীরা বৌদ্ধ। গান্ধিজীও অহিংসার সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। সিংহলীরা কয়েক
বছর ধরে চেষ্টা করছিল মহাস্বাভীকে তাদের দেশে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কাজের
চাপে বাপুজী অবসর পাচ্ছিলেন না।

১৯২৭ সালে গান্ধিজী চীদার খাতা নিয়ে বেরলেন। নিখিল ভারত চরকা সম্মেলন
জন্ত টাকার দরকার। সিংহলীরা বললো—আমুন আয়রাও টাকা দোব।

নভেম্বর মাসে গান্ধিজী সিংহলে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন কস্তুরবা, মহাদেব দেশাই
ও কালেলকার।

সিংহলের লাটসাহেব ও কলোম্বোর ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে চা বাগানের
সামান্য মজুর অবধি মহাস্বাভীকে অভ্যর্থনা করার জন্ত চেষ্টার ক্রটি রাখেনি। বাদির
জন্ত বে ভিকার রুলি তিনি পেতেছিলেন, সিংহলের পয়তাল্লিশ লাখ অধিবাসী সে
জন্ত সানন্দে ছিয়ানী হাজার টাকা চাঁদা দেন। কে কত বেশী টাকা দিতে পারে তা
নিয়ে সেখানে যেন একটা বীতিযুক্ত প্রতিযোগিতা চলে। কাণ্ডিতে জন কয়েক বড়-
লোক দেয় চার-হাজার টাকা; জাক্নার এক কলেজের মেয়েরা দেয় এক হাজার এক
শো এগারো টাকা, কুড়িজন সাধারণ নাপিত দেয় চারশো টাকা, আবার বাহুল্লার
একজন মজুর সামান্য আটটি টাকা হাত দেয়।...

মহাস্বাভী বলেন—বড়লোকের কাছ থেকে আমি টাকা নিই, আমার গরীবের
কাছ থেকে পরল। নিতে আমার আরো বেশী আনন্দ হয়। একজন গরীব সামান্য বে
তখন পরমাটি বা বে আনিটি আমাকে দেয়, আমার কাছে একজন বড়লোকের
যেতরা একখানি বশ টাকার নোটের দতই ভার দায়।

সিংহল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। কলোম্বোর নহর ছাড়িয়ে মোটীর বখন পঞ্জীর পথ

গান্ধীজী

ধরে, চারিপাশের বৌদ্ধধর্ম চোখ বুজিয়ে যায়। হুশাশে রবার আর মাকচিনির বন, পিছনে পাহাড়ের দায় ছড়িয়ে পড়েছে হুগুর বিজারী চা-বাগান, পাহাড়ের পর পাহাড়ের শারি সিরে রিশেছে খেঁচের গায়ে দিগন্তে। উষার অশ্রালোক বধন পাহাড়ের গা বেয়ে নেবে আসে খেঁচরাক বনের মাখায়, রঙমহলের ছুরার ঝোলে একটির পর একটি। আবার বধন হুগুরের শেষ রশ্মিরেখা আকাশের গায় বর্ণচ্ছটার বৈচিত্র্য ছুটিয়ে তোলে, সোশার লতা অপরূপ বগ্নপূরীতে রূপান্তরিত হয়। গান্ধীজী মুহু হয়ে যান, নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, এই ঘাটীর ধরণীর উপর আবার নতুন করে আকর্ষণ জাগে। তিনি দেখেন আর ভাবেন, একটা প্রায়ই শুধু বার বার তাঁর মনে জাগে—প্রকৃতিদেবী এই যে সৌন্দর্যের মন্দির গড়ে রেখেছেন, এর মাঝেই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য মাহুয খুঁজে পেতে পারে, তবু কেন ইট, কাঠ, পাথরের নকল মন্দির গড়ে মাহুয তারই মাঝে ভগবানকে খুঁজে বেড়ায়।

কিন্তু এমন স্বন্দর দেশেও মাহুযের এতটুকু স্বস্তি নেই। এখানেও সাহেবরা বড় বড় চা-বাগান, রবারের কারখানা আর গ্রাফাইটের খনির মালিক হয়ে বসে আছে। লাখ লাখ মাল্ভাজী আর সিংহলী মজুর দিনরাত সেখানে দেহপাত করে দৈনিক আট দশ পয়সা পায়। তাতে কোন রকমে আধ-পেটা খাওয়া চলে। শীতের দিনে একটা জামা কেনার পয়সাও থাকে না। অভাব অনটনকে ভোলার জন্ত তারা বদ খেতে শুরু করে। দেহের উপর এতো অত্যাচার নয় না, খাটতে খাটতে ফুসফুসটা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যায়, শীর্ণ দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বুকের পাঁজরগুলো এক একটা করে গোনা যায়। তারপর একদিন অচেন্নে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

মদ খাওয়াটা সিংহলে অভ্যস্ত ব্যাপক। ইংরাজরা সিংহলীদের এই অভ্যাসটা ভালোভাবেই আয়ত্ত করিয়েছে। যার ফলে সিংহলের বারো কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে এক কোটির উপর আদায় হয় মদ ও ত্যাড়ি বিক্রীর লাভ থেকে। তার উপর বিলাতী মদের দায় হিসাবে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় বিলাতে।

হটলে মজুরদের এক সভায় মহাত্মাজীর চারিপাশে যে সব মজুর এসে পাঁড়ালো তাদের সকলেরই মুখে মদের গন্ধ। মহাত্মাজীর বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই একজন দেশার বোঁকে চীৎকার জুড়ে দিল—গান্ধীজী কি জয়! গান্ধীজী কি জয়!!

মাতাল চীৎকার করে আর নাচে।

মহাত্মাজী মনে বড় আঘাত পেলেন। পর পর কয়েকটি সভায় সিংহলীদের কাছে

আমাদের গান্ধিজী

তিনি নিবেদন করলেন—আইন করে বদ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়াই মাতৃবীর পবিত্র কর্তব্য।

এই সম্পর্কে ইন্ডুল কলেজের ছেলেদেরও বিড়ি সিগারেট খেতে তিক্তি বিবেচ্য করেন। গান্ধিজী বলেন—ধূমপানে খাস দুর্গন্ধ হয়...বুড়ি খোঁয়াটে হয়...ডাক্তারেরা বলেন তামাক খাওয়ার অভ্যাস থেকেই অনেক সময় ক্যান্সার নামক রোগ জন্মায়। বিড়ি সিগারেট খাওয়া কেন? ওটা তো কিছু খাস্ত নয়। বিড়ি সিগারেট খাওয়া বন্ধ কর। ভারতবর্ষে লাখ লাখ লোক দরিদ্র, নিরস্ত্র। বিড়ি সিগারেট বন্ধ করার যে পয়সা বাচে তা তাদের জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

নানা সজ্জা নানাতাবে গান্ধিজীকে অভ্যর্থনা জানায়। মাতারায় মোটার ড্রাইভারদের এক ইউনিয়ন শ'থানেক মোটার গাড়ী সাজিয়ে মহাত্মাজীকে নিয়ে এক শোভাযাত্রা বের করে ফেললো।

হৃদয় হয়েছিল বিস্তোদয় কলেজের সভা। এখানে পাঁচশত গৈরিকধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু গান্ধিজীকে ঘিরে ঐক্যকণ্ঠে আশীষবাণী উচ্চারণ করেন। মহাত্মাজীকে তাঁর বৌদ্ধ ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ বলে মনে করেন।

সিংহলের জনসাধারণ গান্ধিজীকে সাক্ষাৎ বৃদ্ধ অবতার বলে ধরে নিয়েছিল। সে পথে গান্ধিজীর মোটার যেতো সে পথের ছ'পাশে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে উঠতো। সুবাই একবার দর্শন পেতে চায়। অনেক সময় এই জনতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পথে দাঁড়িয়ে-থাকার টিকিট বিতরণ করা হোত। বার...টিকিট থাকলে না তাকে দাঁড়াতে দেওয়া হোত না।

এদের মন জানার জন্য মহাদেব দেশাই সভার এক মজুরকে ডেকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—কেন এখানে এসেছ?

মজুরটির পাশে এক মজুর-রবণী দাঁড়িয়েছিল, সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো—তুমি বা এখানে এসেছ কেন বাপু?

আরেকজন মজুর বললো—জানেন না আপনি? আমরা আমাদের দেবতাকে দেখতে এসেছি।

—তোমাদের দেবতা? তিনি কে?

—গান্ধিজী গো, গান্ধিজী!

—তিনি যে চাঁদা চাইছেন সেই চাঁদা দিয়েছ?

—নিশ্চয়ই! একদিনের মজুরী মশা আনা দিয়েছি।

আবাদের গাঙ্গিজী

—অতো টাকা নিয়ে গাঙ্গিজী কি করবেন বলত ?

—তা তিনি বাই করুন—কোন ভালো কাজই করবেন নিশ্চয়।

মজুরটি তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল মহাত্মাজীকে একবার ভালো করে দেখার জন্য।

শুধু অশিক্ষিত মজুর নয়, রীতিমত শিক্ষিতদের মনেও এই বিশ্বাস প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেকে মনে করেন মহাত্মাজী ধর্ম্মাশোকের পুত্র মহেন্দ্রেরই হয় তো নবজন্ম। তিরানগামার বৌদ্ধ জী-সভা তাঁকে যে মানপত্র দেন, তার প্রথমাই লেখা ছিল—অনেক শতাব্দীর পর আবাব আপনার পবিত্র চরণ এই দেশের মাটি স্পর্শ করেছে...

পথের মাঝে কতবার নরনারী ও যুবকের দল ঘোটার ধামিয়ে তাঁকে সভার মাঝে টেনে নিয়ে গেছে।

স্বাক্ষর-শিকারীদের ঔৎসুক্যও কম ছিল না। কত খাতা যে মাঝনে এসে পড়তো। সব খাতাতেই গাঙ্গিজী সই করতেন। তবে খাতার মালিককে তার আগে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হতো—আমি সর্বদা খন্দর পরবো।

মহাত্মাজীর সঙ্গে খন্দরের অনেক কাপড়-চোপড় থাকতো। কোতূহলীদের কাছে সেগুলি হোত প্রদর্শনী, প্রয়োজন মত আবাব বিক্রীও করা হোত। এই খন্দরের পরিচয় দিতে গিয়ে সিংহলী তামিল সজ্জের সভায় মহাত্মা বলেন—এই খাদি তৈরী হয় নিখিল ভারত চরকা সজ্জে। আমি এই সজ্জের সভাপতি। একজন কোটিপতি এর ধনাধ্যক্ষ, তাঁর নাম যমুনালাল বাজাজ। এর সম্পাদক শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার। এই এই সজ্জের ভিতর দিয়ে ভারতের নানা স্থানে পনেরো শো গ্রামে কাজ হচ্ছে। এই সমস্ত গ্রামে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার কাটুনি চরকা কাটার কাজ পায়, তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতি ধর্মের লোকও আছে। আগে বছরে তিনমাস তাদের কোন কাজই ছিল না, এখন চরকা কেটে তারা দৈনিক এক আনা দু' আনা রোজগার করে। এই কাটুনি ছাড়াও কয়েক হাজার তাঁতি আছে যারা কাপড় বোনে, পোপা আছে যারা ধোর, রংরঞ্জ ও ছাপাইকারও আছে যারা খাদির উপর রং ফলায়। .. এই কাজের হিসাব-পত্তর রাখার জন্য হাজারখানেক কেরানী আছে তারা মাসিক কুড়ি থেকে চল্লিশ টাকা মাহিনা পায়। হুঁচুর জন এমনও আছেন যারা পঁচাত্তর টাকা থেকে আড়াইশো টাকা পর্যন্ত উপায় করেন। তা ছাড়া একমল বেচ্ছা-সেবক আছেন, যারা বিনা স্বার্থে শুধু মাহুকের সেবা করার জন্যই কাজ করে যান। .. গত বছর আমরা কুড়ি লাখ টাকার খাদি তৈরী করে বিক্রী করেছি। এবং আমি আশা

আমাদের গান্ধিজী

রাখি টাকা আর কর্মী পেলে ভারতের সাতলাখ গ্রামে আমার এই সেবার প্রচেষ্টা আমি ছড়িয়ে দিতে পারবো। আমি এইটিকেই আমার দেশের সব চেয়ে বড় সমস্যার প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি।...

বাহুরায় এক জনসভায় প্রশ্ন উঠে—চরকার অন্তর্নিহিত বাণী কি?

মহাত্মাজী বলেন—নিরন্ন নর-নারী, যাদের কোন কাজ নেই, চরকা তাদের বলে : আমাকে চালাও, অন্ততঃ এক মুঠো খাবার জুটবে। এ হোল চরকার অর্থনৈতিক বাণী। চরকা কান্নার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় না, সকলকেই সমভাবে পরিশ্রম করতে শেখায়, আত্মনির্ভরতা শেখায়,—এই হোল চরকার শিক্ষা ও সাধনা। ...চরকা সরল জীবন যাত্রার প্রতীক, যে যন্ত্রণের সাধনা আজ জগৎবাসীকে অভিশপ্ত করেছে, যন্ত্রণকে দীর্ঘরের কাছ থেকে বহুদূরে টেনে এনেছে, চরকা তার বিরুদ্ধে অভিযান করেছে—নতুন শক্তি সৃষ্টি করেছে।...

তিন সপ্তাহ মহাত্মাজী সিংহলে ছিলেন। কত সভায় যে তাঁকে বেতে হয়েছিল তার হিসাব নেই।

কত মাছুষ ক্রোধের পর ক্রোধ হেঁটে একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখতে এসেছে।

এই কটি দিন ধারা মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছিলেন, বিদায়ের বেলা তাঁরা অনেকেই লোথের জল রাখতে পারেন নি। মহাত্মাজীকে আহাজে তুলে দেবার সময় চারিপাশ থেকে শুধু সাড়া উঠেছিল—আপনি আবার একবার আসবেন, ধীরে স্থছে নিশ্চিন্ত মনে দিন কতক এখানে কাটিয়ে যাবেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার মত অবসর বিধাতা গান্ধিজীর অদৃষ্টে লেখেননি।

মাংগালোরে গান্ধিজী বক্তৃতা করছেন, দিল্লী থেকে বড়লাটের চিঠি এসে পড়লো—এই নভেম্বর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

গান্ধিজী সেইদিনই যাত্রা করলেন। মাংগালোর থেকে হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বড়লাট লর্ড আক্কাইন গান্ধিজীর হাতে একখানি চিঠি দিলেন—বিলাত থেকে চিঠিখানি এসেছে। চিঠি নয়, একটি ঘোষণাপত্র। ভারতবাসীকে কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাই বিচার করার ক্ষমত সেখান থেকে একদল সাহেবকে পাঠানো হচ্ছে তার অন সাইমনের সঙ্গে।

সেইবাইরেই ঘোষণাপত্রটি পড়ে গান্ধিজী ভিজালা করলেন—এই জন্মই কি আমাকে ডেকেছিলেন?

আমাদের গান্ধিজী

আইন বললেন—হ্যাঁ।

এই একখানি চিঠি দেবার জন্ত হাজার মাইল দূর থেকে একজন যাত্রীকে ডেকে আনার কোনও প্রয়োজন হয় না, একখানি খামে ভরে পাঠিয়ে দিলেই চলতো। কিন্তু গান্ধিজী সেজন্ত কোন অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না, বড়লাটের সুখের পানে তাকিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন যে বিলাত থেকে এই রকম নির্দেশ ছিল।

সাইমন কমিশন এলো। সারা ভারত কমিশনকে বয়কট করলো। লাল লাজপত, পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি নেতারা পুলিশের হাতে মার খেলেন। পণ্ডিত জহরলাল বললেন—স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

গান্ধিজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এই সম্পর্কে লিখলেন—কংগ্রেস বছরের পর বছর নানা প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু সে-সব প্রস্তাব কার্যকরী করার সামর্থ্য কংগ্রেসের নেই। এতে কংগ্রেস অবনমিত হচ্ছে।

তথাপি কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার প্রস্তাবই তুললেন। গান্ধিজীকেই প্রস্তাবটির খসড়া করতে হোল : 'ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে একবছর সময় দেওয়া হোল, ১৯২০য়ের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি ভারতভূমিকে স্বায়ত্তশাসন না দেওয়া হয় তাহলে কংগ্রেসীরা ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু করবে।'।

কিন্তু এ সম্পর্কে জহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের দলকে তিনি সতর্ক করে দিলেন—স্বাধীনতার কাঁকা কথা বললে চলবে না। কথাটিকে কার্যকরী করার জন্ত প্রস্তুত থাকতে হবে। স্বাধীনতা কঠিন বস্তু, শুধু কথার কাঁকি নয়।

সেইজন্তই ক'দিন পরে যুরোপ থেকে যখন নিষ্করণ এলো দেশ ভ্রমণের জন্ত, গান্ধিজী তখন উত্তর দিলেন—অস্তর থেকে কোন সাড়া পাচ্ছি না, আগামী সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছি, এখন দেশ ছেড়ে চলে গেলে দেশবাসীর কাছে অপরাধী হতে হবে।

বাপুজী আবার ভারত পরিক্রমা শুরু করলেন, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে স্বাধীনতার আহ্বান জানানলেন জনতাকে,—স্বাধীনতার জন্ত প্রস্তুত হও, খবর পড়ো, অশ্লীলতা ভোলো, নেশা ছাড়ো...

সভায় সভায় বিলিভী কাপড়ের ধ্বংস বন্ধ হতে লাগলো, খবরের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গান্ধিজী সভায় সভায় হাত পাতলেন, শুধু অল্প-প্রমোদেই ছ'সপ্তাহের মধ্যে তিনি দু' লাখ সত্তর হাজার টাকা সংগ্রহ করলেন।

কলকাতার এক সভায় বক্তব্য করার জন্ত গান্ধিজীর নামে সরকার অভিযোগ তুললো। গান্ধিজী কদিনের জন্ত গিয়েছিলেন ব্রহ্মদেশে, কিরে আসতেই কলকাতার

আমাদের স্বাধীনতা

আদালতে তাঁকে হাজির হতে হোল, শেষ অবধি জরিমানা হোল একটাকা—বিচারের একটা প্রহসন হোল যাত্রা।

বরদৌলি তালুকের প্রজারা সদার প্যাটেলকে আমন্ত্রণ জানালো, সেখানে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব করার জন্য।

প্যাটেল এলেন গান্ধিজীর কাছে—আশীর্বাদ চাই।

বরদৌলিতে খাজনাবন্দের আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। গবর্নেন্ট সেখানকার প্রজাদের খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছিল,—২০।৩০ টাকা। গরীব চাষীদের সামর্থ্য ছিল না, তারা আপত্তি তুললো, কিন্তু সরকার তাদের কথায় কান দিল না। প্রজারা নিকপায় হয়ে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল।

বোম্বাইয়ের লার্টসাহেব ঘোষণা করলেন—বরদৌলিতে এই কৃষক অভিযান ধ্বংস করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করা হবে।

বরদৌলিতে পাঠান সৈন্ত আশ্রয়ী করা হোল, অন্যায় অত্যাচার চরমে গিয়ে উঠলো কিন্তু চাষীদের নত করতে পারলো না, ছেলেরা মুখে মুখে ছড়া তৈরী করলো—সভার সভায় তারা গান ধরলো—

Pathans to the right of them

Pathans to the left of them

Pathans to the front of them

Police at the tail of them

Marched the Buffalo Brigade।

(ডাইনে পাঠান, বায়ে পাঠান, পাঠান আছে সামনে, পুলিশ চলে পিছনে, মহিষ বাহিনী চলেছে মার্চ করে।)

কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল বঙ্কলার্টকে চিঠি লিখলেন—এখনই উপরুক্ত ব্যবস্থা না হলে আমি সভাপতিত্ব ছেড়ে সত্যাগ্রহ করতে যাব।

এবার গবর্নেন্টকে মাথা নোয়াতে হোল, জজ সাহেবের উপর তার দেওয়া হোল, তবদ্ধ করার জন্য, শেষ অবধি প্রজাদের দাবীই স্বীকৃত হোল, গান্ধিজীর অহিংস নীতিই জয়যুক্ত হোল।

শেখবাসী প্রত্যেক দেখলো—আত্মবিবাস থাকলে সত্য জয়যুক্ত হবেই।

কংগ্রেস আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে : অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠছে বেশে

আমাদের গান্ধিজী

বড়লাট লর্ড আর্কহইন ছুটলেন বিলাতে। বিলাত থেকে কিরে এসে তিনি বললেন—ভারতকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসনের পথে এগিয়ে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।...

মহাত্মাজী তার উত্তরে বললেন—ব্রিটিশ সরকারের যদি সত্যি কিছু দেবার সমিদ্ধা থাকে তাহলে আমরা আলোচনা চালাতে রাজী আছি।

বড়লাট গান্ধিজীকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর সঙ্গে নিমন্ত্রিত হলেন পণ্ডিত মন্ডিলাল, বিঠলভাই প্যাটেল, স্তার তেজবাহাদুর সাপ্‌র ও জিন্না। পুরো তিনটি বঁটা আলোচনা চললো, কিন্তু কোন বীমাংসা হোল না। গান্ধিজী ইং ইণ্ডিয়ায় যন্তব্য করলেন—আলোচনার জন্য বড়লাটকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদের অবস্থাটি কি তা' আমরা এখন বুঝতে পারছি...

চার্লিস সাহেব ওদিকে বিলাতে চীৎকার তুললেন—ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া অন্তায় অপরাধ বলে গণ্য হবে!...

গান্ধিজী তার উত্তরে বড়লাটের কাছে এক খোলা চিঠি লিখলেন, তাতে তিনি ভারতবাসীদের জন্য এগারোটি দাবী জানালেন :

- ১। মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।
- ২। জমির খাজনা অর্ধেক করতে হবে।
- ৩। লবণের কর তুলে দিতে হবে।
- ৪। রাজবন্দীদের ছেড়ে দিতে হবে।
- ৫। সি-আই-ডি বিভাগ তুলে দিতে হবে।
- ৬। আত্মরক্ষার জন্য ভারতবাসী অস্ত্র রাখতে পারবে।
- ৭। টাকার দাম বিদেশে এক শিলিং চার পেন্স করতে হবে।
- ৮। সৈন্ত রাখার খরচ অর্ধেক কমাতে হবে।
- ৯। বড় চাকরীর বাইনে কমাতে হবে।
- ১০। বিদেশী কাপড়ের উপর মোটা হারে শুল্ক বসাতে হবে।
- ১১। 'কোষ্টাল-প্যাসেজ-রিজার্ভেসন-বিল' পাল করতে হবে।

চিঠিখানি ইং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত হোল, তারই একখানি নকল গান্ধিজী দিলেন যিটার বোয়ানজীর হাতে, বিলাতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী রায়সে ন্যাকডোম্ভাল্ডকে দেবার জন্য।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সে পত্রের কোন উত্তর দেওয়া দরকার বলে মনে করলেন না।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সবরমতীর আকাশে ঝড়ের কালো মেঘ পুঁথীভূত হয়ে উঠলো।

আমাদের স্বাধীনতা

সরকারী আমলের শীর্ষ সন্ন্যাসীর কপালে আগলো চিহ্নের দেখা। চক্ৰিণ কোন্ নরনারীর অরবস্ত্রের স্বাক্ষর, হাতের বস্ত্র বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, কোন্ পথে সার্ক হয়ে উঠবে তাই তিনি ভাবতে বললেন। সত্য ও অহিংসার পথই তাঁর পথ সেই পথেই মুক্তাঙ্গী অস্ত্রের সাধনা করতে হবে। মুক্তাঙ্গী কালবেশাধীর সায়তে বাধা উঠু করে দাঁড়াতে হবে, অন্যতকে সত্য দিয়ে জয় করতে হবে, অন্যায়কে আশ্রয় করতে হবে, ভয় পেলে তো চলবে না। সন্ন্যাসীর তৃতীয় নয়ন উল্কাগির হয়ে উঠলো, সত্যসেবীর আত্মনিবেদন ভারতের আকাশে বাতাসে ঘূর্ণনা তুললো— ‘অন্ত জাতির স্বাধীনতা অর্জনের নীতি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর কাছে একটি যাত্রা পথ খোলা আছে, তা অহিংস অসহযোগের পথ, স্বরাজ্যভাঙের জন্ত তোমরা সেই যাত্রের উল্গাতা হও, ইশ্বর তোমাদের সাহস দিন, শক্তি দিন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তোমরা যেন সর্বশ পথ করে অবতীর্ণ হতে পার।’

মহাত্মাজী বড়লাটের কাছে চিঠি লিখলেন—

বন্ধু, ভারতের বৃক্কে ব্রিটিশ শাসন একটি অভিশাপ। এই শাসন ব্যবস্থা আমাদের দাসজাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের কুষ্টির মূলে আঘাত করেছে, আমাদের ধর্মনীতিকে অবনত করেছে।...আপনার নিজের কথাই ধরুন। আপনি মাসিক মাহিনা পান একশ হাজার টাকা, অথচ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসিক পাঁচ হাজার চল্লিশো টাকা মাত্র। এক একজন ইংরাজের দৈনিক আর দু’ টাকা আর প্রধান মন্ত্রী পান দৈনিক ১৮০ টাকা। এদিকে আমাদের দেশে এক একজনের দৈনিক আর মাত্র দু’ আনা আর আপনার বেতন দৈনিক সাত শো টাকা।...এই পদ্ধতির অবিলম্বে পরিবর্তন দরকার।...ব্রিটিশ শাসনে যেসব দুর্নীতি পুঞ্জীভূত হয়েছে তা দূর করার জন্ত আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। কিন্তু আমার এই অনুরোধ যদি আপনার অন্তর স্পর্শ করতে না পারে তাহলে আগামী ১১ই মার্চ তারিখে আমার আশ্রমিক সহকর্মীদের নিয়ে আমি লবণ আইন অমান্য করার জন্ত অভিযান করবো। আপনি যেন করলে তার আগেই আমাকে স্রেস্তার করতে পারেন কিন্তু আমি আশা করি হাজার হাজার কর্মী আমার আরক্ত কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্ত এগিয়ে আসবে।...এ সম্পর্কে যদি আপনি ঘরোয়াভাবে আলোচনা করতে চান, আমি প্রস্তুত আছি।...

চিঠিখানি বড়লাটের কাছে নিয়ে গেলেন গান্ধী আজ্ঞায়ের এক ইংরাজ দূত—
রেজিস্ট্রার রেখা।

আমাদের গান্ধিজী

বড়লাট উত্তর দিলেন—গান্ধিজী এমন এক কার্যক্রম ঠিক করেছেন, যার বলে জনসাধারণের শান্তি বিপন্ন হবে, একমুখ আমি হুম্বিত...

‘ইয়ং ইণ্ডিয়াতে’ মহাত্মাজী লিখলেন—আমি নভজাহু হয়ে অরুজিকা চাইলাম, কিন্তু আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারা হোল... লার্টগাহেবের উত্তর দেখে আমি মোটেই বিস্মিত হইনি।... জনসাধারণের যে শান্তির কথা তিনি বলেছেন তা জেলখানার শান্তি। ভারতবর্ষ একটা বিরাট জেলখানা ছাড়া আর কিছু নয়। যে শোকাবহ শান্তি জাতির বুকের উপর চেপে বসেছে, সেই শান্তিকে ভঙ করাই আমার পবিত্র কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

ইংরাজী ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ। সকাল সাড়ে ছটার সময় একঘণ্টা বছরের বৃহৎ সবরমতীর নদীতীরে এসে দাঁড়ালেন। পরণে কটিবাস, হাতে একগাছি লাঠি, সঙ্গে উনআশীজন আশ্রমিক অহুচর,—ষোল বছরের ছেলেও সে দলে আছে, তাঁতী আছে, পিওন আছে, রঙ-কর আছে, সম্পাদক আছে, গো-পালন বিশেষজ্ঞ আছে, সংস্কৃত-পণ্ডিত আছে,—সর্বজাতির সর্বশ্রেণীর সমন্বয় ঘটেছে।

মহিলারা বললেন—আমরাও যাব।

গান্ধিজী বললেন—না, তা হবে না, মেয়েরা সামনে থাকলে গবর্নেন্ট আমাদের উপর নির্ভর হতে ইতস্ততঃ করবে। শত্রুর কঠোরতা আমি দুর্বল করে ফেলতে চাই না, সেইজন্যই প্রথম অগ্রগামী দলে আমি মেয়েদের রাখতে চাই না।

সোণালী রোদ সামনের ধূসর পথকে উজ্জ্বল করে তুললো, চল্লিশ কোটি জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মহাত্মাজী দাণ্ডির পথে মহা-অভিযান শুরু করলেন, বললেন—সবণের শুরু যদি না তুলতে পারি, তাহলে আর আমি কিরবো না, আমার দেহ সাগরের বুকে ভাসবে।

পিছনে চললেন উনআশীজন নির্ভীক সৈনিক। হাতে এক একগাছি লাঠি, কাঁধের খলিতে ঝুলছে নিত্য প্রয়োজনীয় দু-একটি জিনিষ। তিনজন তিনজন করে এক এক সারি। পরণে শুভ্র বস্ত্রের উপর প্রভাতী সূর্যের অরুণালোক রক্তিম আভায় বিজ্জ্বলিত হচ্ছে, বিদ্রোহের উপক্রমণিকাকে জানাচ্ছে আশীর্বাদ। দৃঢ় তামের পদক্ষেপ, চোখে তাদের আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি। সেই দীপ্তির প্রতিকলন উদ্ভাসিত হোল সমবেত অগণিত নরনারীর মনে, তারা লাড়া তুললো—গান্ধিজীকি জয়!

গান্ধিজী বললেন—সত্যাত্মহীর পরাজয় নেই, জয়ী আমরা হবই, ভগবান, আমার সহায়...

আমাদের গান্ধিজী

দেশ-বিশেষ থেকে এলো অভিনন্দন, এলো উৎকর্ষা পূর্ণ শুভেচ্ছা:

আর্ম্যানী থেকে এক ডাক্তার লিখলেন—বৃহৎ আর্ম্যানীতে প্রতি প্রভাতে ৩ প্রাণ
সন্ধ্যায় এক অতি সাধারণ আন্তিক পরবেশের চরণে আপনার শুভকামনা করছে...

আমেরিকা থেকে পাদরী হোমস লিখলেন—ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন...

দীর্ঘ দূশো মাইল পথ। কখনো গাছের ছায়ায় শীতল, কখনো প্রান্তরের দীর্ঘস্বারে
প্রথর। স্বাধীনতার তীর্থযাত্রীরা এগিয়ে চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
জেতালপুর...নবগাঁ...নড়িয়াদ...বোরসাদ...ব্রোচ...ভাটগাঁ...সুরাট...জালালপুর...
মহামানবের যাত্রাপথের রক্ষতা, গ্রামবাসীরা জল ঢেলে স্নিদ্ধ করে। ঘরে ঘরে
তেরঙা নিশান ওড়ায়, পুষ্পাকীর্ণ করে দেয় পথরেখা, পথের দু'পাশে এসে দাঁড়ায়
নীরব শ্রদ্ধায়, যুগাবতারের দীর্ঘজীবন কামনা করে পূত চিত্তে। হাত জোড় করে
মহামানব এগিয়ে চলেন, স্থিত হান্তে জনতাকে অভিনন্দিত করে বলেন—খদ্দর পর,
নেশা ছাড়ো, স্বাধীনতার সংগ্রামে সত্য্যগ্রহী হও, অহিংসাই আমাদের পথ।...

দিকে দিকে সাড়া জাগে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্ত অগ্রগামী
হয়।

পণ্ডিত মতিলাল বললেন—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষা অভিযানের মত দাণ্ডি অভিযান
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বললেন—বাইবেলে পড়েছি ইস্রায়েলাইটরা মোজেসের নেতৃত্বে
এমনি ভাবেই একদিন পথে বাহির হয়েছিল।

কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল বললেন—দীর্ঘপথ অতিক্রম করে
মহামানব এগিয়ে চলেছেন, মহাতীর্থযাত্রী একখানি যষ্টি মাত্র হাতে নিয়ে গুজরাটের
খুলিধুলার পথ পদব্রজে অতিক্রম করছেন, দৃষ্টি তাঁর স্বচ্ছ, পদক্ষেপ দৃঢ়...

মহাত্মাজী দৈনিক পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করেন।

গান্ধিজী বলেন—ভগবানের আশীর্বাদ থাকলে আমি এই দীর্ঘপথ পদব্রজেই যেতে
পারবো। আমার মনে হচ্ছে আমি অমরনাথ কিংবা বদরীনারায়ণের তীর্থযাত্রা
করেছি...আজকের চেয়ে পবিত্র তীর্থযাত্রা আমার কাছে আর কিছু নেই।

অহুগামী দু-তিনজন পথের মাঝে অহুহু হয়ে পড়েন, কিন্তু পিছু হটার মত
মন নিয়ে তাঁরা পথে বাহির হন নি। তাঁদের জন্ত গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা হোল।

প্রতি সোমবারে মৌন-দিবসে গান্ধিজী বিজ্ঞাপন করতেন।

আমাদের বাঙ্কী

চব্বিশ দিন পরে গান্ধিজী দাণ্ডির সাগর সৈকতে এসে বীড়ালেন।

পরদিন প্রত্যুষে প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজী বসলেন—ব্রিটিশ শাসন ভারতের আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ধ্বংস এনে দিয়েছে। এই শাসন ব্যবস্থাকে আমি অভিশাপ বলে মনে করি। এই শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে আমি বাহির হয়েছি...আবরা কাউকে হত্যা করার জন্য পথে বাহির হইনি, কিন্তু এই অভিশাপকে নিশ্চিন্তভাবে মুছে ফেলা আমাদের ধর্ম।...

শত সহস্র সন্ত্রাস্ত নরনারীর সামনে মহাত্মাজী সাগর থেকে জল ভুলে এনে লবণ তৈরী করতে বসলেন, উন-আশীজন আশ্রমিক তাঁর অঙ্গুগমন করলো। চারিশাশ থেকে সাড়া উঠলো—মহাত্মা গান্ধিজী জয়।

ভারতের ইতিহাসে সে এক অরণীয় দিন।

এই লবণ-আইন-অমাত্যের পিছনে একটা ইতিহাস আছে :

শতাব্দেক বছর আগে অবধি এদেশের মাল বিলাতে বিক্রী হোত। কিন্তু বিলিভী মালের কোন চাহিদা এদেশে ছিল না। এদেশ থেকে জাহাজ ভর্তি করে জিনিষ বেত বিলাতে, আর সেই জাহাজ ফিরে আসতো খালি। শূণ্য জাহাজ সমুদ্রে চলে না, তাই জাহাজের ভার ঠিক রাখার জন্য বিলাত থেকে জাহাজে মাটি বোঝাই করে আনা হোত। গঙ্গা থেকে কালিঘাটের মন্দির অবধি একটি খাল ছিল, জাহাজে আনা সেই মাটি ফেলে ফেলে খালটি বুঁজিয়ে দেওয়া হোল। তারই নাম হয়েছে এখন চৌরঙ্গী রোড। কিন্তু মাটি আনা তো আর লাভের ব্যবসা নয়, এখন কিছু আনতে হবে যা এদেশে বিক্রী করে দু' পয়সা পাওয়া যায়। সাহেবরা ঠিক করলো মাটির বদলে লবণ আনা হবে। কিন্তু দেশী লবণ শস্তায় বিক্রী হয়, বিলিভী লবণ লোকে কিনবে কেন? ইংরাজরা তখন এদেশের রাজা হয়ে বসেছে, আইন কাছন সবই তো তখন নিজেদের হাতে। তখনই তারা আইন করে দেশী লবণের উপর কর বসিয়ে দিল। কর দিতে গিয়ে দেশী লবণের দাম বেড়ে গেল, বিলিভী লবণ সস্তায় বাজারে বিক্রী হতে লাগলো। এথেকে সরকারের দু'দফা আয় হতে লাগলো, এক দফা লবণ বেচে আরেক দফা কর আদায় করে। বছরে এ থেকে নেহাৎ কম টাকা হয় না, শুধু ১৯২৫ সালের হিসাব থেকেই দেখা যায় ইংরাজ সরকার এদেশে বিলিভী লবণ বিক্রী করে এক কোটি বায়ান্তর লক্ষ মণ, আর দেশী লবণের উপর কর আদায় করে দশ কোটি টাকা।

লবণ বাহুরের নিত্যকার প্রয়োজনীয় খাদ্য, তার উপর এইভাবে কর বসানো

আব্বাসের গান্ধিজী

অন্ডায়। এদেশের মানুষ বড় গরীব, লবণ কিনে খাবে অনেকেরই এমন অবস্থা নয়। সমুদ্রের তীরে যারা থাকে তাদেরকেও লবণ কিনে খেতে হয়। সমুদ্র তটে লবণের দানা পড়ে থাকলেও হুড়িয়ে নেবার অনুমতি নেই। পাছে কেউ সেভাবে লবণ সংগ্রহ করে, তাই সাগর তটে পাহারা যোতায়েন আছে। লবণ সংগ্রহ করলেই গ্রেপ্তার হতে হবে। আইনের নামে গরীবদের উপর অত্যাচার ছাড়া এ আর কিছু নয়। এই অত্যাচার বিরুদ্ধেই গান্ধিজী আঘাত করলেন—লবণ সত্যাগ্রহ।

গান্ধিজী ঘোষণা করলেন—দেশের জন্ম রাজদণ্ড ভোগ করতে যারা প্রস্তুত, তারা নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী আইন অমান্য করে লবণ তৈরী করতে পারে।

গান্ধিজী আরও বললেন—১৯২০ সালে জাতিকে আহ্বান করেছিলাম অসহ-যোগের সংগ্রামে, সে আহ্বান ছিল প্রস্তুতির আহ্বান। আবার আজ আমি আহ্বান জানাচ্ছি—এ আহ্বান শেষ সংগ্রামের আহ্বান—চরম নিপত্তির আহ্বান।

সারা ভারতের বৃকে তড়িৎ প্রবাহ বৃহে গেল। সর্বত্র লবণ তৈরী হতে লাগলো। ১৪৪ খারা জারী করেও জনসভা বন্ধ করা গেল না। মদের দোকানে ও বিলিভী কাপড়ের দোকানে স্বেচ্ছাসেবকরা ধর্না দিতে শুরু করলো। তাড়ি তৈরী চিরদিনের মত বন্ধ করার ইচ্ছায় গাঁয়ে গাঁয়ে হাজার হাজার তালগাছ কেটে ফেলা হোল। যারা প্রত্যক্ষভাবে সত্যাগ্রহে যোগ দিতে পারলো না, তারা বে-আইনী লবণ কিনে আন্কোলনকে নৈতিক সমর্থন জানালো। এক এক পুরিয়া বে-আইনী লবণ যে কোন দামে বিক্রী হতে লাগলো। কেবলমাত্র বোম্বাই শহরের পথে লবণ বিক্রী করে শ্রীযুক্ত কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় একাই ত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এক পুরিয়া লবণ পাঁচশো টাকাতেও বিক্রী হয়েছিল।

এলাহাবাদে কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল গ্রেপ্তার হলেন।

কলিকাতায় দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহন গ্রেপ্তার হলেন।

বোম্বাইয়ে রামদাস গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন।

দিল্লীতে দেবদাস গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন।

করাচিতে জয়রামদাস দৌলতরায় পুলিশের গুলিতে আহত হলেন।

পেশোয়ারে জনতার সঙ্গে সৈনিকদের খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেল।

আলমুজ্জ হিয়াচলের অহিংস জনগণ গুলি ও লাঠির আঘাতে বৃদ্ধ হয়ে উঠলো।

গান্ধিজী বললেন—আজ সারা ভারতের বৃকে যে অনাচার চলছে পাঞ্জাবের ভারার সাহেবের অত্যাচার সে তুলনার কিছুই নয়। জনসাধারণ আজ তাদের কর্তব্য

আমাদের গান্ধিজী

পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কষ্ট সহ্য করার মহান অহুত্ব নিয়ে জনসাধারণকে সরকারের এই সঙ্ঘবদ্ধ গুণামির সম্মুখীন হতে হবে !

গান্ধিজীর নির্দেশ, নব ভারতের বেদমন্ত্র। চল্লিশ কোটি নরনারী নতুন অহুত্বজিতে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

গান্ধিজী স্থির করলেন এবার তিনি ধরসনার লবণ গোলা দখল করবেন। কিন্তু চুপিচুপি কোন কাজ করা তাঁর রীতি নয়, বড়লাটকে চিঠি লিখে জানালেন তাঁর ইচ্ছা :

বন্ধু, বিধাতার নির্দেশ পূর্ণ হোক, সহকর্মীদের নিয়ে আমি ধরসনার বাবার সংকল্প করেছি। লবণ গোলা অধিকার করাই আমার উদ্দেশ্য...আমার এই অভিযান ব্যর্থ করতে হলে (১) আপনাকে লবণ আইন তুলে দিতে হবে, না হলে (২) আমাকে ও আমার অনুগামীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, অথবা (৩) নিছক গুণামির দ্বারা প্রত্যেকটি সত্যগ্রহীর মাথা ভেঙে দিতে হবে। আমি আশা করি গবর্নেন্ট সত্যগ্রহীদের সঙ্গে সভ্যতা-সম্মত ব্যবহার করবেন...অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর বর্বরোচিত ব্যবহার করা হয়েছে...সত্যগ্রহের নীতি হিসাবে কতৃপক্ষ যত বেশী নিপীড়ন চালাবেন, সত্যগ্রহী ততবেশী অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হবে। বেচ্ছার চরম দুঃখ ভোগ করতে পারলে সাফল্য নিশ্চিত।...হিংসাকে জয় করার একমাত্র পন্থা হোল অহিংসা। আমি আশা রাখি ভগবান ভারতবাসীকে জ্ঞান ও শক্তি দেবেন, যেন হিংসা ও প্রলোভনের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতে পারে।...আপনি যদি লবণ তৈরী করার বিধি নিষেধ না তুলতে পারেন তাহলে আমি আমার অভিযান আরম্ভ করতে বাধ্য হব !

কিন্তু, যেদিন অভিযান শুরু হবার কথা তার পূর্ব রাতে করাচীতে রাত শোণে একটার সময় সৌরাষ্ট্রের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ত্রিশ জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে এসে গান্ধিজীর ঘুম ভাঙালেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গান্ধিজীর ঘুমের উপর হাত-বিজলীর আলো ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ?

—আপনি আমাকে চান, বেশ, অহুগ্রহ করে আমাকে মুখহাত ধোবার সময় দিন !

ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধিজীকে সময় দিলেন। দাঁত মাজতে মাজতে গান্ধিজী জিজ্ঞাসা করলেন—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, আমাকে কোন অভিযোগ গ্রেপ্তার করলেন ? ১২৪ খান্না নাকি ?

—না, ১২৪ খান্না নয়, আমি একটা লিখিত আদেশপত্র পেয়েছি।

আমাদের গান্ধিজী

—কিছু যদি মনে না করেন, আদেশ পত্রটা আমাদের একবার পড়ে শোনান।

ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ পত্রটি পড়ে শোনালেন—১৮২৭ সালের ২৫ আইনে গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করা হোল।

একটা বাজলো, গান্ধিজী তাঁর কয়েকটি দরকারী জিনিষপত্র ঝোলায় ভরলেন, কাগজপত্রগুলি দিলেন খেচ্ছাসেবকদের হাতে তারপর বললেন—প্রার্থনার জন্ত ক'মিনিট সময় দিন।

দশ মিনিট প্রার্থনা করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাত্রি ১টা ১০ মিনিটে গান্ধিজী পুলিশের লরীতে উঠে বসলেন। অন্ধকারের বুকে লরীখানি অদৃশ্য হয়ে গেল।

গ্রেপ্তারের আগে গান্ধিজী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি দিয়ে বান :

স্বরাজ আসবেই! ভারতবাসীকে অপরিমেয় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অপরকে আঘাত না করে নিজেকে মুক্ত্যর জন্ত প্রস্তুত করতে হবে, তাহলেই ভারতবাসী তার আদর্শকে জগৎসমক্ষে তুলে ধরতে পারবে। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার সহকর্মীরা যেন হতাশ না হন। আমি কেউ নই, সকলের মধ্যে যে অন্তর্ভাবী আছেন তিনিই এই সংগ্রামের নিয়ন্তা, তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে আমরা অগ্রসর হব। আমাদের সেই এক পথ—গাঁয়ের সবাই লবণ তৈরী করবে...মেয়েরা, মদ, আফিম ও বিলিভী কাপড়ের দোকানে ধর্না দেবে...আবালবুদ্ধ বণিজ্য নৃত্য কাটবে...বিলিভী বস্ত্র শোড়াতে হবে...কাউকে অস্পৃশ্য মনে করলে চলবে না...হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খ্রীষ্টানরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে...ছাত্রেরা সরকারী ইন্স্কুল ছাড়বে, কর্মচারীরা সরকারী চাকরী ছাড়বে, সবাই জনসেবায় আত্মনিয়োগ করবে, তাহলেই স্বরাজ্যলাভ সহজ হবে।...

পুলিশ-লরী এলো ট্রেনে, সেখান থেকে বোম্বের ট্রেন ধরা হোল। ট্রেনের জন্ত বখন তাঁরা ট্রেনে অপেক্ষা করছেন সেই সময়টুকুতে বিলাতের 'লণ্ডন টেলিগ্রাফ' কাগজের রিপোর্টার আসমীড-বার্টলেট সেখানে ছিলেন, তিনি লেখেন—নাটকের একটি দৃশ্য আমরা অভিনয় করছি। দৈব প্রেরিত এক মহাপুরুষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ভারতের কোটি কোটি নরনারী তাঁকে অবতার বলে মনে করে। কে বলতে পারে, শতবর্ষ পরে হয়তো এই মানুষটিকেই ত্রিশকোটি লোক ভগবান বলে পূজা করবে। বাকী গান্ধিজীর সঙ্গে ট্রেন ধরার জন্ত ট্রেনে দাঁড়িয়ে আছি। মহা-মানবকে বাকী করে আমার সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মনের মাঝে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি।...

আমাদের গান্ধিজী

সেখান থেকে বরিত্তলি অবধি হ্রেনে, তারপর মোটারে রেরোড়া কারাগার।

সারা ভারত গান্ধিজীর গ্রেপ্তারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো।

কলিকাতা বোম্বাই পুণায় হরতাল হোল, হুদুর পল্লীগ্রামেও তার প্রতিধ্বনি উঠলো। হাবড়া পকাননতলায় জনতা একখানি ট্রেন খামিয়ে দিল, পুলিশ গুলি চালিয়ে তাদের পনেরো জনকে জখম করলো। শোলাপুরে পকাশ হাজার মজদুর এক মিছিল বের করলো, ছ'টি পুলিশ-চৌকি পুড়িয়ে দিল, গুলি খেয়ে মরলো পচিশ জন, জখম হোল একশো জন। গাড়োয়ালি সৈন্যরা সীমান্ত প্রদেশে নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করলো।

সুমাত্রা থেকে পানামা, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা সর্বত্র প্রতিবাদ উঠলো। আমেরিকা থেকে ১০২ জন পাদরী বিলাতের প্রধান মন্ত্রী রাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে টেলিগ্রাম করলেন—গান্ধিজীর সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মিটিয়ে ফেলুন। দুর্ধোগ থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করুন।...

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ অহমিকায়, জনমতের কাছে মাথা নত করা তাদের রাজনীতি নয়, মানবতা ও মনুষ্যত্ব বলে কোন কথা তাদের অভিধানে নেই!

তিনি গ্রেপ্তার হবার পর কি করতে হবে সে সম্পর্কে গান্ধিজী আগেই নির্দেশ দিয়ে ছিলেন—আইন অমান্য শুরু করার পর আমার গ্রেপ্তার হুনিশিত।... আমার গ্রেপ্তারের পর ভারতের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে বারা অহিংসায় আত্মবান, তাঁরা সক্রিয় কর্মনীতি গ্রহণ করবেন, বর্তমান পরাধীনতার কাছে মাথা নত করবেন না... আমার পর সারা ভারতে কে নেতৃত্ব করবেন জানি না, কিন্তু সহকর্মীদের উপর আমার খেঁচা বিশ্বাস আছে।...পৃথিবীর সর্বত্রই গণ-আন্দোলন নেতা সৃষ্টি করে, এ ক্ষেত্রেও গার ব্যতিক্রম ঘটবে না।...আইন অমান্য আন্দোলন একবার শুরু করলে যে পর্যন্ত একজন মাত্র কর্মীও জেলের বাইরে থাকবে, কি জীবিত থাকবে, সে পর্যন্ত আন্দোলন থামে চলাবে না। সত্যিকারের সত্যগ্রহীর স্থান হবে, হয় জেলখানায়, নাহয় দান্দোলনের মাঝে, অথবা স্বরাজ আসতে পারে এমন কোন গঠনমূলক কাজে।

শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু স্বেচ্ছাসৈনিকদের নিয়ে খরসনার দিকে অগ্রসর হলেন, চম্বরে তিনি ঘোষণা করলেন—মহাস্বাভীর শ্রী ও রয় সেহকে পাষণ প্রাচীরের পাড়ালে আবদ্ধ করলেই আন্দোলন থেমে যাবে না। তাঁর নির্দেশ তিনি রেখে গেছেন, দুই নির্দেশই প্রাণবন্ত হয়ে জনগণের চিন্তা ও কর্মধারাকে প্রভাবান্বিত করবে, প্রাচীর সরকারের কোন নির্দেশই সে শক্তিকে শৃঙ্খলিত করতে পারবে না।

আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজীর আরও কাজ সম্পূর্ণ করতে এগিয়ে এলেন আড়াই হাজার খেচ্ছাসৈনিক, চারিদিক থেকে ধরসনার লবণগোলা আক্রান্ত হোল। পুলিশও নির্মমভাবে পুরো ছুটি খটা তাদের উপর লাঠি চালিয়ে গেল, একজনকে খুন করলো, অধম করলো, ছশোনকুই জনকে।

সেই দৃষ্টের বর্ণনা করে ভেলি-হেরাভের জর্জ-মোকাস লেখেন—এক পাহাড়ের উপর গাড়িয়ে আমি দেখছিলাম; স্বজাতীয় শাসকদের নির্মম কর্মতৎপরতা দেখে ইংরাজ হিসাবে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল...

হাজার হাজার মানুষ আঘাত পেলো কিন্তু প্রতিঘাত করলো না। বিলাতের ক্রি-ম্যান কাগজের ওয়েব মিলার লিখলেন—ধরসনার মত দৃষ্ট আমি জীবনে কখনও দেখিনি, মাঝে মাঝে এতো করুণ হয়ে উঠছে যে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। সবচেয়ে বিষয় লাগছে খেচ্ছাসৈনিকদের নিষ্ঠা, গান্ধিজীর অহিংসা নীতিকে তারা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে...

গান্ধিজী বিশ্বাস করতেন অহিংসা ও ভ্রাতৃত্ব দিয়ে শত্রুর মনকেও বদলে দেওয়া যায়। আর সারা ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে গান্ধিজীকে, সেই বিশ্বাস মৃত্যুভয়ের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেইজন্মেই পুলিশ ও মিলিটারীর লাঠি ও বেয়োনেটকে উপেক্ষা করে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতের গ্রামে ও সহরে, ধনীর প্রাঙ্গণ থেকে দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরে।

যে রালে কংগ্রেসের বৈঠক বসলো, নেতারা মন্তব্য করলেন—গান্ধিজী যে মহা অভিনয় শুরু করেছেন, তার জন্ত আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করছি। আমরা আইন অমান্ত আন্দোলনে বিশ্বাস করি, এবং পূর্ণ উদ্ভবে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী...

সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই আন্দোলনকে অতুরেই বিনাশ করতে চেয়েছিল কিন্তু গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বকে ও আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারে নি। বোম্বাইয়ের লাটসাহেব একসময় মন্তব্য করেছিলেন—গান্ধিজী অহিংসা নিয়ে যে পরীক্ষা শুরু করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এতোবড় পরীক্ষা আর হয়নি। তিনি ব্যর্থ হলেন বটে তবে আর এক ইকি অগ্রসর হতে পারলেই তিনি সফলকাম হতেন।

কিন্তু এই এক ইকি অগ্রসর হতে না পারলেও, গান্ধিজীর অসহযোগীরা বতটা অগ্রসর হয়েছিলেন তারই একটা মোটামুটি হিসাব করলে দেখা যায় :

বোম্বাইয়ে ত্রিশ কোটি টাকার বিলজী কাপড় কংগ্রেসীরা আটক করে।

আমাদের গান্ধিজী

মহা পীজা আকির্ষি সিদ্ধি প্রকৃতি মানক ত্রযোর বিজী এতো কবে যায় যে, কর
বাবর হাট লাখ টাকা কতি হয়।

বনকর বাবর বোল লাখ টাকা কতি হয়।

রাজস্বের সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা লোকসান হয়।

বরদৌলির চাবীরা খাজনা না দিয়ে সমস্ত ফসল পুড়িয়ে দিয়ে করোনা রাজ্যে
চলে যায়।

এ বছর কংগ্রেসের কোন বার্ষিক অধিবেশন বসলো না। সব নেতারা জেলে।
দেশের বুকে বিপ্লবের বহ্নিশিখা। রাজ-কাজ প্রায় অচল।

এই দুর্ঘোষের মধ্যে সাংবাদিক জর্জ ব্রোকাথের চেষ্টায় শ্রার ভেজ বাহাদুর সাপক
ও মুকুন্দরাম রাও, জয়াকর, গান্ধিজী ও বড়লাটের মধ্যে মিটমাটের আলোচনা শুরু
করলেন। জেলে বসেই নেতাদের পরামর্শ চললো। নৈনী জেলে ধারা ছিলেন
তাদের নিয়ে আসা হোল গান্ধিজীর কাছে যেরোড়া জেলে। কিন্তু শেব অবধি
কোন নিশ্চিন্তিই হোল না। কংগ্রেসের প্রধান সর্ভভেই বড়লাট রাজী হলেন না—
রাজবন্দীরা মুক্তি পেলো না।

কংগ্রেসীদের বাদ দিয়েই বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক বসলো। ভারত সরকার
তাদের প্রিয়পাত্রদের সেখানে পাঠালেন। ন' সপ্তাহ ধরে নানা আলোচনা চললো,
কিন্তু ভারতবাসীর মনে তার কোন প্রভাবই পড়লো না।

সম্রাট ঘোষণা করলেন—ভারতের ইতিহাসে নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হোল...কংগ্রেস
কর্মীদের সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা হবে...

কদিন পরেই বড়লাট ত্রিশ জন কংগ্রেসী নেতাকে বিনা সর্ভে ছেড়ে দিলেন।
কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানের উপর যে সব বিধি-নিষেধ ছিল তা'ও তুলে নিলেন।

পণ্ডিত মতিলাল মুর্মু অবস্থার পড়েছিলেন এলাহাবাদে, গান্ধিজী ও নেতারা
আগে গেলেন সেখানে। রজন-রশ্মি পরীক্ষা করার জন্য মতিলালকে নিয়ে যাওয়া হোল
লখনৌ। গান্ধিজীও গেলেন তাঁর সঙ্গে। কয়েকদিনের মধ্যেই মতিলাল মারা
গেলেন। শোকাচ্ছন্ন গান্ধিজী অশ্রু-সজল চোখে সাংবাদিকদের কাছে বললেন—
আমার মানসিক অবস্থা সাধারণ একজন বিধবার চেয়েও হীন। একজন বিধবা বৈধব্যের
পরিজ্ঞতা দিয়ে আমার স্বতিকে প্রভা জানাতে পারে, সে সহযোগিতাও তো আমার
নৌ। মতিলালের বুদ্ধিতে আমি বা হারালাল তা আর কিরে পাব না। আজ
কোন গিরিজহার অন্তরালে আত্মগোপন করছে ইচ্ছা করে...

এলাহাবাদে জন-সাধারণের উদ্দেশ্যে গান্ধিজী বলেন—মতিলাল দেশের জন্য সব

আমাদের গান্ধিজী

দিয়ে গেছেন, তাঁরই আদর্শ সামনে রেখে সর্ব্ব দিতে না পারলেও আমরা যেন দেশের স্বাধীনতার জন্য বখাসর্ব্ব দান করি...

পণ্ডিত হুতিলাল তাঁর বিরাট প্রাসাদ 'আনন্দ-ভবন' দেশের কাজে দান করে দান, সেখানেই কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশের আবহাওয়া তখনও শান্ত হয়নি। পুলিশের জুলুম তখনও চলছে।

গান্ধিজী বিলাতের 'নিউজ ক্রনিকলে' লিখলেন—পুলিশের অত্যাচার আগের মতই চলছে। নিরীহ লোক মার খাচ্ছে। বিনা বিচারে সম্রাজ্য লোকদের বাড়ীঘর জ্বিনেপত্র কোক হচ্ছে। সেদিন এক মিছিলে মেয়েদের চুলের হুটি ধরে হুট হুট লাগি মারা হয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে কংগ্রেসীদের পক্ষে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করা অসম্ভব।

এই সম্পর্কে বড়লাটের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার জন্য গান্ধিজী এক চিঠি লিখলেন—আপনার সঙ্গে মুখোমুখি একবার কথা বলতে চাই।

বড়লাট রাজী হলেন, গান্ধিজী লর্ড আর্কইনের সঙ্গে দেখা করলেন।

পনেরো দিন ধরে আলাপ আলোচনা চললো।

চার্লিস সাহেব এইসময় বিলাতের এক সভায় টিম্বলী কার্টলেন : মিডল-টেম্পেলের ব্যারিষ্টার দুর্দান্ত প্রকৃতির মিটার গান্ধী, প্রাচ্যের এক ককির সঙ্গে অর্ধ নগ্ন বেশে লাট সাহেবের প্রাসাদে প্রবেশ করছে—এদৃশ্য ভাবলেও মনে শঙ্কা জাগে, বমনোজ্ঞেয় হয়। একদিকে তিনি এখনও আইন সম্রাজ্ঞ অভিযান সংগঠন ও পরিচালনা করছেন আরেক দিকে সম সর্ভে সম্রাটের প্রতিনিধির সঙ্গে সন্ধির আলোচনা চালাচ্ছেন... আন্তরিকতাপূর্ণ কথা বলার পক্ষে এ এক বিস্ময়কর পরিবেশ—একদিকে বিবেচনাপূর্ণ কংসকারী গোয়ার ধর্মচারী, আরেকদিকে ভারতের রাজ প্রতিনিধি। আশ্চর্যের বলা হচ্ছে আলোচনা 'মধুর' হচ্ছে।...

শুক্রব রটলো—আরব সাগরের 'কুড়িয়া-মুড়িয়া' ধীপে কংগ্রেসী নেতাদের নির্বাসিত করা হবে।

গান্ধিজী বিবৃতি দিলেন—অতীতের কথা ভেবে হুটিশের তুলস্রাস্থি বিচার করে কোন লাভ নেই। নিজের অন্তরের পানে তাকানোই লাভজনক। আমাদের ব্যবস্থা আমরা করলে, হুটিশেরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারবে। আমাদের ক্রটি ও দুর্বলতা অনেক। আমাদের অক্ষমতার জন্য হুটিশের উপর দোষারোপ করি কেন? সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে না পারলে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। সমস্যা সমাধানের ছুটি রাজ পথ আছে—অহিংসার রাজকীয় পথ এবং হিংসার পথ।

পনেরো দিন ধরে আলোচনা করে বড়লাট গান্ধিজীর সর্ভে রাজী হলেন :

রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হবে ।

সব ক'টি অভিজ্ঞাল তুলে দেওয়া হবে ।

লবণ শ্রমতের স্বাধীনতা দেওয়া হবে ।

শান্তিপূর্ণ স্বরূপে বাধা দেওয়া হবে না ।

এক গান্ধিজী রাজী হলেন বিলাতে যে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক কসবে, তাতে ভারতের পক্ষে কথা বলার ক্ষমতা তিনি বিলাতে বাবেন ।

এই চুক্তি সম্পর্কে দেশবাসীর কাছে গান্ধিজী বললেন—এতে কোন পক্ষ জয় হয়েছে তা বিচার করা সম্ভব নয় । আমি বলি দু'পক্ষই জয়ী হয়েছে । তবে কংগ্রেসের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যে না পৌঁছানো অবধি জয়ের প্রশ্নই ওঠে না ।...

কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা—স্বরাজ ।

এই স্বরাজ-পাওয়া সম্পর্কে গান্ধিজী সত্যই কি ভাবেন সেই সম্পর্কে জনকয়েক সাংবাদিক পরের দিন গান্ধিজীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন :

সাংবাদিক—আপনি আপনার জীবদ্দশার মধ্যে পূর্ণ স্বরাজ পাবার আশা রাখেন কি ?

গান্ধিজী—আমি দৃঢ়চিত্তে সেই লক্ষ্যের পানেই তাকিয়ে আছি । আমি এখন ইংরাজদের মত নিজেকে বাষট্টি বছরের যুবক বলে মনে করি ।

সাংবাদিক—স্বরাজ না পেলে কি আপনি সযত্নে আশ্রমে ফিরে বাবেন না ?

গান্ধিজী—না । পূর্ণ স্বরাজ লাভের ত্রুত উদ্দ্যোগিত না হওয়া পর্যন্ত আশ্রমে গিয়ে আমি থাকবো না ।

সাংবাদিক—‘পূর্ণ স্বরাজ’ সঙ্ক্ষে আপনার ধারণা কি ?

গান্ধিজী—পূর্ণ স্বরাজের ভিত্তি হবে পূর্ণ সাম্য । সেই সাম্য সঙ্ক্ষে জনসাধারণের কোন ধারণা নেই । সাম্য বলতে আমি বুঝি বিলাতের ডাউনিং-স্ট্রীট ভারত শাসনের কেন্দ্র না হয়ে দিল্লী কেন্দ্র হবে ।... ব্রিটিশ বাস্তববাদী জাত, স্বজাতির স্বাধীনতা তারা ভালবাসে, তারা আরেক পদ অগ্রসর হবে যখন তারা অপরের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে । ভারতকে সমান অধিকার দেবার সময় যদি কখনও আসে, তাহলে আমি জানি, ব্রিটিশেরা বলবে যে এইটাই তারা চিরদিন চেয়েছিল ।

সাংবাদিক—ইংরাজেরা অন্ত দেশ শাসন করুক এই কি পছন্দ করেন ।

গান্ধিজী—আমার পছন্দ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না । আমি শুধু নিজের দ্বারা শাসিত হতে চাই ।

আমাদের গান্ধিজী

সাংবাদিক—বুটশ পতাকাতলে ‘পূর্ণ স্বরাজ’ লাভ কি আপনি পছন্দ করেন ?

গান্ধিজী—না, বর্তমান পতাকা আমি মেনে নিতে রাজী নই। যদি সম্ভব হয় একটি সমধারণ পতাকা চলতে পারে। প্রয়োজন হলে পৃথক পতাকা করতে হবে।

সাংবাদিক—হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য আসতে কি বহু বছর লাগবে ?

গান্ধিজী—আমার তা মনে হয় না। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কোন অনৈক্য নেই। যে অনৈক্যকে আমরা এতো বড় বলে গণ্য করছি তা উপরের স্তরের। এই উপরের স্তরের মানুষগুলিই ভারতের রাজনীতিক মনোভাবের প্রতীক।

সাংবাদিক—‘পূর্ণ স্বরাজ’ পাবার পর আপনি কি জাতীয় সৈন্তবাহিনী তুলে দেবেন ?

গান্ধিজী—আদর্শবাদী হিসাবে বলবো ‘হ্যাঁ’। কিন্তু আমার জীবদ্দশায় আমি তা দেখতে পাব বলে মনে হয় না। কোন সৈন্তবাহিনী না রাখার মত অবস্থায় পৌঁছাতে ভারতবাসীর বহু বৎসর লাগবে।...

সাংবাদিক—অদূর ভবিষ্যতে বলশেভিকরা ভারত আক্রমণ করতে পারে বলে কি আপনি মনে করেন ?

গান্ধিজী—না, সে ভয় আমার নেই।

সাংবাদিক—বলশেভিক নীতি ভারতে বিস্তার লাভ করছে বলে কি আপনি শঙ্কিত ?

গান্ধিজী—ভারতবাসীকে অতো দুর্বল বলে আমি মনে করি না।

সাংবাদিক—বলশেভিকবাদের মধ্যে ভালো কিছু আছে বলে আপনি মনে করেন ?

গান্ধিজী—ভালো যদি কিছু থাকে, ভারতবাসী তা গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করবে না।

সাংবাদিক—আপনি ভবিষ্যৎ গবর্নমেন্টে প্রধান মন্ত্রী হতে রাজী আছেন ?

গান্ধিজী—না। যাদের মনের যৌবন আছে, হাতে শক্তি আছে তাদের জন্য সে পদ রিজার্ভ থাকবে।

সাংবাদিক—যদি জনসাধারণ আপনাকে চায় ?

গান্ধিজী—আমি তাহলে আপনাদের মত সাংবাদিকদের আড়ালে লুকাবো।

অনেক মার্কিন সাংবাদিক—পূর্ণ স্বরাজ পাবার পর আপনি কি কল-কারখানা তুলে দেবেন ?

গান্ধিজী—মোটাই না। বরং আমেরিকা ও বৃটেনে বেশী কলকব্জার অর্ডার দোব।

আবাহনের গান্ধিজী

সাংবাদিক—আপনি কি বিশ্বাস করেন যে অহিংসা আন্তর্জাতিক জটিলতার সমাধান করতে পারবে ?

গান্ধিজী—আমি বিশ্বাস করি অহিংসা তা পারবে। ভারতবর্ষ এক অকৃত্রিম দেশে সৈন্ত হয়তো থাকবে, কিন্তু মনোভাব বদলে যাবে। জাতিগুলি সৈন্ত বাহিনীর চেয়ে আলাপ আলোচনার উপর বেশী আস্থা রাখবে। সৈন্ত বাহিনী শেষে দ্বন্দ্বীয় হস্ত হয়ে দাঁড়াবে, ঠিক পুতুলের মত, অতীতের একটা শেষ চিত্রের মত, জাতির বন্ধক হিসাবে নয়।

এই প্রশ্ন উত্তরের ভিতর দিয়ে সাধারণের কাছে গান্ধিজীর নীতি স্বচ্ছ হয়ে উঠলো।

গান্ধি-আরুইন চুক্তির সর্বগুলি বিভিন্ন প্রদেশের লাট সাহেবেরা ঠিকমত মেনে নিল না। চারিদিক থেকেই পুলিশের অনাচারের খবর আসতে লাগলো।

অবস্থা চরমে উঠলো, লাহোর বড়য়ন্ত্র মামলার বিচার নিয়ে। সাওদার সাহেবের হত্যার ব্যাপারে ভগৎসিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। গান্ধিজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন, অনেক আলোচনা করলেন, এঁদের প্রাণদণ্ড মকুব করার জন্তু চেটার কোন ক্রটি রাখলেন না।

কিন্তু বড়লাট বাহাদুর গান্ধিজীর অনুরোধ রাখলেন না। ওই দিনজনের চুপি চুপি ফাঁসী দেওয়া হোল।

করাচিতে তখন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হবার উদ্ভোগ হচ্ছে, এমন সময় খবর ছড়িয়ে পড়লো। সারা ভারতের তরুণেরা ফুঁসে উঠলো, করাচি থেকে বারো মাইল দূরে গান্ধিজী ট্রেন থেকে নাবতেই করাচির ছেলেরা কালো নিশান দেখিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করলো, গান্ধিজীকে তারা উপহার দিল কালো ফুলের তোড়া। হুড়াধধাবুকে সভাপতি করে 'নওজোয়ান সভার' বৈঠক বসলো, তারা বললো—গান্ধিজী ভুল করেছেন, ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করা চলে না।

ভগৎ সিংয়ের দলের ফাঁসীর সম্পর্কে চরম নিশ্চিন্তি না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের বৈঠক বসার কোন প্রয়োজন নেই, যনে করে 'নওজোয়ানেরা' কংগ্রেসের অধিবেশনের বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো। দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহন ও অকৃত্রিম নেতারা অনেক চেষ্টা করে তাদের শাস্ত করলেন, গান্ধিজী হুড়াধ বাবুকে ডেকে পাঠালেন নিজের কাছে।

কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো বটে, কিন্তু তরুণদের কাছে গান্ধিজীর জনপ্রিয়তা কমে গেল, ইংরাজের সঙ্গে তখনই একটা বোঝাপড়া করার জন্তু তখন সারা দেশ চকল।

আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজী ও গবর্নমেন্টের এই শঠতার কয় কয় হন নি, কিন্তু চল্লিশ কোটি নরনারীর শুভাশুভ তাঁর উপর নির্ভর করছে, উত্তেজনার বশে হঠাৎ কিছু করে ফেলা ভোঁ তাঁর সাজে না। বাহিরে বিশেষ কোন ভাবান্তর প্রকাশ পেল না, মনের ব্যথা মনে রেখে, বোম্বাইয়ে তিনি আক্কাইনের সঙ্গে দেখা করলেন, আক্কাইন বিলাত যাচ্ছিলেন, গান্ধিজী বহুভাবেই তাঁকে বিদায় অভিবাদন জানালেন।

নতুন বড়লাট এলেন লর্ড উইলিংডন। নতুন করে সরকারী জুলুম শুরু হোল—ধরপাকড়, লাঠিবাজী! গান্ধিজী ক্ষুব্ধ হলেন, বড়লাটকে তিনি জানিয়ে দিলেন—দেশের বর্তমান অবস্থায় তাঁর পক্ষে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়া সম্ভব নয়, সরকার আক্কাইনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

টিকিট কার্টা হয়েছিল, মহাত্মাজী, সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মালব্য তা বাতিল করে দিলেন।

আবার নতুন করে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধিজীর কথাবার্তা শুরু হোল, নতুন করে সন্ধির বিচার করা হোল। লর্ড উইলিংডন নতি স্বীকার করলেন। গান্ধিজী রাজী হলেন বিলাত যেতে। তখন আর বেশী সময় হাতে ছিল না, ঠিক সময় গান্ধিজী বেন জাহাজ ধরতে পারেন, সেজন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হোল।

গান্ধিজী বিলাতে যাচ্ছেন, খবর ছড়িয়ে পড়লো।

রাত দুপুরে গান্ধিজী বোম্বাইয়ে নাবলেন, হাজার হাজার লোক তাঁর জন্ত অপেক্ষা করছিল। অতো রাতেই আঞ্জাম ময়দানে বিরাট সভা বসলো মহাত্মাজীকে বিদায় জানাবার জন্ত। গান্ধিজী বললেন—ভারতের কোটি কোটি লোক পেট ভরে খেতে পায় না। তাদের অবস্থার উন্নতির জন্ত কংগ্রেস চেষ্টা করছে। সেই কংগ্রেসের নির্দেশেই আমি বিলাত যাচ্ছি। যদি আমি সেই বিশ্বাস না রাখতে পারি তাহলে তোমরা আমাকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দিও, ইচ্ছা হলে আমাকে খুন করতে পার, তা আমি অহিংসা বলেই মনে করবো।...ইংরাজ, মুসলমান, খৃস্টান, শিখ, কাকর বিক্কেই আমার কোন বিদ্বেষ নেই। সকলের অধিকারই আমার কাছে সমান।—ইহাই আমার ধর্ম। তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর, তোমাদের শুভেচ্ছা পেলে আমি অসুস্থ হব, ভগবান আমাকে আশীর্বাদ করুন।

অনন্তা অভিনন্দন জানালো—গান্ধিজীকি জয়! বন্ধেমাতরম !!

পরদিন দুপুর সাড়ে বারোটার সময় গান্ধিজী রাজপুতানা জাহাজে গিয়ে উঠলেন। তাঁকে জাহাজে উঠিয়ে দিতে এলেন বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারপতি আর পুরুষোত্তম দাস, পণ্ডিত অহরলাল, সর্দার বল্লভভাই, শেঠ বহুনালাল ও দেশপ্রিয় বটীন্দ্রমোহন।

আহাভের গান্ধিজী

আহাভে আর কাকর ওঠার হুকুম ছিল না, কিন্তু কে কার কথা শোনে ? কত লোক এসে গান্ধিজীর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল। জেটীতে শত শত কংগ্রেস ডলেনটিয়ারের মুখে বিউগিল বেজে উঠলো, গেকরা শাড়ী পরা খেচ্ছাসেবিকারা পতাকা উড়িয়ে গার্ড-অব-অনার আনাগো। শ্মিত হাতে হাত জোড় করে গান্ধিজী বিদায় নিলেন। আহাভ ছেড়ে দিল।

১৯৩১ সালের ১৫ই আগস্ট।

বেলা একটার সময় বোম্বাই বন্দর থেকে ‘রাজপুতানা’ আহাভ ছাড়লো। ডেকের উপর রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহাত্মাজী, আর তাঁর পাশে ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী বীরা বেন, মহাদেব দেশাই, শ্রীদেবদাস গান্ধী, সত্য প্রভাশংকর পট্টনি, প্যারীলাল, ও বনভ্রাম দাস বিরলা।

সামনে জেটীর উপর দণ্ডায়মান শত সহস্র মানুষের জনতা, ক্রমশঃ বাত্মীদের চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দূরান্তের মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের জয়ধ্বনি—‘বন্দে মাতরম্ ! মহাত্মাজীকি জয়’ ! নীল জলরাশি চারিপাশের দিগন্তের সীমানাকে ডুবিয়ে দিল। রেলিংয়ের ধার থেকে মহাত্মাজী সরে এলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকের পাশে যেখানে তাঁর মাল-পত্তর ছিল।

সুটকেশ আর বিছানাপত্তরের বাহুল্য দেখে মহাত্মাজী চমকে উঠলেন, বললেন—এতো জিনিষ কি হবে ? আমরা জগতের সব চেয়ে গরীব দেশের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছি, সেখানে আমাদের সেই যতই চলতে হবে। সিমলাতেও তো শীত কম পড়ে না, সেখানে তোমরা একখানি ধুতি, একটি জামা আর একজোড়া শ্রাওল পরে চালিয়ে দিয়েছ, আর লওনে সে ভাবে চলতে পারবে না ? সেখানে কি এতোই শীত পড়ে।

কাজেই অতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রগুলি ছাড়া বাকী সব এডেন থেকে কেবল পাঠানোর ব্যবস্থা হোল।

মহাত্মাজী ডেকের একপাশে একটু আয়গা বেছে নিলেন, সেইখানে একখানি বন্ধরের চাদর বিছিয়ে তিনি চরকা নিয়ে বসলেন।

চরকা কাটতে কাটতে কোন এক সময় হয়তো অবলাদ আগে, ডেকের উপর খানিকটা বেড়িয়ে নেন। হাঁটু অবধি কাপড়-পর্য্যায় মাছবাটির পানে ছিম্ছিম সাহেব মেয়েরা তাকিয়ে দেখে। এই বাষট্টি বছরের অর্ধনর সন্ন্যাসী সারা ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর মনকে কেমন করে জয় করলো তাই ভাবে হয়তো।

ওদিকে আহাভের বেতার বয়ে একটি পর একটি অভিনন্দন-বাণী আসতে থাকে এই মাছবাটিকে উদ্দেশ্য করে :—

আমাদের গান্ধিজী

—‘সিটি অফ বরোদা’ জাহাজের যাত্রীরা আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে—

—‘ক্রেকেভিয়া’ জাহাজের যাত্রীরা আপনার সাক্ষ্য কামনা করে—

—‘বৃটিশ সোমালিল্যান্ডের’ ‘বারবারা’ সহরের বাসিন্দারা আপনাকে আনন্দ-অভিবাদন জানাচ্ছে।

—মিশরের যা, জগলুল পাশার পত্নী জানাচ্ছেন—মহাভারতের মহান জননায়ককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, সর্বান্তঃকরণে আপনার সাক্ষ্য কামনা করি—

—কায়রোর ‘অল্‌বলঘ’ সংবাদপত্র আপনার ভিতর দিয়ে ভারতকে নমস্কার করছে। কনকারেন্সে ভারতীয় প্রচেষ্টার সাক্ষ্য কামনা করি।

—ওয়াস্ক্‌দ সম্প্রদায়ের সভাপতি মুস্তাফা এল্‌ নাহাশ পাশা জানাচ্ছেন—স্বাধীনতা-কাহী মিশরের পক্ষ থেকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা আপনাকে আজ আমি অভিনন্দিত করছি। আপনার যাত্রাপথ নিরাপদ হোক, ভগবান আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। আপনার সংকল্প যেমন উদার, আপনার সাক্ষ্যও তদনুযায়ী হোক। আপনার প্রত্যাবর্তন শুভ হোক। যখন আপনি কিরবেন তখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আনন্দলাভ করবো,—আমার দেশবাসীও তখন আপনাকে দেখার আনন্দ লাভ করবে। আদর্শ বজায় রাখার ক্ষমতা আপনি যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার জন্য মিশরবাসীরা সেই সময় আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করবে। ভগবান আপনার জীবন দীর্ঘ করুন, আপনার চেষ্টাকে জয়যুক্ত করুন।

মহাস্বামীজীর কাছে বার্তাগুলি পৌঁছে দেওয়া হয়, সহাস্ত্রে তিনি সেগুলি পাঠ করেন, তারপর আবার চরকার হাতল ঘুরিয়ে চলেন।

ছোট ছোট ইংরাজ ছেলেমেয়েরা মহাস্বামীজীকে ঘিরে বসে, বিশ্বের কথা বলে থাকে,—দেখে কি ভাবে তুনো থেকে স্মৃতি বেরিয়ে আসে, চাকা ঘুরে...মহাস্বামী তাদের মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসেন, কখনো বা কাকুর কান ধরে টানেন, কখন বা কাকুর পিঠে একটা চাপড় মারেন—দেখতে দেখতে দিব্যি বন্ধুত্ব জন্মে ওঠে।

মহাস্বামীজী কেবিনে খেতে গেছেন এমন সময় আশ্বে আশ্বে দরজাটি ঠেলে একটি ছোট মুখ দরজার উকি মারলো। মহাস্বামীজী হাসলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই? ভেতরে এসো—

হাসতে হাসতে ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়ালো, তার লোভী দৃষ্টি ছিল খালার আত্মকণ্ঠস্বর পানে। মহাস্বামীজী হেসে আঙুরের খালাটি তার হাতে তুলে দিলেন। ছেলেটি একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আবাদের গাছিকী

একটু বাদেই খালি খালাখানি সে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

জাহাজ এসে লাগলো এভেনে।

সেখানকার ভারতীয়েরা মহাত্মাজীকে নিয়ে গেল এক অভিনন্দন সভায়।

কিন্তু সভা শুরু হবার আগেই এক গোলযোগ বাধলো। ওখানকার শাসনকর্তা বললেন সভায় ভারতীয় জাতীয় পাতাকা ওড়ানো চলবে না।

মহাত্মাজী বললেন—ভারতীয়দের সভায় জাতীয় পতাকা উড়বে না, এ আমি করনাও করতে পারি না। যে পতাকার জন্ত লোকে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে সেই জাতীয় পতাকাকে বাধ দিয়ে ভারতের কোন জন-নায়ককেই সম্মান দেখানো যেতে পারে না। সভায় আমি যাব না।

এভেনে ৫০০০ লোকের বাস, তার মধ্যে ৫৫০০ জন ভারতীয়,—শতকরা দশ-জনও বেশী। এরা সবাই মিলে একটা গোলযোগ বাধিয়ে তুলবে দেখে শেষে প্রেসিডেন্ট তাঁর মত পাল্টালেন—সভার মাঝে তিনরঙা নিশান উড়লো।

গাছিকীও সভায় গেলেন।

সেখানকার বাসিন্দারা মহাত্মাকে অভিনন্দিত করে ৩২৮ খানি গিনি উপহার দিল।

মাসে দীতে মহাত্মাজী জাহাজ থেকে নামলেন। দীনবন্ধু এওরুজ তখন ওখানে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে এলো একদল ছাত্র, বললো—আপনাকে বেতে হবে আবাদের সভায়।

বন্ধুর থেকে সভা অবধি পথের মাঝে দু'সারি যাত্রী দাঁড়িয়েছিল, ভারতের এই অর্থনয় জননায়কটিকে দেখার জন্ত।

সভায় গাছিকী অহিংসার কথা বলেন—

অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র নয়, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লোকের হাতিয়ার। একজন শক্তিশালী জুলু একজন যুরোপীয়ান বালকের হাতে একটি রিকলভার দেখলে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু ভারতের রমণীরা পুলিশের লাঠির আঘাতে বিচলিত হয় না, অকম্পিত যেহে দাঁড়িয়ে থাকে। যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করা বা শত্রুর হাতে হত হওয়া খুবই সাহসের পরিচায়ক। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ সহ্য করা ও সেজন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ না করা তার চেয়েও বেশী সাহসের কাজ...

আশাহের গান্ধিজী

মাসে ই থেকে মহাত্মাজী ট্রেনে উঠলেন।

পথে প্যারিস স্টেশনে সাংবাদিকেরা গান্ধিজীকে ঘিরে ধরলো, তাদের পিছনে প্রাটেক্সভার্ভি জনতা। সবাই স্টেশন মাটারকে বললো ট্রেন পাঁচ মিনিট পরে ছাড়লেও চলবে, কিন্তু এই মহামানবকে একবার ভালো করে দেখে নেবার, দুটো মুখের কথা শোনার এই সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

সাংবাদিকেরা কথাবার্তা শুরু করলেন।

ট্রেনখানি ক' মিনিট দেরী করেই ছাড়লো।

ইতালি ও ফ্রান্সে গান্ধিজীর এই জনপ্রিয়তা সকল ইংরাজের সহ্য হোল না।

‘ডেলিয়েল’ লিখলো—অভ্যর্থনার দীনতায় মিটার গান্ধী নিরাশ হয়েছেন...

‘ইউনিং স্ট্যাণ্ডার্ড’ মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্বকে ছোট করে দেখানোর জন্ত লিখলো—প্রিন্স-অফ-ওয়েলস যখন ভারতে আসেন মিটার গান্ধী তখন তার সামনে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

তবু লগুনে যখন মহাত্মাজী ট্রেন থেকে নামলেন তখন স্টেশনে ভীড় কম ছিল না। মোটার প্রস্তুত ছিল, বরাবর মহাত্মাজীকে নিয়ে আসা হোল ‘ফ্রেগুস মিটিং হলে’। হলটির ভিতরে তখন ভিল ধরণের স্থান ছিল না, বাইরে পথের উপর হাজার হাজার নরনারী বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে ভিড়ছিল—মহাত্মাজীকে একবার দেখার জন্ত, মুখের দুটো কথা শোনার জন্ত।

ইউ-এও লগুনের গরীব পল্লী। সেখানে মুরিয়েল লিটারের আশ্রম ‘কিংসলি হলে’ মহাত্মাজী আশ্রয় নিলেন।

গোল টেবিল বৈঠক বসেছিল সেন্ট-জেমস প্রাসাদে। কিংসলি হল থেকে অনেকটা পথ। সুবিধার জন্ত অনেকে বললো—ওয়েস্ট-এও আমার বাড়ীতে এসে থাকুন।

কিন্তু গান্ধিজী গরীব পাড়া ছাড়তে রাজী হলেন না।

ছ’চার দিনেই পাড়ার গরীব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর দিবি ভাব জমে গেল তিনি হলেন তাঁদের—গান্ধিখুড়ো।

সকালে গান্ধিজী প্রাতঃ ভ্রমণে বেরুতেন, বিঁর বিঁর করে বরক পড়ছে, কনকনে শীতের হাওয়া। বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে তখন যাহা পথে কেবোয় না, খবরের শাখা চারুখানি গায় দিয়ে গান্ধিজী তখন ভ্রমণে বের হলেন, এক জোড়া

আবাসের গাঙ্গিজী

মোজা অবধি পায় নাই, ত্রাণেল পরে নির্ধিবাবে তিনি তুবারাচ্ছর পথের উপর হেঁটে চলেন। বাবটি বছরের মাহুয, কিন্তু শীতকে তিনি জয় করেছেন।

একদিন চেয়ারিং ক্রশ টেশনের কাছে মহাআজী এইভাবে বেড়াচ্ছেন। তখনও লণ্ডন শহরের ঘুম ভাঙেনি।

এক ট্যাক্সি ড্রাইভার ওভার-কোট মূড়ি দিয়ে গাড়ীর মধ্যে বসেছিল, হঠাৎ তার চোখে পড়লো পথের উপর দিয়ে একটি লোক হেঁটে চলেছে। বুড়ো মাহুয সামনের দিকে হুঁকে পড়েছে অথচ গায়ে একটা গরম কোট নেই, পায়ে মোজা নেই, একখানি শাদা স্থতির চাদর গায়, এক জোড়া চম্পল পায়, হন হন করে হাঁটছে। ও কোন মাহুয নয়, নিশ্চয়ই অশরীরী কোন আত্মা—কোন ভূত!

লোকটি তার গাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে, এবার বোধ হয় তাকে ধরবে, গাড়ীর উলটো দিকের দরজা খুলে পথে নেবেই সে ছুট দিল।

তারপর যখন সে শুনলো যে ইনিই গাঙ্গিজী, তখন বললো—অমন মাহুযের পক্ষেই এই তুবারাচ্ছর পথে মোজা পায় না দিয়ে বেড়ানো সম্ভব!

ছোট ছেলেনেয়েরা তাঁকে পথে দেখতে পেলেই সামনে এসে দাঁড়াতো, হুঁহাত তুলে বলতো—গাঙ্গিখুড়ো, নমস্কার!

চরকা কাটার সময় ছেলের দল কাছে এসে বসতো, গল্প করতো, কেউ বলতো—গাঙ্গিখুড়ো, আপনি কি খান?

কেউ বা জিজ্ঞাসা করতো—গাঙ্গিখুড়ো, আপনি জুতো পারেন না কেন?

২রা অক্টোবর তারা গাঙ্গিজীর জন্ম উৎসব করলো। যার যেমন খেলনা পছন্দ, পাঠিয়ে দিল খুড়োর কাছে, কেউ বা লিখে দিল—খুড়ো, এমনি জন্মতিথি যেন তোমার জীবনে ব্যর ব্যর ফিরে আসে।

আবার কেউ বা এসে নিয়ন্ত্রণ করলো—খুড়ো, তুমি আমাদের ওখানে চলো তোমার জন্মদিনে আমরা বাজনা বাজাব, গান গাইব, মোমবাতি জালিয়ে উৎসব করবো।

একদিন এক ভুট্টা মেয়েকে তার বাবা ধরে আনলো গাঙ্গিজীর কাছে। বললো—আমি সকালে উঠতে পারি না, আর জেন রোজ কিল-চড় মেয়ে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেয়, বলে—‘বেলা অবধি ঘুমতে নেই, দেখনা গাঙ্গিখুড়ো কত ভোরে ওঠে!’ আগে যারতে উঠলে বলে—‘জান না, গাঙ্গিখুড়ো বলেছেন, যার খেয়ে যার ফিরিয়ে দিতে নেই!’ আপনি ওকে একটু বকে দিন।

হুঁহাত বছরের মেয়ে জেন বলে—আমি কি বিচ্ছে কথা বলেছি খুড়ো? তুমি বল না—‘যার খেয়ে যার ফিরিয়ে দিতে নেই’!

আমাদের গান্ধী

মহাত্মাজী হেসে বললেন—নিজে না যেনে তোমার বাবাকেই বুঝি সেটা আগে মানাতে চাও।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক শুরু হোল ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে।

লণ্ডনের সেন্ট জেমস প্রাসাদ।

লর্ড প্রাংকি ছিলেন সভাপতি। আর সভাপতির বাঁপাশের প্রথম আসন দেওয়া হয়েছিল মহাত্মাজীকে।

এই বৈঠক চলছিল এগারো সপ্তাহ।

যেদিন অধিবেশন শুরু হোল সেদিন মহাত্মাজীর মৌন-দিবস, কোন কথাই তিনি বললেন না। পরদিন পুরো এক ঘণ্টা বক্তৃতায় ভারতবাসীর অধিকার সম্পর্কে যা কিছু বলা দরকার তার সবই তিনি বলেন।

মহাত্মাজী কংগ্রেসের পরিচয় দেন প্রথমেই :

ভারতের যতগুলি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে, কংগ্রেস তাদের মধ্যে সব চেয়ে পুরানো। কংগ্রেসের বয়স পঞ্চাশ বছর।...এর প্রথম পরিকল্পনা একজন ইংরেজের—এলেন অকটোভিয়ান হিউম।...স্মার কিরোজসা মেটা ও দাদাভাই নোরজী ছিলেন পার্শ্ব।...রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জী ছিলেন ইণ্ডিয়ান খুস্টান।...মৌলানী মহম্মদ আলী কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। আনি বেশাভ ও সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী হয়েছিলেন।...কংগ্রেস ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেয় না। কংগ্রেস স্ত্রী-পুরুষও ভেদ করে না।...সামন্ত রাজাদের পক্ষও কংগ্রেস গ্রহণ করেছে। দাদাভাই নোরজী কান্দীর ও মহীশূরের পক্ষ গ্রহণ করেন, এই দুটি রাজবংশের ঋণ কংগ্রেসের কাছে সাফা করা হয়।...কংগ্রেস নিখিল ভারত চরকা সমিতি আরফ্‌ হু'হাজার গ্রামে আশী হাজার নর-নারীকে কাজ দিয়েছে এবং তাদের প্রায় অর্ধেকই মুসলমান।...কংগ্রেস ভারতবর্ষের কৃষকদেরও প্রতিনিধি। আমরা এই মত সম্পর্কে যদি কেহ প্রতিবাদ করেন, আমি তাঁকে বিতর্কে আহ্বান করছি।...এখনও যদি ভারতীয় জেলের কাগজপত্র আপনারা পরীক্ষা করেন তবে বহুসংখ্যক মুসলমানকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে দেখতে পাবেন। কংগ্রেসের নামে কয়েক হাজার মুসলমান গুলি বছর জেলে গিয়েছিল, আজও কংগ্রেসের খাতাশত্রে কয়েক হাজার মুসলমানের নাম পাওয়া যাবে।...হাজার হাজার অশুভের নামও কংগ্রেসের খাতাশত্রে আছে, যা ভারতীয়

আমাদের দাবী

খৃষ্টানকেও খাতাপত্রে দেখতে পাওয়া যাবে।...অনিবার, মিলের মালিক ও ক্রোড়পতিও কংগ্রেসের মধ্যে আছেন।

সাপ্তাহিক বাটোয়ারা ও অস্পৃশ্যদের ভেদাভেদ সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন :

কংগ্রেস কোন সংখ্যা লিষ্টদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বা বিশেষ নির্বাচন সজ্জা স্বীকার করবে না।...তাতে দারিদ্রশীল শাসনতন্ত্রকে অস্বীকার করা হয়।...ভাস্কর আশেদকর ভারতীয় অস্পৃশ্যদের পক্ষ থেকে যে দাবী পেশ করেছেন সে দাবী পেশ করার অধিকার তাঁর নেই।...ইহাছারা হিন্দুধর্মের ভিতর একটি ভেদ সৃষ্টি করা হবে। সেই বিভেদকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অস্পৃশ্যেরা যদি ইসলাম বা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে যদি হিন্দুধর্ম হুঁভাগ হয়ে যায় তবে তার ফলে হিন্দুদের অবস্থা যা হবে তা সজ্জ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।...এই ব্যবস্থার প্রতিরোধ করার জন্য যদি আমাকে একাই দাঁড়াতে হয়, আমি তাই করবো, সেজন্য যদি জীবন দিতে হয় তাতেও আমি পশ্চাৎ-পদ হব না।...অস্পৃশ্যেরা কি চিরকাল অস্পৃশ্য হয়ে থাকবে?...আমি নিজেই বিরাট অস্পৃশ্য জনসত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব দাবী করি। অস্পৃশ্যদের যদি ভোট দিতে বলা হয় তাহলে আমার বিশ্বাস আমিই তাদের সবচেয়ে বেশী ভোট পাব।...

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন—

গ্রামে আজও হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ঝগড়া নেই...এ বিরোধ ইংরাজ আশার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে। যে মুহূর্তে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের এই দুর্ভাগ্যময় সম্পর্ক দূর হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাবেন যে হিন্দু-মুসলমান, শিখ, যুরোপীয়ান, এ্যাংলো, খৃষ্টান, অস্পৃশ্য, সকলেই এক সঙ্গে একই রকমের মাহুষের মত বসবাস করছে...

স্বাধীন ভারতের ডাবী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন হবে সেই সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন :

দুর্বলই হোক আর সবলই হোক, স্বাধীনতা লাভের অধিকার সকলেরই সমান বলে মনে করি, প্রত্যেক আত্মিক স্বাধীনতা যদি আমি না চাই,— স্বাধীনতা লাভের বোগ্যতা আমারও থাকে না।...

কুটিল ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। প্রত্যেকটি গ্রাম নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং সেই প্রতিনিধিরা নির্বাচকমণ্ডলী গড়ে তুলবে। সেই নির্বাচকমণ্ডলী কেন্দ্রীয় বা যুক্ত ব্যবস্থাপক সভার জন্য

আমাদের গান্ধী

প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।...ভোট দাতাদের লেখাপড়া জানতেই হবে একথা আমি মানি না। আমার দেশের লোক লেখাপড়া শেখে তা আমি চাই কিন্তু ভোট দেবার অধিকারের জন্য লেখাপড়া জানা যদি অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তাহলে তাদের এখনও বহু বৎসর অপেক্ষা করতে হবে, আমি ততদিন অপেক্ষা করতে রাজী নই।...যাদের টাকা আছে তারাই ভোট দিতে পারবে, আর যাদের চরিত্র আছে কিন্তু অর্থ নেই, অক্ষর পরিচয় নেই, তারা ভোট দিতে পারবে না, এ ব্যবস্থা অসহনীয়।...এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যার বলে মনোনীত সদস্যকেও পদচ্যুত করতে পারা যাবে।...কংগ্রেস চায় প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার থাকবে।..

এদেশে উচ্চ পদের কর্মচারীদেরকে যেভাবে মোটা বেতন দেওয়া হয় তার প্রতিবাদ জানিয়ে মহাত্মাজী বলেন—

গড়পড়তা ভারতবাসীর দৈনিক আয় তিন পেনী মাত্র।...ব্রিটিশ জাতি তাদের সতীন উঠিয়ে এই দরিদ্র দেশের লোকদের কাছ থেকে যতদিন পারে ট্যাক্স আদায় করে এক-একজন রাজ কর্মচারীকে মাসিক পাঁচ হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার টাকা মাহিনা দেবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আমি মনে করি আমার দেশে এমন লোক অনেক আছেন যারা সাধারণ মানুষের মত সহজ সরল জীবন যাত্রা নির্বাহ করে ভালো ভাবে, খাঁটি ভাবে, উদার ভাবে, দেশের সেবা করতে দ্বিধা করবেন না।...যে সমস্ত আইনজ্ঞেরা এখানে উপস্থিত আছেন তারা সবাই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। মাহিনা সম্পর্কে সমস্ত রাজারাও আমার বিরুদ্ধে। কি ভীষণ বাধা ও প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তা আমিই জানি, কিন্তু যে বড় কংগ্রেস ও আমি দৃঢ় ভাবে পোষণ করি, তা আপনাদের না জানালে আমি কর্তব্যে অবহেলার অপরাধ করতাম।...

ভারতীয় সৈন্তদল সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন :

সৈন্তদলের ভার আমাদের উপর সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতে হবে।...যদি ইংরাজরা মনে করেন সৈন্ত একশো বছর প্রয়োজন, তবে সেই একশো বছরই কংগ্রেসের অঙ্গকারে হাতড়ে ফেরা ছাড়া উপায় নেই।...কংগ্রেসকে এখন ভীষণ অস্ব-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, নানা দুঃখ সহ্য করতে হবে, প্রয়োজন হলে এক ভগবানের অভিপ্রায় হলে বন্দুকের গুলির সামনে হুক পেতে দিতে হবে, এবং এক্ষণ যদি সত্যিই অর্টে তবে তা অটবে

আমাদের গাঙ্গী

পরম্পরের প্রতি অবিবাসের জন্ত—ইংরাজ ও ভারতীয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এক রকম নয় বলে ।

ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন—

আমি জানি বাংলায় হিংসাত্মক বিপ্লবীদল আছে এবং তারা কাজও করছে । এদের উপর আমার কোন রকম সহানুভূতি নেই তবে এঁদের লক্ষ্য এবং আমাদের লক্ষ্য একই ।...চট্টগ্রামে একটা ছোটখাট সংস্কারের ‘ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান’ নীতি অচল হতে পারে । কলিকাতায় পতাকা প্রদর্শনী উৎসব হয় । দশটি স্বাভাবিক সৈন্য বাহিনীর কুচকাওয়াজ চলে, এর জন্তে যে খরচ হয়েছে সে টাকা কে দেবে ? এর উদ্দেশ্যই বা কি ? এতে কি বিপ্লবীরা ভয় পাবে ? না কংগ্রেস আইন-অমায় ছেড়ে দেবে ? কিছুই হবে না...আমাদের ছেলেরা এই প্রদর্শনী দেখে হাসবে !...ভারতের আকাশে যতই উড়োজাহাজ উড়ুক না কেন, ভারতবর্ষে যতই বিঘোষ আমদানি করা হোক না কেন, তাতে কিছুমাত্র ফল হবে না । এই সব জিনিষ তরুণমতি বালকদের মনেও আজ এতটুকু চাকল্য জাগায় না । যখন তাদের সামনে গুলিগোলা চলতে থাকে তখন তারা যাতে আনন্দে নৃত্য করতে পারে, সেই শিক্ষাই তাদের দেওয়া হয় । পয়জিট কোটা লোক বারা গঠিত এক জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের জন্ত হত্যাকারীর ছোঁরা, বিষের পাত্র, বর্শা অথবা গুলি—কিছুই প্রয়োজন নেই । প্রয়োজন কেবল একটা ইচ্ছাশক্তি । কেবল ‘না’ এই কথাটি বলার মত শক্তি তাদের থাকা চাই । জাতি আজ এই ‘না’ কথাটাই বলতে শিখেছে ।...এমন হাজার হাজার লোক আছে বারা এই শপথ গ্রহণ করেছে যে স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত তারা নিজেও শাস্তি চাইবে না, দেশকেও শাস্তি দেবে না ।...

কিন্তু শেষে গোল টেবিল বৈঠকের কর্মধারায় মহাত্মাজী হতাশ হয়ে পড়লেন, বৈঠকের শেষ দিনে তিনি বললেন—

আমার ভাগ্যে বাহাই হোক না কেন, গোল টেবিল বৈঠকের ভাগ্যে বাহাই ঘটুক না কেন, এই স্বত্তিটাই আমি আমার সঙ্গে বহন করে নিয়ে বাছি যে ছোট-বড় কারুর কাছ থেকেই আমি অবিচ্ছিন্ন ভরসা ছাড়া আর কিছুই পাইনি । বাহুঘের মেহের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তার জন্ত ইংলণ্ড আসা আমার সার্থক হয়েছে, বাহুঘের চরিত্রের উপর আমার যে বিশ্বাস আছে ইহা সেই বিশ্বাসকেই গভীরতর করেছে ।

আমাদের গান্ধিজী

বিলাতের জনগণের কাছে গান্ধিজী অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন, যে তিনি মাস তিন বিলাতে ছিলেন তার মধ্যে তাঁকে যে কত সভায় বক্তৃতা করতে হয় তার হিসাব নেই। যেদিন তিনি বিলাতে পৌঁছলেন তার পরদিনেই আমেরিকাবাসীদের উদ্যোগে তাঁকে এক বেতার বক্তৃতা দিতে হয়। সেই বক্তৃতায় মহাত্মাজী ভারতের আর্থ-সম্পর্কে বলেন—

জগতের বিভিন্ন জাতি পশুর মত পরস্পরের রক্তপাত করে আজ প্রাকৃতিক হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষ এদের নতুন পথ দেখাবে—সে পথ মানবতার পথ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আমি স্বাধীনতা চাই না। সেজন্য আমাকে যদি যুগ-যুগান্তর অপেক্ষা করতে হয় তাতেও আমি রাজি আছি।

মহাত্মাজী বিলাতের কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ল্যাংকাশায়ার, ম্যানচেস্টার, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ প্রভৃতি।

ল্যাংকাশায়ারের প্রমিকেরা মহাত্মাজীকে ঘিরে ধরে, ভারতে বিলিভী বস্ত্র বর্জনের ফলে তাদের কত দুর্গতি হয়েছে সেই কথা বলে। গান্ধিজী আড়াই ঘণ্টা ধরে তাদের সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি বলেন—

অল্প কোন দেশের অকল্যাণ করে আমার দেশের কল্যাণ করতে আমি চাই না।...এখানকার বেকারদের অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে সত্যি কিন্তু এখানে তাঁকে উৎসাহ দেওয়া গেল যে আশেপাশে খেতে নেই। কিন্তু আপনারা যদি ভারতবর্ষের কোন গাঁয়ে যান তাহলে দেখতে পাবেন সেখানকার লোকেরা খেতে না পেয়ে অস্থিচর্চ সার হয়ে গেছে, তাদেরকে জীবন্ত শব্দেই বললেও চলে।...ভারতের এই সব লাখ লাখ লোকের সমাধির উপর আপনারদের সম্পদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবেন না।... আপনারদের বেকার সংখ্যা ত্রিশ লাখ আর আমাদের বেকার সংখ্যা ত্রিশ কোটি। এই ত্রিশ কোটি লোক যাতে সামান্য ভালভাত যোগাড় করতে পারে সেইজন্য তাদের হাতে আমি চরকা তুলে দিয়েছি। আমি যে আশেপাশে আপনারদের কাছে এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এসেছে তার কারণ আমি সেই সব অর্থহারা অর্থনৈতিক নরনারীর একমাত্র প্রতিনিধি। আমি আপনারদের খোটেই সাহায্য করতে পারবো না, ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের ব্যবসাবে আগের মত পুনরুজ্জীবিত করার কোন আশা আর রাখবেন না।

সামিহাদের সভায় মহাত্মাজী বলেন :

ভারতের সমস্ত দলাদলির মূলে হচ্ছে বৃটিশ শাসন। তারাই একদল

আবাহের গাঙ্কিজী

আরেক দলের বিকছে লাগিয়ে দিবে খেলাচ্ছে।... ভারতের সমস্ত গাঙ্কিজের
মুখে যুটল শাসন। একদিকে লাখ লাখ লোক বন্দন অনাহারে থাকে
আরেকদিকে তখন দিল্লী প্রাসাদে বড়লাট বাহাদুর বল-নাচের অহুতান
করেন।... আমার হাতে কনজা থাকলে দেশের রাজাদেরকে আমি বৃহচ্ছাত
করতাম।...

অক্সফোর্ডে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ বেলিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর লিওসের
বাড়ীতে এক সভা বসে। গিলবার্ট মুরে, স্তার মাইকেল ক্রাউলার, পি-পি-লিয়ন্স
প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা তিনঘণ্টা ধরে মহাস্বামীকে নানাভাবে নানা প্রশ্ন করেন।
কিন্তু তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে মহাস্বামী এতটুকু বিব্রত বোধ করেননি।

কথা প্রসঙ্গে মহাস্বামী পাঞ্জাবে জেনারেল ডায়ারের অত্যাচারের কথা বলেন।
শ্রোতার্য শিউরে উঠলো। মিসেস লিওসে বললেন—মিষ্টার গাঙ্কি, আপনি যদি যেন
করেন আমরা বুকে হাঁটলে এই অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত হবে, তাহলে আমরা
পঞ্চাশবার বুকে হেঁটে চলতে প্রস্তুত আছি।

মহাস্বামী বলেন—খেচ্ছায় পঞ্চাশবার বুকে হাঁটা যায় কিন্তু আমি কাউকে তা
করতে বলি না।

২রা অক্টোবর ওখানকার ভারতীয়েরা মহাস্বামীর জন্ম-জয়ন্তীর অহুতান করেন।
ওয়েট-মিনটার প্রেসটা ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করলেন
ফেনার ব্রুকওয়ে।

সভার পক্ষ থেকে গাঙ্কিজীকে একটি চরকা উপহার দেওয়া হয়।

মহাস্বামী এখানে ভারতবাসীর নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে বলেন—

শাসক শ্রেণীর রক্তপাত করে ভারতভূমি কোনদিনই তার স্বাধীনতা চায় না।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োজন হলে ভারতবাসীরা নিজেদের রক্ত
গছার জল লাল করে দেবে।...

এই নভেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাকিংহাম প্রাসাদে গাঙ্কিজীকে নিমন্ত্রণ করেন।
গোল টেবিল বৈঠকের অন্ত্যস্ত সমস্তেরাও সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

লাল ভেলভেট মোড়া সিঁড়ির উপর দিয়ে লর্ড চেম্বারলেন অধঃনয় সম্মানসূচক হাত
ধরে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। করবর্ধন করে
সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী একান্তে মহাস্বামীর সঙ্গে বিনিমিত পাঁচেক কথাবার্তা কইলেন।
তারপর সম্রাট সমবেত সবাইকে চা-পানে আপ্যায়িত করলেন।

আমাদের গাছিকী

মহাত্মাজী তাঁর খান না, আখব্বা অবস্থানের পর মহাদেব দেশাইয়ের হাত ধরে তিনি সেখান থেকে নিষ্কাশ হলেন।

বিলাতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে চার্লি চ্যাপলিন, বার্নার্ড শ' ও ম্যাডাম মন্তেশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চার্লি চ্যাপলিনকে গাছিকী চিনতেন না, তিনি দেখা করতে এসেছেন শুনে মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করলেন—চার্লি চ্যাপলিন কে ?

—অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা, সারা পৃথিবীর মানুষকে ইনি হাসিয়েছেন।

চার্লি মহাত্মাজীর সামনে এসে বসলেন, বললেন—আপনি যন্ত্র পছন্দ করেন না, কেন ?

গাছিকী বললেন—ভারতের কোটা কোটা চাষীরা ছ'মাস পেট ভরে খেতে পায় না তাদেরকে কাজ দেবার জগৎ তাদেরকে আমি চরকা কাটতে বলি।...

—আপনার এই প্রচেষ্টা তাহলে তো কেবল বস্ত্রের সম্পর্কে।

—হ্যাঁ। অরে ও বস্ত্রে সমস্ত জাতির স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। আগে আমরা তাই ছিলাম। ভবিষ্যতেও তাই হবার চেষ্টা করছি।

—কলকারখানার ভিতর দিয়ে কি তা হয় না ?

—ইংলণ্ড বিরাট কল কারখানা করে প্রচুর জিনিষ প্রস্তুত করে, সেই সব জিনিষ বিক্রী করত তাকে বাইরের বাজার খুঁজতে হয়। এরই নাম শোষণ। এই শোষণপন্থী ইংলণ্ড সমগ্র পৃথিবীর বিপদের কারণ। আর তা'ই যদি হয় তবে ভারতবর্ষ বস্ত্রের সাহায্যে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্ত্র প্রস্তুত করলে সেই শোষণপন্থী ভারত জগতের কত বড় বিপদের কারণ হবে তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

—থকুন ভারত যদি কৃষিয়ার মত হয়। আপনারা বেকারদের জগৎ নানারূপ কাজের ব্যবস্থা করলেন এবং অর্থের সমবণ্টনের ব্যবস্থা করলেন তাহলে আপনি কলকারখানা নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। এবং শোষণপন্থী যাতে না হতে হয় সেজন্য শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে দিয়ে বিক্রায়ের সময় বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন— তাই না ?

—নিশ্চয়ই।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও সেখানে ছিলেন। চার্লি তাঁর সঙ্গেও নানা কথা আলোচনা করলেন। কথায় কথায় জেলখানার কথা উঠলো। চার্লি বললেন—কোন কয়েদীর সামনে আমি দাঁড়াতে পারি না। ভগবানের অঙ্গগ্রহ না থাকলে আমাকেও

আবাদের গাঙ্গিজী

হয়তো আজ তাদেরই সঙ্গে থাকতে হোত। আমি জেলের আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী অন্ত্যস্ত ব্যাধির মত পাপও একটা ব্যাধি, ও-ব্যাধির চিকিৎসা জেলে হওয়া উচিত নয়, হওয়া উচিত শুদ্ধি-গৃহে।

এদিকে গাঙ্গিজীর উপাসনার সময় হোল। চ্যাপলিন জুতো খুলে মহাস্বাক্ষরী পাশে কার্পেটের উপর উঠে বসলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষ্য উপাসনা করলেন, তারপর ছুই চিঠি বিদায় নিলেন।

দু'জনের এক সঙ্গে একখানি ছবি তোলা হোল : চার্লি, শুধু গায়ে মহাস্বাক্ষরী নাটি ধরে বসলেন আর মহাস্বাক্ষরী চার্লির টুপিটা মাথায় দিলেন। দুজনের মুখেই প্রসন্ন হাসি। ছবির নীচে পরিচয় দেওয়া হোল—‘চার্লি গাঙ্গী ও মহাস্বাক্ষরী চ্যাপলিন’।

বার্গার্ড শ’ এলেন গাঙ্গিজীর সঙ্গে দেখা করতে। শ’ বললেন—আমি আপনার সম্পর্কে অল্প বিস্তার সংবাদ রাখি। আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে আমার প্রকৃতি-গত একটা মিলও আছে। মানব সমাজে একটা অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে, আমরা দু'জন তারই অন্তর্ভুক্ত।

শ’ জিজ্ঞাসা করলেন,—গোল টেবিল বৈঠকে কি আপনার ধৈর্যের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে না ?

গাঙ্গিজী বললেন—এ সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রকাণ্ড পরিহাস। বক্তৃতা শোনানো হচ্ছে, শুধু সময় কাটিয়ে দেবার জন্য, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তারা স্পষ্ট করে, তাদের নীতি ঘোষণা করে না কেন ? তাহলে তো আমরাও স্পষ্ট বলতে পারি যে নীতি আমরা গ্রহণ করতে পারবো কি পারবো না। কিন্তু ইংরাজের রাজ-নীতি অন্তরকমের। এরা জটিলতা সৃষ্টি করে।

শ’য়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে প্রায় ষট্টি খানেক মহাস্বাক্ষরী আলোচনা হয়।

জগৎ বিখ্যাত শিকারি ম্যাডাম মন্ডেররী মহাস্বাক্ষরীকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর এক ইকুলে ইসলিংটন গ্রামে। সেখানকার ছেলে মেয়েরা রীতিমত ভারতীয় কারদার গাঙ্গিজীকে নমস্কার জানালো। তাদের গান বাজনা শুনে মহাস্বাক্ষরী খুঁসি হন। সভার শেষে তিনি সখেদে বলেন—ভারতের জীর্ণ হুটিরে যে সব বালক বালিকা বাস করে তাদেরকে প্রকৃত ও জীবন্ত শিক্ষা দেবার সমস্ত আবাদের একটা

আমাদের গান্ধিজী

বড় সমস্যা! কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায়ই আমাদের নেই, শিক্ষকের
স্বৈচ্ছাকৃত সাহায্যের উপরেই আমাদেরকে নির্ভর করতে হয়।

বিলাতে কিতাবে মহাত্মাজীর দিন কাটতো তার একটা হিসাব দিয়েছেন স্ক্রয়ার
সেরিডন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী, কয়েকদিন গান্ধিজীর কাছে কাছে ছিলেন তাঁর
একখানি ছবি আঁকার জন্ত।

সকালে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ছিল মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করার সময়।

গান্ধিজী বসে চরকা কাটছিলেন :

প্রথমেই এলেন এক পাত্রী, একখানি খাতা মহাত্মাজীর সামনে ধরে বললেন—
লিখে দিন ‘সত্যিকারের খৃস্টান হতে হলে আমাদের কি করতে হবে’?

তারপর এক ইংরাজ ভক্তলোক এলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর
দেখা হয়েছিল সেই পরিচয়টা জানিয়ে দিতে।

তারপর ডাক্তার মেডক। এঁর অস্ত্রোপচারের ফলে একদিন মহাত্মাজীর জীবন
রক্ষা পেয়েছিল।

তারপর এক ফরাসী মহিলা।

তারপর এক আমেরিকান মহিলা, ইনি বিখ্যাত গায়ক পল রবসনের স্ত্রী।

তারপর গান্ধিজীর পরিচিত এক জার্মান মহিলা।

তারপর মহামান্য আগা খাঁর এক পত্রবাহক।

তারপর এলেন আর এক মার্কিন মহিলা, এক ভারতীয় ছাত্রের স্ত্রী। বললেন—
গান্ধিজী আপনি আমেরিকায় চলুন।

—এখনও কিছু ঠিক করিনি।

—আমেরিকার লোকেরা আপনাকে দেখতে চায়।

—বন্ধুরা বলেন আমি গেলেই তারা আমাকে চিড়িয়াখানায় পাঠাবে।...

তারপর এলেন দীনবন্ধু এগুরুজ।

একদিন সেরিডন মহাত্মাজীর প্রভাতী উপাসনার যোগ দিয়েছিলেন। তখনও
সকাল হয়নি পূর্ব আকাশের কুয়াসা ভেদ করে দুই আলোর আভাস দেখা দিয়েছে।
তার ভিত্তি বিকর্ভতার মাঝে বসে মহাত্মাজী প্রার্থনা করছেন, পাশে দু’জন হিন্দু ও
একজন ইংরাজ বৃদ্ধ কঠোর ভোজ্য পাঠ করছেন। তার মাঝে গিয়ে বসন বসলায়, যনে
হোল আমি বেন স্বপ্ন দেখছি, এই পৃথিবীর দুখ কষ্ট থেকে বন্ধুরে এসে পৌঁছেছি।...

আমাদের গাছিকী

তারপর মহাস্বামীজীর সঙ্গে প্রাক্ত: ভ্রমণে বেরুলাম। তখনও পাঁচটা বাজেনি। তার সঙ্গে ঠিকমত ভাল রাখতে পারলুম না, দেখতে দেখতে তিনি কুমারার মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

মহাস্বামীজী যে কদিন বিলাতে ছিলেন, সব সময় তাঁর সঙ্গে হুঁজন করে পোয়েন্টা থাকতো।

গোলটেবিল বৈঠক শেষ হয়ে গেল, এই ভিসেবর মহাস্বামীজী ট্রেনে উঠলেন। প্রাক্তর্বে ভীড় কম হয়নি। ভারতীয়েরা সাড়া তুললো—বন্ধে-বান্ধরম্! মহাস্বামী গাছিকী জয় !!

ইংরাজ ছাত্র-বন্ধুরা গান ধরলো—চমৎকার খোস্ মেজাজী মাহুৰ ছিলেন তিনি (for he was a jolly good fellow)।

জনতার সকলের মাথাতেই ছিল গাছিকুপী।

কোকটোনে এসে গাছিকী ঈমারে উঠলেন। ইংলণ্ড থেকে বিদায় নেবার আগে মহাস্বামীজী বলেন—

ইংরাজদের বিরুদ্ধে আমি কোন যুগার ভাব বয়ে নিয়ে যাচ্ছি না। যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোই আমার অদৃষ্টে থাকে, আমি প্রীতিপূর্ণ ভাবেই সেই যুদ্ধ চালাবো...

প্যারিসে মহাস্বামীজীকে দেখবার জন্য বিরাট ভীড় হয়। পুলিশ কমিশনার মহাস্বামীজীর হাত ধরে সেই ভীড় পার করে দিলেন। সেন্টলেজার হোটেলের ছ'হাজার প্যারিসবাসী তাঁকে সম্বর্ধনা জানালো। মহাস্বামীজী বলেন—

যুদ্ধ বিরতি রেখে আমি সন্ধির কথাবার্তা চালাতে এসেছিলাম, এখানে এসে যাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে তাদের কলাকৌশল জানা গেল, পরে নতুন উৎসাহে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া বাবে।...

সেখান থেকে মহাস্বামীজী গেলেন জেনেভা হ্রদের তীরে রোম। রোলার বাকী ভিলা-লিনেটে।

সেখান থেকে লেসিনের যাত্রা হাসপাতালে। তারপর সুসেনের এক জনসভায় প্রক্ জেনেভার আন্তর্জাতিক নারী সম্মেল।

রোন উপত্যকায় আশী বছরের এক বৃদ্ধ মহাস্বামীজীকে বাহুর বোনার কৌশল দেখান, গাছিকীও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বোনার চেষ্টা করেন।

আমাদের গান্ধিজী

আমাদের পক্ষে বিলাতের ট্রেনে যাটার বহাস্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, বশ বিনিতি দু'জনের মাঝে কথাবার্তা হয়।

সন্ধ্যাবেলা ইতালি-রাজের কনিষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী মেরিরা এসে বহাস্বামীর সঙ্গে আধ ঘণ্টা গল্প করেন, সন্ধ্যাবেলার প্রার্থনা সভাতেও যোগ দেন।

পরদিন তিনদিসিতে বহাস্বামী আহাজে ওঠেন।

৭৭ দিন পরে ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধিজী ভারতে পৌঁছান।

বোম্বাইয়ে বিপুল জনতা তাকে সম্বর্ধিত করে।

দেশে তখন দমননীতি চলছে প্রচণ্ড, অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারী হয়েছে, নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সন্ধ্যাবেলা বোম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে সভা বসলো, গান্ধিজী বললেন—খুঁট ধরাবলম্বী বড়লাটের কাছ থেকে এই দমননীতি আমি বড়দিনের উপহার বলে গ্রহণ করলাম। গুপ্তচনদের মধ্যে বড়দিনের উপহার দেবার তো রীতি আছে।...

বে ক'মাস তিনি বিলাতে ছিলেন সেই সময় এদেশের বৃকে দুর্ভোগের কি ঝড় বহে যাচ্ছে, সেই সব সংবাদ শুনে গান্ধিজী পরদিনেই বড়লাটের কাছে টেলিগ্রাম করলেন—এই দমননীতি দেখে আমি বুঝতে পারছি না, আমাদের দু'জনের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কি শেষ হয়ে গেল? অথবা আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে এ সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পাব?

একদিন পরেই বড়লাট বাহাদুরের সেক্রেটারী জবাব দিলেন—দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে সব বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা করতে বড়লাট বাহাদুর প্রস্তুত নন।

১লা জানুয়ারী গান্ধিজী আবার 'ভার' করলেন—অহিংসা আমার নীতি। আমি বিশ্বাস করি দেশের শাসনব্যবস্থার জনসাধারণের যদি কোন কতৃৎ না থাকে, তাহলে আইন অমান্ত করার অধিকার তাদের আছে! অহিংস বিপ্লব সশস্ত্র বিপ্লবের মতই কার্যকরী, এবং সেই দিকেই আমি কংগ্রেস কার্ঘনির্বাহক সমিতিতে নির্দেশ দিয়েছি। তবে ইতিমধ্যে যদি বড়লাট বাহাদুর আমার সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত রাখতে রাজী আছি।...

পরদিন বড়লাটের সেক্রেটারী উত্তর দিলেন—আপনি ও কংগ্রেস ওয়ার্মিং কমিটি আইন অমান্ত আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে নিজেরের সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেবেন তা সম্ভব নয়। আপনারা যদি ভেতন কিছুই

আন্দোলনের ব্যক্তিগত

তখন, তাহলে যে সম্পর্কে সবচেয়ে ব্যক্তিগত আন্দোলনের কথা আর প্রতিধ্বনিত হয় তা হইল বিবিধব্যবস্থার প্রবর্তন সরকার তা প্রবর্তন করতে বাধ্য হইলেন না।

৩রা জাহুয়ারী গান্ধীজী 'তার' পাঠালেন—আন্দোলনের উদ্দেশ্যে আমি কুণ্ঠিত। জাতীয় আন্দোলনের সত্যতার বিচার করবে। আপনি আমাকে ও কংগ্রেসকে যে ব্যক্তিগত দায়িত্ব প্রদান করিতে দিয়াছেন, আমি তা স্বীকার করছি।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক কলকাতা, বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা সরকারী নাচারের বেহিসাব তৈরী করেছিলেন তা গান্ধীজীর কাছে পেশ করলেন। নতুন রে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার কথা উঠলো, নেতৃবৃন্দের সমস্ত পারিবারিক জীবন গান্ধীজীর উপর।

কিন্তু গান্ধীজীকে নেতৃত্ব করতে হোল না।

৪ঠা জাহুয়ারী সকাল হবার অনেক আগেই রাত তিনটের সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলো। তারপরেই হুদাযচন্দ্র, সর্দার প্যাটেল, ভাস্কর আমসারী প্রভৃতি তারাকে একে একে কারাগারে স্থান পেলেন। খাদি আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষালয়, কংগ্রেস কার্যালয় প্রভৃতিতে পুলিশ তাল লাগালো। শুরু হোল লাঠি চালাও আর ইকারী জরিমানা।

গবর্নেন্ট স্থির করেছিলেন ছ'সপ্তাহেই কংগ্রেসীদের শাস্তি করে দেবেন। কিন্তু জাহুয়ারী সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চললো, তারা লবণ আইন অমান্য করলো, জেয়াপ্ত পুস্তক প্রচার কলকাতা, বিলিতি জিনিষ বয়কট করলো, অনেক জাহুয়ারী করলো ও বন্ধ করলো। পুলিশের কঠোর দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দিল্লীর চাঁদনী চক্রে যাত্রা ভারত থেকে পাঁচশত কংগ্রেস কর্মী সমবেত হলেন। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন কলকাতা মুক্ত আকাশের নীচে, পুলিশ তাদের কথতে পারলো না, সভাপতি পণ্ডিত মালব্যকে দিল্লী আসার পথে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো।

মাসব্যয়ে আগে গান্ধীজী এক সভায় বলেছিলেন—গান্ধী না থাকলেও গান্ধীজী চিরদিন থাকবে।

গবর্নেন্টও এবার সে কথা ভালোভাবেই টের পেলেন।

গান্ধী-নীতি কোন দার্শনিক মতবাদ নয়, কোন রাজনীতিক সংজ্ঞাও নয়। তাঁর নীতি হচ্ছে মানুষের বন বদলানোর নীতি। এর মূল কথা হচ্ছে সত্য ও অহিংসা। গান্ধীজী বলেন—লোককে যদি ভালো করতে হয় তবে তাকে মেরে ভালো করা যায় না, তাকে ভালোবাসতে হয়, ভালো কথায় তার কুল বুঝিয়ে দিতে হয়।...বতর্দিন

আমাদের গান্ধিজী

মাছ বাছকে হিংসা করবে, ততদিন কগড়া হবে, বৃদ্ধ হবে, হুনিয়ার শান্তি কিছুতে আসবে না। অহিংসাই শান্তির প্রকৃত রাস্তা।

যদি কেউ অস্ত্রায় বা অত্যাচার করে পাণ্টা অত্যাচার করে তার উপর প্রতিশোধ নেওয়া চলে, কিন্তু তাতে অত্যাচারী মন বদলায় না, সে আবার নতুন করে অত্যাচার করার কিকির খোজে। কিন্তু অত্যাচারীকে যদি মিষ্ট কথায়, ভদ্র ব্যবহারে অস্ত্রায়ের কথাটা বুঝিয়ে দিতে পারা যায়, তাহলে সে আর অস্ত্রায় করবে না। জগা মাখাই ঐষ্টচৈতন্য মহাপ্রভুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু সেজন্তু তাঁদে উপর এতটুকু রাগ করেন নি। পরে জগাই মাখাই একেবারে বদলে গেলেন, মহাপ্রভু শিষ্ট হয়ে গেলেন। গান্ধিজী বলেন—ভালোবাসার আঙুনে সবচেয়ে শক্ত জিনি গলে যায়, যদি না গলে বুঝতে হবে সে ভালবাসার জোর কম।

অহিংসার ভিত্তি হচ্ছে সত্য। অস্ত্রায় ও অত্যাচারের মূল কথাই হচ্ছে হিংসা অসত্য। বা সত্য তা-ই সত্য। জোর গলায় বুক সাহস রেখে সত্য প্রচার করে হবে অস্ত্রায়ের প্রতিবাদ করার সময় ভয় পেলে চলবে না। সত্যের যিনি সাধ করেন গুলি গোলা প্রহার ও জেলখানা তাঁকে জয় করতে পারে না। বৃটিশ গবর্নমেন্টে অনাচারের বিরুদ্ধে গান্ধিজী এই সত্যপ্রহের পরীক্ষা করেছেন, এবং জয়ীও হয়েছেন।

সত্য ও অহিংসার মধ্যে হতাশার কোন স্থান নেই। সত্যপ্রার্থী সৈনিক, প্রাণে তরু সে করবে না। সত্যপ্রার্থী নির্ভীকভাবে শৃঙ্খলা বজায় রেখে অস্ত্রায়ের প্রতিবাদ করবে এবং যত লোককে পারে বুঝিয়ে নিজের দলে আনার চেষ্টা করবে। হরিনন্দন আন্দোলন এমনি এক প্রচেষ্টা, এই জন্তু গান্ধিজীর জীবন নাশের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শেষে গান্ধিজীর নীতিই জয়ী হয়েছে।

নিজের আদর্শকে গান্ধিজী সহজ সরল ভাবে প্রকাশ করেছেন—হুনিয়ার ইতিহাস হচ্ছে প্রতিহিংসার ইতিহাস—ও পথে শান্তি আসবে না। চরকার হুতো কাটে খবর পরো, নিজের কাজ নিজে করো, পরের সেবা পারতপক্ষে নিও না, গ্রামে কি বাও, কুটীর শিল্পে নজর দাও, শিকা দাও আর শিকা নাও, মদ ছাড়ো, অশ্লীলতা ছাড়ো, অহিংসায় বিশ্বাস করো, সত্যকে জয়ী করে তোলা।

“সত্যের নাহি পরাজয়

হও ধরবেতে বীর

হও করবেতে বীর

হও উন্নত শির

—নাহি জয়।”

আমাদের বাড়ি

এই সভা ও অহিংসার নীতি যে কতটা শক্তিশালী তা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি, যে-চার্লিস, যে-হিটলার, মুসোলিনি ও ভোজোর কাছে পরাজয় ঘানে নি, এক নিরস্ত্র কিশ সন্ন্যাসীর ভয়ে যে আত্মনাশ তুলেছে—যদি ভারতে ব্রিটিশ রাজ্য স্থাপন করতে চাও, তবে ওই অর্ধ-নর ককিঁটাকে আন্দামানে বীপান্তরে পাঠাও !

এক শেষে ইংরাজকে এই অর্ধনর সন্ন্যাসীর কাছে মাথা নত করতে হয়েছিল।

সভা ও অহিংসা পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে—চলিশ কোটি বাহুযের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে ত্রিশ বছরের মধ্যে।

ইংরাজেরা ভারতীয়দের একাকৈ ভয় করে, চলিশ কোটি বাহু এক হলে এদেশে তাদের রাজ্য টিকবে না, তাই তাদের নীতি ছিল—ভিত্তাইড্ এও ক্ল-এক্য নষ্ট কর, শাসনের সুবিধা হবে ! সেইজন্য তারা হিন্দু মুসলমানের বিদ্রোহ আগিয়ে রেখেছিল, হিন্দু-বিষেবী মুসলমানদের তারা মিত্র করে তুলতো। গোল-টেবিল বৈঠকে তারা আরেকটু এগিয়ে গেল, বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনালাড সাহেব স্থির করলেন—হিন্দুদের মধ্যেই দুটো ভাগ করে দাও—উঁচু জাত আর নীচু জাত—বর্ণ হিন্দু আর অশ্পৃশ্য। আইন সভার দু'দলের আলাদা-আলাদা আসন থাকবে, দু'দল পৃথক ভাবে ভোট দেবে !

গান্ধিজী জেল থেকেই তার প্রতিবাদ করলেন—হিন্দু জাতিকে বিভক্ত করার এই চেষ্টা যদি কার্যকরী হয় তাহলে অনশনে আমি জীবন বিসর্জন দেব !

ম্যাকডোনালাড সাহেব তার উত্তরে বললেন—মহাত্মাজী অশ্পৃশ্যদের শত্রু, তাদের উন্নতি তিনি চান না।

মহাত্মাজী বললেন—ভারতের সাতকোটি হিন্দু অশ্পৃশ্য। বহু শতাব্দী ধরে স্থগা করে তাদের একপাশে কেলে রেখে যে অস্ত্রায় করা হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি অনশন গ্রহণ করলাম। এর প্রতিবিধান না করতে পারলে আমি দেহরক্ষা করবো, সামান্য নুন জল কিংবা সোডার জল ছাড়া আমি আর কিছুই খাব না।

প্রত্যুবে রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি টেলিগ্রাম করলেন—

শুভকাম, এখন প্রত্যুয তিনটে, বঙ্গলবার, আজ দুপুর থেকে আমার অগ্নিশরীরা শুরু হবে। আপনার আশীষ চাই। আপনি আমার সভ্যকারের হৃদয়, কারণ আপনি আমার আন্তরিক উত্কাষী। আপনার অন্তর যদি আমার কাছ সর্বদা করে, আপনি আমার আশীর্বাদ করবেন। অ-ই হবে

আমাদের গান্ধিজী

আমার অবলম্বন। আশা করি আপনি আমাকে বুঝতে পেরেছেন। শ্রীতি জানাবেন—হ, ক, গান্ধী।

কিন্তু অন্তরের বোগ যেখানে নিকটতম, সেখানে একজনের জন্ত আয়েকজন * অপেক্ষা করতে পারেন না। গান্ধিজীর চিঠি পাবার আগেই গুরুদেব 'তার' করলেন—ভারতের ঐক্য ও সামাজিক সংহতি রক্ষার জন্ত মূল্যবান জীবন আহুতি দেবার প্রয়োজন আছে...আমার ক্ষুধিত অন্তর শ্রদ্ধা ও শ্রীতি সহকারে, আপনার মহান প্রায়শ্চিত্তের গতি লক্ষ্য করছে।

য়েরোডা জেলে বেলা দ্বিপ্রহর থেকে গান্ধিজী অনশন শুরু করলেন। জেলের নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করা হোল। তাঁর বিছানার চারিপাশে সমবেত হলেন কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী, বল্লভভাই প্যাটেল ও মহাদেব দেশাই প্রভৃতি বনিষ্ট অন্তরঙ্গের দল। আকাশ তায়েবজীর কন্ঠা রৈহানা বেন একটি গুজরাতী ভজন পাঠিয়ে ছিলেন, সমবেত কণ্ঠে তাই গাওয়া হোল :

উঠ, আগো মুসাফির, ভোর, ভাই

অব রৈন কই। জো সোবত হৈ ?

জো সোবত হৈ বহ খোবত হৈ

জো আগত হৈ বহ পাবত হৈ।

টুক নীদর্সে জঁখিয়া খোল জরা

ও গান্ধিল ! রবসে ধ্যান লগা।

বহ শ্রীতিকরনকী রীত নহী

রব আগত হৈ তু সোবত হৈ।

জয় জান ভুগত করণী আপনী

ও পানী ! পাপর্সে চৈন কই ?

জব পাপকী গঠডী নীস ধরী

কির নীস পকড় কোঁ যোবত হৈ ?

জো কাল করে বহ আজ কর লে

জো আজ করে বহ অব কর লে

অব চিড়িয়ন খেতী চুগত ভারী

কির পছড়াবে ক্যা হোবত হৈ ?

[পবিত্র আগো, প্রভাত হয়েছে। আর রাতি নেই তবু ভূমি জয়ে আজ কেন ? যে করে থাকবে তার সব রাবে, যে আগবে সে-ই পাবে শান্তি।

আবাহের গান্ধী

ওগো অলস যারেক চোখ বেলে ভাঙাও, বিনয়িতার কথা জাবো। সবাই যখন জেগেছে তখনও তুমি ঘুমিয়ে আছ, এই কি তত্ত্ব নিবেদনের রীতি ?

ওগো পাশী, তোমার পাপ মোচনের জন্য সচেত হও। পাপের দ্বারে শান্তি নাই। পাপের বোঝা তুমি বাড়িয়ে চলেছে, তুমি কেঁদে কি হবে ?

বা কাল করবে তা আজই শেব কর। বা আজ করবে তা এখনই সম্পন্ন কর। পাখী যখন তোমার শব্দ নিয়ে বাবে, তারপর আপশোষ করলে কি হবে ?]

গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন।

সারা ভারত ব্যাকুলতার ঢকল হয়ে উঠলো। সর্বত্র সভা বসলো। দেশবহু লোক সেদিন উপবাস করলো। গান্ধীজীর দীর্ঘ জীবন কামনা করে যন্ত্রিণে যন্ত্রিণে প্রার্থনা শুরু হোল।

দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যতার প্রকোপ বেশী। সেখানে সেদিনকার কার্যশ্রুটি হোল :

পূর্ণ উপবাস।

বারোঙ্কোপ থিয়েটার দেখা ও সমস্ত আনন্দ উৎসব বন্ধ।

সব রকম খেলাধুলা বন্ধ।

রেডিও শোনা বন্ধ।

হোটেল, রেইংরেস্ট ও খুবারের দোকান বন্ধ।

অস্থায়ীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা।

গান্ধীজীর অনশন! সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা এসে সমবেত হলেন পুণায়। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব যে আইন চাইছেন তাই নিয়ে বসলো আলোচনার বৈঠক।

একটি একটি করে দিন কাটে, গান্ধীজীর অবস্থা একটু একটু করে খারাপের দিকে অগ্রসর হয়। উৎকণ্ঠিত ভারত নেতাদের সুখের পানে তাকিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত ভগ্নতে থাকে।

নেতারা দিনের পর দিন আলোচনা করেন, যখনই কোন জটিলতা দেখা দেয় তখনই ছুটে আসেন গান্ধীজীর কাছে। শেষে গান্ধীজী ডক্টর ভীষাও রামজী আবেশকরকে বললেন—অস্পৃশ্যদের সমগ্রভাবে কল্যাণ হাতে হয় তা-ই আমি মনে নেব...তোমার সম্প্রদায় আমার সম্প্রদায় থেকে কার্যতঃ একেবারে পৃথক হয়ে বাবে তা আমি সহিতে পারি না। আমরা ঐক্য বজায় রাখবো, আমাদের ভাগ করা চলবে না। অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের এক গভীর কলঙ্ক। যদি হিন্দুধর্ম থেকে অস্পৃশ্যতা একেবারে মুছে বেলা না যায়, তাহলে এই রানি আর বার বহু দিক থেকে হিন্দুর সামাজিক ও রাজনৈতিক

আবদুল গাফিল

দীর্ঘকাল বিবাক করে ফুলবে। সেইজন্য আমি তোমাকে অল্পনয় করছি, কিন্তুদের
বেজার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার হুঁসোল দাও। আবাকে বর্ষ কিন্তুদের
যদি কাছ করার হুঁসোল দাও।...দশ পনেরো বছরের কথা নয়, পাঁচ বছর বাদে
গণভোট নেওয়া হবে, তার বেশী ঘেরী করা চলবে না। বন্ধুদের বল, এই একটা
বিষয়ে আবার যত বলাবে না। আমি হয়তো মাহুদ খারাপ হতে পারি, কিন্তু
সত্য বর্ণন আবার মুখ থেকে প্রকাশ পায় তখন তা দুর্ভেদ্য।

ডাঃ আবেদকর এবার নরম হয়ে যান, পাঁচ দিন আলোচনার পর অল্পনয়
বন্ধুদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার পরিত্যাগ করলো। ছিন্ন হোল বিভিন্ন প্রদেশের
পরিষদে হরিজনদের ১৪৮টি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। এই আলোচনা 'য়েরোডা
চুক্তি' নামে প্রসিদ্ধ। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন পণ্ডিত যদুনমোহন মালব্য,
ডেপুটি বাহাদুর শাপক, মুকুন্দরাম রাও জয়াকর, ডক্টর ভীমরাও রামজী আবেদকর,
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, শংকরলাল
ব্যাংকার, বি. এল. রাজভোজ, হংস মেহেতা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, বালচাঁদ
দীরাটাদ, ফরদাথ কুন্ডল, শি. কোদওয়াও, জি. কে. গ্যাভগিল, মহু হুবেদার,
অবজিকাবাই গোখলে, এবং আরো অনেকে।

কিন্তু এখানকার নেতারা মানলেই তো হবে না, বিলাতে যারা আইন তৈরী
করলেন তারা তো মানা চাই, তাই বিলাতে থবর পাঠানো হোল, দীনবন্ধু এওক্স
ছিলেন বিলাতে। সেখানে যা কিছু করা সম্ভব, সবই তিনি করলেন।

এদিকে গান্ধীজীর অবস্থা ক্রমশ সংকটজনক হয়ে আসছে, দুজন ডাক্তার সব সময়
তীর পাশে বসে আছেন। দিনে দু'বার তীর বাহ্য সম্পর্কে বুলেটিন বেরাচ্ছে। জেল
আর কারাগার নেই, হয়েছে তীর্থক্ষেত্রে, কতজন আসছে গান্ধীজীর ঘর-আনতে,
মহাত্মাজীকে দেখতে।

এক সাংবাদিক এই সময়কার এক বর্ণনা দিয়েছিলেন বোম্বাইয়ের 'ইলাস্ট্রেটেড
উইকলি' কাগজে—'ওয়ার্ডের সামনে দেড়শো কীট লম্বা ও চল্লিশ কীট চওড়া একটি
বারান্দা। সেই বারান্দার এক পাশে ছোট একটি আমগাছের নীচে গান্ধীজীর খাটিয়া
পাতি। জেলখানার লাল কবল মুড়ি দিয়ে তিনি খাটের উপর শুয়ে আছেন।
চাক্ষুণ্যে বসে আছেন, জীবন্তী কড়রবা, মহাদেব বেশাই, বলভভাই প্যাটেল, এবং
আরো অনেকে। একজন তালপাতার পাখা নিয়ে তাঁকে হাওয়া করছেন। দুর্বল
কীট সাহসিকির পানে ডাকালে, সাংবাদিক হিন্দাবে কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে না।
পাশে এক বোতল ফল আছে, দু-একটা কথা বলার পর তিনি এক চুপ করে ফল

শান্তিরাজ্য

থাকেন। কিন্তু এই দুর্বলতার মাঝেও তাঁর চোখ দুটি জল জল করছে। জেলের ডাক্তার হুঁশ পাশে ঝড়িয়ে আছেন। কত রকম জল-পাইয়ের জেল যালিশ করে দিচ্ছেন কপালে।...

‘বটী খানেক তাঁর পাশে বলে থাকার পর আয়ার মনে হোল, তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিচ্ছি। মহান রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে দীরে দীরে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আসবার সময় তাঁর সেক্রেটারীর মুখে শুনলাম—এখনও তিনি তাঁর চারটের সময় ওঠেন, লাড়ে চার থেকে পাঁচটা পর্যন্ত প্রার্থনা করেন। তারপর জেলের নাপিত এসে হাড়ী কামিয়ে দেয়, তারপর এক চুমুক জল খেয়ে এক বটী ঘুমিয়ে নেন, তারপর আসে টেলিগ্রাম, সবোৎপত্তের প্রতিনিধি ও নেতার দল।’

শান্তি-নিকেতনে খবর এলো গান্ধিজীর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ আর ছির থাকতে পারলেন না, বরাবর চলে এলেন পুণায়। ২৬শে সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা, রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন যেরোডা জেলে গান্ধিজীর শয্যাপার্শ্বে। গান্ধিজীর পাশে বসে, শীর্ণ শ্রান্ত সন্ন্যাসীর মুখের পানে তাকিয়ে কবিত্বের চোখে জল এলো, গান্ধিজীর বুকের উপর মুখ রেখে তিনি কেঁদে কেঁদে কেঁদলেন। মিনিট কয়েক কেউ কোন কথা বললেন না। তারপর চোখের জল মুছে ধরা গলার গুচ্ছের আনালেন—মহাত্মাজীর মনোবেদনার গুরুভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে অশ্রুতদের ভক্ত বা কিছু করা দরকার সব কিছু করার জন্তই তিনি প্রস্তুত আছেন!...

যুদ্ধ কষ্টে ভারতের দুই জ্ঞানবি পরম্পরের কাছে অন্তর মেলে ধরলেন।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মহাত্মাজী শ্রান্ত হয়ে পড়ছেন দেখে রবীন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন।

গান্ধিজীর অবস্থা সেদিন অত্যন্ত কাহিল, ডাক্তাররা শংকা প্রকাশ করছেন, সারা দেশ তাকিয়ে আছে যেরোডা জেলের পানে। নেতারা উদগ্রীব হয়ে আছেন বিলাতের উক্তরের প্রতীকায়—তাদের চুক্তি প্রধান যন্ত্রী মেনে নেবেন কি নেবেন না।

এমন সময় বিকাল সওয়া-চারটের সময় বিলাত থেকে খবর এলো—আপনারের চুক্তি আমরা মেনে নিলাম।

গান্ধিজীর জয় হোল, সারা ভারতে উল্লাসের বজা বয়ে গেল, এক বটীর মধ্যে গান্ধিজী অনশন ভঙ্গ করলেন।

যেরোডা জেলখানা ভারতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হোল। গান্ধিজীর খাটিয়ার চারিপাশে এসে বসলেন রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী, বরুণরানী নেহেরু,

আবাহের গাভিৰী

উৰ্দ্ধিলা দেবী, আব্বালাল সরভাই, সর্দার বলভভাই, মহাদেব দেশাই, এবং সবরমত
আব্বাহের শ'দুয়েক আত্মমিক ।

প্রার্থনা শুরু হোল । কবিগুরু গীতাঞ্জলির একখানি গান গাইলেন—

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা-ধারায় এসো
সকল মাধুরী লুকায়ে যার, গীত-সুখা-রসে এসো
কর্ম যখন প্রবল আকার
গরজি-উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয় প্রান্তে হে জীবননাথ, শান্ত-চরণে এসো ।
আপনারে যবে করিয়া রূপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ । রাজ সমারোহে এসো ।
বাসনা যখন বিপুল ধলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে তুলায়
ওহে পবিত্র ! ওহে অনিত্র ! রক্ত আলোকে এসো ।

ওই জেলেরই কয়েদী পরাশর শাস্ত্রী কয়েকটি সংকৃত শ্লোক আবৃত্তি করলে
তারপর সমবেত কণ্ঠে গুজরাতি ভজন শুরু হোল :

বৈষ্ণব জনপতি তেনে কহিয়ে
যে পীড় পরাই জানে রে ।
পরদুঃখে উপকার করে তোয়ে
মন অভিমান না আনে রে ॥

সকল লোকমা' সহনে বশে
নিশা না করে কেনী রে ।
বাচ কাছ যন নিশ্চল রাখে
ধন ধন জননী তেরী রে ॥

সমদৃষ্টি নে তুচ্ছ ত্যাগী
পরজী জেনে মাত রে ।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে
পরধন নও ঝালে হাথ রে ॥

মোহ মায়া ব্যাণে নহি জেনে
দৃঢ় বৈরাগ্য জেনে মনমে রে

স্বাধীনতার গান্ধী

স্বাধীনতা' ভালী বে লাগি

সকল তীরথ তেনা তনয়। রে—

বনলোভী নে কপট রহিত ছে

কাম ক্রোধ নিবার্য রে।

ভগ্নে নবসৈরে তেজ দরশন করতী

কুল একোত্তোর তাঁর্য্য রে।

[তাঁকেই তো বৈষ্ণবজন বলে—যাঁর মনে পরহিতের আকাঙ্ক্ষা আছে, যিনি পরের দুঃখে উপকার করেন, যাঁর মনে কোন অভিমান নেই, যিনি সকল লোককে সমভাবে শ্রদ্ধা করেন, কান্ধর নিন্দা করেন না, যাঁর মনে কোন চাকল্য নেই, তাঁর জননী ধন্য। যাঁর ভোগের কোন তৃষ্ণ নেই, যিনি পরস্পরকে নিজের মায়ের মত মনে করেন, যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি, পর-ধনে কখনও হাত দেন না, যাঁর মন মোহ মায়ায় আবদ্ধ নয়, যিনি বৈরাগ্যের কঠোর সাধক, যিনি রামনামে আত্মহার্য্য হয়ে আছেন, তাঁর মনের মাঝে সকল তীর্থের পবিত্রতা বিস্তারিত। যাঁর মনে কোন কপটতা নেই, যিনি কাম ক্রোধকে জয় করেছেন, তিনিই পরম বৈষ্ণব। কবি নরসিংহ সেই মহামানবের দর্শন লাভ করে ভবসাগর পার হতে চান।]

ভজন শেষ হোল, কঙ্করুবা এক গ্রাম কমলালেবুর রস তুলে দিলেন গান্ধীজীর হাতে, তা পান করে গান্ধীজী উপবাস ভঙ্গ করলেন।

ইতিমধ্যে ঝুড়ী ঝুড়ী ফল আর সন্দেশ আসতে শুরু করেছে। যত ছিল জানা-অজানা বন্ধু ও শুভাকাংখীর দল, সবাই পাঠিয়েছে কত রকমারি সন্দেশ, কত রকমের ফল। সেই সব ফল ও সন্দেশ বিলি করা হোল সমবেত শুভাকাংখীদের মধ্যে।

ভারতের বাহিরের দূর দূরান্তর থেকে জানী ওনী ও দেশনায়কেরা গান্ধীজীকে শুভেচ্ছা জানানেন :

মিশরের কাররো থেকে ক্রীমতী সোফিয়া জগলুল পাশা জানানেন—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়ত্বভূক্তিশীল মিশরের নরনারীরা উদ্বোধন-ব্যাকুল চিন্তে লক্ষ্য করছে ভারতের এক্য ও স্বাধীনতার জন্ত আপনি কি মহান আত্মত্যাগ করছেন।... আমি সত্যই আশা রাখি গান্ধীজীর মহান আত্মত্যাগের জিত্তর দ্বিগুণে ভারতবাসী জাত্ব ও স্বদেশপ্রেমের বন্ধনে এক্যবদ্ধ হবে, যাঁর জীবন ও কর্মনীতি সারা পৃথিবীর লক্ষ্য সেই মহান ভারত সন্তানের জীবন রক্ষার জন্ত ও দেশের স্বাধীনতার জন্ত সাজেট হবে।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে 'মিশরীয় ওরফ্ দলে'র সভাপতি হুতাক নাহাশ পাশা জানানেন—ভারতীয়দের মধ্যে এক্য ও জাতি বিচার দূর করার জন্ত আপনি যেভাবে

আমাদের বাঙালী

আমরা বলি নিতে সক্ষম করেছেন তা বিশ্ববাসীকে চিত্তে গভীর রেখাপাত করেছে। স্বাধীনতা ও স্বজাত্যবোধ বিকাশ করার জন্য আমরা যে চুপে ভোগ করেছি তারই পবিত্র বন্ধনে গত বিশবছর ধরে ভারতবর্ষ ও বিশ্ব একত্র বাঁধা পড়েছে। সকল সম্প্রদায়ের ও সকল ধর্মের মিশরীরা বিশ্বাস করে যে বিরাট ভারতীয় জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহাত্মার জীবন রক্ষার জন্য তাদের পবিত্র ঐক্যকে পুনরুজ্জীবিত করুক। গান্ধিজী যে মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ দিচ্ছেন তার সাক্ষ্যের জন্য প্রাচ্যের প্রত্যেকটি সংগ্রাম-শীল ব্যক্তি ভারতের পানে তাকিয়ে আছে। বিশ্বদেশের নাব্যে মিশরীদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে ও ভারতীয়দের প্রীতি জ্ঞাপন করছি এবং লভ্য, লাভ্য ও স্বাধীনতার যে মহান আদর্শ আপনি জগতের সামনে তুলে ধরেছেন তা বাস্তবে রূপায়িত হোক—এই আমরা কামনা করি।

দক্ষিণ আফ্রিকার 'কেপটাউন যুক্ত হিন্দু সম্মেলন' জানালেন—আপনি অনশন ভক্ত করেছেন জেনে আমরা আনন্দিত। আজ—আপনার ৬৪তম জন্মতিথিতে—আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করে ভারতভূমির সেবা করুন, আপনার স্বাস্থ্য অক্ষয় হোক।

জার্মানী থেকে 'হামবুর্গ শান্তি সঙ্ঘ' জানালেন—শান্তি-স্বপ্নদেরা কামনা করছে এই সংগ্রামে ভগবান আপনার প্রাণ রক্ষা করুন।

আমেরিকার শিকাগো শহরের 'স্ট্রাশানালা আইরিশ রিপাবলিকের' পক্ষ থেকে ডেনিশমাল জানালেন—বৃটিশের উপর আপনার বিজয়লাভে আইরিশ গণতান্ত্রীর সান্নিধ্য অভিনন্দন জানাচ্ছে। সৃষ্টিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অঙ্গুরোধ করি।

জেনেভা থেকে রোমঁ রোলঁ ও মদলিয়েঁ রোলঁ জানালেন—আপনার আত্মিক বিজয় লাভের জন্য আমরা আনন্দিত।

জার্মান বন্ধু হার্মান ক্যালেনবাখ জানালেন—আনন্দ করছি। প্রীতি জানবেন।

বিস্তার থেকে বীনবন্ধু এগুরু জানালেন—আপনার উপবাসের ভিত্তর দিয়ে আপনি যে মহাপ্রেম প্রদর্শন করলেন সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।... আপনার উপবাস ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে বিশ্বকর বিজয় লাভ করেছে তার জন্য আমরা আনন্দিত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর ইচ্ছাকে সার্থক করে তোলার জন্য তিনি আপনাকে অক্ষয় স্বাস্থ্য দিন।

আমেরিকার ক্রকলীন থেকে পাদরী জন-হেইনস্-হোব্‌স্ জানালেন—পরবেশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনার জীবন রক্ষা পেয়েছে। লভ্যগ্রহ অবিস্মরণীয় জরলাভ করলো।

বোম্বাইয়ের গাঙ্গী

মহাত্মা গান্ধী সাংবাদিকদের বললেন—প্রয়োজন হলে হরিজনদের সঙ্গে আমি আমার উপবাস করবো।...আমার কিছু থাকলে আমি হরিজনদের সেবার তা দিয়ে দিতাম, কিন্তু প্রোগ্রাম ছাড়া দেবার মত আর কিছুই তো আমার নেই।...কায়র বিক্রেত আমার কোন অভিযোগ নেই, শুধু হিন্দুর বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করার জন্য, শুধু ধর্ম-কার্যে অগ্রপ্রাণিত করার জন্যই আমি উপবাস করেছি।...

মেয়েদের উদ্দেশ্যে গাঙ্গী বলছিলেন—আমি চাই, তোমরা অন্তর থেকে অস্পৃশ্যতার মূলমন্ত্র উপড়ে ফেলবে, হরিজন ছেলেমেয়েদের তোমরা দেখবে, নিজের ছেলেমেয়েদের মত। তোমরা তাদের ভালবাসবে নিজের আত্মীয় পরিজন ভাই বোনের মত—সকলেই তো ভারতমাতার সন্তান।...মেয়েদের অন্তর সেহপ্রবণ, চুপে দেখলে অন্তর গলে যায়। যদি হরিজনদের দুঃখ কষ্ট তোমাদের মাঝে দোলা দেয় এক তোমরা অস্পৃশ্যতা তুলে দাও, আর তার সঙ্গে তুলে দাও উচ্চ নীচের পার্থক্য, তাহলে হিন্দুধর্ম পরিমল হবে, এবং হিন্দুসমাজও আধ্যাত্মিক মার্গে মহাবেগে অগ্রসর হবে। পরিণামে সারা ভারতের পয়ত্রিশ কোটি জনগণের কল্যাণ হবে। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ যখন সেই বিশ্বয়কর পরিশোধন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হবে, তখন সারা বিশ্বের মানব সমাজের উপর তার স্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।...

এই কথাগুলি মেয়েদের অন্তর স্পর্শ করেছিল, কত মেয়ে তাদের গায়ের গহনা খুলে নিশ্চলচিত্তে গাঙ্গীর হাতে তুলে দিয়ে এসেছে, কোন পরিচয় রাখে নি, কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি। বোম্বাইয়ের মেয়েরা এগিয়ে এলো কাজ করতে। এতদিন বোম্বাইয়ের সব মন্দিরে অছুৎসদের প্রবেশ করার অধিকার ছিল না, হিন্দু হয়েও হিন্দুর মন্দিরের দরজা ছিল তাদের কাছে বন্ধ। বোম্বাইয়ের মহিলা প্রতিষ্ঠান গাঙ্গী-সেবাসেনা এবার সাড়া তুললো—সমস্ত মন্দিরে হরিজনদের ঢুকতে দিতে হবে।

এ সম্পর্কে গণভোট নেবার ব্যবস্থা হোল।

বিলম্বী কার্যদায় ছাপানো কাগজে ডেঁড়া কেটে ভোট দেওয়া নয়। এ ভোটের কোন ধরন নেই, লেখাপড়ার সংগেও কোন সম্পর্ক নেই। বোম্বাই শহরের সাতটি বড় মন্দিরের সামনে ছুটি করে বড় বাক্স রাখা হোল, একটি শাদা আর একটি কালো। বেজাসেবিকাদের পাহারা বসলো বাক্সগুলির পাশে। যে সব মেয়েরা মন্দিরে পূজা করতে আসবে তারা পথ থেকে এক এক টুকরো পাথর হুড়িয়ে এনে সেই বাক্সে ফেলে দিয়ে যাবে। যারা বিশ্বাস করে দেবতার কাছে অস্পৃশ্য বলে কিছু নেই, মন্দিরে হরিজনরাও পূজা করতে পারে, তারা আসবে শাদা পাথর, ফেলবে শাদা

আমাদের মন্দির

বাক্সে আর ঘাড়া মনে করে মন্দিরে অম্প্ৰস্তরা ঢুকবে না, তারা জানবে কালো পাথর, ফেলবে কালো বাক্সের মধ্যে।

ভোটের কলাকল গুণে দেখা গেল—হরিজনদের পক্ষে ২৪,৭২৭ জন আর বিপক্ষে আছেন ৪৪৫ জন :

মাথব বাগ—	হরিজনদের পক্ষে ১০,৬২২	বিপক্ষে ৪১
তুলেশ্বরের রাম মন্দির	" " ৫০৫১	বিপক্ষে ৮০
নরনারায়ণ মন্দির—	" " ৩০৬০	বিপক্ষে ৪০
মথাদেবী—	" " ১,৭১৮	" ১২
ঠাকুরদ্বারের রাম মন্দির—	" " ৩,৫৩১	" ২৬৫
বাবুল নাথ	" " ৫২৫	" ২
তুলেশ্বরের রাধাকৃষ্ণের মন্দির—	" " ২২০	" ৫
	পক্ষে ২৪,৭২৭	বিপক্ষে ৪৪৫

তুধু এই সাতটি মন্দিরই নয়, বোম্বাইয়ের সমস্ত মন্দির হরিজনদের অস্ত্র মুক্ত হয়ে গেল, আর তারই সংগে সারা ভারতের অসংখ্য মন্দিরে অম্প্ৰস্ত বলে আর কিছুই রইল না।

বাংলা দেশে উদ্বুদ্ধ হোল—কালীঘাটের মন্দির, জিগুরা রাজ্যের সব মন্দির, রাজবাড়ীর কালিমন্দির, নৈহাটীর সব মন্দির...

বিহার প্রান্তে—পাটনার বড় পদ্মনন্দেবীর মন্দির, জামশেদপুরের শ্রীরাম মন্দির, গয়ার সব কটি মন্দির...

উড়িষ্যা প্রান্তে—কটকের বিখনাথ মন্দির...

বুঙ্গ প্রদেশে—প্ররাগের বারোট মন্দির, লখনৌর বাণীকবির মন্দির, মীরাটের কালিপঙ্কজের শিবমন্দির, এবং অস্তান্ত পাঁচটি মন্দির...

মধ্য প্রদেশে—নাগপুরের শুক্রবারী মন্দির ও অস্ত্র ছাট মন্দির, অকলপুরের প্রত্যেকটি মন্দির, রাবপুরের গোপীনাথ মন্দির, ওয়ার্ধার মন্দির, অমরাবতীর নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির ও অম্বা মন্দির, বেলগাঁয়ের হুসমান মন্দির ও কপিলেশ্বর মন্দির...

বিহারীতে—দ্বাপাশ্বর মন্দির...

বোম্বাইয়ে—আম্বোদাবাদের দেবীমন্দির, বিঠোবা কল্লিগী মন্দির, ঠাকুরদ্বার মন্দির, কঙ্কবণ্ডরাবা মন্দির, মুরলীধর মন্দির, নরনারায়ণ মন্দির, ঠাকুরদ্বার বক্ত্রেশ্বর মন্দির, হুসমান মন্দির, পুণার শিবমন্দির, থানার বাক্কাই মন্দির, থাণ্ডেশ্বর

আমাদের গান্ধিজী

শকাবতী শ্রীমন্দির, নড়িয়াতে দেবী জ্বরব বাই মন্দির, বোম্বাইয়ের গান্ধাবী মন্দির, জুবলীও ও শেলহাবার মন্দির, আমেদাবাদে রামজী মন্দির...

পাক্ষাবে—মহাবীর মন্দির...

সিদ্ধান্তে—সব মন্দির...

হায়দরাবাদ রাজ্যে—শিবমন্দির...

বরোদা রাজ্যে—খাণ্ডেরাও মহাদেব মন্দির...

মহীশূর রাজ্যে—মারিয়াখা করেল গণেশ মন্দির, বেণু গোপালস্বামী মন্দির, শোলা-পুয়ের সিদ্ধেশ্বর মন্দির...

রণপুর রাজ্যে—কবীর মন্দির...

ময়দেশে—কুন্দস্বামী মন্দির, অজুনের মন্দির, কোলাপুরের দত্ত মন্দির, মহাভৈরবী মন্দির, সবস্বামীদীর শ্রীবিঠল মন্দির...

এগুলি ছাড়া ভারতের বহুস্থানে খ্যাত অখ্যাত বহু মন্দির হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত হোল। মানবতা কুসংস্কারকে জয় করলো।

দেশের নেতারা হরিজনদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য হরিজন সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করলেন, যনশ্রাম দাস বিড়লা হলেন সঙ্ঘের সভাপতি এবং অমৃতলাল ঠাকুর হলেন সম্পাদক। ভূপালের নবাব মুসলমান, তবু হিন্দুদের মধ্যে এই সংস্কার আন্দোলনের জন্য তিনি সবার আগে দিলেন পাঁচ হাজার টাকা।

সবরমতী আশ্রমের আপ্পা সাহেব পটবর্ধন ছিলেন কারাগারে, জেলখানায় তিনি খাজড়-মেথরদের সঙ্গে সমভাবে কাজ করতে চাইলেন, কিন্তু জেলের কর্তারা সে অনুমতি দিলেন না—উঁচু জাতের লোক হরিজনদের কাজ করতে পারে না।

আপ্পা সাহেব অনশন শুরু করলেন।

গান্ধিজীর কাছে খবর এলো। গান্ধিজী আপ্পা সাহেবকে সর্বাধীন করলেন, সহায়ত্ব জিনিয়ে তিনিও শুরু করলেন অনশন।

দু'দিন উপবাস।

তৃতীয় দিনেই ভারত সরকার জেলের আইন কায়েদ সব বললে দিলে। উচ্চ জাতির কোন লোককে জেলে বেথরের কাজ দেবার নিয়ম ছিল না, সে নিয়ম শোখরানো হোল—আপ্পা সাহেব জেলে সাধারণ বেথরের মত মলমুক্ত পরিষ্কার করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

গান্ধিজীকেও আর অনশন করতে হোল না।

আমাদের দাবী

ভারতের সমস্ত অস্পৃশ্যতার মানি দাবীশাস্ত্রে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সংক্রান্ত রোগের মত হিন্দু আচারকে পঙ্ক করে ফেলেছিল, গুরুদ্বার মন্দিরে ভারি প্রকাশ দেখা দিল—অস্পৃশ্যদের পূজার অধিকার নিয়ে বাধলো গোলমাল।

হরিজনদের নেতা কেলান্ন বললেন—হরিজনরা হিন্দু, হিন্দু-মন্দিরে ঢোকবার তাদের অধিকার আছে।

মন্দির নিয়ন্ত্রকেরা বললেন—পারিয়াদের মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নেই।

কেলান্ন বললেন—এই অজ্ঞায়ের প্রতিবাদে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করবো।

গান্ধী বললেন—কেলান্ন উপবাস করলে আমাকেও উপবাস করতে হবে।

গান্ধী অনশন করবেন! মন্দিরের মালিকেরা জন্ত হয়ে উঠলো, ব্যাপারটার গুরুত্ব নিজদের উপর থেকে সরিয়ে দেবার জন্ত বললো—আমরা তো অনসাধারণের কথাই জানিয়েছি যাত্র, অনসাধারণ কি চায় গণভোট নিয়ে দেখা যাক!

কেলান্ন রাজী হলেন।

পরমা জানুয়ারী ২০, ১৯৩০ জন নাগরিকের মতামত নেওয়া হোল। তাতে দেখা গেল, হরিজনদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন—১৫,৫৬৩ জন—শতকরা ৭৭ জন [এঁদের মধ্যে ৮০০০ মহিলাও ছিলেন]।

হরিজনদের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন—২৫৭৩ জন—শতকরা ১৩ জন।

মধ্যপন্থী হিসাবে মন্ত জানিয়েছেন—২০১৩ জন—শতকরা ১০ জন।

হরিজনদের অধিকারই স্বীকৃত হোল, গান্ধী ও কেলান্নকে আর উপবাস করতে হোল না। গুরুদ্বার মন্দিরদ্বার হরিজনদের জন্ত উন্মুক্ত হোল।

গান্ধী বললেন—অস্পৃশ্যতার মূলভিত্তি আমি উপড়ে ফেলতে চাই। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই আমি বেঁচে আছি, সেজন্য আমি সানন্দে প্রাণ দিতেও পারি। ইহাই আমার গত পঞ্চাশ বছরের বশ্য।...আমার জীবনের কোন মূল্যই আমি দিই না। হিন্দুরা স্বর্গীয় শত সহস্র নরনারীর উপর যে অজ্ঞার আচরণ করেছে আমার মত শতটি জীবন দান করলেও তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হবে না।...আমার যদি দেবার মত আর কিছু থাকতো, আমি স্বচ্ছন্দে দিতাম, কিন্তু দেবার মত শুধু আমার জীবনটাই আছে।...আমি মরি কিবা ষাট তাকে কিছু বায় আসে না, আমার উদ্দেশ্য সাধন্য লাভ করুক এইটাই আমার কামনা...

কেল থেকেই গান্ধী হরিজনদের সেবা করার অধিকার দাবী করলেন।

কিন্তু গণভোট সে অধিকার দিতে চাইল না।

আমাদের গান্ধিজী

চই যে থেকে গান্ধিজী আবার অনশন শুরু করলেন, বললেন—কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়। এ আমি ও আমার সহকর্মীদের আত্মতত্ত্বের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা, যেন হরিজনদের উন্নয়নের জন্য আমরা আরো বেশী নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে পারি।

গান্ধিজীর তখনকার ভয় বাহ্যের পক্ষে একুশদিন অনশন করা বিপজ্জনক। ভারত সরকার সেই বিপদের মুঁকি নিতে সাহস করলেন না, অনশন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার গান্ধিজীকে মুক্তি দিলেন। গান্ধিজী বললেন—মুক্তি আমি পেয়েছি, কিন্তু হরিজনদের সেবা করা ছাড়া অন্য কোন কাজে আমি আত্মনিয়োগ করতে পারবো না। তাহলে আমার উপবাসের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।...

মুক্তি পাবার জন্য গান্ধিজী অনশন করেন নি, দেশবাসীর মনকে অস্পৃশ্যতার সংস্কার থেকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। অনশন চলতে লাগলো।

পুনায় লেডী প্রেসলতা ঠাকরসীর প্রাসাদ 'পূর্ণ কুঠা'। জেল থেকে বেরিয়ে সেখানেই গান্ধিজী শয্যা গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাধব শ্রীহরি আনেকে অহরোধ করলেন ছ' সপ্তাহের জন্য আইন অমান্ত আন্দোলন স্থগিত রাখতে। বললেন—এই উপবাস শেষ করে যদি আমি বাঁচি তাহলে কংগ্রেসকে বখা কর্তব্য নির্দেশ দেবার চেষ্টা করবো। গবর্নেন্টের উচিত ইতিমধ্যে দেশে সত্যিকারের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সমস্ত আন্দোলনকারীকে বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া।

গবর্নেন্ট তার উত্তরে বললেন—রাজনৈতিক বন্দীদের বতদিন জেলখানায় রাখা সরকার তার বেশী রাখার ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু রাজবন্দীদের ছেড়ে দিলে যদি আবার আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু হয়ে যায় সেইজন্য আমরা তাদেরকে এখনই ছেড়ে দিতে পারছি না। আমরা এমন কিছু করতে চাই না, যাতে নতুন করে গোলযোগ শুরু হতে পারে।

কিন্তু অপর পক্ষ কি করবে না করবে তার উপর গান্ধিজীর চিন্তাধারা নির্ভর করে না। আন্দোলন বন্ধ করার যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন তা আর প্রত্যাহার করলেন না। আন্দোলন বন্ধ হোল।

আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া অনেকের কাছেই ভালো লাগলো না।

হুদ্র ভিয়েনায় ছিলেন বিটলভাই প্যাটেল ও হুতাঘটন বন্ধ, সেখান থেকে তাঁরা বিবৃতি দিলেন—আইন অমান্ত আন্দোলন স্থগিত রাখার জন্য যে নির্দেশ গান্ধিজী দিয়েছেন, তা থেকে তাঁর নীতির ব্যর্থতাই তিনি স্বীকার করেছেন... রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধিজী ব্যর্থ হয়েছেন বলেই আমরা মনে করি। কংগ্রেসকে এখন আবার নতুন করে সংগঠন করার সময় এসেছে—নতুন নীতি, নতুন পদ্ধতি ও নতুন

আবাহের গান্ধী

নেতার আজ একান্ত প্রয়োজন, কারণ সারা জীবন ধরে যে কর্মনীতি গান্ধীজী অগ্রসর করে আসছেন তার ব্যতিক্রম করে কোন কাজ করা গান্ধীজীর কাছে থেকে আশা করা অস্বাভাবিক।...কংগ্রেসের যদি আমূল সংস্কার সম্ভব হয় ভালো কথা, অন্য কংগ্রেসের ভিতরেই একটি শক্তিশালী দল গড়ে তুলতে হবে।...

তারা গান্ধীজীকে ঠিক বুঝেছিলেন, রাজনীতিক লাভ লোকসানের চেয়ে নীতি কথা ও মহত্ববোধের কথাই গান্ধীজীর কাছে বড় ছিল। মুক্তি পাবার পর কর্ণাটকে নেতা গান্ধীজীর রাও দেশপাণ্ডে যখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে কথায় কথায় কর্ণাটকে অবস্থা সব বললেন—কেমন ভাবে সেখানে আইন অমান্য আন্দোলন ধীরে ধীরে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, কংগ্রেসকর্মীরা মিথ্যা ও গোপনতার আশ্রয় নিয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাকে ফাঁকী দিয়ে কেমন ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন...

কংগ্রেসের এক নাম-করা নেতা ছিলেন বসে, সব শুনে তিনি খুঁসি হলেন, বললেন—চমৎকার! খুব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে!

গান্ধীজী বললেন—খুব বুদ্ধির পরিচয় আছে সত্যি, কিন্তু এ সত্য্যগ্রহ নয়।

গান্ধীজীর সত্য্যগ্রহের নীতিতে মিথ্যা বা গোপনতার স্থান ছিল না—আন্দোলন বরং বন্ধ রাখাও ভালো, কিন্তু সত্য্য ও অহিংসা থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না!

পূর্ণ হুঠাতে গান্ধীজী একুশ দিন উপবাস শেষ করলেন। দেশের সর্বত্র তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে প্রার্থনা করা হোল।

কদিন পরে পুনরায় কংগ্রেস কর্মীদের বৈঠক বসলো, তাঁরা স্থির করলেন—গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে একটা মীমাংসার পৌছবার চেষ্টা করবেন।

গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু বড়লাট দেখা করতে রাজী হলেন না। কংগ্রেস কমিটি নির্দেশ দিলেন—সাধারণভাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ থাকলেও, কংগ্রেসকর্মীরা ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে সত্য্যগ্রহ চালাতে পারে।

গান্ধীজীও কংগ্রেসের এই নির্দেশ মেনে নিলেন। ঘোষণা করলেন—পূরল আগস্ট তিনি রাসগ্রামে বাজা করবেন, এবং সেখান থেকেই শুরু করবেন ব্যক্তিগত সত্য্যগ্রহ।

নিজেকে প্ররক্ত করার চেষ্টায় গান্ধীজী এলেন শবরমতী আশ্রমে, দাঁড়ি বাধার সময় তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতা না নিয়ে তিনি আশ্রমে কিরবেন না। স্থির করলেন এমন কোন বন্ধন রাখবেন না, যা তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে পারে। তিনি আশ্রমটি

আমাদের গাঙ্গিঙ্গী

বর্ষেষ্টের হাতে তুলে দিতে চাইলেন, কিন্তু গবর্নেষ্ট তা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তখন তিনি আঙ্গিঙ্গী হরিজন সঙ্ঘের হাতে তুলে দিলেন। আঙ্গিঙ্গে তখনও ঐক্খিগজন বাসিন্দা ছিল, কথা রইল তাদের নিয়ে গাঙ্গিঙ্গী তাঁর অভিবান বৃক করবেন।

কিন্তু পরলা আগস্ট প্রভাত হবার আগেই গাঙ্গিঙ্গীকে পুলিশ পাকড়াও করলো। তাঁকে ও তাঁর অঙ্গচরদের তিনদিন আটকে রাখা হোল বেরোড়া জেলে।

চৌঠা আগস্ট গাঙ্গিঙ্গীকে ছেড়ে দেওয়া হোল, সঙ্গে সঙ্গে জেলের দরজার ম্যাকিষ্ট্রেষ্টের এক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হোল তাঁর হাতে, ম্যাকিষ্ট্রেষ্ট সাহেব লুখ্য দিয়েছেন—বেরোড়া গাঁয়ের সীমানা ছেড়ে আপনাকে চলে বেতে হবে এক পুশার আপনাকে বাস করতে হবে।

পরোয়ানা পড়ে গাঙ্গিঙ্গী হাসলেন—আদেশ অমান্ত করাই বিনি স্থির করেছেন আদেশ মান্ত করার কোন প্রব্রই তখন ওঠে না। গাঙ্গিঙ্গী রাসগ্রামের দিকে বাঙ্গা করলেন।

খবর পেয়েই পুলিশ ছুটে এলো, আধঘণ্টার মধ্যে গাঙ্গিঙ্গী আবার গ্রেপ্তার হলেন, আদেশ অমান্ত করার অভিযোগে তাঁর উপর এক বছর কারাবণ্ডের আদেশ হোল।

সারা ভারতের বৃকে আবার নতুন উন্নাদনা দেখা দিল। এক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের নগরে ও গ্রামে, পথে ও প্রান্তরে শত শত কর্মী কারাবরণ করলো।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাধব ক্রীহরি আনে, তেরোজন সহকর্মী নিয়ে আকোলা বাবার পথে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর স্থান দখল করলেন সর্দার শাহুল সিং কবিশের। তাঁকেও পুলিশ পাকড়াও করলো। কস্তুরবা, দেবদাস, মহাদের দেশাই, রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি একে একে কারা-প্রাচীরের আড়ালে অদৃষ্ট হলেন। তারপর সারা ভারতের শত শত কর্মীর মাঝে আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো, প্রতি প্রদেশে দেখা দিল অগণিত জেল-বাজীর কনতা।

গাঙ্গিঙ্গী দাবী করলেন—জেলের মধ্যে থেকেও হরিজন সেবার পূর্ণ অধিকার তাঁকে দিতে হবে।

গবর্নেষ্ট জানালো—জেলের ভিতর থেকে তা হবে না।

গাঙ্গিঙ্গী বললেন—হরিজন সেবা রাস-প্রবাসের বৃত্তই আমার বাচার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, এ ছাড়া আমি বাচতে পারি না। এই অধিকার না পেলে আমি উপবাসে দেহত্যাগ করতে বাধ্য হব।

আবাসের গাঙ্গিজী

গবর্নেন্ট জানালেন—যদি তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখেন তাহলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া যায়।

কিন্তু গাঙ্গিজী কোন সর্ত্ত যেন নিতে রাজী হলেন না।

১৬ই আগস্ট থেকে আবার অনশন শুরু করলেন।

প্রথম চারদিন ভালই কাটলো, পঞ্চম দিনে গাঙ্গিজীর অবস্থা এতই কাহিল হয়ে পড়লো যে সরকারী ডাক্তাররা শংকিত হয়ে উঠলো, তাঁকে তাড়াতাড়ি পুশার সেহুন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলো। হাসপাতালেও গাঙ্গিজী দু'দিন কয়েদীর মতই রইলেন। কিন্তু সপ্তম দিনে তাঁর জীবন সংশয় হোল—আর বুঝি গাঙ্গিজী বাচেন না!

সরকারের দৃঢ়তা এবার টুটলো। গাঙ্গিজীকে আটক করে রাখতে আর তারা সাহসী হোল না। সেই দিনই বিনা সর্ত্তে গবর্নেন্ট গাঙ্গিজীকে ছেড়ে দিলে।

গাঙ্গিজী মুক্তি পাবার জন্য অনশন করেননি, হরিজন সেবার আত্মনিয়োগ করার অধিকার পাবার জন্যই উপবাস করেছিলেন। কেউ যেন তাঁকে ভুল না বোঝে, তাই তিনি জনসাধারণকে জানালেন—এক বছর জেলে থাকার কথা, আগস্ট ১৯৩৪ সালে সেই এক বছর শেষ হবে। ততদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে বন্দী বলেই ভাববেন, ততদিন কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে থাকবেন না। হরিজনদের সেবা করার অধিকার তিনি চেয়েছিলেন, একান্তভাবে সেই কাজই তিনি করবেন।

হরিজনদের সমস্ত সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে গাঙ্গিজী আবাস পথে বেরিয়ে পড়লেন।

গাঙ্গিজী বললেন—অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে বড় গ্লানি...আমরা ভগবানকে পতিতপাবন বলি, সেইজন্যই হিন্দু হয়ে যারা জন্মেছে তাকে অস্পৃশ্য বলে ভাবা সরতানি ছাড়া আর কিছু নয়।...আমি সনাতনী হিন্দু। সংস্কৃত ভাষায় আমার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য নেই, তবে বেদ ও উপনিষদের অজুবাদ আমি পড়েছি, এবং হিন্দু হিসাবে এতটুকু দাবী আমি করতে পারি যে, সে-সব শাস্ত্রগ্রন্থের অন্তর্নিহিত সুরটো আমি ধরতে পেরেছি। অজ্ঞাত ধর্ম সম্পর্কেও আমি পড়েছি...আমি উপলব্ধি করেছি যে যদি আমার মুক্তি আসে সে হিন্দুধর্মের ভিতর দিয়েই আসবে। হিন্দুধর্মের প্রতি আমার প্রীতি ও আস্থা গভীরতর হয়েছে। সেইজন্যই আমি বিশ্বাস করি যে হিন্দু ধর্মের কোথাও অস্পৃশ্যতা বলে কিছু নেই, যদি থাকে তাহলে সে ধর্ম আমার ধর্ম নয়। ...এই সম্পর্কে আমি বিতর্ক করতে চাই না। ভগবদ্গীতা বা মহাভারত থেকে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে আমার মতকে সমর্থন করানোও আমার পক্ষে কঠিন। হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য আমি ধরতে পেরেছি। অস্পৃশ্যতা বীকার করে হিন্দু

আমাদের স্বাধীনতা

মহাপাপ করেছে, আমরা অবসম্মিত হয়েছি, সবত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আমরাই হয়েছি অশান্ত। যতদিন হিন্দুরা অশান্ততাকে তাদের ধর্মের অন্তর্গত বলে মনে করবে, যতদিন হিন্দু সমাজ ভাবে তাদের এক ভাইকে শাস্তি দেয়া হয় ততদিন স্বরাজ লাভ অসম্ভব। সুখিতির সঙ্গে কুরুরটিকে ছেড়ে স্বর্গে প্রবেশ করতেও রাজী হননি, সুখিতির বংশধরেরা অশান্তদের বাদ দিয়ে কেমন করে স্বরাজ লাভ করবে। যে অন্যায়ের জন্য গবর্মেন্টকে আমরা সম্মতান বলে গালি দিই, অশান্ত ভাইদের প্রতি কি আমরা সেই অপরাধে অপরাধী নই?... আমরা আমাদের ভাইদের পতিত করেছি, তাদের বুক দিয়ে হাঁটতে শিখিয়েছি, মাটির উপর তাদের নাক ঘষতে শিখিয়েছি, চোখ রাঙিয়ে তাদের ট্রেনের কামরা থেকে নাবিয়ে দিই, ইংরাজেরা কি এর চেয়েও বেশী কিছু করেছে? যতদিন আমরা দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা করতে না পারি ততদিন স্বরাজের কথা বলা অবাস্তব... আমাদের দুর্বল-ভাইদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করে আসছি, যতদিন সেই পাপ থেকে আমরা নিজাদের মুক্ত করতে না পারছি ততদিন আমরা পশু ছাড়া আর কিছু নই।...

দশমাস ধরে মহাত্মাজী আধাবর্ডের প্রত্যেকটি প্রদেশে পরিভ্রমণ করলেন, শত শত সভায় তিনি অশান্ততা নিরাকরণের নির্দেশ দিলেন, আর তারই সঙ্গে সাধারণের কাছে হাত পাতলেন হরিজন সেবায় কিছু সাহায্য করার জন্য।

এক সভায় ছোট্ট একটি মেয়ে ফুলের মালা পরিয়ে দিল গান্ধিজীর গলায়। মহাত্মাজী হেসে বললেন—মালাই দিচ্ছ, তোমার হাতের আংটিটা দাও না কেন হরিজন কাণ্ডে?

—আপনি যখন চাইছেন নিশ্চয়ই দেব।—যেটি আঙুল থেকে আংটিটি খুলে ফেললো।

গান্ধিজী তাড়াতাড়ি বললেন—না না, তোমার মা বাবা হয়তো বকবেন।

—তারা কিছু বলবেন না, আপনি এটা নিন।

কিন্তু তবু গান্ধিজী নিতে চান না দেখে বালিকার চোখে জল এলো, কত কষ্টে বললো—আপনি তাহলে নেবেন না?

চোখের জল গান্ধিজী সহ করতে পারতেন না, বললেন—বেশ তাহলে দাও।

কত আরগায় কত মানপত্র দেওয়া হোত গান্ধিজীকে। কোথাও রূপায় কোঁটার, কোথাও বা হাতীর দাঁতের কোঁটার। সভার মাঝেই গান্ধিজী সেগুলি নীলামে চড়াতে, সভাপতি হাঁকতেন—যো রূপিয়া, তিন রূপিয়া, পাঁচ রূপিয়া...

আমাদের গাভি

হরতো দর উঠলো তিনশো টাকা। গাভি বললেন—তিনশো টাকা হলে
কোঁ চলবে না, আমি এক একটি বেচে যে হাজার টাকা করে পাই।

হাজার টাকাতোই শেষ অবধি কোঁটাটি খিলি হোল।

কোঁথাও মানপত্র দেবার কথা উঠলেই তিনি বলতেন—টাকার খলি চাই কিন্তু!

দক্ষিণ ভারতের এক সত্তার এক ভদ্রলোক বললেন—আপনার পায়ের দুটো
আমার গৃহে দিতে হবে!

—কিন্তু আমি যে হরিজনদের কাজ করতে বেরিয়েছি, অবসর বড় কম!

—আমি আপনার সময়ের দাম দোব। বতরুণ আপনি আমার বাড়ীতে থাকবেন
প্রত্যেকটি মিনিটের জন্য আমি ১১৮ টাকা করে দোব!

এইভাবেই চললো অর্থ সংগ্রহ।

তিনি যে শুধু সংগ্রহই করে যেতেন তা নয়, ছোট একখানি পকেট-বই
খাকতো সঙ্গে, প্রতিদিন রাজে বসে তাতে হিসাব রাখতেন।

একদিন এক মার্কিন যুবক তাঁকে প্রশ্ন করলো—কত টাকা গেলেন?

—সাড়ে তিন লাখ।

—এ টাকা কিভাবে খরচ করবেন?

—হরিজনদের সেবার সংগঠনের কাজে। কোন প্রোপাগান্ডা নয়!

তৈনে গাভি চলছেন, তৈনে তৈনে গাড়ী থামছে, অগণিত জনতা তাঁকে এক
বার চোখের দেখা দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, সাড়া তুলছে—মহাত্মা গাভি জয়!

গাভি হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালেন জানালার সামনে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে
বললেন—হরিজনদের জন্য একটি করে পয়সা তোমরা দাও আমাদের।

গাভি ভিক্ষা চাইছেন! জনতার মধ্যে তৈলাতৈলি পড়ে গেল, কে আগে তাঁর
হাতে পয়সা দেবে তার ভরে হুক হোল ব্যস্ততা, মুহূর্ত মধ্যে এক হাত ভরে গেল,
গাভি আরেক হাত বাড়িয়ে দিলেন। সে মুষ্টিও পূর্ণ হতে বেরী হোল না।
গাভির হাতে পয়সা তুলে দেওয়ার আনন্দে জনতা উল্লসিত হয়ে উঠলো—মহাত্মা
গাভি জয়!

তৈন হাফলো, গাভি হিসাব করতে বললেন কত পয়সা সংগ্রহ হোল সেখানে।
একটি পয়সাও হিসাবের কাজে পড়তো না।

আবাবের গাফিলী

রাত্রেও এইভাবে পরশা ভিক্ষার ব্যক্তিক্রম ছিল না। হুপুর রাত্রে হয়তো গাফিলী ঘুমচ্ছেন, এমন সময় ক্রেশনে গাড়ী এসে থামলো, জনতার চীৎকার শুনে গাফিলীর ঘুম ভেঙে গেল, তিনি বিবর্ত্ত হলেন না, হাসিমুখে জানালার ধারে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, বললেন—হরিজন সেবাকে লিয়ে মুখে এক এক পৈসা দিচ্ছিলে!

পণ্ডিত মালব্যাজীর মত তিনি বড় বড় ধর্মীর কাছে থেকে, রাজা মহারাজার কাছে থেকে অনারসে লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা চাননি, তিনি চেয়েছিলেন হরিজনদের সেবায় ভারতের প্রত্যেকটি মাছবের কিছু কিছু দান থাক।

ছোট ছেলে তাঁর সামনে অটোগ্রাফের খাতা বেলে ধরলেই তিনি স্বাক্ষর দিতেন না, হেসে বলতেন—আগে আমার কী দাও পাঁচ টাকা?

কোন ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করতে গেলে তিনি হেসে বলতেন—আমাকে ছুঁলেই কী লাগবে!

হরিজন কাণ্ডে কিছু না দিলে ডাক্তার রেহাই পেতেন না।

সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা সভাতেও হরিজনদের জন্য তিনি টাকা তুলতেন।

১৯৩৭ সালে যখন 'শাদা কাগজের' নতুন আইন চালু হোল, তখন এক সাংবাদিক গাফিলীকে প্রশ্ন করেন—কংগ্রেসীরা কি যন্ত্রিৎ গ্রহণ করবে?

গাফিলী ঠাট্টা করে বললেন—কেন? তুমি কি মহী হতে চাও নাকি?

সাংবাদিক বেচারী আর কি বলে, এক পাশে সরে দাঁড়ালো, কিন্তু মহাস্বামী এতো সহজে তাঁকে ছাড়লেন না, বললেন—তোমার টুপিটা আমাকে দেবে, ভিক্ষাপাত্র করবো!

সাংবাদিক তাড়াতাড়ি টুপিটি খুলে গাফিলীর হাতে দিলেন। গাফিলী সেটি হাতে নিয়ে প্রথমেই বাড়িয়ে দিলেন সেই সাংবাদিকের সামনে, বললেন—আগে তুমিই কিছু দাও, তোমা থেকেই শুরু হোক!

সাংবাদিক তাড়াতাড়ি কিছু দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন, চারিদিকে হাসির হব্বা উঠলো।

এই টাকাটা যে শুধু হরিজনদের জন্যই ব্যয় হোক তা নয়, দ্বারা অল্পমত তাদের উন্নতি বিধানের কাজেও ব্যয় করা হোক, সেখানে হিন্দু কি মুসলমানের বিচার ছিল না। অনেক বৌদ্ধা হিন্দুর তা ভালো লাগতো না, একবার একজন ধর্মী এসে বললেন—মহাস্বামী, আপনাকে আমি দু'লাখ টাকা দিতে চাই, কিন্তু একটা কথা—মুসলমান ও হরিজনদের কাছে এ টাকা আপনি ব্যয় করতে পারবেন না!

আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজী হেসে বললেন—কথাটা ভালো। কিন্তু তোমার ওই সর্ভে তো আমি টাকা নিতে পারবো না, তুমি আর কোন মহাত্মাকে খুঁজে বের কর গে—

সত্যগ্রহীর কাছে টাকার চেয়ে তো সত্য বড়।

কয়েক মাসের মধ্যেই মহাত্মাজী আট লাখ টাকা সংগ্রহ করলেন।

কিন্তু এমন মহৎ কাজও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। একদল সংস্কারাজের যাহূব এতদিনের জাত্যাভিমান এতো সহজে ছাড়তে পারলো না, গান্ধিজী ছোট লোকদের জন্ত এতো যাতায়াতি করছেন এ তারা সহিতে পারলো না। তারা গান্ধিজীকে আশ্বাত করার জন্ত সংকল্প করলো।

তাদের প্রথম অভিযান প্রকাশ পেল পুণা সহরে।

পুণা মিউনিসিপ্যালিটি সেদিন এক বিশেষ সভায় গান্ধিজীকে নিমন্ত্রণ করে। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একখানি মানপত্র দেবার জন্ত। যথা সময় গান্ধিজী মোটারে যাচ্ছিলেন, পথে একটি যুবক তাঁর গাড়ীতে বোমা ছুঁড়লো। যুবকের মোটার চিনতে ভুল হয়েছিল। আগের গাড়ীতে যাচ্ছিলেন অস্ত্র লোক, বোমাটি সেই গাড়ীর সামনেই কাটলো। মোটারখানি লাফিয়ে উঠলো, ভিতরের সাতজন আরোহী জখম হোল।

চলিশ কোটি মানুষের অদৃষ্টলিপি সেদিন ভালো ছিল বলতে হবে। জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা সে মোটরে ছিলেন না, তিনি আসছিলেন পিছনের গাড়ীতে। নিরাপদে তিনি গৌর-সভায় এসে পৌঁছলেন।

হরিজনদের ব্যাপারে কর্মীদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক প্রায় লেগে থাকতো। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ছোটলোকদের সমান অধিকার দেবার বিরোধী ছিলেন। কান্ট্রির বানী পণ্ডিত লোকনাথ ছিলেন এই দলের যাহূব। একদিন তো হরিজন কর্মীদের সংগে তাঁর প্রচণ্ড বিতর্ক বেধে গেল।

লোকনাথ হরিজনদের যাহূব বলে মানতে চান না।

কর্মীরাও হুক্তি দিতে ছাড়েন না।

শেষে পণ্ডিতজী গান্ধিজীকে গালি দিতে শুরু করলেন। গান্ধি-বাবীরা আর সহিতে পারলো না, মাথায় খুন চড়ে গেল, হাতে ছিল লাঠি, এক বা বসিয়ে দিল পণ্ডিতজীর মাথায়। মাথা ফেটে গেল। রক্তারক্তি ব্যাপার।

খবর পৌঁছালো গান্ধিজীর কাছে। তিনি মর্ষাহত হলেন। সত্যগ্রহের নীতি তো এ নয়। সত্যগ্রহী সত্যের জন্ত লড়বে। তার কাজ হোল অজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াই করা, অপরাধে আশ্বাত করা নয়,—যারা অজ্ঞান করছে তাদের নিজের ভুল

আব্বাশের গাঙ্গী

বিয়ে দেওয়া, ভোজ্য সত্য উপলব্ধি জার মনে চুকিয়ে দেওয়া। সে যে পর্বত
 তার ভুল না বুঝতে পারবে, সে পর্বত সত্যগ্রহণ সম্বল হবে না। নির্ভীক হয়ে
 গিয়ে যেতে হবে, পরাজয় মানা চলবে না—বৃত্তান্তেও হার মানবে না। আব্বাশ
 লে তাকে সহিতে হবে, কিন্তু আব্বাশ করা চলবে না।...আর কান্ডে সত্যগ্রহীরা
 ভিত্তিকীকে আব্বাশ করে বসলো, সত্যগ্রহের মর্ম এখনও তো তারা পরিপূর্ণভাবে
 বুঝতে পারেনি। তাদের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন, তাদের মনস্তত্ত্ব করা দরকার।
 গাঙ্গী সাতদিন অনশন করলেন। কর্মীদের উদ্দেশ্যে আব্বাশ করলেন—পর-যত
 ইতে যেন তারা অভ্যস্ত হয়, কোন মতেই হিংসার আশ্রয় না লয়।

হরিজন আন্দোলনের গতি ব্যাহত হোল বিহার ভূমিকম্পে।

কয়েক মিনিটের ভূমিকম্প বিহারের ত্রিশ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে যে ক্ষতি হোল,
 গাঙ্গী অতর্কিত। দেড় কোটি মানুষ গৃহহারা হোল। কুড়ি হাজার লোক প্রাণ
 হারালো। নাটি কেটে গরম বালি ছুটলো, হাহাকার উঠলো শহরে শহরে, গাঁয়ে
 গাঁয়ে। কত লোক যে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়লো!

শত সহস্র কংগ্রেস কর্মী ছুটে এলেন বিহারে আর্ডারের সেবা করতে।

ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ খবর পাঠালেন গাঙ্গীর কাছে। গাঙ্গী ছুটে এলেন।
 একঘাস ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পদব্রজে ঘুরে বেড়ালেন। কোথাও-কোথাও সেবার
 জন্ত ভিক্ষার কুলি পেতে ধরলেন, বললেন—আর্ড সেবার দান কর। আব্বাশ
 কোথাও বা সর্বহারাদের ডেকে বললেন—ভিক্ষা চেও না, কাজ চাও! আব্বাশ কখনো
 সেবকদের ডেকে বললেন—সরকারী লোক কি কংগ্রেসী লোক বলে কোন পার্থক্য
 করো না, হিন্দু-মুসলমানের বিচার করো না, স্পৃহা অস্পৃহা বলে ভাববার মত অবসর
 আজ আর নেই।

চারিদিকের এই দুর্ভোগের মাঝে সত্যগ্রহের আন্দোলন থেমে আসে, তথ্যসি
 একদল কর্মী গাঙ্গী আন্দোলন থামিয়ে দিয়েছেন বলে তীব্র সমালোচনার অবতারণা
 করেন। গাঙ্গী তাঁদের হুঁজিকে ঘেন্নে নিতে পারলেন না, অনেক বিচার বিবেচনা
 করে তিনি কংগ্রেসের সমস্ত পদ ছেড়ে দিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বললেন—অনেক
 কংগ্রেস-কর্মীর সঙ্গে আব্বাশ মন্তব্য মিল হচ্ছে না।...অনেক তীব্র কংগ্রেসকর্মী
 আব্বাশ নীতিকে সমর্থন করতে না পারলেও আব্বাশ নির্দেশ পালনে ঝিা করেননি।...
 আব্বাশ চরকা ও বস্ত্রকে দেশবাসীর লামনে ভুলে ধরতে চাই। কিন্তু অনেক কর্মীর এতে

আমাদের স্বাধীনতা

পূর্ণ স্বাধীনতা নেই।... ভারতবর্ষকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় তাহলে চরকা বন্ধরকে স্বীকার করতেই হবে।... চরকা জনগণের স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতীক।... এ জাতির দ্বিতীয় ফুসফুস। এই ফুসফুসটি ব্যবহার না করার অশ্রুই আজ আমরা ক্ষ হতে বসেছি। অথচ এই চরকার উপরেই আজ বহু কর্মীর বিশ্বাস নেই। বন্ধর বিশ্বাস না করার অর্থ জনগণের সংগে কংগ্রেসের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলা।... অনেকে মনে করেন হরিজন আন্দোলনের ব্যাপারে আইন অমান্ত আন্দোলন বন্ধ করে দি আমি ভুল করেছি। কিন্তু আমি বা বুকেছি তা না করলে নিজের কাছে বিশ্বাসচ্য হতাম।... চৌক বছর ধরে আমি অহিংসার পরীক্ষা করছি। অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মীর কাছে এটা একটা নীতি কিন্তু আমার কাছে এটি একটি ধর্ম। যদিও এ সম্পর্কে আমি এখনও রীতিমত ব্যাপ্তি লাভ করতে পারিনি। এই নীতি এখন কিছুদিন শু আমার একার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ভালো।... সত্যগ্রহ আমার জীবন-বেদ। সত্য আমার কাছে ভগবান। আমি অহিংসার সাধনায় পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করতে চাই আমার দেশের স্বাধীনতা—সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতা এই সত্যগ্রহসম্মানের অন্তর্গত ইহকালের কি পরকালের কোন লাভ-লোকসানের আশায় আমি এই সত্য সাধন ছাড়তে পারি না। এই সত্যসাধনাই পূর্ণ স্বাধীনতা। আজ আমার দেশবাসীকে একথা বোঝাতে না পারলেও একদিন সত্য নিজগুণে ভাষার হয়ে উঠবে।... আমি ভারতের জন্য পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই। পূর্ণ শ্রদ্ধার অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে অনেক বেশী। সেইজন্য বর্তমান বৈজ্ঞানিক আমি শ্রদ্ধার ব্যাখ্যা করি না কেন, কোন ব্যয়েই সে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয়নি।... এখন আমি কংগ্রেসের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাই।...

কাজে কলমে গান্ধিজী কংগ্রেস ছাড়লেন বটে, কিন্তু তাবধে কাজের বিরতি হোল না। গ্রাম উন্নয়নের কাজ, হরিজনের কাজ, জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার কাজ— সব কিছুই সমভাবে চলিতে লাগলো। কর্মীদের তিনি নির্দেশ দিলেন—সত্যগ্রহ আধ্যাত্মিক অস্ত্র।... আমি এই অস্ত্র প্রয়োগের বিশেষজ্ঞ হবার দাবী রাখি। এই অস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে বর্ষে সতর্কতার প্রয়োজন। সত্যগ্রহের গোড়ার কথাই হচ্ছে—সত্যগ্রহীর বর্তমানটুকু দেখলেই চলবে না, আরো দূরে দৃষ্টি রাখতে হবে। সেইজন্য অনেক আলোচনা করার পর এখন সত্যগ্রহ স্থগিত রাখতে চাই।... আমার বিশ্বাস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অব্যবহৃত হতে হলে এইটাই হোল প্রথম পদ।... সত্যগ্রহ মানে শুধু আইন অমান্ত করাই নয়, সত্যগ্রহ মানে সত্যের প্রতি অঙ্গসংকীর্ণতা। এক সেই অঙ্গসংকীর্ণতা পরিপূর্ণভাবে অহিংস নীতির প্রয়োগ করা।... আইন অমান্তকারীদের

আমাদের বাড়ি

এখন কাজ হবে বার্ষিক শুল্ক ও করদায়ক বন্ধ করতে পেশা, জাতি গঠনের কাজে আন্ত-নিয়োগ করা।

এই জাতি গঠনের জন্য মহাত্মা জী কংগ্রেস কর্মীদের আঠারো বলা কার্যনীতির নির্দেশ দিলেন :

১। বন্দর—গান্ধিজী বলেন বন্দর আমার কাছে একতার প্রতীক, অর্থোপার্জনের স্বাধীনতা ও সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতীক। এই চরকা কাটার মূল কথা হচ্ছে দেশকে স্বাবলম্বী করে তোলা। আমাদের দেশে বছরে হাজার কোটি গজ কাপড়ের ব্যবহার। আগে এর সবটাই আমাদের দেশে তৈরী হোত কিন্তু ইংরেজেরা এদেশের চরকা নষ্ট করে দেয়, তখন তাঁতীরা দিশি হুতা না পেয়ে বিলিভী হুতার কাপড় বুনতে শুরু করে, কোটি কোটি টাকার হুতা বিলাত থেকে এদেশে আসতে থাকে। পরে তাঁতীদের বুড়ো আত্মল কেটে দিয়ে তাঁত চালানোর ব্যবস্থাও কমিয়ে দেওয়া হোল। বিলিভী কলে বোনা কাপড় আসতে শুরু করলো। শেষে দেখা গেল ১০০০ কোটি গজের মধ্যে আমাদের দেশে তৈরী হচ্ছে মাত্র ২৫০ কোটি গজ—মিলে ১৫০ কোটি গজ আর তাঁতে ১০০ কোটি গজ। বাকী ৭৫০ কোটি গজ আমরা কিনছি বিলাত থেকে। এই কিনতে গিয়েই আমাদের গরীব দেশ বছরে বছরে আরো বেশী গরীব হয়ে পড়ছে। এই টাকাটা দেশে রাখার জন্য মহাত্মা জী দেশবাসীর হাতে চরকা তুলে দিলেন, বললেন—প্রত্যেক লোকেরই দিনে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা চরকা কাটা উচিত। সকলকেই তিনি বন্দর পরতে অনুরোধ করলেন। বন্দরের দাম যদি মিলের কাপড়ের চেয়ে বেশীও হয় তবু। কারণ এক টাকার মিলের কাপড় কিনলে টাকাটার বেশীর ভাগ পায় মিলওলারা, কিন্তু এক টাকার বন্দর কিনলে টাকাটার বেশীর ভাগ পায় চাষী, হুটুনি আর তাঁতী। তাতে গরীব লোকেরা কিছু পয়সা পায়, অনাহারের হাত থেকে বাঁচে। অবসর পেলে গান্ধিজী নিজেও চরকা কাটতেন। এই ব্যসেও তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। যুখে কথা বলতেন, হাতে কাজ করতেন। চুপ করে বসে গল্প করার সময় তাঁর ছিল না। নিজের হাতে কাটা হুতার কাপড় বুন তিনি পরতেন।

২। বনিয়াদি শিক্ষা—আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তা বদলাতে হবে। তাদের হাতে কলমে এমন জ্ঞান দিতে হবে যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই ওরাধী শিক্ষা পরিকল্পনার সৃষ্টি।

৩। বয়স্কদের শিক্ষা—আমাদের দেশে একশো জনের মধ্যে মশকুন মাত্র কোন

আমাদের বাড়িকী

রকমে নাম সই করতে পারে। ব্যক্তরা অধিকাংশই অশিক্ষিত। তাদের শেখাতে হবে লেখাপড়া, জানাতে হবে আমাদের কি ছিল, কিসেরা আমাদের ভাত কাপড় খুঁধ শান্তি কি ভাবে লুটে নিচ্ছে, কি ভাবে আবার আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারি।

৩। কুটীর শিল্প—গাঁয়ের ঘরে ঘরে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গাঁয়ের লোকেরা নিজ নিজ গাঁয়ের তৈরী জিনিষই বখাসমত কিনবে। গাঁয়ে সাবান তৈরী হবে, কাগজ তৈরী হবে, দেশলাই তৈরী হবে, চামড়া পাকানো হবে, বানিতে তেল তৈরী হবে, গর ভাঙতে হবে বাঁতার, ধান ভাঙতে হবে টেকীতে...

৪। ছাত্র—ছাত্রেরা স্কুলে কাটবে, খন্দর পরবে, দলাদলি করবে না, দেশের উন্নতি সম্পর্কে পড়াশুনা করবে। রোগীর সেবা করবে, অশিক্ষিতদের লেখাপড়া শেখাবে, ছোট জাতকে ভাই বলে মনে করবে, অন্য ধর্মের লোককে বন্ধু বলে ভাববে রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি শিখবে। ছাত্রীদের বোনের মত দেখবে, সময় ঠিক রেখে চলবে শিখবে।

৫। জাতি ও ধর্ম—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী সবাই মিলে-মিশে থাকতে হবে।

৬। অস্পৃশ্যতা—ছোট জাতের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের উন্নতি করতে হবে তাদের ভাই বলে নিজেদের মধ্যে ডেকে নিতে হবে।

৭। নেশা—মদ, তড়ি, আকিং, গাঁজা প্রভৃতি নেশা দেশ থেকে একেবারে বিদায় করতে হবে।

৮। গ্রাম—ভারতে সাত লাখ গ্রাম আছে, প্রত্যেক গ্রামকে স্বাভাবিক কয়েক গড়ে তুলতে হবে।

৯। স্বাস্থ্য—সংচ্ছিন্নতা, উপযুক্ত পরিশ্রম, মুক্ত বায়ু সেবন, স্বচ্ছ হয়ে পানী পান করা হয়ে বলা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হবে।

১০। নারী—মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকা দিতে হবে।

১১। ক্রিয়াকর্ম—এদেশে ত্রিশ-বত্রিশ কোটি মানুষ চাষ আবাদ করে, তাদের ঠিকমত শিক্ষিত করে তুলতে হবে, স্বাধীনতার কথাটা ঠিকমত বুঝিয়ে দিতে হবে।

১২। মজদুর—যারা কারখানার কাজ করে তাদের সংরক্ষণ করতে হবে

আমাদের গান্ধী

সব তাদের জন্ত পাঠশালা খুলবে, হাসপাতাল করবে। স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা করবে, দরকার হলে মালিকদের বিরুদ্ধে লড়বে।

১৪। আদিবাসী—এদেশে কোল, ভীল, গাওভাল প্রভৃতি পাহাড়িয়া জাত আছে, প্রায় দু'কোটি, তাদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

১৫। কুষ্ঠ ও বন্ধ্যা—এদেশে বারা কুষ্ঠ, বন্ধ্যা প্রভৃতি মারাত্মক রোগে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ভালো করে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬। টাকা-পয়সা—সকলের টাকা পয়সা সমান হওয়া দরকার, অহিংসার মধ্য দিয়ে বড় লোকদের সকলের সাথে সমান করে দেবার চেষ্টা করতে হবে, ধনীদিগের মন বদলে দেবার চেষ্টা করতে হবে।

১৭। রাষ্ট্র-ভাষা—ভারতের সব লোক যাতে সব লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে সেজন্য একটা রাষ্ট্র ভাষার দরকার, হিন্দী হবে সেই রাষ্ট্রভাষা, এই ভাষা সকলের শেখবার ও শেখাবার চেষ্টা করতে হবে।

১৮। মাতৃভাষা—প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভাষা ভালো করে শিখবে। মাতৃ-ভাষার উন্নতি করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

গান্ধীজী বলেন এই আঠারো দফা নীতিকে কার্যকরী করতে পারলেই সত্যিকারের স্বাধীনতা আমাদের হাতে এসে পড়বে।

গান্ধীজীর নেতৃত্ব সখের ক্রিয়া ছিল না, কর্মীদের বাণী ও নির্দেশনামা দিয়ে নিজে চুপ করে থাকতেন না, নিজে সেই নীতি কার্যকরী করার জন্য অনন্তসাধারণ পরিশ্রম করতেন। তাঁর আদর্শের মূল কথা ছিল—আপনি আচরি ধর্ম অগ্নে শিখাও। কথার চেয়ে তিনি কাজ ভালবাসতেন বেশী, সেইজন্যই তিনি বলেছিলেন—আমার জীবনই আমার বাণী!

কাজ করতে নাবলে তিনি নিজের মেহের পানেও ডাকাতেন না, কাজ সম্পূর্ণ না করে তিনি স্বস্তি পেতেন না। জাতি গঠনের প্রোগ্রাম নিয়ে যখন তিনি কাজ শুরু করলেন, দেখতে দেখতে এতো কাজ হাতে জমে গেল যে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। সারা ভারতের কল্যাণ করতে হলে এ কাজ অবিলম্বে শেষ করতে হবে! অল্প সব কাজ বাকী রেখে, হাতের কাজ শেষ করার জন্য তিনি চার সপ্তাহ বৌনাবলয়ন করলেন—সুখ বুঝে হাতে-কলমে শুধু কাজ আর কাজ।

গান্ধীজী বলতেন—চরখা চালা-চালাকর খরচ দেবে!

আবাদের গাড়ী

এই চরকার চারিপাশ ঘিরে সংগঠনের এক পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। পণ্ডিত নারায়ণ আগরওয়াল গাড়ীঘর সংগে আলোচনা করে এই সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা তৈরী করেন। এই পরিকল্পনার মোটামুটি কথা হচ্ছে প্রত্যেক ভারতবাসীকে সাতটি ব্যাপারে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে :

- ১। স্বাস্থ্যকর খাদ্য।
- ২। দরকারী কাপড় জামা।
- ৩। বাসস্থান।
- ৪। পড়াশুনার ব্যবস্থা।
- ৫। চিকিৎসার সুবিধা।
- ৬। খবর পাঠাবার ও যাতায়াতের সুবিধা।
- ৭। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা।

খাদ্যের কথা উঠলেই চাষ আবাদের কথা ওঠে। দেশে ভালো ফসলের ব্যবস্থা করতে হবে। ৬৫ কোটি বিঘা জমি খালি পড়ে আছে, সে জমি চাষের কাজে লাগাতে হবে। জমিদার বলে কিছু থাকবে না, জমি হবে রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এ দেশে ৫ কোটি গোরু মোব আছে, তাছাড়া ৩৩ কোটি আছে অন্ত্রাশ্রয় গৃহপালিত পশু, সেই সব পশু পালনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। ফল ও শাকসবজি চাষের উন্নতি করতে হবে।

প্রত্যেকটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। নিজেদের প্রয়োজন যত খন্দর তারা নিজেরাই তৈরী করবে।

এক একটি লোকের জন্য অন্ততঃ ছ'সাত হাত লম্বা ও ছ'সাত হাত চওড়া বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শহরগুলিতে ঘেঞ্জি বাড়ীঘর করতে দেওয়া হবে না। কারখানাগুলি শহরের বাইরে সরিয়ে দিতে হবে। শ্রমিকেরা যেন স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকতে পারা সেবিকে নগর রাখতে হবে।

সকলে যাতে শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু বই পড়ানো নয় হাতে কলমে কাজ করাতে হবে, ছুটির সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে। ইকুলে যাবার যত খরচ হয় তার যেন কারখানার মজুরী করতে না যায়। অশিক্ষিত বয়স্কদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যে তারা যেন ভয় পায় না, নিজের দেশকে চিনতে পারে ও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে। দেশের মধ্যে অশিক্ষিত যেন কেউ না থাকে।

অল্প বয়সে না হয় তাঁর ব্যবস্থাও এইরকমই পারাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের গান্ধিজী

হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স ও গৃহের অপরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধুলার ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাসলোভিত চাই।

বাতারাতের সুবিধার ক্ষমতা রেলপথ বাড়ানোতে হবে, জলপথে নৌকা ইমার ও শুল্কপথে বিমান-পোত বাড়ানোতে হবে। পোষ্টাফিস বাড়ানোতে হবে, চিঠিপত্র পাঠাবার, টেলিফোন ও টেলিগ্রাম করার খরচ হ্রাস করতে হবে, সুপ্রচুর ব্যবহার করতে হবে।

খেলা-ধুলা ও আমোদ-প্রমোদের হ্রাস হ্রাস ব্যবস্থা করতে হবে। সিনেমা রেডিও ব্যক্তিগত প্রভৃতির ভিতর দিয়ে শুধু নিছক আনন্দ বিতরণই নয়, লোকশিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সব নীতিকে কার্যকরী করতে হলে, রাষ্ট্রের বাজে খরচ কমাতে হবে। বারাক্ষরী করবে তাদের মাইনে পাঁচশো টাকা বৈশিষ্ট্য হবে না। সৈন্য বিভাগের খরচ কমাতে হবে না। বৈশিষ্ট্য আয়ের উপর বৈশিষ্ট্য কর বসাতে হবে। সরকারী সম্পত্তির উপর বৈশিষ্ট্য সম্পত্তি থাকলে বৈশিষ্ট্য কর চাপানো হবে। চাষীদের শ্রম কমাতে হবে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণার খরচ বাড়ানোতে হবে। কেউ বিশেষে মাল পাঠিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না, বিদেশী ব্যবসা চালাবে রাষ্ট্র। মজদুরদের সংখ্যা গড়তে হবে। গায়ে গায়ে চাষীদের পক্ষাঘাত থাকবে। প্রয়োজন মত ভালো কাজে পক্ষাঘাতকে রাষ্ট্র টাকা ধার দেবে। এই সব কাজে মোটামুটি রাষ্ট্রের খরচ পড়বে ৩৫০০ কোটি টাকা, তবে রাষ্ট্রের আয়ও বাড়বে আরো বৈশিষ্ট্য।

এই পরিকল্পনা, ১৮ দফা কর্মসূচী, সত্য ও অহিংসা নীতি মিলে যে রূপ গ্রহণ করে অনেকে তাকেই গান্ধিবাদ বলে নাম দেন। ১৯৩৬ সালে যাওলিতে গান্ধি-সেবা সম্মেলন এক সভায় এই সম্পর্কে গান্ধিজী বলেন—গান্ধিবাদ বলে কিছু নেই। আমি চাই না যে আমার মৃত্যুর পরে আমার নাম নিয়ে কোন নতুন সম্মেলনের সৃষ্টি হয়।

গান্ধিজী চেয়েছিলেন ভারতবাসীকে আত্মস্থ করতে, ব্যক্তিত্বের পূজা করা বা মতবাদ দিয়ে অভিভূত করে ফেলতে তিনি চান নি।

গান্ধিজীর মাতৃভাষা গুজরাতি। আত্মজীবনী এবং অন্যান্য অনেকগুলি বই তিনি মাতৃভাষায় লেখেন। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে একজন ভালো লেখক বলা চলে। তাছাড়া ভারতের অন্ততম চিন্তানায়ক হিসাবেও যেকোনো গান্ধিজী-সম্মেলনে তাঁকে সভাপতি হবার ক্ষমতা আদায় জানানো হয়। জাতীয় সাহিত্যের ক্ষমতা কি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে সেই সব সভায় তিনি হুসুমত মতামত ব্যক্ত করেন।

১৯৩৬ সালে মাদ্রাসে নিখিল ভারত গান্ধিজী-সম্মেলন বলে, সেখানে সাহিত্য

আমাদের গান্ধিজী

সবকে গান্ধিজী বলেন—আমার যদি কমতা থাকতো তবুও বৈশব বই সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মবিশ্বাস, এবং ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও জাতিগত বিবেচনার প্রচার করে, তা বন্ধ করে দিতাম !

বাস করেক পরে আয়েদাবাদে গুজরাতি সাহিত্য-সম্মেলনের বৈঠকে গান্ধিজী বলেন—আমি চাই শিল্প ও সাহিত্য জনসাধারণের অঙ্গ হবে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয়।...

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন ও ভারতীয় সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন বসে যাত্রাজে, সেখানে সভাপতির অভিভাষণে গান্ধিজী বলেন—সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা থাকবে না... শুধু রসস্বাদই হিসাবেই সাহিত্যকে আমি পছন্দ করি না।...

শুধু সাহিত্য নয়, শিল্প ও সঙ্গীতকেও গান্ধিজী বড় ভালবাসতেন। কাল-শিল্প নিয়ে তিনি খুব বাড়াবাড়ি করেন নি সত্য, কিন্তু চারিপাশে তাঁর শিল্পী-দৃষ্টি ছিল, নিজে বে সামান্য দু-একটা জিনিষ ব্যবহার করতেন তাতেও একটা কাল-শিল্পী থাকতো। তাঁর ঘরে বঁটার মুখে একটি পিতলের ঢাকনা চাপা দেওয়া থাকতো। ঢাকনাটি একখানি পিণ্ডুল পাতার ধরে ঠেঁয়ী। শান্তি নিকেতনের শিল্পাচার্য নন্দলাল বহু সেই পাতাটির সৌষ্ঠব দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

গান্ধিজীর মন ছিল সত্যকায়ের শিল্পীর মন। তিনি একবার বলেছিলেন—চারিপাশের সেরাল শুধু আমাদের আশ্রয় দেবার অঙ্গ—যদি ছবি দেখতে চাও তবে মাথার উপর নীল আকাশের পানে তাকিয়ে দেখ; চোখের সামনে দেখ দিগন্ত ছোঁয়া সবুজ মাঠ। হাতের আঁকা ছবি কি এর চেয়ে বেশী সুন্দর ?...

হরিপুরা কংগ্রেসে শিল্পাচার্য নন্দলাল বহু এক চিত্র প্রদর্শনী করেন। গান্ধিজী সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন। গোলপাতায় ছাওয়া কুটীরে আঁকা চার শো ভালো ভালো ছবি টাঙ্গানো হয়েছিল। ছপুরের রোদ গোলপাতা ও ছাটকে পাশ কাটিয়ে এসে পড়েছিল ঘরের ভিতরে গান্ধিজী ঘরে ঢুকেই বমকে ঝড়ালেন। গোলপাতার ছায়া ঘরের যেখানে আলপনা এঁকে দিয়েছে যেন। সেইখিকে থানিক তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চোখ তুলে গান্ধিজী হেসে বলেন—নন্দাবু, আপনি কি এতো সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন ?

নন্দাবু বলে গান্ধিজী কত উঁচু ধরনের সম্বন্ধার।

বিলাতে বাবার সময় রোমের চিত্রশালার আর নির্ভার গায় আঁকা বিচিত্রচিত্র জীবনের ঘটনাবলীর বিবিধাখ্যাত ছবিগুলি দেখে গান্ধিজী এমন ভ্রম হয় হয়ে গিয়েছিলেন যে, কোন ঠাঁকে যে করেকটি বঁটা কেটে গেছে তা তিনি টের পাননি।

আমাদের গান্ধিজী

দেশী ও বিদেশী সঙ্গীতও গান্ধিজীর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একবার কথায় যা তিনি নন্দবাবুকে বলেছিলেন—দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য আমি সত্যগ্রহের দ্রুত না নিত্যম, তাহলে আমি সঙ্গীত চর্চাভেই জীবন কাটিয়ে দিভায়। ন আর সেপথে বাবার ঙ্গপায় নেই। আমি এখন ভিন্ন উদ্দেশ্যে আত্মনিরোগ করেছি। জীবনে আমি আর অন্য কিছু করতে পারবো না। কিন্তু তা বলে মানব সংস্কৃতির বেঙ্কস্ত অংশ যে শিন্ন তাকে আমি অবহেলা করতে পারিনা। তবে এখন আমি রের একজন রুচ সমালোচক হিসাবে তুর্গায় অর্জন করেছি।

গান্ধিজীর এই তুর্গায় হবার কারণও ছিল। শিন্ন ও সাহিত্যে তিনি বিদেশী প্রভাব তে পারতেন না। তিনি বলেন—আমাদের সংস্কৃতিতে যে সম্পদ আছে কোন তির তা নেই। একথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। কিন্তু আমরা তা জানি না, আমরা তার মূল্য দিতে শিবি নি।...রুরোপীয় সংস্কৃতি রুরোপীয়ের পক্ষে শুভ কিন্তু আমরা যদি তার নকল করার চেষ্টা করি তাহলে তা ভারতের পক্ষে ধ্বংসমূলক হবে।

কাজেই যেসব শিল্পী ও লেখক বিদেশ থেকে প্রেরণা লাভ করেন, তাঁরা গান্ধিজীকে সহিবেন কেমন করে।

১৯৩৫ সালে ইন্দোরে হিন্দি-সাহিত্য সম্মেলনে গান্ধিজী সভাপতিত্ব করেন। সেই সভায় গান্ধিজী বলেন—হিন্দীভাষা কিষাণ যজ্ঞচুরের ভাষা, তারা এ ভাষা ইংজে বুঝতে পারে, এই ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ভাষার ব্যাপারে এইটাই সত্যিকারের গণতন্ত্র।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার বোগ্যতা সম্পর্কে গান্ধিজী ‘হরিজনে’ আলোচনা করেন : হিন্দী, হিন্দুস্থানী ও উর্দু একই ভাষা, দেবনাগরী অথবা কার্সী অক্ষরে লিখিত।...হিন্দু ও মুসলমানদের এই ভাষার কথা বলতে শেখা অবশ্য কর্তব্য।...যতদিন পরস্পরের প্রতি অবিবাস থাকবে ততদিন হিন্দুরা এই ভাষার বেশী সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করবে, মুসলমানেরাও বেশী আরবী কার্সী শব্দ ব্যবহার করতে চাইবে। কিন্তু যখন আমরা সারা ভারতকে আমাদের দেশ বলে ভাবতে শিখব তখন আর এই বিভেদ থাকবে না।...জনগণের ভাষা বর্ষগত বিভেদের ভিত্তিতে বিচার করা ঠিক নয়।...রোমান অক্ষর ভারতে চলতে পারে না। কার্সী ও দেবনাগরী যথো দেবনাগরী অক্ষরেরই প্রাধান্য পাওয়া উচিত, কারণ ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষাই দেবনাগরী অক্ষর থেকে উৎপন্ন, সেইজন্য শেখাও সহজ।

গান্ধিজীর নির্দেশই নব ভারতের মন্ত্রনাবিত্ত। সারা ভারতের একা রাখতে

আমাদের গান্ধিজী

হলে, একটা জাতীয় ভাষার মাধ্যম অনিবার্য। কংগ্রেসী নেতারা মন্ত্রী হবার পরেই হিন্দী প্রচারে সচেষ্ট হলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে কিন্তু আপত্তি উঠলো। সেখানে ইংরাজীর চলন বেশী, ইংরাজীকেই তারা রাষ্ট্রভাষা করতে চাইল। জনকন্ঠে লোক হৈ চৈ করে একটা হুজুগ তুলে কারাবরণ করতেও বিদ্রোহ করলো না। কিন্তু রাজ-গোপালাচারী বাহে আপত্তি শোনার মত মাছুষ নন। সারা ভারতের একদল শিক্ষাভিমानी লোক কীৎকণ্ঠে আপত্তি তুললো—জোর করে একটা ভাষা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া অজ্ঞার !

গান্ধিজী এঁদের উত্তর দিলেন—বাপ মী তার ছেলের কাছে ইংরাজীতে চিঠি লিখবে, এ আমি সহ্য করিতে পারি না।

এর উত্তরে কেউ কেউ আবার বোকার মত বললো—ইংরাজী শিক্ষা ছিল বলেই আমরা স্বাধীনতার মর্ম বুঝেছি এবং স্বরাজ্যের জন্ত আন্দোলন করছি।

গান্ধিজী বললেন—এদেশে যত কুসংস্কার আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিকটই হচ্ছে যে, এখনও আমরা মনে করি যে স্বাধীনতার ভাব গ্রহণ করতে হ'লে এবং সম্যকভাবে চিন্তা করতে হলে ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।... স্বরাজ্যলাভ করতে হলে ইংরাজী শিক্ষার অঙ্ক মোহ অবশ্য ছাড়তে হবে।...

একজন গান্ধিজীকে প্রশ্ন করলো—রাজা রামমোহন, লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধী নিকট ইংরাজী না জানলে কি এতো খ্যাতিলাভ করতে পারতেন ?

গান্ধিজী জবাব দিলেন—শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি ইংরাজী না জেনেও যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, রামমোহন ও তিলককে পক্ষে তা সম্ভবপর হয়েছিল কি ? শঙ্করাচার্য একা বা করেছিলেন সমগ্র ইংরাজী শিক্ষিত লোক মিলিত ভাবেও তার একাংশ সম্পন্ন করতে পারে নি। আমার বিশ্বাস স্বাভাবিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে রামমোহন ও তিলক অধিকতর বিখ্যাত হতে পারতেন।.....

কিন্তু তবু একদল গণ্ডিতমস্ত লোক জিদ ছাড়লো না, গুরুগভীর কণ্ঠে মত প্রকাশ করলো—বেশ, তাহলে আমাদের দেশীয় অক্ষর ছেড়ে দিয়ে রোমান অক্ষর চালানো হোক, লেখা-পড়াও ছাপাখানার কাজ সহজ হবে, বুঢ়াকরের বায়েলা থাকবে না।

গান্ধিজী তাদের হুক্তিকে খণ্ডন করলেন—ভারতবর্ষ এক পৃথক জাতি, তার একটা পৃথক অক্ষর থাকবে না কেন ? বেকনাসরী শব্দকে আমি সর্বাঙ্গকরণে সমর্থন করি। ভারতের বিভিন্নভাষা বেকনাসরী থেকেই উদ্ভূত। সেইজন্য সবত ভাষাই বেকনাসরী অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। তাতে জনসাধারণের ভাষা নিকা অনেক সহজ হবে। এখন আমি বেকনাসরী ও উর্দু দুটি অক্ষরেরই সমর্থন করছি

আমাদের গান্ধিজী

বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ চলছে বটে, কিন্তু এদেশে এদেশে তো কোন বিরোধ নেই। সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার অক্ষর এক হলে এক অধিক হবে। একথা কুললে চলবে না যে এদেশে অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত, শুধু বিখ্যা জিমের বশে কিছু না ভেবেচিন্তে তাদের উপর বিভিন্ন অক্ষর চাপিয়ে দিলে আত্মহত্যার সামিল হবে। উর্ বা ফার্সী দেবনাগরীর সঙ্গে সমভাবেই চলবে বতদিন না মুসলমানেরা জাতীয়তার দিক থেকে দেবনাগরীর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নেবে। কিন্তু রোমান অক্ষর চলতেই পারে না। কেবল ছাপাখানার সুবিধার জন্য লাখ লাখ লোককে এই অক্ষর শিখতে বাধ্য করা যায় না। পবিত্র কোরাণ পাঠ করতে হলে মুসলমানদের আরবী ভাষা শিখতে হবে। হিন্দুদের শাস্ত্র পড়তে হলে দেবনাগরী অক্ষর চিনতে হবে কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিখতে না হলে হিন্দু ও মুসলমানের রোমান অক্ষর চেনার কোন দরকার নেই। সেই জন্যই রোমান অক্ষর এদেশে জনপ্রিয় হতে পারে না। জোর করে কিছু চালাতে গেলে গণজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জনগণ তা সরিয়ে দেবে। সেই গণজাগরণ আসছে—অতিদ্রুত আসছে!

গান্ধিজীর বাণী সত্য। জাগ্রত জনগণ মাতৃভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা বলে গ্রহণ করেছে, এখন হিন্দীভাষা যত শীঘ্র ইংরেজীর স্থান দখল করবে পরামর্শিতার শেষ বেশটুকু তত তাড়াতাড়ি এদেশ থেকে বিদায় নেবে, আমরাও হুঁত ও সবল মনে দেশীয় কর্ণণাকে প্রচার সঙ্গে গ্রহণ করতে শিখবো, মহাত্মাজীর আদর্শ ও পূর্ণতা লাভ করবো।

শহরের চেয়ে গান্ধিজী গ্রামকেই বেশী পছন্দ করতেন। ১৯৩৬ সালে সেবাগ্রামে তিনি নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। ওয়ার্ধার মগনওয়াড়ী থেকে এই গ্রামটি প্রায় আড়াই কোশ দূরে। গান্ধিজী বলেন—সেবাগ্রামের নিরিবিচি আমার ভালো লাগে। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আমি প্রেরণা লাভ করি। সত্যগ্রহ হুক করা থেকেই আমি আশ্রমে বাস করে আসছি। আশ্রমই আমার সাধনা ক্ষেত্র। কিন্তু সেবাগ্রামকে আমি ঠিক আশ্রম বলতে পারি না। আমি শুধু সেখানে নিরিবিচিতে কাজ করতে চাই। তবু এখানে একটি আশ্রম গড়ে উঠছে, নতুন নতুন কুটির তৈরী হচ্ছে। এটি এখন একটি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। আমি এর নাম দিয়েছি—অক্ষরদের আশ্রম। সেহের দিক থেকে ও মনের দিক থেকে আমি পঙ্ হরে পড়েছি সেইজন্য আমার চারিশাশে আমি পঙ্র ভীড় কমিয়েছি। এটিকে একটি উন্নাদ আশ্রমের সঙ্গে তুলনা করলে নেহাৎ অবৌদ্ধিক হয় না। চরকা কেটে বস্ত্র লাভের কথা পামল

আমাদের গাছিকী

হাস্য আর কে ভাবতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ পাগলেরা নিকেরে পানলামির কথা জানে, সেইজন্যই আমি নিকেকে হুঁচিভের লোক বলে মনে করি।

এই হোল সেবাগ্রামের পরিচয়।

এই আশ্রমে বিভিন্ন কটির বিভিন্ন খাছুষের সবাগম হয়েছিল। বসন্তভাই প্যাটেল একবার রহস্ত করে বলেছিলেন—আশ্রমটি একটা চিড়িয়াখানা।

আশ্রমের একখানি ঘরে থাকতেন শিক্ষাবিদ্ আর্থনায়কম্। সিংহলে তাঁর দেশ। আমেরিকায় তিনি উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। গাছিকী ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা লিখে যে শিক্ষাপত্তির প্রবর্তন করেছিলেন, আর্থনায়কম্ নিয়েছিলেন তারই পরিচালনার ভার।

একখানি ঘরে ছিলেন অধ্যাপক ভাঁসালি। বিচিত্র এঁর জীবনকথা। উচ্চশিক্ষা শেষ করিে গুজরাত বিভাগীঠের অধ্যাপক হিসাবে ইনি জীবন আরম্ভ করেন। তারপর স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যান। শেষে কয়েকবার অনশনের পরীক্ষা চালালেন। তারপর একদিন সংসারের উপর বীভত্ব হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন বনে। বনবাস কালে বছর কয়েক তিনি যৌনব্রত গ্রহণ করেন। পাছে কথা বলতে হয় তা-ই ভাষার একটি আখটি দিয়ে ঠোট হুঁখানি সেলাই করে ফেললেন। এক কাঁচা আটা ও নিমপাতা খেয়ে কয়েকটি বছর কাটিয়ে দিলেন। এই সময় একদিন সহসা গাছিকীর সঙ্গে তাঁর দেখা হোল। গাছিকী তাঁকে নিয়ে এলেন আশ্রমে, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নাগা সন্ন্যাসীকে কাপড় পরালেন। এখন অধ্যাপক ভাঁসালি প্রতিদিন দশঘণ্টা করে সূতা কার্টেন আর সাত বক্টা করে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান।

এখানে থাকতেন দাদাভাই নওরোজীর নাতনী শ্রীমতি খুর্শীদ। সংসীতজ্ঞা হিসাবে এঁর নাম আছে। ফ্রান্স ও ইতালিতে দীর্ঘ ছুঁকুর করে ইনি সঙ্গীত সাধনা করেন। তারপর সেবাগ্রামে এসে গাছিকীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

একজন আপানী সাধু ছিলেন। তিনি সারাদিন কাজ করতেন আর সন্ধ্যার সময় আপানী ভুগুভুগি বাজিয়ে স্থর তুলতেন—ওম্ নমো হোম্ রমে কোয়ম্।

একজন হুঁঠরোগী ছিলেন, স্বদেশী করে জেল খাটতে খাটতে তাঁর হুঁঠ হয়। পণ্ডিত মাহুয, সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। হুঁঠ রোগীকে সবাই তৃণা করে সেইজন্য অনশনে সেহত্যাগ করার সংকল্প নিয়ে তিনি একদিন গাছিকীর কাছে এসে বসলেন—আমি আশ্রমের আশ্রমে থাকতে চাই। এখানেই আমি জীবন পাশ করবো।

গাছিকী বললেন—তোমাকে তো আমি না বলতে পারি না। কিন্তু তুমিই তোমাকে দেখা করা করবেন।

কুর্কোয়ীর ভক্ত আলাদা ঘর তৈরী হোল :

এখানে ছিলেন ইহুদী বহুবিধ বস্তু শ্রিত-মান। এর বেশ আধারী। হিটলার খন দেশ থেকে ইহুদী ভাড়াতে হুক করলেন তখন ইনি দেশত্যাগ করে নাবা স্থানে রুতে ঘুরতে সেবাগ্রামে এসে বস বৈবেছেন। রখন বহুবিধ কাছে বীণা নিয়ে তিনি রখন পুরোদস্তর সন্ধ্যাগী, নতুন নাম নিয়েছেন—ভারতানন্দ।

এক মাসের ঘরে থাকতেন রাজার মেয়ে রাজকুমারী, অমৃত কাউর।

আশ্রমে গান্ধীজী ছিলেন আশ্রমগুরু—বাপুজী। কোন ব্যাপারেই তাঁর নোযোগের অভাব ছিল না। রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করছেন, পক্ষর সেবা করছেন, শাসনিকদের অভাব অভিযোগ শুনছেন, কংগ্রেস নেতাদের কর্মপদ্ধতির নির্দেশ দিচ্ছেন, সিমলা-লণ্ডনের প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির বিচার করছেন, কোন কাজে কোথাও এতটুকু অবহেলা নেই। ছোট বড় জ্ঞানী ও অজ্ঞবিত্ত,—প্রত্যেকটি মানুষ তাঁর কাছে সমান ব্যবহার পেয়েছে।

সেবাগ্রাম সম্পর্কে গান্ধীজী একবার এক মার্কিন সাংবাদিককে বলেন—আমার রুগণ ভারতবর্ষ এবং সেবাগ্রামেই সীমাবদ্ধ। আমার সহকর্মীদের মত আমি আন্তর্জাতিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না।

কন্তু বুবা ছিলেন আশ্রম-মাতা, সকলের সেবার দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর।

আশ্রমের সবাইকেই নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়। রান্না করা, বাসন রান্না, কাপড় কাচা, পায়খানা সাফ করা—কিছুই বাদ সেবার উপায় নেই। গান্ধীজী নিজে প্রতিদিন রাত তিনটের সময় উঠে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করে চলতেন।

গান্ধীজীর জীবন-বাজা ছিল সরল অনাড়ম্বর। আশ্রমে তিনি থাকতেন একখানি ঘাটির ঘরে। কোন রকমে জন পনেরো বসতে পারে এমন একখানি ঘাটির ঘর। ঘাটের ছাড়া আর কোন আসবাব-পত্র নেই। দেয়ালের গায় কয়েকটি খেজুর গাছ ঝাঁকি আছে। একপাশে একটি চরকা, কাগজপত্র, বই ও কুরশা কলম আর পিতলের একটি লোটা।

এই ঘরটিই সকাল বেলা গান্ধীজীর আশিস ঘর।

এগারোটোর সময় এই ঘরটিই খাবার ঘরে রূপান্তরিত হয়। গান্ধীজী সকলের সঙ্গে খেতে ভালবাসতেন, খাবার পরিবেশন করতেন নিজের হাতে।

খাবার বস্তুখানেক পরে এই ঘরেই গান্ধীজী খবরের কাগজ ও চিঠিপত্র নিয়ে বসতেন।

আমাদের গাছিকী

তারপর ঘটাখানেক গড়িয়ে নিভেন যাহুরের উপর।

তারপর দেখা, লোকজনের সঙ্গে দেখা করা ও চরকা কাটা...

সন্ধ্যার পূর্বে আহাশ শেষ, তারপর প্রার্থনা, সান্নাধ্যবশ ও নিরা...

অনেক সময় গাছিকী আশ্রয়ের কর্মীদের জন্য আলাদা কোন সময় রাখতেন না। প্রভাতে ও সন্ধ্যার ভ্রমণকালে গাছেই তাদের সঙ্গে দরকারী আলোচনা শেষ করতেন।

সেবাশ্রমের এই মাটির ঘরে অনেক মনীষী ও রাজনীতিকের শুভাগমন হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত যার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার পরমানন্দে গাছিকীর সান্নাধ্য এখানে সাতটি দিন কাটিয়ে যান। আশ্রমের স্তম্ভের বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন :

একতলা বাড়ী, মেয়াল দরমার ঘেরা, ছাদটি লাল টালির.....

ঘরের মেঝের উপর শাদা চাদর বিছিয়ে গাছিকী শুয়ে আছেন, কাছেই একজন শিশু বসে টানা পাখায় হাওয়া করছে... একজন মহিলা একটি ভিজা তোয়ালে ভাঁজ করে নিয়ে এলেন গাছিকীর মাথায় দেবার জন্য।... গাছিকীর হাত দুটি বেশ লম্বা, আঙুলগুলি বেশ লম্বা এবং স্তম্ভিত। হাঁটু দুটি একটু বে-মানান। শরীরের হাড়গুলি বেশ চওড়া ও শক্ত। সৰু ঠোঁটের উপর গোঁপ ছোড়া প্রায় শাদা, নাকটি একটু বেশী মাজায় লম্বা। নীচের ঠোঁটটি ভাব ব্যঙ্গক—সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চোখের চাহনিটা যেন করুণা মাখানো। গাছিকীকে দেখলেই যেন স্নায়ু মাথা নত হয়ে আসে।... নীরব আশ্রয়ত্যাগের তিনি একটি জীবন্ত প্রতীক।... তিনি কর্মমর্মে অভ্যস্ত নন, স্মিতহাস্তে হাতদুটি মুক্ত করে অভিবাদন জানান, কিন্তু তাঁর অন্তরের সারল্যটুকু প্রকাশ পায়।... ঘরে সাজ-সজ্জার কোন বাসনা নেই। এক-পাশের দেয়ালে যিন্তুগুটির একখানি স্তম্ভের ছবি ঝুলছে।... সোনার ক্রেমের চশমা তাঁর চোখে।... সামনের দেওয়ান-দানীতে তিনটি ফাউন্টেন পেন সাজানো আছে।... বিছানার বাম ধারে কয়েকখানি বই স্তম্ভের করে সাজানো।...

গাছিকীর সকলের সঙ্গে একত্র বসে খাওয়া ও খাওয়ানো ফিশারকে মুগ্ধ করেছিল, তিনি লিখেছেন :

লম্বা ঝাঁবার ঘরের দরজার সামনে টেবিলের উপর মানানসই পাত্রে ঝাঁবার সাজানো রয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের বসবার আরগী আলাদা... গাছিকীর বাঁ দিকে বসে আছেন তাঁর কৃষ্ণ বস্ত্রীনা পত্নী কস্তুরবাঁ... আশ্রয়বাসী ছোট ছোট ছেলেরাও এই ঘরের মধ্যে আছে।... সকলের সামনে একটি করে পিতলের থালা রাখা হোল... গাছিকীর সামনে কতকগুলি পাত্র এনে রাখা হোল, তিনি সেগুলি খুলে সকলের

আমাদের গান্ধিজী

পায়ে বাবার ভাগ করতে শুরু করলেন। ... প্রায় জন ত্রিশেক লোক মেঝের উপর বসে আছেন। সকলেরই পরনে শাদা শোবার, সামনে সবাই বাবার সাজানো। চু করে একটি ঘণ্টার আওয়ায শোনা গেল, এক ভক্তলোক চোখ বন্ধ করে উচ্চৈঃস্বরে যন্ত্র উচ্চারণ করার পর ধাওয়া শুরু হোল।

লুই কিশার গান্ধিজীর সঙ্গে দু-একবার সাক্ষাৎ-অনুবেণ্ডে বেরিয়েছিলেন। সেই ভ্রমণের বর্ণনা প্রসঙ্গে কিশার লিখেছেন :

বিকাল সওয়া ছ'টার সময় গান্ধিজী বাহির হলেন। বাঁশের একটি লম্বা লাঠি তাঁর হাতে। গান্ধিজীর চিকিৎসক ডাক্তার দাস এবং আশ্রমের কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। দু'জন মহিলার কাঁধে ভর দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন। আশপাশের গ্রাম থেকে একদল যুবক তাঁর দর্শন পাবার আশায় চারিপাশে এসে জমা হয়েছে, তাদের চোখে মুখে ভক্তির ভাব ফুটে উঠেছে। গান্ধিজীকে দেখাযাত্রই তারা সবাই প্রণাম মাথা নত করলো। আরো একটি বৃদ্ধের দল গান্ধিজীর দর্শন পাবার আশায় চারিপাশে এসে জড়ো হয়েছে। কেউতে নানাবিধ দিয়ে মেঠো পথ ধরে আমরা চলতে শুরু করলাম। গান্ধিজী এবার আমাদের কথা বলার সুযোগ মিলেন।

কিশার গান্ধিজীকে নানা বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন। সাতদিন ধরে অবসর ব্যত এই প্রশ্নোত্তর চলে। মহাত্মাজী কত সরল ও সহজ মায়া ছিলেন তা তাঁর উত্তরগুলি পড়লেই বোঝা যায়। কিশার গান্ধিজীর মনোভাগতের একখানি নিখুঁৎ ছায়াচিত্র বেলে ধরেছেন ইংরাজী ভাষা-ভাষীদের কাছে।

সেবাশ্রমের এই আশ্রমে হাটীর ঘরে মাহুরের উপরে বসে রাজনীতি আলোচনা করে গেছেন বিলাতের লর্ড লোথিয়ান ও স্যার ট্যাকোর্ড ক্রিপস, আপানের ডক্টর কাপাওয়া ও তাকাওকা। কবি ইয়োনে নগুচি, ডাক্তার টমিকো কোরা, অন্ন-নিয়ন্ত্রণ-আন্দোলনের নেত্রী মিসেস মার্গারেট সিংগার প্রভৃতি সাহিত্য, সমস্যা ও সমাজনীতি সম্পর্কে মহাত্মার অভিমত শোনার জন্য এখানে এসেছিলেন।

গান্ধিজী কাকুর ঘন রেখে কথা বলতে শেখেন নি কখনও। সত্য অগ্রিম হলও তিনি মুখের উপর বসে দিভেন। ১৯৩৮ সালে, আপানীর বধন এশিয়ার বাবু প্রেষ্ঠ শক্তিমান রাই হয়ে উঠেছে, নিজেদের হৃদয় হৃদয়ার জন্য তারা নতুন হর ব্যবছে—এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য ; তখন আপানী পাল্লাবেটের সত্য ভাষাভাষকে গান্ধিজী সোজা কথায় বলে দিলেন—এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য—এ বীড়ি আমি সমর্থন

আমাদের নাজিজী

করিনা, অবশ্য ইউরোপ বিধেবই যদি এর অর্থ হয়।...তোমাদের জগবান বুকের নীতি পুনরালোচনা করতে হবে এবং সেই বাণী পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তোমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য।

নাজিজীর এই কথা তখন শক্তিমত্ত জাপানের কাছে ভালো লাগেনি, তখন তারা সমগ্র এশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখছিল, সেই পরবলোভী অহঙ্কারই বুকের পর তাকে পরাধীন করেছে। ইতিহাসের বিচিত্র পরিহাস।

ওয়ার্ধার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে বছবার।

গোল টেবিল বৈঠকের পর শাদা কাগজের যে আইন তৈরী হয় তাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী দলের মন্ত্রী হবার কথা ওঠে। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে ওয়ার্ধার কমিটির এক বৈঠকে, এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়, এবং মন্ত্রিত্ব নেওয়ারই স্থির হয়। নাজিজী বলেন—মন্ত্রীরা যদি লং, স্বাথহীন, পরিশ্রমী হন, ও সদা সজাগ থাকেন, বুদ্ধিক্ত লক্ষ লক্ষ লোকের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা যদি তাঁদের থাকে তাহলে কংগ্রেসের আদেশ অমুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক কিছু করার অপবাণ্ড সুযোগ তাত্রা পাবেন।

মন্ত্রীদের প্রথমেই কি করা কর্তব্য সে সম্পর্কেও নাজিজী ইঙ্গিত দিলেন—মাদক নিবারণ, কিবালদের অবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা প্রবর্তন, ও কারাগার সংস্কার।...

নাজিজী হরিজনে লিখলেন—আমাদের স্বাধীনতা ক্রীতদাসের স্বাধীনতার পর্ববসিত হবে, যদি মন্তপায়ী ও মাদকসেবীরা তাদের পুরাণো অভ্যাস পরিহার মত বজায় রাখে।

নাজিজীর অমুযায়ী হোল কংগ্রেসীদের সংহিতা। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেই কংগ্রেসীরা সেই আদর্শে কাজ করতে শুরু করলেন। সাম্রাজ্যের মন্ত্রীরা সালাম, আর্কট, চিত্তুর, কোদাপ্পা প্রভৃতি জেলায় আইন করে মাদক সেবন বন্ধ করে দিলেন। তাতে, আবগারী কর থেকে যে আয় হোত তা থেকে এক কোটি টাকা কমে যায়। বিহার ও বৃহৎপ্রদেশেও এই দিকে কাজ করার জন্য তেরো লাখ টাকা রাজস্বের ক্ষতি হয়। চাষীদের উন্নতি করার জন্য বৃহৎপ্রদেশে বারো শো করীকে নিষেক করা হয়। কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে চাষীদের সুবিধা দেবার জন্য অনেক নতুন নিয়মকানুনও তৈরী করা হয়। মন্ত্রীরা জনশিকার দিকে বিশেষ জোর দেন, কর্তব্যই ওয়ার্ধা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয়। সাম্রাজ্যে ৩৫৫টা নয়া-তালিমী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহারে ১৪২৫০টা শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। বৃহৎপ্রদেশে ২৩০০০০

আন্দোলনের গাভি

অশিক্ষিতকে লেখাপড়া শেখানো হয়। লেখাপড়াকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশে চার হাজার ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। মধ্য-প্রদেশে কারাগারের আইনকাহ্নন বদলানো হয়।...

এই সব কাজে একদল যাত্রাবাহকের আর্থিক সাহায্য লাগে, তারা কংগ্রেসের বিরোধী হয়ে ওঠে। নানাভাবে তারা বাধার সৃষ্টি করে, ভালো কাজেরও কঠোর সমালোচনা করতে থাকে। এই সমালোচনা চরমে গিয়ে ওঠে যাত্রাজে হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালাবার চেষ্টায়। তারা হিন্দি শেখানোর বিশেষ আগ্রহী তোলে। শেষে যাত্রাজ সরকার এদের নামে আদালতে নালিশ করেন। গাভিরা মন্ত্রীদেব সমর্থন করে লেখেন—অনেকে বলেন কংগ্রেস পক্ষীরা অহিংসবাদী, আদালতে মামলা করে বিরোধী দলকে সাজা দেওয়া তাঁদের উচিত নয়। কংগ্রেসের অহিংসবাদের মানে কিন্তু আমার কাছে তা নয়। হিংসাত্মক বক্তৃতা দিলে বা হিংসাত্মক কাজে উৎসাহ দিলে কংগ্রেস মন্ত্রীরা উপেক্ষা করতে পারেন না।

কংগ্রেসীয়মন্ত্রীদের একটা বড় সমস্যার সামনে এসে পড়তে হোল, তা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যা। যাত্রাজ ও বোম্বাইয়ের মন্ত্রীরা রাজনৈতিক মন্ত্রীদের ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মন্ত্রীরা রাজবন্দীদের ছেড়ে দেবার কথা ভুলতেই সেখানকার লাটসাহেব আপত্তি তুললেন। বন্দীরা সংখ্যায় ছিলেন নেহাৎ নগণ্য, বিহারে বারো জন, যুক্তপ্রদেশে পনেরো জন। কথাটা তাদের কানে পৌছাতেই তারা অনশন শুরু করে দিলেন, মন্ত্রীরাও পদত্যাগ করলেন,—যারা কংগ্রেসের নির্দেশে আন্দোলন করলো, তারাই যদি জেলে রইল তাহলে কংগ্রেসীদের যত্ন নিয়ে লাভ কি! লাটসাহেব দু'জন আর সুবিধা করতে পারলেন না। রাজবন্দীদের ছেড়ে দিতে রাজী হলেন।

কিন্তু বাংলাদেশে তো আর কংগ্রেসী মন্ত্রী ছিল না, কিন্তু রাজবন্দী সব চেয়ে বেশী ছিল এখানেই। মুসলীম-লীগ-পক্ষী মন্ত্রিসভা এঁদের মুক্তি দেবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাই করলেন না। এদিকে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হোল, মহাস্বাভাবী নিজে এলেন কলকাতায়। ব্যারাকপুর লাটভবনে গিয়ে বাংলার লাটসাহেব তার জন প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে দেখা করলেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সি জেল, হাওড়া জেল ও হিজলী বন্দীশালায় গিয়ে কথাবার্তা কইলেন এবং বন্দীদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখিয়ে একদিন অনশন করলেন (২৬শে অক্টোবর)। গাভিরা তখন 'রাত প্রেসার' তুলছেন, তবাপি চেষ্টার কোন ক্রটি রাখলেন না। পুরো কিন্টি সমস্যা

গান্ধীজীর গান্ধীজী

জিনি আন্দোলন চালানোর লক্ষ্যে ৩ মূল্যবান মন্ত্রীসভার সঙ্গে। গবেষণার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন—এইসব রাজবন্দীরা আর হিংসার বিষয় করেন না।

গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় কাজ হোল, ১১০ জন রাজবন্দীর মুক্তি ঘোষণা ব্যবস্থা হোল।

অল্পকাল হলেও তারা ভারতের রাজনীতির চাপে শ্রী সন্ন্যাসীর অবসর বেলে না। কলিকাতার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসলো। বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী নারায়ণের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমা হয়েছিল। সেই সম্পর্কে অল্পকাল করে গান্ধীজীকে এক রিপোর্ট তৈরী করতে হোল। কংগ্রেস কমিটি সেই বিরুদ্ধি পাঠ করে নারায়ণকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন।

এতো কাজের চাপ অল্পকাল দেহে সইল না। গান্ধীজী অল্পকাল হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনে, ধবর পেয়েই ছুটে এলেন কলিকাতায়। হৃদয় মহামানবের সমাবেশে—গলা-ঘমুনা সঙ্কে—কলিকাতা পবিত্র হোল।

গান্ধীজী বিরে গেলেন জুহুর সমুদ্রতীরে। ডাক্তাররা নির্দেশ দিলেন—নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম করতে হবে, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, হরিজনে প্রবন্ধ লেখা, সব বন্ধ করুন।

কিন্তু চল্লিশ কোটি নর-নারীকে স্বাধীনতার আলো যিনি দেখাযেন, বিশ্রাম গ্রহণ করা তো তাঁর বিধিবিধি নয়।

রাজবন্দীদের মুক্তির প্রথম আবার জটিল হয়ে উঠলো,—আগের চেয়ে জটিলতর। রাজবন্দীরা ভেঁবেছিলেন সকলেই এবার মুক্তি পাবেন, কিন্তু দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেও যখন মুক্তি এলো না, তখন পাঞ্জাব বন্দীশালায় হুড়ি জন বন্দী অনশন শুরু করলেন।

সেই ধবর এসে শৌহাল হাজারিবাগ জেল। সেখানেও সাতজন রাজবন্দী অনশন শুরু করলেন।

বাংলায় তখনও এক হাজার রাজবন্দী কারাগারীরাইর অভয়ালে ছিলেন, সেখানেও এবার অনশনের প্রতিশ্রুতি উঠলো।

গান্ধীজীর আর বিশ্রাম করা হোল না, আবার আসতে হোল কলিকাতায়। তার জন এগারসনের জায়গায় নতুন লাক্ষ্যাহেব এসেছিলেন লর্ড ব্রাভোর। গান্ধীজী ব্রাভোরের সঙ্গে দেখা করলেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সি জেল ও দিল্লি সেন্ট্রাল জেলের রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রায় বাসখানেক করে চালানেন আলোচনা, পেরে বন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তাঁদের অনশন থেকে নিরস্ত করলেন।

কিরে মাঝার আগে দিন মাতকের জন্ত গেলেন পেশোয়ারে। সেখানে গান্ধী সেখা
হুসের চতুর্থ বারিক সম্মেলন বললো। গান্ধী সেই বৈঠকে বললেন—অহিংসার
চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু নেই।

উড়িষ্যা থেকে গান্ধী গেলেন পেশোয়ারে।

অনেক দিন ধরে বাগ্‌শা খান তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন একবার খুদাইবিদবত-
গারের মাঝে গিয়ে দাঁড়াবার জন্ত। গান্ধীরও আগ্রহ ছিল অনেক দিনের, কিন্তু
দ্ব্যধিন সময় করে উঠতে পারেননি, দুর্ধ্ব পাঠানেরা আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে
গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল, ১৯৩০ সালের বন্ধকের গুলির সামনে তারা
বুক পেতে দিয়েছে কিন্তু কাঁধ থেকে বন্ধক নামিয়ে পালটা গুলি চালায়নি। গান্ধীর
বাগী সীমান্তবাসীর চেয়ে আন্তরিকভাবে আর কোন জাতি গ্রহণ করতে পারেনি।
গান্ধী এবার গিয়ে দাঁড়ালেন তাদের মাঝে, গুরুশিষ্যে প্রত্যেক যোগাযোগ ঘটলো।
পাঠানদের গায়ে গায়ে জিগায় জিগায় গান্ধী যে সন্ধান পেলে তা অভাবিত।

কংগ্রেসে আবার ছুটি হল দেখা দিল। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, ১৯১৯ সাল থেকে
গান্ধীই ছিলেন কংগ্রেসের কর্ণধার। তিনি কংগ্রেসের সমস্তপন ছেড়ে দিলেও
কংগ্রেসী নেতারা তাঁকে ছাড়তে পারেন নি। কংগ্রেসের প্রত্যেকটি সংগ্রামে তিনিই
ছিলেন অগ্রগামী। কিন্তু সবকটি সংগ্রামই তিনি শেষ করেন গবর্নমেন্টের সঙ্গে
আপোষ রক্ষা করে, একদল তরুণ কর্মীর এটা পছন্দ হোত না, তাঁরা চাইতেন আপোষ-
হীন সংগ্রাম। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি হবার সময় থেকে এই দলটির নেতৃত্ব এসে
পড়লো হুভাবচন্দ্রের উপরে। তরুণদল চেয়েছিলেন হুভাবচন্দ্র গান্ধীর প্রভাব
অতিক্রম করে সংগ্রামের নতুন গতি নির্দেশ করবেন। সেইজন্য পরের বছর জিল্পুরী
কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার জন্ত তাঁরা হুভাবচন্দ্রের নামই সুপারিশ করলেন। অপর
দল আবুল কালাম আজাদ ও পটুতি সীতারামিয়ার নাম প্রস্তাব করলেন। আজাদ
সভাপতি হতে চাইলেন না। পটুতি সীতারামিয়াকে সন্ধান করলেন গান্ধী স্বয়ং।

একদিন গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ীই সভাপতি নির্বাচন হয়েছে। গান্ধী থাকে
চেয়েছেন কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়নি। হুভাবচন্দ্রও গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ীই হরিপুরা
কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু এবার বামপন্থীরা গান্ধীর মতকে খীকার
করে নিলেন না।

হুভাবচন্দ্র বহু বনান জব্বার পটুতি সীতারামিয়ার।

विषादमय भाषिणी

[illegible]

হাজারবাবু তার উত্তরে বললেন—যক্ষিপন্থীর। গবর্নেন্টের সঙ্গে আপোষে বন্দী
করতে চাইছেন, আমি তাদের পথের কাটা।...

এদেশে এদেশে কংগ্রেসীদের ভোট নেওয়া হোল। ২২৫৭ ভোটের মধ্যে হত্যাবাদী পেলেন ১৫৮০ ভোট, আর ডকটর সীতারামিয়া পেলেন ১৩৭৭টি। হত্যাবাদীই জিতলেন।

শান্তিলাল বললেন—আমি একথা স্বীকার করি যে স্বাধাযবাবুর পুনরায় সভাপতি হবার আমি বিরোধী ছিলাম। কি কারণ তা আমি আলোচনা করতে চাই না। নীতারামিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নাম প্রত্যাহার করতে আমিই নিষেধ করি। সেই জন্যই নীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়। আমার কর্মধারা ও নীতিকে বাধা মিলে আমার কিছুই থাকে না। আমি এই নির্বাচনের ফলে বুঝতে পারলাম যে ধারা ভোট দিয়েছেন তাঁরা আমার নীতি ও কর্মধারা পছন্দ করছেন না। এর জন্য আমি আনন্দিত।... আমার সংখ্যা লম্বিষ্ট দল শুধু সংখ্যা গরিষ্ঠদের সাক্ষ্য কামনা করে।... কংগ্রেসের অগ্রগমনে কোন বাধা সৃষ্টি করা তাঁদের উচিত নয়।... তাঁদের ভালো লাগবে না তাঁরা কংগ্রেসের বাইরে চলে আসতে পারেন। মনে কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়, অধিকতর কার্যকরী হিসাবে জাতির সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

হুভাষ বাবু তাড়াতাড়ি ওয়ার্ধায় গেলেন গান্ধিজীর কাছে, বললেন—মহাত্মাজীর দ্বারা অর্জন করা ই আমার প্রধান লক্ষ্য। সারা ভারতের আত্মা অর্জন করেছে যদি আমি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির আত্মা অর্জন করতে না পারি তাহলে আমার পক্ষে জ্ঞান একান্ত মনোভিত্তিক হবে।

গান্ধিবীর সঙ্গে হুতাশচক্রে তিনঘণ্টা কথা হোল। সাংবাদিকদের গান্ধিজী বলেন—হুতাশ বাবুকে এবার নিজের অহুগামীদের ভিতর থেকে মনোমত ওয়াকিং করিষ্ট করতে হবে, এখন আব তাঁর কাছে হুতাশবাবুর উপদেশ নেবার কিছু নেই। এই নির্বাচনে এইটাই প্রমাণ পেয়েছে যে কংগ্রেসীরা আবার নীতিকে সর্বাঙ্গ মনেন না।

ওষাকি কবিতার মানে জন পুথিতে লিখিত পুথ্যাঙ্গ করণেন, তাঁরা বললেন—

গান্ধীজীর গান্ধী

দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের অনৈক্যের কারণকে পরিচালনা করত, আবার তাদের হযোগ দিচ্চেন। তাঁরা যদি স্বার্থ হন তাহলে তাঁরা সেরে নিশ্চয়ন।

দক্ষিণপন্থী নেতারা এভাবে তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করবেন হুজুর্গজ তাঁ মনেনি। অহহ বেহে একশো-তিন-তিনি আর নিয়ে তিনি আবার হুটসেনে গার্বার। কিন্তু গান্ধীজীর মত তিনি বদলাতে পারলেন না।

গান্ধীজী কংগ্রেসের পরিচালনা করবেন না, গান্ধীবাদী নেতাদের পক্ষে একথা উক্তা করাও শক্ত। তাঁদের পক্ষ থেকে গোবিন্দবল্লভ পন্থ জিগুদী-কংগ্রেসে এতদার মলেন—গত কয়েক বছর ধরে গান্ধীজীর পরিচালনায় কংগ্রেসের কার্যধারা পরি-লিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমে ছেদ টানা চলবে না।...সামনে বে জটিল সমতা থা দিতে পারে তার মধ্যে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই জাতিকে সাক্ষ্যের পথে পরি-লিত করতে পারেন। সেই জন্তই আমরা চাই রাষ্ট্রপতি বেন গান্ধীজীর বনোন্নয়ন মজুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচন করেন।...

গান্ধীজী তখন রাজকোট অনশন শুরু করেছেন।

ক'দিন পরে তিনি রাজকোট থেকে কিরলে রাষ্ট্রপতি হুজুর্গজ গান্ধীজীর সঙ্গে থা করলেন। কিন্তু কোন ফল হোল না, হুজুর্গজ বাবু ধানের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি ডে তুলতে চাইলেন, গান্ধীজী তাঁদের বনোন্নয়ন করলেন না। ওয়ার্কিং কমিটি ছাড়া কংগ্রেসের কাজ চলে না, হুজুর্গজকে রাষ্ট্রপতি পদ ছেড়ে দিতে হোল। দেখা গেল গান্ধীজীকে বাধ দিয়ে কংগ্রেস চলে না।

ক'মাস পরে হুজুর্গজকে দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বের করে দিলেন—তিনি য় তিনি কংগ্রেসের কোন পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। এই সম্পর্কে গান্ধীজী মলেন—হুজুর্গজকে আমি ভাবতাম আমার ছেলের মত। সেই সৌজন্যতা থেকে জ আমি খলিত হলাম। হুজুর্গজের উপর যে দণ্ডবিধান করা হোল তার সঙ্গে চ থাকার জন্ত আমি চুপ্চড়।

রাজকোট।

এদেশে ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য আছে, সর্বত্রই রাজাদের অনাচারে প্রজাদের মধ্যে ক্ষোভ জেগে উঠেছিল। কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছিল সেখানেও।

গান্ধীজী এই প্রজা-আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করছিলেন।

কাথিয়াবারে ৩৬০টি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য আছে, রাজকোট তার মধ্যে একটি। রাজ্যটি যদিও ছোট কিন্তু পলিটিক্যাল এজেন্ট এখানে থাকার জন্ত এটিকেই পছন্দ

তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররাও আসে। রাজকোটে জনসংগঠন হিসেবে বীরগুণ, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ রাখে। প্রজাদের মেত্ব করে যদিও প্যাম্পন, কুলা সরাঠাই ও কস্তুরবা কারাবরণ করেন। শেষে বঙ্গভাই প্যাটেল কর্তৃক গিয়ে রাজকোটের রাজা ঠাকুরসাহেবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করেন। কিন্তু শেষ অবধি ঠাকুরসাহেব চুক্তিমত কাজ করতে রাজী হলেন না। গাঙ্গুলী স্বয়ং এসেন রাজকোটে।

রাজকোটের রাজপরিবারের সঙ্গে গাঙ্গুলীর পরিচয় বহুদিনের। গাঙ্গুলীর পিতা কাবাগাঙ্গী ছিলেন এই রাজ্যের দেওয়ান। পলিটিক্যাল এজেন্ট যখন একবার এখানকার রাজাকে অপমান করে, তার প্রতিবাদ করে কাবাগাঙ্গী জেলে যেতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই ঠাকুর সাহেবের বিবাহের সময় কস্তুরবা সবার আগে তাঁর কপালে কুম্ভম শোভিত করেন। সেই ঠাকুর সাহেব যখন প্রতিশ্রুতি রাখলেন না, গাঙ্গুলী যেন বড় ব্যথা পেলেন। ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি সেখানে গিয়ে অনশন শুরু করলেন। হরিজন কাগজে তিনি লিখলেন— পলিটিক্যাল এজেন্টের প্ররোচনায় তিনি প্রজাদের উপর যে অস্ত্রার করছেন সবার আগে তার প্রতিবিধান করা প্রয়োজন।

আমরণ অনশনের সংকল্প।

একদিকে সীমান্ত এক সামন্ত নরপতি, আরেকদিকে ভারতের চল্লিশ কোটি জনগণের মন-অধিনায়ক। একদিকে অহংকার আরেকদিকে আত্মাহুতি,—নিছক এক স্বার্থের প্রতিবাদে শত সহস্র প্রজার প্রতিভা,—শোষণ-নীতি বনাম মানবতা।

সারা ভারতভূমি উৎকর্ষায় শুরু।

বড়লাট মধ্যস্থ হলেন, মীমাংসা করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি তার মরিচ গরারের উপর তার পড়লো ঠাকুর সাহেব যে চুক্তি করেছিলেন তা বিবেচনা করার জন্য। আর অভিযোগ করার কিছু রইল না, চারদিন অনশন করার পর পঞ্চম দিনে গাঙ্গুলী আহাৰ গ্রহণ করলেন।

তিন সপ্তাহ ধরে সমস্ত মরিচ গরার বিচার করে তার মরিচ গরার ঠাকুর সাহেবের বিরুদ্ধে সার দিলেন, কংগ্রেসের অর্থ হোল।

গাঙ্গুলী কিন্তু খুশি হতে পারলেন না; সহসা তাঁর মনে জাগলো—রাজকোটের বিরুদ্ধে উপবাস করার মধ্যে তাঁর অন্তরে বিদ্বেষের ভাব ছিল। তখনই গাঙ্গুলী দিল্লী থেকে ফিরে গেলেন রাজকোটে। ঠাকুর সাহেব ও বড়লাটের কাছে তিনি কথা প্রার্থনা করলেন। অসুখের হুঁশিয়ারি সার গ্রহণ করলেন না। যে সব

সাক্ষীসাক্ষীরা জাতিসংঘের সভাকক্ষে গান্ধীজী ওয়াশিংটনের নতুন বিবিসি-কম্পেনি, গহনা গান্ধীজীর এই দুটি-পরিবর্তন ঘোষণার মত বিবরণ জাতিসংঘ। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে রাজনৈতিক লাভ লোকসানের চেয়ে সত্য-উপলব্ধির মূল্য ছিল বেশী, রাজনীতির দাব-বাহী কুটিলতার আগ ছিঁড়ে খড়ের সন্ধান দেওয়াই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

অগত্যাগী মহামুখের সন্ধাননা দেখা দিল। হিটলার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে করায়ত্ত করার জন্য অহংকারে দৃষ্ট হয়ে উঠলো। গান্ধীজী হিটলারকে একখানি খোলা চিঠি লিখলেন, অহরোধ জানালেন যেন জয়ের রক্তক্ষয়ী মহাসমরে লিপ্ত না হন, শত সহস্র লোককে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে এগিয়ে না যেন :

‘মানবতার দিক থেকে বিচার করে অনেক বন্ধু আপনার কাছে চিঠি লেখার জন্য আমাকে অহরোধ করেছেন। কিন্তু তা হঠকারিতার পরিচয় হবে বলে আমার মনে হয়, তাবু সে কথা বিচার না করে আমি আপনার কাছে আবেদন করছি। একথা আজ স্পষ্ট যে আপনিই জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ যিনি যুদ্ধের বর্ষণতা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারেন। আমার মত অহিংসবাহীর আবেদনে কি আপনি সাড়া দেবেন? আমি যদি আপনার কাছে আবেদন জানিয়ে কোন অন্তর করে থাকি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করবেন।’

কিন্তু গান্ধীজীর আবেদনে কান দেবার মত মন তখন হিটলারের ছিল না। নাৎসিরা পোল্যান্ড আক্রমণ করলো, বিশ্ব-সংগ্রাম শুরু হোল। গান্ধীজী বড়লার্টকে বললেন—যখন আমি ভাবি ওয়েস্ট-মিনিটার-আর্বি, পার্লামেন্ট ভবন ও সেন্ট-পলস ক্যাথিড্রালের মত ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন হর্যগুলি যোমা ফেলে ধ্বংস করা হবে তখন আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আমি আপনাদের এই ছদ্মবেশে সহায়কৃতি জানাচ্ছি, এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।...

কংগ্রেস ওয়ারিং কমিটি কিন্তু গান্ধীজীর মত এতো উদার হতে পারলেন না, তাঁরা বললেন—গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতি আমাদের পূর্ণ সহায়কৃতি আছে, কিন্তু তারত-বর্ষের উপর জোর করে কোন লড়াই চাপিয়ে দিলে কংগ্রেস তা সমর্থন করবে না।

সিমলাতে গান্ধীজীর ডাক পড়লো। বড়লার্টের সঙ্গে গান্ধীজী আলোচনা করতে গেলেন, কিন্তু সে আলোচনা সফল হোল না। কিরে এসে গান্ধীজী বললেন—বড়লার্টের কাছে থেকে আমাকে খালি হাতেই ফিরতে হোল, কোন বোঝাপড়াই হোল না। কেননা সত্যিকারের বোঝাপড়া যদি কিছু করতে হয় কংগ্রেসের সঙ্গে করতে

আমাদের ব্যক্তিগত

হবে—তবে আমি শুধু বলে এলাম যে ইংরাজদের পক্ষে আমার ব্যক্তিগত সহায়ত্ব জড়িত আছে।

ওয়ার্ডার কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসলো, তাঁরা স্থির করলেন—ভারতবর্ষ এ মুহূর্তে যোগ দেবে কি সেবে না, তা ভারতবাসীরাই ঠিক করবে। সহযোগিতার কথা উঠবে সমানে সমানে। এই সংগ্রাম গণতন্ত্রের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে অথচ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় এখনই তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না।...

গান্ধীজী বললেন—ইংরাজদের যেটুকু সাহায্য করা দরকার তা বিনা সর্তেই করা উচিত বলে আমি মনে করি। কিন্তু একথা শুধু আমি ছাড়া আর কেউ ভাবে না দেখে আমি দুঃখিত।...একদম আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ব্রিটিশ রাজনীতিকদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন। গণতন্ত্র সম্পর্কে যে কথা তাঁরা বলেন তা যথার্থ প্রতিপালিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ইংরাজ কি চায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতকে মুক্তে লিপ্ত করতে, না ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত পূর্ণ সহযোগিতা?

বিলাতে লর্ড জেটল্যাণ্ড এর উত্তর দিলেন—ব্রিটেনের এই দুর্দিনে ভারতের স্বাধীনতা দাবী করা অস্বাভাবিক! বা কিছু করতে হবে আমরা যুদ্ধের পর করবো।

গান্ধীজী বললেন—ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁরা যেন সাম্রাজ্যবাদের ভাষা তুলে যান এবং বারো সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলে বাঁধা তাদের সম্পর্কে ইতিহাসের এক নতুন পৃষ্ঠা খুলে ধরেন।

জহরলাল সেই কথাই আরো স্পষ্ট করে বললেন—লর্ড জেটল্যাণ্ড যে কথায় কথা বলেছেন তা বহুদিনের মৃত ভাষা, কুড়ি বছর আগে এই বক্তৃতা দিলে ভালো শোনাতো!...আমরা বাজারের দরদারি করতে চাই না।

বিলাতে তার জাহ্নুয়েল হোর আশাস দিলেন—সাম্রাজ্যবাদের আকাঙ্ক্ষা আমরা অনেকদিন আগে একশালে দূর করে দিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি যে এই ক্ষমতে অস্ত্র আভিকে শালন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তাই অস্ত্র আভিকে আত্মনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে।

আমরা গান্ধীজীর তাক পড়লো বড়লাটের দরবারে। রাষ্ট্রপতিপ্রসাদ এবং জিন্নাও কেখানে উপস্থিত হলেন। আলোচনা হোল। কিন্তু শেষ অবধি জিন্না গোলওয়ান বাদলেন। মুলদরবারের বক্তৃতা পাওয়া সত্ত্বেও তার চেয়েও অনেক বেশী তিনি দাবী করলেন। যত্নে মিললো না। মহাত্মাজী হরিজনে লিখলেন—কংগ্রেসকে তার লক্ষ্যে

আমাদের গান্ধী

পৌছাতে হলে আরো বেশী শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। বৃটিশের কাছ থেকে কংগ্রেস চেয়েছিল কীট কিন্তু পেলে পাখর।

এই শক্তি সঞ্চয় করার অর্থই হোল, নতুন আন্দোলনের ভিত্তর দিয়ে শক্তির পরীক্ষা করা। ওয়ার্কিং কমিটি সেইদিকেই নির্দেশ দিলেন। আটটি প্রদেশের কংগ্রেসী বহীরা পদত্যাগ করলেন। কর্মীরা ভাবী সংগ্রামের নীতি প্রচার করতে লাগলেন জনগণের মধ্যে।

মার্চ মাসে রায়গড়ে কংগ্রেস বসলো, গান্ধী বসলেন—প্রত্যেকটি কংগ্রেস কমিটিকে এক একটি সভাপ্রহ কমিটিতে রূপান্তরিত করতে হবে।...আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি। আমরা যখন সৈনিকের মত অগ্রসর হবো, তখন সৈনিকেরা যখন সেনানায়কের আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আমাদেরও ঠিক তাই করতে হবে—সেনানায়কের আদেশই হবে আইন। আমি তোমাদের সেনানায়ক, কিন্তু আমার মত শক্তিহীন সেনাপতি ইতিহাসের পাতায় একজনও দেখা যায় নি। আমার মত হোল ভালবাসা।...আমি সকলকেই ভালবাসি।...তবু তোমরা যখন আমাকেই সেনাপতি করেছ তখন আমার কথা তোমাদের মানতে হবে, তর্ক করা চলবে না। আমার ধর্ম প্রেমের ধর্ম, এবং প্রেম-ধর্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধৈর্য।...আমি নি, তোমরা সবাই জেলে যাবার জন্ত প্রস্তুত। কিন্তু সেই জেলে যাবার অধিকার র্জন করতে হবে, তার মূল্য দিতে হবে।...বডুই আমি অহিংসার কথা জাবি ততই র মধ্যে আমি গুণের সন্ধান পাই।...সত্যই আমার ভগবান।...সত্য ও অহিংসা ডা তোমাদের হয়তো অস্ত কোন নীতি থাকতে পারে, কিন্তু আমার নীতি সেই পাতন। আমি মাছব, আমার ভুল হতে পারে। আমি নিজেকে মহাত্মা বলে ন করি না। ঈশ্বরের কাছে আমরা সবাই সমান।...আমি শত্রুর মনে শুভ বুদ্ধি গাতে চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমার সংগ্রাম, কিন্তু বারা সাম্রাজ্য চালার দের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। যাতে কোন সংঘাত না বাধে সেজন্ত যি পকাশবার বড়লাটের কাছে বেতে রাজী আছি।...কিন্তু দেশবাসীর স্বার্থের ক্ষতি। আমি কিছুই করবো না।

গান্ধীজীর এই নীতিকে বামপন্থীরা সর্বাঙ্গকরণে সমর্থন করতে পারলো না। মফ-কংগ্রেসের পাশে বামপন্থীরা এক সম্মেলন করলো, তার নাম বিল—আপোষ-দায়ী সম্মেলন। সেখানে তারা প্রস্তাব করলো—কংগ্রেসী নেতার গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন স্বকম আপোষ করার চেষ্টা করলে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

আমাদের গান্ধীজী

আমাদের বিরোধীরা শুধু প্রকাশই করলো না, গান্ধীজীর বিরুদ্ধে প্রচার-বার বিপিন করলো, কালো নিশান দেখিয়ে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিকোড প্রদর্শন করলো।

গান্ধীজীর কাছে এ ব্যাপার নতুন নয়, তিনি ধৈর্য হারালেন না, বললেন—আমার নীতির বিরুদ্ধে বড় প্রকাশ করার অধিকার সকলেরই আছে। এতে উত্তেজনার কিছু নেই।...বিরোধী দলকে সঙ্কট করতে না পারলে ভোয়সা অহিংসার অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে না। আমি জানিনা গান্ধীবাদ বলতে কি বোকার, আমি ভো নতুন কিছুই প্রচার করিনি, যা আছে তাকেই শুধু নতুন আকার দেবার চেষ্টা করেছি যাত্র।

কিন্তু বিরোধী দল ধৈর্য হারালো, কলিকাতার পরের ঠেশনে ভীড়ের ভিতর থেকে কোন একজন লোক গান্ধীজীর কামরার ভিতর একপাটি জুতো ছুড়ে দিল।

বুড় ক্রমশঃই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে, হিটলারের বিজ্ঞ বাহিনী সমস্ত বাধা অতিক্রম করে দুবার বেগে যুরোপের বুকে এগিয়ে চলেছে, মুসোলিনীরা সেনা নেবে আসছে মিশরের দিকে। এই সময় ভারতবর্ষের সহযোগিতা উপেক্ষা করার ব্যাপার নয়, তার উপর গান্ধীজী যখন বলেছেন পকাশবার তিনি বড়লাটের কাছে যেতে রাজী আছেন। লিমলিৎগো আবার গান্ধীজীকে ডেকে পাঠালেন।

বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করে গান্ধীজী দেশবাসীর কাছে কৈকিয়ৎ দিলেন—আমি কোন দলের নেতা হিসাবে লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করিনি, আমি বন্ধু ভাবে আলোচনা করার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম—যদি কোন রকমে আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি, বিশেষতঃ কংগ্রেস কি চায় তা বুঝিয়ে বলার উদ্দেশ্যে আমার ছিল।...

বড়লাট কংগ্রেসীদের নিয়ে তাঁর বন্ধীসভাকে বড় করতে চাইলেন। কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না, তাঁরা দাবী জানালেন—সহযোগিতার আগে জাতীয় সরকার চাই।

ওয়ার্ণার কংগ্রেস কমিটিতে গান্ধীজী বললেন—ইংরাজেরা হেরে যার তা আমি চাই না, তাদের বর্ধাণা ক্ষুদ্র হয় তা'ও আমার কাম্য নয়। কিন্তু বে নিজে ডুবে থাকে সে অপরকে সাহায্য করবে কেমন করে?...

আবার বড়লাট গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন, কিন্তু অরাজ দেবার কোন প্রতিকল্পিত না থাকার সে আলোচনাও ব্যর্থ হোল।

গান্ধীজী এবার ইংরাজ জাতির উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি লিখলেন—বৃটিশ পরাজিত হয় তা আমি চাই না, পতনজির জোরে সে অরাজ করুক, তা'ও আমি চাই না।...নাথীনের সঙ্গে ভোয়সা পকাশজির প্রতিযোগিতা কর এ'ও অন্যাকল্পিত।

অসহযোগের আন্দোলন

দুই চাই তোমরা নাগাদীঘরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, আর নিজে না, অহিংস বিদ্রোহ।...
 আমরা হিটলার ও মুসোলিনীকে নিবারণ জানাও। তোমাদের দেশ, রাষ্ট্র ও
 শক্তি তারা লুণ্ঠন করে নিল। কিন্তু এখন তারা তোমাদের কাছে বসত। রাষ্ট্র
 হবে, তখন ছেলে-বুড়ো নির্বিচারে তোমরা প্রাণ বিক্রিও করিত হবে না।... আরও
 অহিংস-অসহযোগের পরীক্ষা করে আমি যথেষ্ট সাক্ষ্য লাভ করেছি।... আমি এমন
 একটি ঘটনাও জানি না যেখানে এই নীতি ব্যর্থ হয়েছে। যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে
 আমার অক্ষমতার জন্তই তা ঘটেছে। আমি নিজের পূর্ণতা রাষ্ট্র করি না। কিন্তু
 আমি সত্যের সন্ধানী, সত্যই আমার কাছে ভগবান, সত্যাত্মস্বাক্ষরের মধ্যে আমি
 অহিংসাকে আবিস্কার করি। অহিংসা আমার জীবনের আদর্শ। সেই আদর্শকে
 প্রচার করা ছাড়া আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।...

কিন্তু সাম্রাজ্য-বিস্তারীদের নীতির বালাই থাকে না, শোষণ কখনও সত্যকে
 স্বীকার করে না। নিপীড়িত জনগণের দীর্ঘবারে সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাংকের একাউন্ট
 ক্ষীণ হয়। সন্ধানের আড়ালে তারা আত্মরক্ষা করে, চল্লিশ কোটি অসহীন জন-
 গণের দাবী তারা গ্রাহ্য করবে কেন। ভারতবাসীর অধিকার জানাবার জন্য গান্ধিজী
 আবার সত্যগ্রহের আহ্বান জানানলেন—একক সত্যগ্রহ।

একক সত্যগ্রহ।

১৭ই অক্টোবর গান্ধিজীর আশীর্বাদ নিয়ে বিনোবা ভাবে ওয়াশিংটন আন্দোলন থেকে
 বাহির হলেন। হাতে তেরডা নিশান, মুখে কংগ্রেসের বাণী, নির্ভীক পদক্ষেপে পথ ও
 প্রান্তর অতিক্রম করে স্বাধীনতার সৈনিক এগিয়ে চললেন, গায়ে গায়ে কিবাণলেন
 ডেকে বললেন—ইংরাজের এই হুকুকে সৈন্ত হয়ে, অর্থ দিয়ে, সাহায্য করা পাপ।...
 এই সংগ্রামকে প্রতিরোধ করতে হবে অহিংসা দিয়ে।...

পঞ্চম দিনে বিনোবা ভাবেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো।

ভারতের জহরলাল।

ভারতের একে একে বহু কংগ্রেসকর্মী, প্রধান মন্ত্রী থেকে একজন সাধারণ
 নাগরিক অবধি—সারা দেশকে জুলিয়ে দিল আন্দোলনের দোলা।

সর্বশেষ সত্যগ্রহীদের সংবাদ প্রকাশ করা বন্ধ করে দিলেন, গান্ধিজী ও
 প্রতিবাদে 'হরিজন' 'হরিজনবন্ধু' ও 'হরিজন-সেবক' কাগজ বন্ধ করে দিলেন।

গান্ধিজী বললেন—আমি পরামর্শ স্বীকার করবো না। বৃটিশ আড্ডিকে আমি
 সত্য অসত্য কল্পনার চেষ্টা করবো যে করেই অথবা কোন দলের ব্যর্থতার উপ-

আমাদের দাবিদারী

ভারতের স্বাধীনতা নির্ভর করছে না, জাতি নীতি স্বীকার করতে বৃটিশের যে অনিচ্ছা তাতেই এইরূপ ঘটেছে। যদি লড়তেই হয় তাহলে যেন পরাম্পরের মাঝে ভুল বোঝার কল না থাকে, কোন তিক্ততা না থাকে। আমি এই আশাতেই সংগ্রাম শুরু করেছি—ভারতবর্ষ ভালো ব্যবহার দাবী করে শুধু ইংরাজদের কাছ থেকেই নয় সমগ্র বৃটিশ জাতির কাছ থেকে।...দাবী হচ্ছে বাচবার অধিকার, অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার। সহজ কথায় বাক্য বলে কথা বলার স্বাধীনতা, কংগ্রেস এই স্বাধীনতা দাবী করে নিজের জন্ত নয়, সকলের জন্ত। কংগ্রেসের নীতি হোল অহিংসা।...

ভারত-সচিব লিওপোল্ড আমেরী তর্জন করে উঠলেন—যারা জেলে যেতে চায় তাদের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না।...

আমেরী সাহেবের তর্জনে দেশ-সেবকেরা ভয় পেলেন না, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আড়াই হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করলেন।

আমেরী সাহেব বিলাত থেকে সাড়ম্বরে উপদেশ দিলেন—ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ, তাতে স্বাধীনতার কথা এখন দূরে রাখাই ভালো।

গান্ধিজী বললেন—আমি বারবার বলেছি ইংরাজেরাই আমাদের একতার বাধা-রূপ, তাদের নীতিই হচ্ছে বিভেদ বাধিয়ে শাসন করা। বৃটিশ যতদিন অস্তবলের জোরে ভারত শাসন করবে ততদিন বৃটিশ রাজনীতিকেরা বিভেদের নীতি বজায় রাখবেই। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মাঝে বিরোধ দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু সে বিরোধ বৃটিশ রাজনীতিকেরা আমাদের ঘরোয়া বিরোধ বলে মেনে নিচ্ছেন, কেন? আজ তারা ভারত ছেড়ে চলে যাক, লীগ ও অসন্তান রাজনীতিক নেতারা নিজেকে স্বার্থের পাতিলেরে নিজদের সমস্তা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলবে। হরতাল সেজন্য আমরা নিজদের মাঝে বিবাদ করবো, কিন্তু সে বিবাদ পনেরো দিনের বেশী স্থায়ী হবে না, এবং আজকের দুক্কে যত মানুষ একদিনে মরছে ততো রক্তপাত হবে না; অবশ্য যদি কাইরে থেকে আমরা কোন শক্তির সাহায্য গ্রহণ করি না আনি।...আমেরী সাহেব ভারতের সবুজি সবুজে যে কথা বলেছেন তা আমি কল্পে নিশ্বাসে পড়েছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি—সে কাহিনী পৌরাণিক যুগের। ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ ক্রমশঃ নিঃশব্দ হতে বসেছে। তারা খেতে পার না, তাদের পরনে কাপড় নেই। কার্ল ভারত একটি লোকের ইচ্ছামুখারী শাসিত হচ্ছে, তিনি কোটি কোটি প্রকার রাজস্ব ইচ্ছামত ব্যয় করেন। ইংরাজ আজ ভারতকে তার গোষ্ঠার নীচে ডুবে করছে। এই অবস্থার প্রত্যেক ভারতবাসীর উচিত এই খেজাচাদের

আসামের শাসিকী

বিক্রমে বিক্রোহ করা। সৌভাগ্যের কথা ভারতে শাস্তিপূর্ণ ভাবে বিক্রোহ হয়েছে, এই শাস্তির দ্বিতর দিবেই ভারতবর্ষ তার লক্ষ্যে গিয়ে পৌছাবে।

সেনাপতি তাঁর সৈন্যদের চিন্তেন, সৈনিকেরাও বিশ্বস্তভাবে সেনাপতির বিশ্বাসকে সার্থক করে তুলেছিলেন, কংগ্রেসের হিসাব দেখলেই তা জানা যায় :

প্রদেশের নাম :	শুলি কত্ব ক প্রেস্তারের সংখ্যা :	আদারী পরিমাণ :
সংযুক্ত প্রদেশ	১৪২৫	৩৮০০০
অন্ধ্র প্রদেশ	৮৮২	১৬৫৩৩
তামিলনাড়ু প্রদেশ	৪২৪	২০০০০
উৎকল প্রদেশ	৩১৫	২৫৩২
গুজরাট প্রদেশ	২২৬	৪১৫০
বিহার প্রদেশ	২৪২	৪৩৪০
মহারাষ্ট্র	২২১	১২১৫
কর্ণাটক	২১০	৪৩৮৫
আসাম	১৭৬	৩১৪৫
মহাকোশল	১৩৭	১০৩০২
বিদর্ভ	১২৩	৮১৭৬
কেরল	৭০	৫৭০০
বোম্বাই	৪৭	?
বাংলা*	৩২	৩৬২৫
দিল্লী	৩২	২০৫০
নাগপুর	২১	৪২১৫
আজমীর	১০	৫৬৪
সীমান্ত প্রদেশ	২	০
	৪৭৪২	২০২৬৬৩

এই সত্যগ্রহীদের যোগ্যতা সম্পর্কে সেনাপতির শুধু একটিমাত্র নির্দেশ ছিল—যে হত্যা কাটতে পারে না, সে সত্যগ্রহী হতে পারবে না।

মেশ কাল পাত্রে উপরে মহাশাস্ত্রী স্থান দিবেছিলেন সত্যগ্রহীর আদর্শকে, টাইম্‌স্-অফ-ইন্ডিয়া কাগজে তিনি লেখেন—হিটলার যদি ভারত আক্রমণ করে, এক সমস্ত সত্যগ্রহীকে হত্যা করে তাহলে হত্যাশ্রু ও ভরের কোন কারণ নেই। যদি

* সেবে বাংলা ও পাঞ্জাবে শুলি সত্যগ্রহীদের প্রেস্তার করা হোয়ে য়ে।

আমাদের গান্ধী

একসম সত্যগ্রহী ভার্মান-বাহিনীর গায়ে গান্ধীকে বিনা বিধেবে বৃত্ত্য বরণ করে, তাহলে এই সব সত্যগ্রহীর কথা প্রকৃত বীরের মত ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষর লেখা থাকবে।

সত্যগ্রহীদের সে দৃঢ়তা ছিল, একবার যিনি পথে নাযাতেন তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ কোন কারণে এতটুকু শিথিল হোত না। বাংলা দেশে এক সত্যগ্রহী দিনের পর দিন জাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচার করে গেছেন, পুলিশ আর জরিমানার ভয়ে কেউ তাঁকে আশ্রয় দেয়নি, একমুঠো অন্ন জোটেনি কয়েক দিন। কিন্তু সেজন্য তাঁর অগ্রগতির বিরাম ঘটেনি। শেষে এক জমিদার তাঁর আহ্বানের ব্যবস্থা করেন।

সারা ভারতের বিরাট রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যেও মহাত্মাজী ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এবং সংগঠনের কাজকে ভীড়ের মাঝে হারিয়ে ফেলেন নি। বীনবন্ধু এগুরুজ অস্থায়ী দেহে কলিকাতার এক হাসপাতালে পড়েছিলেন, গান্ধীজী তাঁকে দেখতে এলেন কলিকাতায়।

সেখান থেকে গান্ধীজী কলুরবাকে সংগে নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সকাশে। আশ্রুকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানলেন। শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না। কিছুদিন আগে এমনি এক দুর্ভোগ থেকে গান্ধীজী বিশ্বভারতীকে সঙ্কটমুক্ত করেছিলেন, কবিগুরু এবার তাই গান্ধীজীকে বললেন—আমার জীবনের সাধনা ও সম্পদ এই বিশ্বভারতী, এই প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার জন্য, বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত ভার আপনি গ্রহণ করুন।

গান্ধীজী এলেন মলিকান্দায় গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে।

গান্ধীজী গেলেন বরদৌলিতে প্যাটেলের আশ্রমে।

কান্দী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তজ জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিলেন।

শেষে বীনবন্ধু এগুরুজের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য পাঁচ লাখ টাকা গান্ধীজী ফুলে যেন শান্তিনিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথ যখন অস্থায়ী হয়ে পড়লেন, গান্ধীজী যেখানেই থাকুন না কেন নিয়মিত প্রত্যয়েবের প্রকর নিভেন। যখন নিকে আমার অবসর পেলেন না মহাদেব দেশাইকে পাঠিয়ে দিলেন কবিগুরুক শয্যাপার্শ্বে। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পারিত, বিদ্যুৎ-বীজের মত কখন কখন মহাত্মাজীর কথাই হরতো তাঁর মনে আগছিল, এমন সময় মহাদেব দেশাই গান্ধীজীর চিঠিখানি এনে তাঁর হাতে দিলেন। কবির হাত বেঁচে

কিনো, জিওগ্রাফি পড়তে পড়তে আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভীষ কোথ হুল হুল করে উঠলো, মুখের আভ্যন্তরিকতা কৃতার্ব হোল, সরসীর হোল।

১৯৪১-এর ২রা অক্টোবর।

ভারতের অহিংস সেনানতি তিরাত্তর বৎসরের জীবন আরম্ভ করলেন। সেবা-
মায়ে গান্ধিজীর অয়োৎসব হোল। আত্মমিকেরা বারো হাজার টাকাই একটি বলি
। তিন কোটি গজ সূতা গান্ধিজীকে উপহার দিলেন।

গান্ধিজী বললেন—এক এক গজ সূতো আমাদের স্বরাজ্যের পথে এক এক পা
গিয়ে দেবে। এ কাব্য কথা নয়, এ আমার অন্তরের কথা। স্বরাজ্য বলতে আমি
নগণের স্বরাজ্য বুঝি। শাসাদের হানে কালোদের স্বৈরাচার-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
বতে আমি চাই না। আমি স্বরাজ্য বলতে বুঝি—গরীব লোকেরাও হুম্ম যি কল
। সব জি খেতে পাবে, উপযুক্ত আহার পাবে, থাকবার যত স্বাস্থ্যকর বাড়ী পাবে।
। দোলানের গতি দেখে আমি খুশি হয়েছি...লোকে যদি কোন বাহু দেখাবার আশা
রে থাকে, তা দেখাতে আমি পারবো না, তবে অহিংসা হোল পরম-শিতার
ভিত্তিক, তিমিই এর সাফল্য দেবেন। অহিংসা সংগ্রাম দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের
গ্রাম। যুরোপে আজ দানবীয় যুদ্ধের ফলে সেখানকার জনগণকে যে অকথ্য কষ্ট
হু করতে হচ্ছে আমাদের কোনদিনই ততো দুঃখ সহিতে হবে না। কিন্তু
। আমাদের ব্যবহার জেলে বেতে হবে, প্রয়োজন যত আমরা যদি দুঃখবরণ করতে না
পারি তাহলে স্বরাজ্যের কথা বলাই অসম্ভব। অহিংসার পথে যে স্বরাজ্য আমরা
চাই, গঠনমূলক কাজে সাফল্যলাভ করাই তার ভিত্তি। গঠনমূলক কাজে আমাদের
লেগে থাকতে হবে।

সংগ্রামের দিকেই কংগ্রেস কর্মীরা কর্ষশক্তি কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেন।
ওরাকিং কমিটির ধনঘন সভা বসাতে শুরু করে, প্রত্যেকটি বৈঠকে গান্ধিজী গান্ধী-নীতি
ও ভবিষ্যৎ কর্ষশক্তির ইঙ্গিত দিতে থাকেন।

ডিসেম্বর মাসে বরনৌলির বৈঠকে গান্ধিজী বললেন—আমি কংগ্রেস-সেবক, সত্য
ও অহিংস নীতি কলার রেখে আমি কংগ্রেসের সেবা করতে চাই।

আত্মরারী মাসে ওরারার বৈঠকে গান্ধিজী বললেন—কংগ্রেস কমিটিগুলিকে
শক্তিশালী করতে হবে, খেজালসেবকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে, জনসাধারণের সঙ্গে
যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করতে হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে যেন কংগ্রেসের বাপী ঘিরে
পৌঁছান।

আমাদের গান্ধিজী

এক কৰ্মীদের কাছে ভাবী সংগ্রামের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য গান্ধিজী আবার তাঁর হরিজন প্রকাশ করলেন। পনেরো বাস কাগজখানি বন্ধ ছিল।

মুহু ক্রমেই সংকটপূর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছালো। চীনের ভিতর দিয়ে আপানীরা এগিয়ে এলো রেংগুন অবধি। চীন ও ব্রহ্মদেশের সমস্ত উপকূল আপানীদের করতল গত; আহাজে অস্ত্রপত্র আমদানীর পথ একেবারে বন্ধ। চীনের রাজধানী শিহিয়ে গেছে চুংকিয়ে। কিভাবে লড়াই চালিয়ে এখন আপানীদের কবল থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় তাই আলোচনা করার জন্য চীনের সর্বাধিনায়ক জেনারেল-সিমো চিয়াং-কাই-শেক এলেন ভারতবর্ষে। বড়লাট ও প্রধান সেনাপতির সঙ্গে চিয়াং নানা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর দেশবাসীর মনোভাব জানার জন্য জহরলালের সঙ্গে অনেক কথা হোল। পণ্ডিতজীর সঙ্গে তিনি এলেন শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্র-ভীর্ষ দর্শনে। কলিকাতায় গান্ধিজীর সঙ্গে চিয়াংয়ের দেখা হোল। সাত্বে চারকটা ধরে আলোচনা হোল, চিয়াং ইংরাজী জানেন না, চিয়াং-পত্নী দু'কনের মাঝে গোভাষীর কাজ করলেন।

ইংরাজেরা এগিয়ার দুই মহাদেশের রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে এই আলোচনা ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু চিয়াং জানতেন বড়লাট বা প্রধান সেনাপতির কথা ভারতবাসীর কথা নয়। ভারতবর্ষের মনের কথা জানতে হলে, গান্ধিজীর মুখ থেকে তা স্তনতে হবে। সেইজন্য ভারত-সরকারের দিক থেকে কোন ব্যবস্থা না হলেও চিয়াং নিজে উদ্যোগী হয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করেন।

গান্ধিজীর সঙ্গে মহাদেব দেশাই ও পণ্ডিত জওহরলালও ছিলেন। গান্ধিজী একটি চরকা নিয়ে গিয়েছিলেন। কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ তিনি সেই চরকার ছুতা কাটেন, তারপর সেই ছুতা ও চরকাটি উপহার দিয়ে আসেন চিয়াংকে।

এই সভার বিশেষ ছিল ব্যাডাম চিয়াংয়ের পরিচয়। ভারতীয় কারখানার বন্ধের লাড়ী পরে মাথার সিঁড়র দিয়ে পুরোপুরি ভারতীয় মহিলা সেজে চিয়াং-পত্নী মহাত্মাজীকে প্রণাম জানান।

আলোচনা কি হুইছিল জানা যায় না, তবে মহাত্মাজীর বাণী ও ব্যক্তিত্ব যে মহাচীনের রাষ্ট্রনায়কের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বোঝা যায় তাঁর ভিহাব বাণীতে। ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবার সময় চিয়াং বলেন—আমি আপা রদনি ও বিশ্বাস করি যে গ্রেটব্রিটেন ভারতবাসীর কোন দাবীর অপেক্ষা না রেখেই বড়জীর

আমাদের গান্ধিজী

হব তাদের হাতে দেশ-শাসনের ক্যামড়া দেবে...ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তাতে গন্নিবা
ডবে এবং বিজ্ঞানোচিত কাজ হবে বলেই আমি মনে করি।

ব্রিটিশ মন্ত্রী ট্যাকোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ এলেন ভারতবর্ষে।

দু'বছর তিন মাস আগে লড়াই শুরু হবার মুখেই তিনি আরেকবার এসেছিলেন।
তখন ক্রিপ্‌স্‌ সাহেব এসেছিলেন গান্ধিজী ও কংগ্রেসী নেতাদের সংগে আলোচনা
তে, এবারও সেই একই ব্যাপার। তাঁর আলোচনা করার বিষয় ছিল—কংগ্রেস
যুদ্ধে যোগ দিক্, যুদ্ধ শেষ হলে ধীরে গৃহে তাদের স্বাধীনতার বিলি-ব্যবস্থা করা
ব। এখন কংগ্রেসীরা বড়লাটের দরবারে মন্ত্রী কলক।

গান্ধিজী ও কংগ্রেসী নেতারা ক্রিপ্‌স্‌ সাহেবের সংগে তখনও একমত হতে পারেন
এবারও এ স্তরে রাজী হতে পারলেন না, গান্ধিজী বললেন—‘এ হচ্ছে ভবিষ্যতের
সই করা চেক—এ পোষ্ট ডেটেড চেক।’ সাংবাদিকেরা আবার তার সংগে যোগ
দিল—‘দেউলিয়া ব্যাংকের নামে—অন এ ক্র্যাশিং ব্যাংক!’ ক্রিপ্‌স্‌ সাহেবের
চাবগুলি সারা ভারতের সংবাদ-পত্রে নতুন নাম পেল—দেউলিয়া ব্যাংকের উপর
ইত্তের জন্ত সই করা চেক—এ পোষ্ট ডেটেড চেক অন এ ক্র্যাশিং ব্যাংক।

তথাপি ক্রিপ্‌স্‌ সাহেবের সংগে কথাবার্তা কহে গান্ধিজী প্রত্যেক বারই হাসি-
বাহির হয়ে আসতেন। ক্রিপ্‌স্‌ বলতেন—আমি গান্ধিজীকে হাসতে শিখিয়ে
ছি।

পরে অবশ্য গান্ধিজী হেসে বলেন—সব ব্যাপারটাই হাস্যকর।

জাপানী আক্রমণ সম্পর্কে ইংরাজরা যে ভয় দেখাতো সেই সম্পর্কে গান্ধিজী
কটা স্টা কথা বলেন—ইংরাজরা ভারতে আছে বলেই জাপানীরা এ দেশ আক্রমণ
হে...আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্রিটিশ ও ভারতের পরস্পর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন
র দিন এসেছে। ব্রিটিশকে সাফল্য লাভ করতে হলে প্রথমেই কৃত অস্ত্রারের নতশোধন
তে হবে।...ব্রিটিশের এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকৃত স্থানগুলি ছেড়ে চলে বাঙারার
আমি যে আবেদন করেছি, আশা করি প্রত্যেক ব্রিটনই তা সমর্থন করবেন।
যদি তাই বিনা রক্তপাতে নতুন যুগের সূচনা করতে। ভগবানের হাতে তোমরা
তুমিককে সমর্থন কর, তা বহি খুব বেশী বলে মনে হয়, অরাজকতার মধ্যেই তাকে
কাজও। তাই মধ্যে থেকেই সত্যকারের ভারতের অভ্যুদয় হবে।

ব্যর্থকাম ক্রিপ্‌স্‌ সাহেব বিলাতে গিয়া যে সব বাক্য কথা বলেন, সেই প্রসঙ্গে
জী বললেন—ভারতকে জোর করে সাম্রাজ্যবাহী যুদ্ধে নামানো হয়েছে। বিজিত

আমাদের স্বাধীনতা

রাষ্ট্রশক্তিকে স্বাধীনতা দেবার জন্য এই সংগ্রাম লড়া হচ্ছে। যারা অন্য জাতির মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছে এক জাতিকে পরাধীন করে রাখা তাদের পক্ষে অসহ্য। কিন্তু মুক্তি ভারতকে পরাধীন করে রেখেছে, কাজেই এই যুদ্ধের কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। তাহলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই স্বাধীনতা দিতে হয়। সব দল একত্র হয়েছিল বলে যে কথা তোলা হয়, তা অর্থহীন। কোন ক্রীতদাসকে মুক্তি দিতে হলে তার যত্নমত জিজ্ঞাসা করার কোন মানে হয় না। অনেক ক্রীতদাস তার শিকলকেই ভালবাসে। ভারতের একটি দল যদি সেই শিকলেই বিশ্বাস রাখে, সেই কারণে সমগ্র ভারতকে শুল্কান্বিত করার কোন অর্থ হয় না। ইংরাজ চলে গেলেই শাস্তা ভারত একতরফী হয়ে আবার হবে।

এই যত্নবিরোধের মূলে ছিল মুসলীম লীগ। লীগের নেতা জিন্না প্রস্তাব করতে শুরু করে যে এদেশের মুসলমানেরা ভারতীয় নয়, হিন্দুদের স্বার্থ আঁচি ভারতের স্বার্থ এক নয়। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের মধ্যে কোন মতেই তার মিলতে পারে না।

গান্ধিজী এই সম্পর্কে সুই-কিসারকে একদিন বলেছিলেন—একটা ছুঁতোর কথা নয়, এটা কলংকের কথা। এ দোষ শুধু মুসলীম লীগের। হুঁতোর মধ্যে মধ্যে কংগ্রেস এক লীগকে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আমি কংগ্রেস স্তরকে বলা বলার জন্য উপস্থিত ছিলাম। মুসলীম লীগের মিটার জিন্নাও উপস্থিত ছিলেন। তারাকে আগে থাকতে একটা ঘরোয়া আলোচনার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলাম। এবং ইংরাজ সরকারের কাছে যুক্ত আবেদন যাতে পেশ করতে পারি, সেই উপায় উদ্ভাবন করার কথাও বলেছিলাম। দিল্লীতে হুঁতোর দেখা করার কথা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন প্রস্তাব করলাম যে ভারতের স্বাধীনতা আমাদের উভয়েরই কার্যতখন জিন্না বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—‘আমি স্বাধীনতা চাই না!’ এর পর আমরান হতে পারলাম না। আমি তাকে এমন কথাও বললাম যে বড়লাটের কাছে একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে আমরা একতরফী একটা ভাষা দেখাই।...হয় তিনি আমরান দ্বীপান্তে আসতে পারেন নাহয় আমি তাঁর গাড়ীতে বেতে পারি। শেষ পর্যন্ত তাঁর গাড়ী করেই লন্ডন প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু একসঙ্গে গেলেও সেখানে নিয়ে তিনি বড়লাট বাহাদুরকে ডির হয়ে ডির যত জানিয়ে দিলেন।...বাস্তব জীবনে আমাদের দুটি জাতিতে পরিণত করা অসম্ভব। আমরা একই জাতি। পারিবারিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যেক মুসলমানেরই পূর্ব পুরুষ হিন্দু। এর দ্বারা জাতিগত পার্থক্য বোঝায় না। আমরা যদি দুটি জাতি হতাম, এবং

আবাসের গাফিলত

দীন মুসলমান পন্থী আবাসের খুশখবরী লিখিত করতেন তাহলে আবাস। রাজস্বাধিকার কী ভাতি হয়ে বেতে পারতাম না। ঠিক এই দুটি খবর সম্ভাব্যকেনও দুটি ভাতি বলা ল না। সমগ্র যুরোপ খুশখবরী বর্ষে বিবাসী এবং ইংলও ও জার্মানী মধ্যে কঠিনত ভাবাগত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও একে অপরের টুটি চেপে ধরতে কহর করেনি। রুতে আবাসের একই ঐতিহ্য বর্তমান। উত্তর ভারতে হিন্দু ও মুসলমান উত্তর প্রদেশেই হিন্দী ও উর্দু বক্তে পারে। যাত্রায়ে হিন্দু ও মুসলমান ভাবিল আর কথা বলে এবং বাংলা দেশে তারা হিন্দী ও উর্দুতে না বলে বাংলাতেই কথা ল। সাম্প্রদায়িক হত্যার কারণ খুঁজলেই দেখা যায়, হয় সেটা গোহত্যায ব্যাপারে হয় সেটা কোন ধর্মাবলম্বীর বিচ্ছিন্নের জন্ত। এ থেকে এই কথাটাই প্রমাণিত হয় অসহযোগই বিরোধের সৃষ্টি করে। আভিভেন এর কারণ নয়। অসহযোগ বিচ্ছেদ চায় না, রাজনীতিকেরাই এই বিচ্ছেদ ঘটান।

গান্ধীজীর মনে এই বিশ্বাস ছিল বলেই দোসরা আগষ্টের হরিকন কাগজে তিনি বলেন—ইংরাজ যদি সভাই স্বাধীনতা দিতে চায়, তাহলে মুসলিম লীগের হাতেও ত পারে, আবাসের কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু স্বাধীনতা দেবার এতটুকু আগ্রহ বৃটিশের ছিল না। জুলাই মাসে ভারত সরকারের সেক্রেটারী তার কেন্দ্রীয় পাকেল, ভারতবাসী সাক্ষরী কর্মচারীদের সঙ্গে এক সাফল্যের জারী করলেন : তাতে কংগ্রেস ও গান্ধীজীকে বিশ্বের চোখে কে করে ছোট করা যায়, সেই সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশ দেন ; পাকেল সাহেব বলেন : আইন অমান্য আন্দোলন জার্মান ইতালি আপানকে উৎসাহিত করবে। গান্ধীজীর প্রস্তাব অস্বীকারী ভারতে অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে আপানকে ভারতে আয়তন হ্রাস করবে। ...শত্রুপক্ষের বেতারাে কংগ্রেসী নেতাদের কথা এখন প্রায়ই শোনা যায়, তিনি কীভাবে যায় কংগ্রেসের এই প্রস্তাব ভারতের শত্রুদের সুবিধা করে দেবে যাত্র। ...আজ্ঞা জরী নাহলে ভারতের স্বাধীনতা আসবে না—জীভবাসের জগতে স্বাধীন ভারত সম্ভব নয়। ...স্বরণ রাখতে হবে যে মুসলমান, শিখ, কমিউনিষ্ট, ব্রাহ্মণ ও খ্রিস্টানভাঙলি কংগ্রেস বিরোধী ...যনে রাখতে হবে যে আপানের জয়ে কংগ্রেসকর্মীরা মর্শিত...বাঙ্গা জাতীয় সরকার গঠনের পর ভারতীয় সৈন্ত বাহিনী ভেঙে দেবার কথাটী। শত্রুপক্ষের কাছে হুত পাঠাবার কথাও তিনি বলেন। আজাদ ও স্বাধীন যে ভারতবাসী গণবিশ্বোভের জয় দেখিয়েছেন তাতে ভারতবর্ষ আপান ও স্বাধীন হাতে সিরে লড়বে। ...এখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনবত গঠন করা বরকার।

আমাদের গান্ধিজী

সেই উদ্দেশ্যে ধর্মের কাগজে চিঠি ছাপিয়ে, পুস্তিকা প্রকাশ করে, বক্তৃতা দিয়ে, কার্টুন ছবি, পোষ্টার ও বেতার বোম্বা মারফৎ রীতিমত প্রচার চালাতে হবে।...

ছবিগুলি কেমন হবে সেই সম্পর্কে কয়েকটি পরিকল্পনাও পাকেল সাহেব দিয়ে দেন : একখানি ছবি বা পোষ্টারে থাকবে একখানি ঘরের ছবি। ঘরের ছুঁদিকে দুটি দরজা। ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে একজন কংগ্রেসী আর তার পিছনে একজন চাষা। বাঁদিকের দরজা দিয়ে একজন ইংরাজ সৈনিক বেরিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেসী তাকে নমস্কার করছে, আর ডানদিকের দরজায় একজন জাপানীর মুখ দেখা যাচ্ছে, চাষাটি সেদিক পানে তাকিয়ে বলছে—বাবুজী, দেখুন কে আসছে।

আরেকখানি ছবিতে আঁকা থাকবে পথের এক চৌমাথা। চৌমাথার উপর এক সাইন বোর্ড ঝুলছে তাতে লেখা আছে—জগ। দু'জন পথিক পথের মোড়ে থমকে দাঁড়িয়েছে, একজন জিজ্ঞাসা করছে—স্বাধীনতার পথ কোনটা? আরেকজন উত্তর দিচ্ছে—অয়ের পথই স্বাধীনতার পথ।...

আরেকখানি ছবিতে থাকবে পর পর তিনটি মাইক্রোফোনের সামনে হিটলার মুসোলিনী ও তোজো বক্তৃতা করছে, তিনজনই বলছে—আমি কংগ্রেসের প্রস্তাব সমর্থন করি।

একখানি সাহুলার গান্ধিজীর হাতে এসে পড়লো, তিনি যন্তব্য করলেন—এ থেকে জনসাধারণ জানতে পারবেন আন্দোলন দমন করার জন্য গবর্নেন্ট কতদূর অগ্রসর হবে। ভগবান জানেন এই ধরনের নির্দেশ আর কতগুলি ছাড়া হয়েছে।...গণভোট নিয়ে জনমত গ্রহণ করা হোক, এবং সরকার সেই জনমত মেনে নিক, কংগ্রেস খুশি হবে। ইহাই হোল সভাকারের গণতন্ত্র।...‘ভারত ছাড়ে’ মৌখিক কথা নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরের অভিব্যক্তি। জনসাধারণ যেন যেন রাখে যে জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করার চেয়ে জীবিকা আহরণের আরো অনেক সংপথ খোলা আছে।

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বললো—শুধু ভারতের জন্যই নয়, বিশ্বের নিরপত্তার জন্য ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব করলো—ভারতের জনগণ বিপদ ও দুর্ভোগের মাকে সাহস ও সহিষ্ণুতা না হারায়, গান্ধিজীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারত এক হয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকের সত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে বাবে!...ভারতের স্বাধীনতা সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার পূর্বসূচনা যাত্রা, ব্রহ্মদেশ, বালয়, হিন্দুচীন, পূর্বভারতীয় বীপপুঞ্জ ইরান ও ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত।...ভারতের স্বাধীনতার জন্য দেশব্যাপী

আমাদের স্বাধীনতা

গণ সংগ্রামের প্রয়োজন :—গান্ধীজী সেই অসিংশ সংগ্রামের অবশ্যকারী নেতা । এই কমিটি তাঁকে পথ প্রদর্শক হতে, নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান করছে ।—যদি এমন সময় আসে যখন কংগ্রেস আর তার নির্দেশ দিতে পারবে না, তখন প্রত্যেকটি স্বাধীনতা-কাষী ভারতীয় সংগ্রামের কঠিন পথে নিজের নিজের পথ প্রদর্শক হবে, বতর্দিন না স্বাধীনতা ও মুক্তি আসে...

গান্ধীজী বললেন—আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবো আপনাদের সেনাপতি হিসাবে নয়, পরিচালকও নয়, কেবল আপনাদের সেবক হিসাবে । আজার অজ্ঞত বলছে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে, একলা দাঁড়াতে হবে । সারা জগৎ আমার পানে চোখ রাঙিয়ে দাঁড়ালেও এগিয়ে যেতে ভয় করলে চলবে না, ভগবানে বিশ্বাস রাখলেই চলবে ।...আমি হয়তো বেশীদিন বাঁচবো না, কিন্তু আমি যখন চলে যাব, তখন ভারত স্বাধীন হবে ; শুধু ভারতই নয়, সারা জগৎ স্বাধীন হবে । ...যদি সারা দুনিয়া আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি ভারতের সমস্ত লোক বোকারবার চোঁটা করে যে আমি ভুল পথ ধরেছি, তবু আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাব,—ভারতের অজ্ঞ, সারা জগতের মঙ্গলের জন্ত ।...ব্রিটিশ ভারতের উপর সবচেয়ে বেশী অনাচার করেছে, কিন্তু সেজন্ত তাদের আমি অজ্ঞায় আশ্বস্ত করবো না ।...আমরা সকলে ভারতের স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করবো । আমি অর্থেষ হয়ে পড়েছি । সকলের স্বাধীনতার জন্ত আমরা সংগ্রাম করবো ।...মুসলমানেরাও ভারতের লোক, ভারত তাদেরও মাতৃভূমি, তাদের দরজা খোলা আছে, তারাও কংগ্রেসে প্রাধিক্ত পেতে পারে ।—মুসলমানদের জন্ত হিন্দুদেরও আজ জীবন-পাত করার সময় এসেছে ।...গণসংগ্রাম আসছে । আমাদের গোপন কিছু নেই । এ আমাদের প্রকাশ্য অভিযান ।...কংগ্রেসকে ধ্বংস করার শক্তি কারুর নেই । আমরা এক বিরাট সান্নাধ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নাবছি । একে ভুল করলে চলবে না, ভুল বুঝলেও চলবে না । মরু জিন কোন কার্যকলাপ আমাদের নেই, যে গোপনে কিছু করার চোঁটা করবে, সে ব্রহ্মের পাবে ।

গান্ধীজী কংগ্রেসে পাঁচ দফা কর্মসূচী দিলেন :

১। সংবাদ-পত্রগুলিকে নির্ভীকভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে ।...সরকারী স্কুল নিয়ে মাথা নত করা চলবে না, সেজন্ত তাঁদের আপিস ও ছাপাখানা বিসর্জন দেবার জন্ত প্রস্তুত হতে হবে ।

২। রাজ্যত রাজাদের আমি শুভাকুখ্যায়ী । আমি দেশীয় রাজ্যে অন্বেষি, আমার যাবা ছিলেন এক রাজার দেওয়ান ।...আমি চাই সামন্ত রাজারাও এখন মূখ্যমন্ত্রীর

আমাদের গান্ধিজী

যেনে চলবেন। আমাদের উপর দেশ শাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন।...তা যদি তাঁরা না করতে পারেন তাহলে স্বাধীন ভারতে তাঁদের স্থান হবে না। সশস্ত্র রাজারা তাঁদের বেজাচার ভুলে যান।

৩। এই আন্দোলনে গোপন কিছু থাকবে না, গোপনতা পাপ, শুদ্ধভাবে কোন কাজ করা চলবে না।

৪। ছাত্র ও অধ্যাপকেরা সাহস সঙ্কর করে কংগ্রেসের পাশে এসে দাঁড়াবেন। যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাদের পেশা ও ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনা ছেড়ে আসতে হবে।

৫। সরকারী কর্মচারীদের এখনই চাকরী ছাড়ার প্রয়োজন নেই, তবে তাঁরা যেন গবর্নমেন্টকে জানিয়ে যেন যে তাঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেন।

৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় গান্ধিজীর ‘ভারত ছাড়ো’ প্রস্তাব গৃহীত হোল, এই সন্মর্কে আমেরিকার উদ্দেশ্যে গান্ধিজী বললেন—
আমি সত্যের পূজারী, সত্যই আমার ভগবান।...আমি অল্পভব করি যে ভগবান আমার হেহের প্রতিটি তত্ত্বতে বিরাজমান।...সেই সত্যকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি যে ভারতকে স্বাধীন থেকে মুক্তি দেওয়া ব্রুটেনের অবশ্য কর্তব্য।...ভারতবাসীর মনে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, এই স্রায় কাজের দ্বারা তা প্রশমিত হবে। অসন্তোষ সদিচ্ছায় রূপান্তরিত হবে। সমস্ত বোম্বার্ক বিমান ও রণশেপণের চেয়ে তার মূল্য বেশী...আমি জানি কংগ্রেস সন্মর্কে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা আপনাদের চোখ কাশ বিভ্রান্ত করেছে, আমাকে ধান্দা বাজ ও ব্রুটেনের ছদ্মবেশী শত্রু বলে চিত্রিত করা হয়।...আপনারা তুম্ব একটি কথা বিচার করবেন, কংগ্রেস যে বিনা সর্ভে ভারতের স্বাধীনতা চাইছে সে কি অসম্ভব? বলা হয়—‘এখন তার সময় নয়,’ কিন্তু আমরা বলি ‘এখনই সেই সময়।’ তাহলেই এ দেশে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে। মিত্র পক্ষ ও ভারতবাসীর কাছে তার বখেট মূল্য আছে।...এই মুহূর্তে ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে দেওয়া আমি বখেট মূল্যবান বলে মনে করি।

আগে থেকে ‘ভারত ছাড়ো’ প্রস্তাবের একখানি নকল সংগ্রহ করার জন্য ভারত সরকার পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন, কি করতে হবে তা ও তারা স্থির করে রেখেছিলেন কংগ্রেস ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যে দুঃসাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত সরকার সে জন্য তার কর্তব্য করতে পিছিয়ে যাবে না। রাষ্ট্রীয় সমিতি থেকে কোন কংগ্রেসীই আত্ম ঘরে ফিরলেন না; ৯ই আগষ্ট প্রত্যুষেই পুলিশ সবাইকে গ্রেপ্তার করলো। বহাঙ্গাঙ্গীকে নিয়ে বাওরা হোল আগাখাঁ প্রাসাদে, সঙ্গে রয়েলেন কতকগুলি ও মহাশয়ের শোশাই।

স্বাধীনতার বাঙ্কী

সারা ভারতের বৃহৎ বস্ত্র-যুগ্ম গণবিক্রয় দেখা দিল। সোকে বেলারাইন উপড়ে ফেললো, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিল, পুথের মাঝে খানা কেটে রাখলো, খানা ও কাছারি পুড়িয়ে দিল, যদের দোকান তখনচ করে দিল, ব্রিটিশ শাসন অচল করে তুললো মিলিটারী এলে নির্বিচারে গুলি চালালো, প্লেন থেকে বোমা ফেললো, বাড়ী জালিয়ে দিল, সাধারণের উপর কত যে অত্যাচার করলো, তার মীমা নেই। হুঁয়াল পরে বড় লাটের দপ্তর থেকে এক হিসাব বেরলো তাতে জানা গেল :

নিহত হয়েছে—২৪০ জন

আহত হয়েছে—১৬৩০ জন

জেলে গেছে—২৬০০০ জন

বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে—১৮০০০ জন

পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে—৬০,২২৯ জন

শুধু তমলুক মহকুমাতাই পুলিশ পুড়িয়ে দিয়েছিল ১৬৪ খানি গৃহস্থের বাড়ী ও ৩১টি কংগ্রেস কার্যালয়। সারা ভারতে আরো কত বাড়ী পুড়েছিল তার হিসাব নেই।

তার রাব্বানী আয়ার এই ব্যাপারে বড়লাটের মন্ত্রী ছেড়ে দেন, বলেন—আজ এমন কোন শক্তি নেই, বা জাতির এই অগ্রগতিকে রোধ করতে পারে।

গান্ধীজী বড়লাটকে একখানি চিঠি লিখলেন—ভারত সরকার অবস্থাকে সংকট-জনক করে তুল করছে।...আপনার কাজ আমি বতাই অপছন্দ করি না কেন, আমি আপনার বন্ধুই আছি... ভগবান আপনার পথ প্রদর্শক হোন।...

বিলাতের পার্লামেন্টে চার্চিল সাহেব এর উত্তর দিলেন—মিটার গান্ধী যুগ্ম যে অহিংসার বাণী প্রচার করেন কংগ্রেসদল এখন সে নীতি বর্জন করে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ অবতীর্ণ হয়েছে...আমাদের বিরাট বাহিনী ভারতে গিয়ে পৌছেছে...ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এতবড় বাহিনী আর কখনও যায় নি...ভারতের এই পরিস্থিতিতে আমাদের হতাশ হবার বা ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

গান্ধীজী লিখলেন—বিকল্পে বস্ত্র কথাই বলা হোক না কেন। আমি তথ্যাদি দাবী করছি যে কংগ্রেস কর্মচারী এখনও অহিংসনীতিতে অচল আছে। যে কলসফুলক কাজ বটছে তার জন্য কংগ্রেসকেই আমি দায়ী করছি। সরকারী কঠোর ব্যবস্থা অসন্তোষ ও ভিত্তিক্তা বৃদ্ধি করবে বাজ।

কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি গান্ধীজী ও কংগ্রেসকর্মীদের মুক্তি দাবী করলেন।

কিছুক্ষণ নিরোপী দাবী করলেন—এক অস্থলস্থান কথিটি করে কোন পক্ষের যোগ্য তার মীমালা করা হোক।

আমাদের স্বাধীনতা

নিজের প্রশাসন স্বাধীনতা দাবী করলেন—ভারতীয় সরকার চাই।

বাংলার রাজস্ববন্দী ভট্টর ভ্রাতাপ্রাসাদ গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার অস্বাভাবিক পেরে প্রতিবাদে পতন্যগ করলেন।

চীন দেশ থেকে 'ভার' এলো—গান্ধীজীর প্রেরণারের সংবাদ, বাংসা হাংগামা ও রক্তপাতের লবায় পেয়ে চীনারা অত্যন্ত দুঃখিত।...ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূল লক্ষ্য মিত্র পক্ষের সংগ্রাম নীতির সঙ্গে এক, সেইজন্যই আমরা ভারতের প্রতি সহায়ত্বীত্ব সম্পন্ন।...

বক্সি আফরিকার জেনারেল স্মিট্‌স লওনে বললেন—গান্ধীজীকে শত্রুপক্ষের লোক বলা নিছক বোকামি। তিনি একজন বিরাট মানুষ। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন—অগতির শ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি মহান আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত।...সেই আদর্শ আমাদের বর্তমান সংকটপূর্ণ পৃথিবীতে কার্যকরী হবে কি না সেই প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু মিটার গান্ধী একজন মহান দেশপ্রেমিক, মহামানব, মহান আধ্যাত্মিক নেতা।

আমেরিকায় ইন্সপেক্টর ভারতের বিরুদ্ধে যে প্রমাণাগাণ্ডা চালিয়েছিল, তার প্রতিবাদে কলম ধরলেন—লুই ফিশার, এডগার স্নো, লিন-উ-তাং, পাল'বাক, ও উইল্ডেল উইলকিন্স।

লুই ফিশার লিখলেন—ভারতের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে গান্ধীজী।...তিনি জাপান, জর্মানী কি ইতালির পক্ষে নন তিনি ব্রিটিশের পক্ষে, চীনের পক্ষে, আমেরিকার পক্ষে। তিনি চান আমরা যুদ্ধে জয়ী হই। কিন্তু ভারতবাসীর সহায়ত্বীত্ব ছাড়া আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করবো এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না।...গান্ধীজী বাংলা হাংগামা বা বিশৃঙ্খলা চান না, তিনি এ সব করতে নিষেধ করেন...গান্ধীজী অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও কমা করতেই তিনি অত্যন্ত।

লিন উতাং লিখলেন—গান্ধীজী নিশ্চয়ই যুঁহ কারণ জর্জ ওয়াশিংটনের মত তিনি ইংলন্ডের শৃঙ্খল থেকে যাতৃত্বমিকে হুক্তি করতে চান...গান্ধীজী ও নেহেরু জর্জ ওয়াশিংটন ও ডিক্লেয়ারার মতই দৃঢ়চেতা লোক...আমেরিকা ও আরারল্যান্ডের উপর অতীতে যে অন্যায় করা হয়েছিল ভারতের উপরেও আজ সেই অন্যায় করা হচ্ছে। গান্ধীজী ও নেহেরু এক বিরাট শক্তিকে উদ্ভূত করে তুলেছেন...আমরা আজ গ্রীস যুগোশ্লাভিয়া ও হাঙ্গেরি জন্ত লড়াই, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার প্রতি কি আমরা জোহ হুঁজে থাকতে পারি।...ভারত এখনই স্বাধীনতা চায়, সে স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত তার সংগ্রামের শেষ হবে না।

আমাদের স্বাধীনতা

পাল' যাক লিখলেন—ভারতের সুযোগ্য স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টা, তিনি কোটি লোকের মনে আশা জাগ্রত করে দিয়েছেন।

উইলিয়াম উইলকিন লিখলেন—ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষাকে অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য একপাশে টেলে সরিয়ে দিলে শুধু গ্রেটব্রিটেনের কতি হতে না, আমেরিকারও কতি হবে।

এই সব জনমতের উত্তরে একটা কিছু বলা প্রয়োজন, সেইজন্য পার্লামেন্টে চার্লিস সাহেব বললেন—কংগ্রেস একটি বল মাত্র, এবং ভারতের মর কোটি মুসলমান, পাঁচ কোটি অশুভ্র এবং সামন্তরাজ্যের ২ কোটি ৫০ লাখ প্রজা কংগ্রেস বিরোধী... কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও গত দু'বাসে (জুলাই ও আগস্ট) আমরা যুদ্ধের জন্য সেরেখে ১ লাখ ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক পেয়েছি।...কংগ্রেসের বড়বড় ব্যর্থ করতে আমাদের মোটেই কষ্ট হয়নি, পাঁচশতেরও কম লোক প্রাণ হারিয়েছে মাত্র এবং সামান্য সংখ্যক বৃষ্টিশ কৌজকে এখানে ওখানে ঘোরাতে হয়েছে।...

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-সাহেব যিটার উইলিয়াম কিলিংস্কে পাঠালেন এসেয়ে, যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে। কিন্তু গান্ধিজী ও অহরলালের সঙ্গে দেখা করার সুবিধা তিনি পেলেন না।

বিলাত থেকে বৃষ্টিশ সরকার এক বিবৃতি প্রচার করলেন। নিজেদের কাজের একটা কৈফিয়ৎ দিলেন অগত্যবাসীর কাছে : এই প্রকাশ্য বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন গান্ধিজী। এ যুদ্ধ বৈদেশিক অধীনতা-পাশ ছিন্ন করার সংগ্রাম, অস্ত্রহীন বিদ্রোহ—সংক্ষিপ্ত, দ্রুত ও স্থানান্তরিত।...গান্ধিজী চরম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়েছেন—বতাই কয়-কতি হোক না কেন ?...এক একস্থানে এই বিপ্লব এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে সহসা মনে হবে এমন উদ্ভাব হয়ে উঠতে পারে তা বিশ্বাস করা চলে না।...সর্বত্রই হিন্দু ছাত্রেরা প্রাধান্য নিয়েছে...মুসলমানেরা কোন অংশই গ্রহণ করেনি...কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক এতে প্রধান ভূমিকা অভিনয় করেন...দিল্লী থেকে এক প্রচার পুস্তিকা ছিঁদ করা হয়, তাতে লিনলিথগো ও ওয়াডেলকে বন্দী করে ভারতীয় গণতন্ত্র ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছে।...ইত্যাদি।

আমরা ধাঁ প্রসঙ্গে গান্ধিজীকে বন্দী করে রাখা হোল। সঙ্গে ছিলেন কল্লুহা, বহামেব সেনাই, সরোজিনী নাইডু ও মীরা বেন।

বহামেব সেনাই তখন অসুস্থ, কিন্তু সবচেঁটে সে অসুস্থতা প্রাণ করলো না, সে মাদ্রাসে বৃষ্টি বছরেরও বেশী মহাত্মাজীকে একনিষ্ঠ হয়ে সেবা করেছেন, সেজেটোরী

হিলায়ে তিনি মহাদেবের বসিল হস্ত পরসেই তাঁর আশ্রয়ে বসাই বিচার না করেই তাঁকে ও কলী করতের। সাতাশ বছর বয়স থেকে দেশাইজী কিন্তু সাতদিনের মধ্যে পঞ্চদশকে মুক্তি দিয়ে গেলেন।

মহাদেব হরিভাই দেশাই বোম্বাইয়ে ওকালতি করতেন। চন্দ্রাধর সত্যগ্রহের সময় তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দেন—একা নয়, সতীক। সে ১৯১৮ সালের কথা। যথুসনে গান্ধীজী যখন কিবাণদের অর্থৈতনিক ইচ্ছা বুঝলেন তখন দেশাইজী ও তাঁর স্ত্রী সেখানে শিক্ষকতা শুরু করলেন। শেঠ ঘনশ্রামদাসও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। শিল্প সাহিত্য ও কাব্যের উপর তাঁর দখল ছিল অসামান্য, অল্পদিনেই তিনি গান্ধীজীর সেক্রেটারীর আসনটি দখল করে বসলেন। ইয়ং ইণ্ডিয়া ও হরিজন পত্রিকার সম্পাদনার ভার পড়লো তাঁর উপর। তাছাড়া সত্যগ্রহ-আজকের অভিযালা থেকে রামাধর অবধি কিছুই তাঁর পরিচয় থেকে বাত যেত না। মহাদেব সব সময়েই ছায়ার মত থাকতেন গান্ধীজীর পাশে পাশে, মেটো ঘেমন ছিলেন সেক্রেটারীর কাছে। কিন্তু সেজন্য মহাদেবের ব্যবহারে কোনদিন এতটুকু অহংকার প্রকাশ পায়নি। অসামান্য কর্মক্ষমতা নিয়ে দিনের পর দিন তিনি মহাদেবের সেবা করে গেছেন বিনিময়ে কোনদিন কিছুই চাননি। কাকর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি। পরাধীন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের সেবা করে বিদেশীর বন্দীশালায় তিনি নিজেকে নিশেষ করে দিলেন।—জাতির পরাধীনতার প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন।

তাঁর শেষ দিন সম্পর্কে গান্ধীজী লিখেছেন :

মহাদেবের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। পূর্বে কিছুই বুঝা যায় নাই। গত রাতে শান্তিতে নিদ্রা গিয়েছিল। প্রাতরাশ গ্রহণ করেছিল। আমার সঙ্গে সন্ধ্যাও করেছিল। হুশীলা ও জেলের ডাক্তাররা বথাসাধ্য করেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘের ইচ্ছা অসম্ভব। হুশীলা ও আমি দেখান করিয়েছি। প্রশান্ত মেহ পুষ্পাচ্ছাদিত, ফুলারি প্রজ্জলিত। হুশীলা ১৪ আমি গীতা পাঠ করছি। মহাদেব বোম্বাই ও দেশ প্রেমিকের মৃত্যু বরণ করেছে। দুর্গা, বাবলা ও হুশীলাকে [মহাদেবের পত্নী, পুত্র, কন্যা] বলে—কোন শোক চলবে না। এমন মহান মৃত্যুতে জুই আনন্দ। আমার সামনেই রাহের ব্যবস্থা হয়েছে। চিত্তান্ত রাখবো। দুর্গাকে আজ্ঞাযেই থাকতে বলে, কিন্তু স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে হলে সে যেতে পারে। আশা করি বাবলা সাহসীর মত মহাদেবের যোগ্যস্থান পূরণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে।

কিন্তু এই কথাগুলোই ইরাক সরকার বথাসবর মহাদেবের পরিবারবর্গের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেনি।

বন্দী-বাসের প্রাচীরে সবাইয়ের শোষণের দাপট হয়। প্রতিদিন প্রত্যেক বন্দীজীই সেখানে এসে দাঁড়াইতেন। প্রত্যেকী বুঝে সবভাবিত ব্যবস্থাকে যিনি অস্বস্তির মৌনভাষাকে হঠাৎ অস্তর দিয়ে উপহার করতে চাইতেন, বিরোধবাদী হিসেব নাখে উৎসাহ হয়ে উঠে আঁখিমালা ফুটে উঠতে চাইত কি না কে জানে!

কিন্তু চল্লিশ কোটি আর্ড নরনারীর স্বাধীনতার যিনি পুরোধা, ব্যক্তিগত গোপন দুঃখের অস্বস্তি রাখলে তো তাঁর চলবে না।

গান্ধীজী বন্দীনিবাসে। ভারতের সমস্ত স্বদেশ-প্রেমিকেরা কারা-প্রচেষ্টার অন্তরালে। ভারত সরকার এবার বীরে হচ্ছে এক বিবৃতি তৈরী করলেন। ভারত-সরকারের স্বায়ত্ব-শাসন বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী স্যার রিচার্ড টটেনহাম এক পুস্তিকা প্রকাশ করলেন—“হাকামা সম্পর্কে কংগ্রেসের দায়িত্ব”। তাতে তিনি গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে সব কিছুর জন্তই দায়ী করলেন। গান্ধীজী তার বীর্ষ উত্তর দেন, এবং টটেনহামের সমস্ত যুক্তিকে ধ্বংস করেন। ভারতীয় আন্দোলনকে গান্ধীজী জিভাবে পরিচালিত করতে চান তা এই উত্তর থেকেই ভালভাবে জানা যায়।

গান্ধীজী তখন অনশন করছেন—জীবনের আশা নেই, তথাপি সরকার তাঁকে হুক্তি দিলে, উপরন্তু সেই সময় নিজেদের দোষ খালনের জন্য সরকার পক্ষ এই বিবৃতি প্রচার করলেন। মহাত্মাজী সেই উপবাসে মেহত্যাগ করলে এই বিবৃতির উত্তর দেবার কেউ থাকতো না, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন, সেইজন্য উপবাস শেষ করে উত্তর দেবার সুযোগ গান্ধীজী পেলেন। গান্ধীজী লিখলেন :

...দে হালিলের লক্ষ্যবস্ত আমি, সেটি প্রকাশের জন্য আমার উপবাসের কালকে নির্বাচিত করা হোল কেন বলতে পারেন?...অভিযোগ পত্রের আরম্ভ হয়েছে বিখ্যা বর্ণনার সহিত।...বৃটিশ গবর্নমেন্টের প্রতিটি কাজের সম্বন্ধে ঠিক কথাই বলা হয়েছে, যে তা' ভার স্বীয় স্বার্থ ও নিরপত্তার জন্য। যৌথ আধার স্বার্থ বলে কিছু নাই—জাতীয় প্রাধান্য পাপের বদলে পুণ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। শুধু ভারতবর্ষে একথা সত্য নয়, একথা সমভাবে সত্য আফ্রিকায়, একথা সত্য ব্রহ্ম ও সিংহলে।...এই কথা যোগের দাওয়াইও কথা হওয়া উচিত। দাওয়াই আমি নির্দেশ করেছি—অন্তত ভারত থেকে আর যথোচিতভাবে সমস্ত ইউরোপীয় স্বাধিকার থেকে অবিলম্বে সমস্ত বৃটিশের প্রস্থান। বৃটিশ জনগণের এইটাই হবে সর্বাঙ্গের বিরোধিতা ও পরিহার কাজ। এতে অবিলম্বে মিত্রশক্তি সম্পূর্ণ মৈত্রিক পক্ষের উপর দণ্ডায়মান হবে। ভারতে বৃটিশ উপস্থিতিই আপনাকে ভারত আক্রমণের নিয়ন্ত্রণ জানাচ্ছে।...প্রত্যাহার

আমাদের দাবিজী

বা পরিভ্রমণ করার বৃত্ত কিছুই আমার নেই। সে সময় আমি যেমন বৃটিশ জাতির বন্ধু ছিলাম, আজও তাই আছি। তাদের প্রতি এক কথা বিশেষও আমার নেই। কিন্তু তাদের সীমা পর্বিসীমা সম্বন্ধে আমি কোনকালেও অন্ধ থাকি নাই, যেমন অন্ধ হইনি তাদের মহান গুণাবলি সম্বন্ধে। ...বৃটিশ জনগণের সহিত ভারতবর্ষের কোন বিবাদ নেই। আমার শত শত বৃটিশ বন্ধু আছেন। এগুরুষের বন্ধুত্বই বৃটিশ জনগণের সহিত আমাকে একত্র বন্ধন করার পক্ষে যথেষ্ট। ...আমি তো ক্যানিং-নাথনি শক্তি ও মিত্রশক্তির মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখি না। ওরা সবাই-ই শোষণ করে, সবাই-ই তাদের 'আর্থ' অর্জনের জন্য প্রয়োজনমত নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেয়। আমেরিকা ও ব্রুটেন অতি মহান জাতি কিন্তু তাদের মহত্ব আফ্রিকা ও এশিয়ার নির্বাক বানবতায় কলঙ্কারের সম্মুখে ধূলির যত পড়ে থাকবে। শুধু তাদেরই (ব্রুটেন ও আমেরিকা) অস্ত্রাঘের প্রতিকার করার শক্তি আছে। কলংকমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানব স্বাধীনতা বা অস্ত্র কিছু সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার তাদের থাকতে পারে না। ...বিশ্বের শান্তির জন্য, চীন রাশিয়ার জন্য, মিত্রশক্তির কারণের জন্য, ভারতবর্ষ বৃটিশ শক্তির আঁই চলে যাওয়া উচিত। ...মিত্রশক্তি আজ এক বিরুদ্ধ শক্তির ভার বহন করছে।—অবশ্যই জড়ত্ব নিয়ে এক বিরূপ জাতি পড়ে আছে ব্রুটেনের পদতলে। শুধু ব্রুটেন নয়, আমি বলবো মিত্রশক্তির পদতলে। ...মিত্রশক্তির সম্বন্ধে হতদিন পর্যন্ত ছুটি পাপ চেপে থাকবে, একটি পাপ হচ্ছে ভারতের পরাধীনতা, অপরটি হচ্ছে নিগ্রো ও আফ্রিকার জাতিগুলির দাসত্ব—ততদিন পর্যন্ত তাদের সংগ্রামের নৈতিক কারণ থাকতে পারেনা। আমি অনেক অপেক্ষা করেছি আর অপেক্ষা করতে পারি না। এই মুহূর্তে চল্লিশ কোটি নরনারীর কোন বক্তব্য থাকবে না। এটি জাতি হুমকরই ব্যাপার। আমাদের কর্তব্য সমাধা করার জন্য যদি আমরা স্বাধীনতা পাই তাহলে জাপানের অগ্রগতি রোধ করে চীনকে আমরা রক্ষা করতে পারি। যে মুহূর্তে আমরা স্বাধীন হব, সেই মুহূর্তেই আমরা এমন এক জাতিতে রূপান্তরিত হব, যে জাতি তার স্বাধীনতার প্রতিদান দেবে এবং সমস্ত শক্তি যারা মিত্রশক্তির কারণের সহায়তা করবে। ...হরিকনের ভক্ত আমি একাধিকবার এই অভিযাত্র প্রকাশ করেছি। ...আমার নিবেদন ভারতে বৃটিশ শক্তি অকলান হোক। ...এখন ভারতবর্ষ তো ক্রীতদাসমাত্র। ...বৃটিশরা যদি একে (আমার আশো-লনকে) ফুল বুকে আর তাদের হাবভাবে যদি প্রকাশ পায় যে তারা একে ধ্বংস করতে চায় তবে কলংকলের হারিষ তাদেরই, আমার নয়। কাল যে মুহূর্তে ভারত স্বাধীন হবে সেই মুহূর্তেই ব্রুটেন নৈতিক শক্তি লাভ করবে আর লাভ করবে নৈতিক করে স্বাধীন

আমাদের পাকিস্তান

এক স্বাধীন জাতির শক্তিশালী মৈত্রী। ইহা ইংলণ্ডের শক্তিকে সর্বোচ্চ ডিগ্রীতে ভুলে দেবে।...আজ ভারতবাসীর মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব নেই। তাদের মধ্য হতে উহা নিঃক্ষেপের করা হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে যদি বীজিত আনতে হয়, স্বাধীনতাকে তবে কাল নয় আজই আসতে হবে। কংগ্রেস তাই অবশ্যই অস্বীকার করবে করেংগে ইয়া করেংগে।...অহিংস-নীতি অর্থাৎ প্রতিশোধবিহীন আত্মনিগ্রহ ও স্বার্থত্যাগই হোল আন্দোলনের সঙ্গী প্রস্তাব।...এই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় হিন্দুস্থানী বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম—কিছুই গোপনভাবে করা হবে না। ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এ সংগ্রামে গোপনতা পাপ। স্বাধীন ব্যক্তি গোপন আন্দোলনে জড়িত থাকবে না।...এই বর্তমান সংগ্রামে আমাদের প্রকাশ্য কাজ করতে হবে এবং পলায়ন না করে গুলির আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করতে হবে। এই ধরনের সংগ্রামে সমস্ত গোপনতাই পাপ, অতি নিয়ম-নিষ্ঠভাবে তা অবশ্য বর্জন করতে হবে।—যে ব্যক্তি গোপনতা পাপ বলে বর্জন করেছে তাকে সেই অপরাধে অপরাধী করা, বিশেষ করে যখন সেই অভিযোগের কোন প্রমাণ নেই, কিছুটা কঠোর।...অযথা করলেও প্রমাণিত হবে না, যে আপনাকে ঠিক পথে ছিলেন; শুধু প্রমাণ হবে আপনাদের ধ্বংসের শক্তি ছিল বৃহত্তর। একথা স্পষ্টতঃ মিত্রশক্তিবৃন্দের পরেও প্রযোজ্য, যদি না তারা এশিয়া ও আফ্রিকায় অপর সমস্ত পরাধীন জনগণকে স্বাধীন করবার আন্তরিকতা ও প্রতিশ্রুতি স্বরূপ এই মুহূর্তেই ভারতকে মুক্তি দিবার স্বার্থ ছারোচিত কাজ সম্পন্ন করে।...আমার ধারণার সংক্ষিপ্ত সার :

১। আমার ধারণা শুধুমাত্র অহিংসাই ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে সক্ষম, শুধু আপনাদের বিরুদ্ধেই নয়, সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধেও।

২। আমার ধারণা বৃটেন ভারত রক্ষা করতে অক্ষম। সে আজ ভারতকে রক্ষা করেছে না, সে রক্ষা করেছে নিজেকে আর ভারত ও অন্তান্ত্রস্থানের স্বাধীনতাকে। এগুলি প্রায়ই ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

৩। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের অভিপ্রায় ছিল পরিণামে বৃটিশ শক্তির প্রস্থান, আর সম্ভব হলে সংগে সংগেই সমস্ত প্রধান দলগুলির প্রতিনিধি সহ এক অস্থায়ী গণসংসদ গঠন। প্রস্থানটা যদি গড়ি-মসির সহিত হয় তবে অরাজক কালের উদ্ভব হবে।

৪। ভারতের সৈন্যবাহিনী বৃটিশের হাট বলে স্বভাবতই ভেঙ্গে দেওয়া হবে—যদি না এটা নিজবাহিনীর অংশরূপে গঠিত হয় অথবা স্বাধীন ভারত সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ প্রদান করে।

আমাদের গাফিলত

১। মিত্রশক্তি ও স্বাধীন ভারত গবর্নেন্টের নীতিমূলক সর্বোচ্চ মিত্রবাহিনী অবস্থান করবে।

২। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে স্বাধীন গবর্নেন্ট তার সাধ্যমত সামরিক সাহায্য প্রদান করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু ভারতের দীর্ঘতম অংশে—যেখানে কোনরূপ সামরিক প্রচেষ্টা সম্ভব নয়—সেখানে জনসমবায় কর্তৃক চরম উৎসাহ-উদ্বীপনার সহিত অহিংস কর্মপন্থা গৃহীত হবে। ...কংগ্রেসের প্রস্তাবে আছে—

...ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হ'লে এক অস্থায়ী গবর্নেন্ট গঠিত হ'বে এবং স্বাধীন ভারত সমিলিত জাতিপুঞ্জের অন্ততম মিত্র হবে। ...ভারতীয় জনসাধারণের সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক এক মিশ্র গবর্নেন্ট হবে। এর প্রাথমিক কাজ হবে মিত্রশক্তির সহিত একত্রভাবে স্বীয় সশস্ত্র এবং অহিংস শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষ রক্ষা ও আক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং যাদের কাছে সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা থাকবেই সেই কবিবেকত্র, কারখানা ও অস্ত্রাংশে স্থিত কর্মীদের কুশল ও প্রগতি বর্ধন করা। ...আর গণপরিষদে ভারত গবর্নেন্টের জ্ঞাত জনসাধারণের সমস্ত শক্তির গ্রহণযোগ্য এক শাসন-পদ্ধতি রচনা করবে। প্রদেশগুলির হাতে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তাধিকার ও অবশিষ্ট ক্ষমতা স্তম্ভ থাকবে। ...গণসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে শুধুমাত্র নিজের জগ্ৰহী ক্ষমতা আহরণ করার কোন অভিপ্রায় কংগ্রেসের নেই। ক্ষমতা এখন আসবে তখন তা অবশ্যই ভারতের সবগ্রহ জনগণের মধ্যে আসবে। ...ভারতবর্ষের সর্বশক্তিমান গবর্নেন্টের মুসলীম লীগের পক্ষ-তলে আশ্রয় লওয়া নিবাজনক। এতে সেই পুরাণো সাম্রাজ্যবাদী মন্ত্র—‘বিভাগ করে শাসন করার’ উগ্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। লীগ কংগ্রেস অর্নেকটা খাঁটি ঘরোয়া প্রশ্ন। উহা যদি লীগ অন্তর্হিত না-ও হয় তবে বিদেশী প্রভুত্বের অবসান হলে নিকিৎস্রাংশে অন্তর্হিত হবে। ...বুয়র যুদ্ধ ও গত মহাসমরের সময় আমি ‘ভালো ছেলে’ ছিলাম, কারণ ব্রিটিশ গবর্নেন্টের ইচ্ছার সহিত আমার কাজের সংগতি ছিল, আজ আমি ছুটি শত্রু। আমি যে বললে গেছি তা এর কারণ নয়। এর কারণ...ব্রিটিশ গবর্নেন্টকে জাতি-প্রভু দেখা যাচ্ছে। ব্রিটিশের শুভেচ্ছায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম বলেই পূর্বে সাহায্য করেছিলাম। আজ আমাকে বাধা দিতে দেখতে পাওয়ার কারণ ব্রিটিশ গবর্নেন্টের উপর স্থাপিত বিশ্বাস অস্বাভাবিক কাজ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক। ...আমার এই উদ্ভ্রম হয়তো কর্কশ লাগবে, কিন্তু ইহাই সত্য, সযগ্রভাবে সত্য,—ঈশ্বর যে সত্য আমাকে দেখতে দেন সেই সত্য ছাড়া আর কিছু নয়।

...আমার সামনে কুজিটি আইন অমান্ত আন্দোলনের তালিকা রয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সেই প্রথমটা হতে এই তালিকার ইচ্ছা। যেগুলিতে জনসাধারণের

আমাদের শান্তি

উন্নতির বাধ ভেঙে গিয়ে পরিণামে দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের সংঘটন হয়েছে সেই উদাহরণগুলিও আমার স্মরণে আছে। যে দেশ ভূমিখণ্ডের দিক থেকে রাশিয়া-মিহীন ইউরোপের মত বৃহৎ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তর তার বিপুল আকৃতির অল্প-পাতে হিংসাকার্যের এই উদাহরণগুলি অবশ্য মন্দ হলেও মক্ষিকা দংশনের সমান মাত্র। গোপনভাবে অথবা প্রকাশ্যে হিংসাই যদি কংগ্রেসের নীতি হোত, অথবা তার পৃথল্য কম কঠিনতর হোত, তাহলে উপলব্ধি করা সহজ যে ওই হিংসাকার্য মক্ষিকাদংশনের পরিবর্তে আয়েয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সমান হোত। কিন্তু বতবার বখনই একপ দুখটনা ঘটে, ততবার তখনই সমগ্র কংগ্রেস-সংগঠন কর্তৃক সেগুলির সঙ্গে বুঝাপড়া করবার জন্য পূর্ণোচ্চয়ে ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমি নিজেই উপস্থানের আশ্রয় নিয়েছি। তাতে জনগণের মনে হিতকর ফল প্রসব করেছে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে গবর্নেন্ট যদি সরাসরি কাজের দ্বারা অনাবশ্যকভাবে জনসাধারণের ধৈর্যের বাধ না ভেঙে ফেলতেন তাহলে কোন হিংসা কাজের সংঘটন হোত না।... অহিংসা কোন মঠমন্দিরের ধর্ম নয়, শান্তি ও চরম মোক্ষের জন্তও তা পালনীয় নয়। অহিংসা হোল মহত্ত্বের সকল মর্যাদার সহিত সামগ্রিকপূর্ণভাবে সমাজের বৈধে থাকার জন্ত ও যে শান্তির জন্ত সমাজ অতীত বহুযুগ ধরে ব্যাকুল হয়ে আছে তা লাভের উদ্দেশ্যে প্রগতির পথে অগ্রসর হবার জন্ত এক সামাজিক আচার-বিধি। তাই একথা ভাবলে দুঃখ হয় যে পৃথিবীর এক অতি শক্তিমান গবর্নেন্ট এই মতবাদকে খাটো করে এর উপাসকদের (তারা যতই অসম্পূর্ণ হোক) অকর্মক করে দিয়েছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এই আগষ্ট আমি বলেছিলাম :...

‘আমি বা করেছি ও বলেছি তার মধ্যে একেবারে খাটি অহিংসা ছাড়া আর কিছু নেই। ওরাকিং কমিটির খসড়া প্রস্তাব অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রস্তাবিত আন্দোলনেরও মূল অঙ্গরূপ অহিংসায়। তাই আপনাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন, যিনি অহিংসায় আত্মহীন বা ধৈর্যহীন, তাহলে তিনি এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে বিরত থাকুন।...আমাকে এখনই কাজ করতে হবে।...আমি খিঁচা করবো না বা শুধু মাত্র চেয়ে থাকবো না—ইহা আমার ক্রমতা অধিকারের জন্ত আন্দোলন নয়, ইহা ভারতের স্বাধীনতার জন্ত খাটি অহিংস সংগ্রাম।...স্বাধীনতার অহিংস সৈনিক নিজের জন্ত কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, সে শুধু তার দেশের স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করে। স্বাধীনতা এলে কে দেশ শাসন করবে তা নিয়ে কংগ্রেসের চিন্তা নেই। ক্রমতা বখন আসবে তখন তা জনগণের অধিকারেই আসবে এবং তারাই স্থির

আমাদের সাধিনা

করবে কায় নিকট উহা স্তম্ভ করা যায়।...আমার বিশ্বাস পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের অপেক্ষা বেশী সত্যকার গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হয়নি।...অহিংসা প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে সকলের জন্যই সমান অধিকার থাকবে।’

বড়লাট, বীনবন্ধু এওরঙ্গ ও কলিকাতার বেট্রোপলিটানকে আমি বলেছিলাম—
‘আমার ভিতরের বাহা আমাকে কখনও প্রভাবিত করে নাই, তা আমাকে বলছে সারা জগৎ বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও আমাকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।...’

১০ই আগস্টের বক্তৃতায় আমি বলি অহিংসা ব্যতীত সত্যিকারের স্বাধীনতা আসতে পারে না...আমার জীবনতরীর কর্ণধার এই মূলগত বিশ্বাস ও ইহাই আমাকে আশা দেয় যে সমগ্র ভারতবর্ষ আসন্ন সংগ্রামে অহিংসার নীতি বজায় রাখবে। যদি দেখা যায় আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত তবুও আমি পশ্চাদপদ হব না বা বিশ্বাস পরিহার করবো না। শুধু বলবো—এখনও পাঠশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। আবার আমাকে চেষ্টা করতে হবে। সত্যপ্রাণের মধ্যে জুয়াচুরী বা মিথ্যার স্থান নেই। জুয়াচুরী ও মিথ্যাচার পৃথিবীতে চুপি চুপি পা কেসে আসছে। এরূপ পরিস্থিতির অসহায় দর্শক হতে আমি পারি না। আমি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করেছি।...দেশের কোটি কোটি যুক মানুষ আমার মধ্যে তাদের বন্ধু ও প্রতিনিধিকে দেখেছে। আর আমিও নিজেকে তাদের সঙ্গে অভিন্ন করে দিয়েছি। তাদের চোখে আমি যে বিশ্বাসের দীপ্তি দেখেছি তা আমি অসত্য ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তম সংস্থানে পরিবর্তিত করতে চাই। আমাদের উপর সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ বতাই হোক না কেন, এ থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে।...সমগ্র পৃথিবী বিশাল আগুনে ছেয়ে যাচ্ছে, আজ যদি এক মণে চূপ করে নিজের হয়ে বসে থাকি তবে ঈশ্বর আমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার ব্যবহার না করার জন্য তিরস্কার করবেন।...পরিস্থিতি এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে আর কংগ্রেসের ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।...রাজ্যের অবসানে যেমন দিন আসে ঠিক তেমন বিদেশী প্রভুত্বের অবসানে সাম্রাজ্যিক ঐক্য আসবে। যদি চল্লিশ কোটি জনসাধারণ স্বাধীন হয় তবে নিপীড়িত মানব সমাজের অন্তান্ত অংশও স্বাধীন হবে। আর যিহ্ন-জাতি-বৃন্দ স্বভাবতই এই স্বাধীনতার স্বাৰ্ভবাহক হওয়ার দরুন বিশ্বের নৈতিক ও অবৈতনিক নেতৃত্ব আপনা থেকেই তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে।...আমার বা কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা হিংসাকার্য কখনো বিবেচিত হয় নাই, আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, যদি কংগ্রেসীরা হিংসার দ্বারা উত্তম থাকে তাহলে তারা আমাকে তাদের মধ্যে জীবিত দেখতে পাবে না, গণ-আন্দোলন আমার দ্বারা কখনো আরম্ভই হয়নি—শুধু ইহা আরম্ভ করার সমস্ত ভার আমার উপর স্তম্ভ ছিল, সরকারের সাহিত আদান

স্বাধীনতার সাক্ষী

লোচনার কথা চিন্তা করেছিলাম। আলোচনা যার্ব হলে তখনই আলোচনার কথা ছিল, আর আলোচনার কত দুই বা তিন সপ্তাহ স্বত্বস্বীকারের কথা ভেবেছিলাম—তাই ইহা হুস্পট যে প্রেক্ষারাদি না হলে একদল গোলযোগ তৈরী না, বিগত ৯ই আগস্ট ও পরে যেমন ঘটছিল...কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী যে গমনো জনসাধারণেরই হিংসাকার্য নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাধিত হয়েছিল।... ধীনতাকে খোঁকা দেওয়া হয়েছে। কখনো হিন্দু মুসলিম অনৈক্য, কখনো ক্ষত্রবর্গের প্রতি অঙ্গীকার, কখনো তপনিলভুক্ত জাতির স্বার্থ, কখনো ইউরোপীয়দের ঐয়মী স্বার্থ, স্বাধীনতার দ্বার রুদ্ধ করেছে। বিভাগ যার শাসন—সে শেখহীন উৎস। ই আগস্টের স্বাক্ষি পর্বন্ত কংগ্রেসের সক্রিয়তা প্রস্তাবাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ই-এর প্রত্যাঘ কংগ্রেসকে কারারুদ্ধ দেখলো। তারপর যা ঘটলো তা সন্ন্যাসির বর্ষেষ্টেরই কাজের ফল...আমি একথা বলতে সাহস করবই যে, গবর্নেষ্ট যদি ঐরতব্যাপী কংগ্রেস-কর্মীদের কারা রুদ্ধ করার পরিবর্তে তাদের সেবার হুযোগ নিতেন গহলে ওই অভাব (ভারতবর্ষের অধিবাসীদের খাদ্য বস্ত্র ও জীবনের অন্তান্ত আবশ্যকীয় অভাব) একেবারে নিবারিত করা না গেলেও অনেক লঘু করা যেত।... দায়ার নিবেদন...রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়ে মুক্তির পরে দ্বারা অপরাধ সম্পাদন বা ধর্ন মূলক কাজে ধরা পড়বে তাদের বিচার করাই তাদের উচিত। তাঁদের অসীম ক্ষমতা সংগে নিয়ে অপ্রতিপালনীয় অভিযোগের আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন নেই।... ঐরিশেষে আমি যদি কোথাও ভুল করে থাকি এবং আমার ভুল যদি আমাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়, আমি সানন্দে নিজেকে সংশোধন করবো। আমি যা বোধ করেছি, তাই ঐরলভাবে লিখে গেছি।

টর্টেনহাম এর উত্তর দিল—আলোচ্য পুস্তিকাটি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়েছে, আপনাকে সংশয়যুক্ত করা বা আপনার নিকট থেকে বৃত্তি তর্ক বের করে আনার উদ্দেশ্যে নয়...আপনার সহায়ত্বূতি কোথায় তা হুস্পট।...আপনার বন্দীস্থের কারকের পরিবর্তন নাহলে গবর্নেষ্ট আপনাকে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুবিধা প্রদান করতে প্রস্তুত নন।...

গান্ধীজী লিখলেন—আমার প্রত্যাশার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে,...আমার নির্দোষিতা গবর্নেষ্টকে বিশ্বাস করানতে পারা যায় নি। ...অভিযোগগুলিকে যে শুধু সবভালি একসঙ্গে স্বীকার করেছি তা নয়, পক্ষান্তরে গবর্নেষ্টের বিরুদ্ধেও পাল্টা অভিযোগ এনেছি। এই হেতু আমি মনে করি উত্তর পক্ষের অভিযোগ একটি নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করার ব্যাপারে তাঁদের সম্মত হওয়া উচিত।...

আমাদের গান্ধিজী

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ক্রমতামতের কাছ থেকে সত্য ও স্বেচ্ছাচারের যোগ্য মূল্য কোনদিনই পাওয়া যায় না।

মহাত্মাজীকে বন্দী করার পর বিশ্বের চিন্তাশীল মণীষীরা যেভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন তাতে আশ্চর্যের স্থান নেই। ভারত সরকার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তোলে। সংবাদপত্রে সেই সব অভিযোগ পড়ে গান্ধিজী বড়লাটকে লেখেন—

‘যেহেতু লক্ষ্য ভারত গবর্নেন্ট ও আমাদের একই।... ভারত গবর্নেন্ট যেন করেন এই লক্ষ্যের অমলাভের জন্য ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই। আমি ঠিক বিশ্বাসী হই যে... আমি নিজেকে ছ’মাসের সময় দিয়েছিলাম। সময়টা শেষ হয়ে এসেছে। আমার মৈত্রীর অবস্থাও তাই। কিন্তু আমি জানি সত্যগ্রহের নীতি এই সব পরীক্ষার মুহূর্তে প্রতিকার নির্ধারণ করে। এক কথায় ইহা ‘উপবাসের দ্বারা দেহ ক্রমশঃ দুর্বল করা’। আমার ওই একই নীতি শেষের আশ্রয় ছাড়া অন্য কোনো ভাবে এর ব্যবহার নিষেধ করে। এড়াতে পারলে আমি ইহা নিতে চাইনা।... বেদনার শাস্তি-কর ঐশ্বর্য না পেলে আমি সত্যগ্রহীর জন্য নির্দিষ্ট নীতি অর্থাৎ সামর্থ্য অনুযায়ী উপবাসের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব। ২৫ ফেব্রুয়ারীর প্রাত্যহিক প্রাতঃরাশের পর শুরু হয়ে ২৫ মার্চের প্রাতে উহা শেষ হবে। সাধারণতঃ উপবাসের সময় আমি লবণসহ জল গ্রহণ করি। কিন্তু ইদানীং আমার পদ্ধতিতে জল নিষিদ্ধ। এইবার তাই জল পানযোগ্য করবার জন্য লেবুর রস মেশাবার প্রস্তাব করছি। কারণ আমৃত্যু অনশন করার পরিবর্তে ঐশ্বর্য করেন তো পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়াই আমার ইচ্ছা। গবর্নেন্ট সাহায্যাদির ব্যবস্থা করলে উপবাস আরো শীঘ্র শেষ হতে পারে।... এক পরীক্ষাশীল গবর্নেন্টের প্রতিনিধি আপনি ও এক নগণ্য ব্যক্তি আমি—আমাদের মধ্যে কে দেশ ও মানবতার সেবা করবার প্রয়াস পেয়েছে, ভাবীকালের মানুষ ভবিষ্যতের মধ্য দিয়াই তা নির্ণয় করবে।

টটেনহাম তার উত্তরে জানালো—‘যদি আপনি বন্দী অবস্থায় উপবাস করতে চান তবে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ও নিজের ঝুঁকিতে তা করতে পারেন।...’

গান্ধিজী অনশন শুরু করলেন। কাছে ছিলেন কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু ও বীরা বেন। ভাতার গিল্ডার ছিলেন রোরোডা জেলে, তাঁকে নিয়ে আদালত হোল পুনরায় বন্দীবাঁধে।

বাহিরে বন্ধন খরচ গিয়ে পৌছালো, তখন গান্ধিজীর স্বাস্থ্য খারাপের বিবেচনায় ছাড় দেওয়া হল—বন্দি ভাব, রাগে মুগ্ধ নেই। ক্রমে স্বাধীনতা আরো বেড়ে গেল,

আমাদের গান্ধিজী

ভা বে জলটুকু তিনি পান করতেন, তাতেও কষ্ট হতে লাগলো। চারিদিক থেকে দাররা ছুটে গেলেন—কলিকাতা থেকে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, ডাক্তার হুশীলা রায়, বোম্বাই থেকে সার্জেন জেনারেল মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডি। নাক, কান, গলায় গরুর এসে গান্ধিজীকে পরীক্ষা করলেন। সারা ভারতের জনগণের উৎকর্ষা শাস্তার জন্য সকাল বিকালে ছ'জন ডাক্তারের স্বাক্ষর দিয়ে গান্ধিজীর স্বাস্থ্য-সংবাদ বণা করার ব্যবস্থা হোল,—ডাক্তার গিলডার, মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডি, ডাক্তার চান্দ্র রায়, লেকটেণ্ট ক্যাপ্টেন ডাণ্ডারী, ডাক্তার হুশীলা রায়, লেকটেণ্ট ক্যাপ্টেন শা। বোম্বাই সরকারের উপদেষ্টা ব্রিটো সাহেব এলেন গান্ধিজীর অবস্থাটা হুঁচ দেখবার জন্য।

২১শে ফেব্রুয়ারী গান্ধিজীর অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে উঠলো। বেলা ৪টার সময় নি মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। ধমনীর গতি অল্পভব করা যায় না।

পরদিনও অবস্থা বিশেষ ভালর দিকে গেল না, ইউরিয়ামের ভাব দেখা গেল। আর বুঝি গান্ধিজী আর বাঁচেন না। সারা ভারত থম্‌থম্‌ করতে লাগলো, বড়লাটের দ্বার থেকে তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন—হামি মুদী, নলিনীরঞ্জন সরকার ও দ্বব শ্রীহরি আনে।

২৫শে গান্ধিজীকে গরম জলে গা মুছিয়ে গাজ-মর্দনের ব্যবস্থা করা হোল, কিন্তু খাপি অবস্থা বিশেষ কিছু ভালর দিকে গেল না।

২৭শে তারিখে তিনি লোক চিনতে পারলেন না। কিন্তু ডাক্তারদের তিনি হরোধ করেছিলেন যখন তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়বেন তখন যেন তাঁরা জোর করে ফান কিছু না করেন, সেইজন্য গান্ধিজীর মুখ থেকে যখন লালা বরতে শুরু করলো তখন ডাক্তাররা কিছুই করতে সাহস পেলেন না, উপরন্তু গান্ধিজী এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন, তাঁর মানসিক শান্তি নষ্ট করতেও ডাক্তাররা শঙ্কিত হয়েছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিলাতে চার্লস সাহেবের কাছে 'তার' করলেন—হামি এই শেষমুহুর্তে আপনার কাছে আবেদন করছি মহাস্বাস্থ্যজীকে মুক্তি দিন।... গান্ধিজীর স্বৃত্য ঘটলে ভারত ও ইংলেণ্ডের মধ্যে যে হৃদয়তার সম্ভাবনা আছে তা চরদিনের মত নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু মুক্তি দেবার জন্য বুটিশের তখন বোটাই আগ্রহ ছিল না।

শোনা যায় এই সময় ভারত সরকার মহাস্বাস্থ্যজীর স্বৃত্য অবধারিত মনে করে পুণ্য প্রচুর চক্ষন কাঠ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

আমাদের গান্ধিজী

কিন্তু কুটিশ প্রকৃতির ইচ্ছা সকল হোল না, গান্ধিজীর অবস্থা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ হ্রাস হোল। ৩রা মার্চ সকাল ৯টায় তিনি বথন অনশন শেষ করলেন, তখন সমস্ত অসুস্থতা তিনি জয় করেছেন, শুধু দৈহিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বললেন—গান্ধিজী আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছেন। স্বভাবের অত্যন্ত কাছে গিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন।

উপবাস শেষ করে গান্ধিজী বললেন—জানিনা, ভগবান কেন আমার জীবন রক্ষা করলেন, সম্ভবতঃ তিনি আমাকে দিয়ে আরো অনেক কাজ করিয়ে নিতে চান।

এই উপবাসের সময় গান্ধিজী দৈনিক সাড়ে সাত পো জল খেতেন, তাতে তিন ছটাক নেবুর রস মিশানো থাকতো। কিন্তু সময় সময় জল পান করলেই বমি হবার উপক্রম করতো, তখন কিছু পটাসিয়াম সাইট্রেট, অথবা সোডিয়াম সাইট্রেট খুলে মিশিয়ে নিতেন। কিন্তু এই সামান্য জল দেহের ক্ষয় পূরণের কোন সহায়তা করতে পারে না, গান্ধিজীর দেহের ওজন চৌদ্দ সের কমে গেল,—একমন সাড়ে চৌদ্দ সের থেকে এক মন আধ সের।

সারা ভারত ভগবানের কাছে গান্ধিজীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করলো।

গান্ধিজীর এই অনশন শুধু এদেশে সাড়া তোলে নি, বিলাতে ও আমেরিকাতেও সোরগোল তুলেছিল, চার্চিলের দল সেখানে বেসব প্রোপাগান্ডা করতো লুই কিশার, এডগার স্নো, বার্নার্ড শ', প্রভৃতির বিরূতি সেই কুটিলতার জাল ছিন্ন করে ফেলে। ভারতের অনেক নরনারী সহায়কৃতি জানিয়ে আট-দশ দিন আহার করেননি, আমেরিকাতেও অনেক লোক একদিন অনশন করেছিলেন।

বার্নার্ড শ' তো একদিন স্পষ্টই বলে দিলেন—গান্ধিজীকে বন্দী করে রাখা গবর্নমেন্টের পক্ষে মর্যাদার চরম পরিচয়। হিটলারের বিরুদ্ধে আমরা যে নৈতিক কাহিন্য দেখাই এ ঘটনাটি ত্রা একেবারে মুছে দিচ্ছে। রাজ্যের উচিত বিনাস্তে গান্ধিজীকে ছেড়ে দেওয়া এবং তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর যে মানসিক পন্থতা দেখা দিয়েছে সেজন্য গান্ধিজীর কাছে ক্ষমা চাওয়া। তবেই ভারতের কাছে আমাদের মুখ থাকবে।

কিন্তু সহজ কথা চাটিল সাহেবকে বোঝানো শক্ত—উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শাস্তয়ে—চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী—যদি ভারতের এক অর্ধ-নর ককিরের কাছে রাখাই নোয়াতে হোল, তাহলে কিসের ভয় এতো লৈল আর জলি সোলা কাহান রাখা ?

স্বাধীনতার গান্ধী

বন্দীবাগে কস্তুরবা' অস্থায়ী হয়ে পড়লেন। তাঁর বাসনানী কুলে উঠলো, আর তারই সঙ্গে দেখা দিল ক্রাকাইটস্ আর বুকস্ বহুশা। চৌধুর পাভাগুলি কুলে উঠলো, জন্মসন্ম উঠলো ১৮০ বার। ডাক্তার গিলডার ও ডাক্তার নায়ার জেলের অধ্যক্ষকে লিখলেন তাঁর কাছে একজন সেবিকা রাখার অন্ত।

কিন্তু কষ্টপূর্ণ সে ব্যবস্থা করলেন না, গৌড় কাছ গান্ধীকে একদিন অন্তর কস্তুরবা'র সঙ্গে দেখা করার অস্থায়িত্ব দিলেন যাত্র। কিন্তু যখন প্রতিদ্বন্দ্বের অন্ত সেবার প্রয়োজন তখন একদিন অন্তর একজনকে অল্পকালের অন্ত দেখা করতে দেওয়ার কোন মানে হয় না।

যায়ের অস্থায়িত্ব বড়ছেলে হরিলাল এলেন দেখা করতে, কিন্তু ঢুকতে পেলেন না। দেখতে দেখতে অবস্থা খারাপ হতে লাগলো, একদিন রাতে ঘুম কষ্ট হয়ে গেল। বাস নিতে কষ্ট হতে লাগলো, ঘমনীর গতি হয়ে এলো দুর্বল। সেহবর্ণ তখন দুশর। ডাক্তার নায়ার ও ডাক্তার গিলডার সেইখানেই বন্দী ছিলেন, তাঁদের চেষ্টা কুড়ি মিনিট পরে কস্তুরবা' কিছুটা সুস্থ হলেন। ডাক্তার দু'জন জানালেন—ডাক্তার জীবরাজ যেহতা ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে একবার দেখানো দরকার।

কিন্তু সরকার সেদিক থেকে কোন চেষ্টাই করলো না।

গান্ধীজী তখন অস্থায়ী—শয্যাশায়ী। তাঁর রক্তের চাপ ১০৬/১১০। সেই অবস্থাতেই তিনি অনেক চিঠিপত্র লিখে সরকার থেকে অস্থায়িত্ব আদায় করেন যে, একজন সেবিকা থাকবে, ডাক্তার জীবরাজ যেহতা রোগিনীকে দেখবেন, আত্মীয়রা এসে দেখা করতে পারবেন এবং বৈষ্ণুরাজ শিবশর্মা রোগিনীর চিকিৎসা করবেন।

কিন্তু কদিন সেবা করার পর সেবিকা বুঝতে পারলেন যে তাঁর একার পক্ষে রীতিমত সেবা করা সম্ভব নয়, তিনি বিদায় নিলেন, তার স্থান দখল করলেন কাছ গান্ধী, গিলডার ও নায়ার।

জেলের কর্তাদের কড়া হুকুম ছিল বৈষ্ণুরাজ অথবা ডাক্তার জীবরাজ রাতে বন্দী-বাগে থাকতে পারবেন না, ফটকের বাইরে ঘোটারে তাঁরা সারারাত বসে থাকতেন, অস্থায়ী বাড়লে রাতে সেইখান থেকে তাঁদের ডেকে আনা হতো।

কবিরাজী চিকিৎসার কোন ফল হোল না। রোগিনীর অবস্থা কষ্ট হয়ে এলো।

গান্ধীজী অস্থায়ী দেখে নিয়ে এসে বসলেন রোগিনীর পাশে। কয়েকটি রাত্রি ছুটকট করে রোগিনীর কেটে গেল। সারাজীবনের কঠিন নিষেধ এতটুকু মিথিল হোল না। চূড়ান্ত বছরের কষ্টা স্বাধীন কোলে বাঁধা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শিব-

আবাহনের গাঙ্গিলী

চতুর্থীর বন্ধা তখন রাত্রির অন্ধকারে ঘন কালো হয়ে উঠছে (সন্ধ্যা ৭-৩০ কি, ২২শ-সেপ্টেম্বরী ১৯৪৪)।

জারতের জনগণ-মন-অধিনায়ক, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাহুব অহুহ দেহ নিয়ে চূপ করে তাকিয়ে রইলেন, সাম্রাজ্যবাদীর কঠিন কারাগারে তাঁর জীবন-গঙ্গিনী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, উপযুক্ত সেবা ও যোগ্য চিকিৎসা করে শেষ মুহূর্তে তাঁর বাতনার এতটুকু লাঘব করতে পারলেন না, সারা জীবন অহিংসা ও মানবতার অহুশীলন করেও সাম্রাজ্যবাদীর লোভ ও নিষ্ঠুরতা তিনি জয় করতে পারলেন না। যারা একাগ্র চিত্তে তাঁর সেবা করলো, যারা নিজেকে সমর্পণ করলো তাঁর হাতে, তাঁর চোখের সামনেই তাঁরা ভিল ভিল করে মৃত্যু বরণ করলো, তিনি তাঁদের রোগবজ্রা উপশম করার জন্য সামান্ত কিছু করতে পারলেন না। নিজের এই অক্ষমতার কথাই গাঙ্গিলীর চিত্তকে ধোলা দিচ্ছিল কি না কে জানে। তাঁর চোখে জল এসেছিল কী। কালো আকাশের পানে তাকিয়ে, বাইরের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে গাঙ্গিলী বোধ হয় ভাবছিলেন—কত রুবা গেল, মহাদেব গেল, মতিলাল গেল, লক্ষণ গেল, যতীন্দ্রমোহন গেল, শেখবদু গেল, ভিলক গেল, গোখলে গেল... আরো কত গেল—‘এর বত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা ?

অর্গ কি হবে না কেনা—

বিখের ভাগ্যী শুধিবে না

এত ধণ

রাত্রির তপস্তা সে কি আনিবে না দিন

নিদারুণ দুঃখরাতে

মৃত্যুঘাতে

মাহুধ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা

তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা।’

কিন্তু শোক করার অবসর তখন কোথায়, শেষকৃত্যের জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করলেন—আমার পুত্র ও আত্মীয়দের হাতে মৃতদেহ সমর্পণ করা হোক।

কিন্তু সে অনুরোধ গবর্নেন্ট রাখলেন না।

মহাদেব দেশাইয়ের দেহ যেখানে ভরীকৃত করা হয়েছিল তারই পাশে কত রুবার শেষ-কাজ সমাধা হোল। ঘোঁরাই কুণ্ডলীর মাঝে ধরতীর সঙ্গে দেহের সব লক্ষণ শেষ হয়ে গেল, গাঙ্গিলী শুধু হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তদ্রূপে শেষ পানে তাকিয়ে তাঁর বীরে আন্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—‘আত্মা হয়তো অল্পকৃতি উপলব্ধি করতে পারে।’

স্বাধীনতার স্বাক্ষর

দেশবাসী শোকে ভরা হয়ে গেল। স্বাধীনতার এই ঘাট কত রূপে শোক-বিষ পালনের আবেশন করলেন। কত রূপে স্বাধীনতার স্বাক্ষর করার জন্য কত রূপে আত্মত্যাগ খোলা হোল। পাঁচাত্তর লাখ টাকা সংগ্রহ করার কথা হোল, কিন্তু দেশবাসী যেহেতু ছিল এক কোটি কুড়ি লাখ টাকা। টাকাটা ভারতের নারী জাতির কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে।

এই শোকের মধ্যেও বৃহৎ সত্যপ্রাণীকে সত্যপ্রাণীরা স্বাক্ষর দিল না। তার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী আমেরিকায় ভারত সরকারের হয়ে লাকাই গাইলেন—ভারত গবর্নেন্ট বহু বার কত রূপে স্বাক্ষর দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু স্বাক্ষরকে ছেড়ে যেতে তিনি চাননি। সরকার তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাননি। তার উপর ওই একই বাড়ীতে একজন নামকরা ডাক্তারও ছিলেন, কত রূপে তাঁর সেবা শুশ্রূষার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন...

বিলাতের কমন্স-সভায় বাটলার সাহেব বললেন—কত রূপে স্বাক্ষর কোন অসুযোগ পাওয়া যায়নি এবং ভারত সরকার বিশ্বাস করেন যে তাঁকে আগাখাঁ প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরিত করা তাঁর পক্ষে বা তাঁর পরিবারের পক্ষে কখনো সম্ভব হোত না...আমি সংবাদ পেয়েছি যে, মিটার গান্ধীর অসুযোগে পুনঃস্থিত আগাখাঁ প্রাসাদের প্রাঙ্গণে অন্ত্যেষ্টিক্রম সম্পন্ন হয় এবং বহু ও আত্মীয়-স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।...

গান্ধিজী আর সহিতে পারলেন না, তিনি সত্যপ্রকাশ করার জন্য পর পর কয়েকখানি চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি বললেন—গবর্নেন্টের প্রদত্ত সংবাদ সমগ্রভাবে ভ্রান্ত। আমাকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হলেও যে আমি পবিত্র অশ্বিনভূমির পরিবর্তে এই কারাগারপ্রাঙ্গণে আমার শ্রমের দাহ কার্য সমাধার সম্মত হব ইহা ধারণা করা যায় না... এই সমস্ত ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে গবর্নেন্টকে লেখা আমার পক্ষে সুখকর বা সহজ নয়। কিন্তু যিনি বাট বছরেরও অধিক দিন আমার বিশ্বস্ত সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর স্বাক্ষর জন্মই একথা লিখছি।...

কিন্তু অগত্যা কালে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করাই যাদের নীতি তারা সত্যকে গ্রহণ করবে কেন! স্যার রিচার্ড টটেনহাম শেষে উত্তর দিলেন—ভারত সরকার আপনার পত্রগুলি হৃৎকষের সঙ্গে পাঠ করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আপনি যে অভিযোগগুলি করেছেন, তাঁদের বিশ্বাস, নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা সেগুলি প্রমাণিত হবে না। সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট জাতি যেন করেন যে তাঁদের নিকট প্রেরিত অসুযোগগুলি রক্ষা করতে যৌক্তিকতার দিক থেকে জাতি যে কল্যাণের প্রচেষ্টা করেছিলেন তার

আমাদের স্বাধীনতা

ভারোচিত বীজটি এই শোকের সময় আপনার নিকট থেকে প্রত্যাশা করা সম্ভব হবে না। এক-একটি পত্রালাপ চালিয়েও কোন প্রয়োজনীয় উদ্বেগ নিব্ব হবে না।

বন্দীবাসে মহাস্বামী মহালেবিদ্যা দেখা গিল। খুস,খুসে অর তারই সঙ্গে আমায়।
শোক ও নিঃসঙ্গতা তাঁর মন ও শক্তিকে বিষাদক্সিত করে তুললো।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কি একটা কাজে গিয়েছিলেন বোঝাইয়ে, বোঝাই সরকারের অল্পরোধে তিনি গাভিজীকে দেখতে গেলেন পুনায়। ডাক্তার বিধানকে দেখে গাভিজী খুশি হলেন, কিন্তু চিকিৎসা করার কথা শুনে বললেন—ডাক্তার বিধান, তোমার চিকিৎসা তো আমি নিতে পারবো না।

বিধানচন্দ্র বিস্মিত হলেন, বললেন—আমার অপরাধ কি জানতে পারি না?

গাভিজী বললেন—আমার দেশের চল্লিশ কোটি দীন দুখীর অস্থখে তুমি বধন চিকিৎসা করতে পার না, তখন আমিই-বা তোমার চিকিৎসা নেব কেন?

বিধানচন্দ্র বললেন—এই কথা! মহাস্বামী, আমি চল্লিশ কোটি নরনারীর চিকিৎসা করতে পারিনি এ কথা সত্যি, কিন্তু এই চল্লিশ কোটি নরনারীর যিনি আশা-ভরসা, চল্লিশ কোটি পরাধীন যাহুয ধীর মূখের পানে চেয়ে আছে, চল্লিশ কোটি নরনারীর দুখ লাঘবের ভার ধীর হাজে, যিনি বাঁচলে চল্লিশ কোটি বাঁচবে, ধীর যুতুতে চল্লিশ কোটি মরবে, তাঁর চিকিৎসার ভার সেই চল্লিশ কোটি নরনারী আমার উপর দিয়েছে, আপনি 'না' বললেই বা আমি শুনবো কেন?

গাভিজী বললেন—কিন্তু ডাক্তার বিধান, তোমার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা তো আমি নিতে পারি না।

বিধানচন্দ্র বললেন—মহাস্বামী আপনি তো বলেন যে—পৃথিবীর সব কিছু—
এমন কি খুলিকণাটি পর্যন্ত ভগবানের সৃষ্টি—একথাটা কি সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন?

মহাস্বামী বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, সমস্তই ভগবানের সৃষ্টি!

—তাহলে মহাস্বামী এলোপ্যাথি চিকিৎসাও কি তাঁর সৃষ্টি নয়?

গাভিজী এবার হেসে ফেললেন, বললেন—তোমার উকিল কি ব্যারিষ্টার হওয়া উচিত ছিল, তুমি কেন যে আইনজীবী হওনি আমি তাই ভাবছি।

—ভগবান আমাকে আইনজীবী না করে চিকিৎসাজীবী করেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে এমন একদিন আসবে যেদিন তাঁর সব-সেবা ভক্ত বোহনদাশ করবর্তী মহাস্বামীর চিকিৎসার ভার পড়বে আমার উপর। উকিল ব্যারিষ্টার হয়ে হরতো আমি অনেক বেশী টাকা উপার্জন করতে পারতাম, কিন্তু ভগবানের প্রিয়তম সন্তানের

চিকিৎসা করার পৌঁছানো তো সেজন্য না। এই কাজই জরুরি আমাদের কাছে।
হয়েছে।

বহাওয়ালী হলে উঠলেন, বললেন—তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই, তুমি কি
কুখ্য দেখে পাও, বাই!

এলোপ্যাথিক মতেই সেবার গান্ধীজীর চিকিৎসা হোল, এবং কদিনের মধ্যেই
বদানচন্দ্র তাঁকে নিরাময় করে কলকাতায় ফিরলেন।

বন্দীশালায় গান্ধীজীর জন্ত কি রকম খরচ-পত্র হচ্ছে সেই সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিব
কদিন এসেছিলেন বলে বললেন—আগা খাঁর প্রাশ্নাদে মিঃ গান্ধী ও অন্যান্য সহ অন্তরীণ-
দের ব্যয়ভার মাসিক পাঁচশো পঞ্চাশ টাকার মত।

খবরের কাগজে কথাটা পড়েই গান্ধীজী গবর্নমেন্টের কাছে লিখলেন—বে বৃহৎ
নে বহু সংখ্যক বন্দী বেষ্টিত অবস্থায় আমাদের আটক রাখা হয়েছে আমার মতে
সাধারণের অর্থের অপচয়। যে কোন কারাগারে থাকতে পেলেই আমি সম্পূর্ণ খুশি
কিবো।...সঙ্গীগণ ও আমার জন্ত ব্যয় শুধুমাত্র মাসিক সাড়ে পাঁচ শো টাকাই নয়।
ই বিরাট স্থানটির (বার একটি অংশমাত্র আমাদের নিকট উন্মুক্ত) ভাড়া এক
রাট দেহবন্দীর দল ও সুপারিনটেন্ডেন্ট জমাদার ও সিপাহী সহ আভ্যন্তরীণ কর্মচারী-
দের ব্যয় ভারও এর সঙ্গে যোগ করা উচিত। এবং এর সঙ্গে আরো যুক্ত হবে আভ্য-
ন্তরীণ বাসিন্দাদের তদারক ও উত্তান পরিচর্যার জন্ত নিয়োজিত যেরোডা থেকে আনীত
একদল আসামীর ব্যয়ভার। সত্যত, এই ব্যয় বহনের সবটাই আমার মতে
পূর্ণরূপে অনাবশ্যক। আর জনসাধারণ যখন অনাহারে বৃত্তান্তে তখন উহা
ভারতের জনসাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ। গবর্নমেন্টের নির্বাচন মত যে কোন সাধারণ
কারাগারেই আমাদের ও আমার সংগীদের স্থানান্তর করবার অহরোধ করছি।
বিশেষে এই ব্যয়ভারের সবটুকুই ভারতের কোটি কোটি লোক হাজারের নিকট হতেই
সংগৃহীত হয় ভেবে আমার বিষম চিন্তকে অবলম্বন করে রাখতে পারছি না।

সরকার এ সম্পর্কে কোন সাড়া দিলেন না। সন্তোহ হুই বামে গান্ধীজী আবার
ধলেন—এই বন্দীশালায় অন্তরীণদের অন্ত কোন কারাগারে (সেখানকার খরচ
নিয়ন্ত্রণ করে কম হবে) পাঠাবার অহরোধ করে গত ৪ঠা মার্চ একখানি পত্র
লেখিলাম। এই বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই চিঠি পাঠাবার হ'ল সন্তোহ পরে এই যে সকাল বেলা জেলখানার ইন্সপেক্টর-

আমাদের গান্ধিজী

জেনারেল এসে গান্ধিজীকে বললেন—আপনার শরীর-গতিক কেমন? ট্রেনে বা মোটর গাড়ীতে শ'খানেক মাইল যেতে পারবেন?

প্যারিলাল ও আর দু'একজন বীরা সেখানে ছিলেন, একথা শুনে তাঁরা চমকে উঠলেন, তবে কি গান্ধিজীকে অস্ত্র কোন বন্দীবাসে স্থানান্তরিত করা হবে? কিন্তু কেউই কোন প্রশ্ন তুললেন না। ইনসপেকটর-জেনারেলও কিছু বললেন না।

সন্ধ্যাবেলা টোর সময় ইনসপেকটর-জেনারেল আবার এলেন, বললেন—বহাদ্দারী কাল সকাল আটটার সময় আপনি বিনা সর্তে মুক্তি পাবেন।

গান্ধিজী বললেন—আপনি কি ঠাট্টা করছেন?

—না! হুমু এসে গেছে। সকাল আটটার পর এখানে আর কোন শাস্ত্রী থাকবে না, আপনি ইচ্ছা করলে এখানেও থাকতে পারেন। কিন্তু আপনার পক্ষে এখানে না থাকাই ভালো, এখানে সৈনিকদের সব ঘাঁটি রয়েছে, যারা আপনার দর্শন পেতে আসবে তাদের সঙ্গে সৈনিকদের সহসা কোন হাংগামা বেধে যেতে পারে।

মুক্তি অপ্রত্যাশিত। গান্ধিজী বারেক কি যেন ভাবলেন, তারপর লম্বুকাটে বললেন—আমার গাড়ী ভাঙার কি হবে?

—চলে বাবার সময় নিশ্চয়ই আপনি গাড়ীভাড়া পাবেন।

ইনসপেকটর-জেনারেল চলে গেলেন, গান্ধিজী গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

প্যারিলাল পাশেই বসেছিলেন, সহসা কোন একসময় গান্ধিজী প্রশ্ন করলেন—আমার স্বাস্থ্য খারাপ বলেই কি এরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে?

তারপর নিজেরই তার উত্তর গিলেন—যাক যেকন্ডাই ছাড়ুক, ওরা বা বলছে তাই সহজভাবে গ্রহণ করা ভালো! তোমরা আটটার আগেই তৈরী থেকো! আটটার পর আর তোমাদের এক মিনিট সময় যোব না।

গান্ধিজী সাত বছর বন্দী থাকার কষ্ট প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু টিক একুশ মাস পরে তিনি মুক্তি পেলেন।

সারা রাত জিনিষ পত্রর বাধতেই কেটে গেল। গান্ধিজী চুপ করে বিছানায় পড়ে রইলেন, চোখে দু' নেই, বত রাজ্যের চিন্তা ভীড় করে এলো তাঁর মাথায়—জরীপ কোটি নরনারীর দুঃখ ও দারিদ্র্যের দুর্ভাবনা।

রাত কেটে গেল, দিনের আলো পূর্ব গগনে ফুটে ওঠার আগেই লকলে জ্বান শেষ করে প্রার্থনার সমবেত হলেন।

তারপর গান্ধিজী গবর্নমেন্টের কাছে লিখলেন, আবেদন জানালেন—শ্রীমহাদেব দেশাই ও আমার জীব বাহুস্থানটি পবিত্র ভূমি, বন্দীর মল প্রত্যাহ দু'বার স্থানটি পরিদর্শন

আমাদের গান্ধিজী

যে স্বর্গতঃ আশ্রয় উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ প্রদান করতেন।...আমার বিশ্বাস গবর্নেন্ট এই নটি দখল করার ও তৎসহ মহাত্মা আগা খাঁর প্রাংগণ মধ্য দিয়া গমন অধিকারও দায় করবেন, যাতে বন্ধু ও স্বজনবর্গ ইচ্ছামত সমাধি-ভূমি পরিদর্শন করতে রেন। গবর্নেন্টের অচ্যুতি সাপেক্ষে আমি পবিত্র স্থানটির রক্ষা ও প্রাত্যহিক প্রার্থনার দাব্য করতে ইচ্ছাকরি। আশা করি আমার অনুরোধ অন্তিমায়ী গবর্নেন্ট বিস্ত্রক পক্ষ গ্রহণ করবেন।*

সাতটার সময় গান্ধিজী এসে দাঁড়ালেন সমাধি-স্থানে, কস্তুরবা ও মহাসেবকের গানভূমিতে শেষ পুষ্পার্ঘ তুলে দিলেন। আর তিনমাস আগে তিনি মৃত্তি পেলে সুরবাকে সঙ্গে নিয়েই তিনি স্মৃতিতে পারতেন।

‘হাররে হৃদয়, তোমারি সক্ষর

দিনান্তে নিশান্তে

তুণু পথপ্রান্তে

কেলে যেতে হয়.....’

পৌনে আটটার সময় ইনেসপেকটর-জেনারেল মোটার নিয়ে এলেন।

টিক আটটার সময় প্রাসাদ বেষ্টিত কাঁটা তারের বেড়া পার হয়ে গান্ধিজীর গান্ধী থামলো; পুলিশ অপেক্ষা করছিল, ডাক্তার হুশীলা নায়ারের হাতে একখানি মনামা জারী করলো: ‘আগা খাঁ প্রাসাদের কোন কথাই তিনি প্রকাশ করতে রবেন না।

পূর্ণহুটির দিকে মোটার ছুটলো, গান্ধিজী চূপ করে বসে রইলেন। আজ তিনি হারা, একান্ত আপনার দুঃজনকে তিনি শিছনে কেলে রেখে চলেছেন। কোন সময় বলে উঠলেন—এর চেয়ে মহত্তর মৃত্যু হয় না। বা’ ও মহাসেব স্বাধীনতার মূলে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা অমর হয়ে রইলেন। কারাগারের বাইরে ল এ গৌরব কি তাঁরা পেতেন?

* গবর্নেন্ট এই আবেদনের উত্তরে জানিহেলেন—ভূস্বত্বিকার আইনের বলে গবর্নেন্টের পক্ষে বাধ্যতা-মূলকভাবে দখল করা আইনভঃ অসম্ভব। গবর্নেন্টের মতে উহা আপনার ও মাত আগা খাঁর মধ্যে ব্যক্তিগত আলোচনার বিষয়...

প্রাসাদটি সাময়িক কড়পক অধিকার করে। শেষে অনেক লেখালেখির পর গবর্নেন্ট ার—প্রতি রবিবার সমাধি-ভূমি পরিদর্শন করা চলেতে পারে। অল্প দিন সমাধি-ভূমি র্দর্শন-কামী ব্যক্তিকে আগা খাঁর প্রাসাদস্থিত ৩৩ সংখ্যক ডিভিসনের কামাডার-জেনারেল ায়ের নিকট আবেদন করতে হবে।

আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজীর শরীর তখনও ভালো সারে নি। নিউজ কনিকিলের সাংবাদিক গেল্ডার সাহেব এলেন গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করতে, এবার গান্ধিজী কি করবেন সেই সম্পর্কে আলোচনা হোল, গান্ধিজী কথার কথায় বললেন—আইন অমান্ত আন্দোলন হুক করার ইচ্ছা আমার নেই, আমি আবার উনিশ-শো-বিয়াল্লিশ সালে কিরে যেতে চাই না। ইতিহাসকে পুনরাবৃত্তি করানো যায় না, কংগ্রেস-প্রদত্ত অধিকার না থাকলেও জনসাধারণের উপর আমার যে প্রভাব আছে তারই জোরে আজ আমি আইন অমান্ত আন্দোলন হুক করতে পারি, কিন্তু তাতে শুধু ব্রিটিশ গবর্নেন্টকে হারানি করা হবে, আমার উদ্দেশ্য তা হতে পারে না।

তবু গান্ধিজীর সম্পর্কে প্রোপাগান্ডা বিরাম ছিল না, গবর্নেন্টের পক্ষ নিয়ে তার বিরুদ্ধে ঝাঁপ দিলেন আমেরিকাতে গান্ধিজীর নিন্দা করলো, বললো—গান্ধিজীর এবার রাজনীতি থেকে বিনায় নেওয়াই উচিত...

এই সব দেশদ্রোহী আর্থবাহীদের মতামত গান্ধিজী বিশেষ গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু কিরোজ ষাঁ হুনের জবাব দিলেন জর্জ বার্গার্ড শ', তিনি বললেন—গান্ধিজীর রাজনীতি পঞ্চাশ বছরের পুরানো হয়ে গেছে। তাঁর কলাকৌশলে ভুল থাকতে পারে কিন্তু তাঁর নীতি স্পষ্ট, তা পঞ্চাশ বছর আগেও যেমন ছিল, পঞ্চাশ লাখ বছর আগেও তেমনি ছিল।

ইতিমধ্যে গান্ধিজী ডাক্তার জয়াকরকে চিঠি লিখলেন—দেশ আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে, তোমরা কি ভাবছ আমি জানি না, কিন্তু আমি সুখী নই। আমি লজ্জিত। আমার অসুখ হওয়া ঠিক হয়নি, অসুখ যেন না হয় সেই জোরে আমি করেছিলাম কিন্তু শেষে ব্যর্থ হলাম, আমার মনে হয় আমার এই অসুখটা কাটিয়ে উঠলেই ওরা আবার আমাকে জেলে পাঠাবে। কিন্তু যদি আমাকে ধরে তাহলে আমি কি করবো। কংগ্রেসের আগষ্ট-প্রস্তাবকে আমি প্রত্যাহার করতে পারবো না...ওইটাই আমার প্রাণ-বায়ু...

শরীরটাকে ভালোমত সারাতে গান্ধিজীর বেশ কিছুদিন লাগলো। কিছুদিন তিনি কাটালেন জুহুর সাগর তীরে, তারপর গেলেন পুণায় ডাক্তার দীনশা মেহতার চিকিৎসালয়ে, সেখান থেকে গেলেন পাঁচগাতিতে। কিন্তু সেহ দুর্বল হলেও, বয়স বাড়লেও যেন দুর্বল হয়নি।

জুনমাসে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় বললেন—গবর্নেন্টের বিরুদ্ধে 'না' কথাটাই হোল স্বরাজের চাবিকাঠি।

জুলাই মাসে কয়েকটি আলোচনা ও বিবৃতিতে তিনি বললেন—স্বাধীনতার জন্যই

আমাদের দাবিদারী

আমি কেউ আছি, যদি যদি স্বাধীনতার জন্যই করবো। ...আমি চাই এখনই সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা যেনে নেওয়া হোক তবে মিত্রপক্ষের প্রয়োজন মত বুদ্ধবাকীরা কিছু বাধা-নিষেধ থাকতে পারে। ...ভারতের স্বাধীনতা যদি পাওয়া যায় তাহলে আমি নীচে নামতেও রাজী আছি। ...তোমরা (কংগ্রেসীরা) নিজের আধিকার করবে এক জেলে যাবার সুঁকি নেবে, বিশ্বাস রাখবে যে এই ভাবে জেলে খেলে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করা হবে। ...আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে 'ভারত ছাড়া' প্রস্তাব একটা আকস্মিক চাঁৎকার নয়, ক্রোধের বশেও এ প্রস্তাবের খসড়া করা হয়নি। পাল্লারিচোরা ভাষার বললে বলতে হবে ভারতবাসীরাই ভারতবর্ষ শাসন করবে—কোন-দল বিশেষের দ্বারা নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। ...

ডেলি-ওয়ার্কারের প্রতিনিধির কাছে মহাস্বামী বললেন—অধুনা মিত্রপক্ষ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক ঘোষণা করছেন, আমার কাছে—আরো সহজ করে বললে—নিপীড়িত জাতির কাছে এ সব ঘোষণা অর্থহীন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা নিপীড়িতদের খুশি করতে পারে না। 'নিপীড়িত জাতি' বলতে আমি বুদ্ধি এশিরাবাসী ও আফ্রিকাবাসী। তাঁরা যদি গণতন্ত্রের জন্যই সংগ্রাম করেন তাহলে পৃথিবীর সমস্ত শোষিত জাতির সেই গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু আমি দেখছি বাস্তব ঘটনা তার উল্টোটাই প্রমাণ করছে। প্রায় সমস্ত দলই আজ এবিষয়ে একমত যে ভারতবর্ষ এখন যেভাবে বিদেশী আধিপত্য বহন করছে এখন কোন দিন ছিল না।

মহাস্বামী আশ্রমে ফিরে এলেন। ছোট ছেলেমেয়েদের আর আনন্দের লীলা রইল না। রাজনীতির চেয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের সারল্যই মহাস্বামী বেশী ভাল-বাসেন, এই ক'দিন মহাস্বামীকে না পেয়ে তাদের বড় কষ্ট হচ্ছিল।

মহাস্বামীর কাছে ছোটদের যাওয়া আসার কোন বাধা ছিল না, কাজের অভাব করলে মহাস্বামী নিজেই আসতেন তার ঘরে।

একবার একটি মাত্রাজী ছেলের পেটের অসুখ করেছে, বিকালবেলা চূপ করে বিছানার তরে তরে সে ভাবছে কি খাবে, এমন সময় মহাস্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন, হেসে বললেন—কি গো, কেমন আছ ?

—সেরে গেছি।

—বেশ বেশ ! খুব খিদে পাচ্ছিল জে ? কি খেতে ইচ্ছে করছে বলত ?

আমাদের গান্ধিজী

ছেলেটা ককি খেতে বসে ভালবাসতো, বললো—এক কাপ ককি খেতে ইচ্ছে করছে !

—হুই ছেলে, পেটের অন্ত্র সারতে না সারতেই ককি খাবে !

ছেলেটার মুখ বলিন হয়ে গেল। তার বিমর্ষ মুখের পানে তাকিয়ে মহাত্মাজী বললেন—বেশ, বেশ, এক কাপ ককি দেবার ব্যবস্থা আমি করছি, আর তার সঙ্গে হুঁধানা গরম গরম চোষ্ট যন্দ হবে না, কি বল ?

ছেলেটা তো মহাত্মা, বললো—সত্যি দেবেন ?

—দেখনা, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি—

মিনিট হুড়ি পরে খটখট করে খড়বের শব্দ তুলে মহাত্মাজী কিরে এলেন, হাতে একখানি ট্রে। ট্রের উপর হুঁধানি চোষ্ট আর এক কাপ ককি। ট্রেটা সামনে এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে গান্ধিজী বললেন—এই নাও তোমার ককি, নিশে করতে পারবে না কিন্তু, এই ককি আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি, খেয়ে তোমাকে সার্টিকিফেট দিতে হবে।

ছেলেটার মুখে সহসা কথা জোগালো না, মহাত্মাজী নিজে তার অন্ত ককি তৈরী করে এনেছেন। কোন রকমে বললো—কিন্তু আমার অন্ত আপনি এত কষ্ট করলেন ?

—কথা বলবে পরে, ককি জুড়িয়ে যাচ্ছে যে !

ছেলেটা আর কিছু বলতে সাহস পায় না, কাপে চুমুক দিতে শুরু করে। গান্ধিজী হাসি মুখে তার পানে তাকিয়ে থাকেন, খাওয়া শেষ হলে ঘর থেকে বাহির হয়ে যান। ছেলেটা তাকিয়ে থাকে, তার দৃষ্টি ঝান্সা হয়ে আসে।

আরেক দিনের কথা।

গান্ধিজী পুণা থেকে বোম্বাই যাচ্ছেন, সঙ্গে দশজন সেক্রেটারী ও বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ। কুড়ীর জেলীর কাষরা, ভিতরে ও বাইরে মাঝবের গোলমাল। তার উপর কন্ট্রোল করে বৃষ্টি পড়ছে, গাড়ীর ছাদ দিয়ে ভিতরে জল পড়ছে। এসব কিন্তু গান্ধিজীর মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, স্থির চিত্তে তিনি হরিজনের অন্ত প্রবন্ধ লিখে চলেছেন।

এক ঠেগনে বৃষ্টির সেই মূল ধারাকে অগ্রাহ করে কয়েকটা ছেলে এসে উঠলো গান্ধিজীর কাষরার জানালায়; গান্ধিজীকে দেখতে পেয়েই তারা সানন্দে চীৎকার করে উঠলো—গান্ধিজী, গান্ধিজী ! জয় মহাত্মা গান্ধিজী জয় !!

আমাদের গান্ধিজী

কিশোর কণ্ঠের চীৎকারে গান্ধিজীর কলম থেবে গেল। জানালার পানে তাকিয়ে তিনি হাসলেন। ছেলেদের তিনি ভালবাসতেন, তাদের সব কিছু অভ্যাচার নইলে তিনি সদাই প্রস্তুত ছিলেন।

মার্কিন সাংবাদিক লুই-কিশার ছিলেন সঙ্গে, তিনি প্রশ্ন করলেন—গান্ধিজী, এই ছেলের দল আপনার কাছে আসে কেন ?

গান্ধিজী হাসলেন, টাকওলা মাথার ছুঁপাশে দুটী আঙুল দেখিয়ে বললেন—আমার মাথায় দুটী শিং আছে, ওরা সেই শিং দেখতে আসে।

জানালার বাইরে ছেলেরা হেসে উঠলো, লুই-কিশারও না হেসে থাকতে পারলেন না, গান্ধিজীর সরল ছেলে-মাহুবি তাঁকে মুগ্ধ করলো।

একবার কলকাতার এক যন্তেসারী ইঙ্কলের একদল ছোট ছেলেমেয়ে গিয়েছিল সোদপুরে গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করতে। প্রত্যেকেই গান্ধিজীকে প্রশ্ন করে এক এক টাকা প্রণামী দিল। শেষে কয়েকটা নেহাৎ ছোট ছেলে সাহস করে আর এগিয়ে আসে না। গান্ধিজী হেসে একটা ছেলের হাত ধরে টানলেন, আরেকজনের নাকটীর উপর এক টোকা মারলেন, ছেলেদের মাঝে হাসির ঢেউ উঠলো, সব জয় ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, কে আগে বাপুজীর কাছে গিয়ে টাকা দেবে। দু'দশ মিনিটের মধ্যে গান্ধিজী দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেললেন সব ক'টা ছেলের সঙ্গে। বললেন—এই টাকাগুলো যে দিলে, এ নিয়ে আমি কি করবো বলদিকি ?

ছেলেরা উত্তর দিল—গরীব হরিজনদের সেবার খরচ করবেন।

গান্ধিজী হেসে বললেন—ঠিক বলেছ। আরো অনেক টাকা আমার দরকার, তোমরা এখন ছোট আছ, এখনই তোমরা আমাকে টাকা দিচ্ছ, বড় হয়ে কিছু লাখ লাখ টাকা দিতে হবে।

ছেলেরা বাড়ি কাত করে বললো—দোব !

খানিক পরে ছেলেদের জলখাবার মুড়ি এলো। ছোটরা খেতে শুরু করে দিয়েছে এমন সময় বাপুজী তাদের মাঝে এগিয়ে গেলেন, বললেন—বাঃ, নিজেসাই সব খাচ্ছ, আমার ভাগ কই ?

বাপুজী জ্ঞান হাতখানি বাড়িয়ে ধরলেন। ছোটরা এক ভাগ মুড়ি তাঁর হাতে ভুলে দিল, গান্ধিজী হো হো করে হেসে উঠলেন।

জুুু এবেশেই নর বিলাতের ছেলেমেয়েদের কাছও গান্ধিজী ছিলেন—গান্ধিকাকা।

আবার গান্ধী

সোলটেবিল বৈঠকে দিনের পর দিন গান্ধী যখন গুরুতর গভীর আলোচনায় ব্যাস্ত, তখনও অবসর সময় দেখা যেত ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি গল্প বলতে বসেছেন—ভারতবর্ষের গরীব-দুঃখীদের গল্প। আবার কখন-বা তাদের হাত ধরে বাহির হয়ে পড়েছেন মাঠে বেড়াতে।

লগনের ইষ্ট-এণ্ডের ছেলেমেয়েরা গান্ধীকাকে এমন ভালবেসে কেলেছিল, যে চলে আসার দিনে তারা আর ছাড়তে চায় না, কলভরা চোখ তুলে গান্ধীকে তারা প্রায় করলো—গান্ধীকাকা আবার কবে আসবেন ?

হালি মুখে গান্ধী উত্তর দিলেন—যেদিন আমার দেশ স্বাধীন হবে, সেদিন আবার আসবো।

স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মানুষ হয়ে আবার একদিন বিলাত যাবার ইচ্ছা হয়তো তাঁর মনে ছিল, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা তা নয়।

গান্ধী যেখানেই থাকতেন, দিনের মধ্যে একটা সময় ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটাতেন, সভায় যাবার পথে ওদের কাঁধে ভর দিয়ে যেতেন, হেসে বলতেন—তোমরা হচ্ছে আমার লাঠি—লকড়ি !

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সখ্য ছিল আন্তরিক।

আমেরিকার রবীন্দ্রনাথ গান্ধী সম্পর্কে বলেন—যহাওয়া গান্ধী বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর মন শক্তির মত সয়ল। কেউ যদি তাঁকে আক্রমণ করে গান্ধী তখন তার দিকে চেয়ে হাসবেন। যদি তাঁকে আমেরিকার সিংহাসন হস্তান্তর হয়, তিনি সেই সিংহাসনের মণিমুক্তো খুলে নিয়ে গরীবদের বিলিয়ে দেবেন। নিজের জন্য তিনি কিছুই চান না।...

আবার রবীন্দ্র-অনুষ্ঠান সময় গান্ধী লিখলেন—ভারতবর্ষে কিসে আসার পর গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আশ্রয় দেন, তাঁর সঙ্গে আমার প্রার্থের যোগ। সে যোগ এতো গভীর ও পবিত্র যে সকলের সামনে তা বলা যায় না।...

রবীন্দ্রনাথ অস্থির হয়ে পড়েছেন, গান্ধী শান্তি-নিকেতনে এলেন তাঁকে দেখতে।

এসে শুনলেন, ভক্ত্যররা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্রাম নেবার জন্য অস্থির করেছেন, কিন্তু তিনি তথাপি দ্রুপরে লেখাপড়ার কাজ করেন। গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে বললেন, —গুরুত্ব, আপনাদের কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ভোঁ অর্থাৎ, মহাত্মাজী কি ভিক্ষা চাইবেন তাঁর কাছে। হেসে বললেন—কলুন, আপনার কি ভিক্ষা?

মহাত্মাজী হাতজোড় করে বললেন—কেখুন, আমি আপনার বৈনশ্রমী কীদর থেকে রোজ এক বটী করে ভিক্ষা চাইছি। আপনি দুপুরে একবটী করে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নেবেন, সেই সময় আপনি পড়া-লেখার বা অন্য কোন কাজ করবেন না।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন—তথ্যস্তু।

সেই দিন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা একবটী করে বিজ্ঞান করতেন।

কবিগুরুর মৃত্যুর পরে গান্ধিজী গেলেন শান্তি-নিকেতনে। বোলপুরে ঐশ থেকে নেবে, তিনি হাঁটতে শুরু করলেন, গাড়ী তৈরী ছিল কিন্তু তিনি গাড়ীতে উঠলেন না, বললেন—শান্তি-নিকেতন আমার কাছে পরমতীর্থ। পবিত্র স্থানে পায়ে হেঁটে যাওয়াই আমাদের প্রথা।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের তিনি বললেন—সোনার মন্দির তৈরী করলে এই মহাকবির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখানো হবে না। আমরা যদি তাঁর বাণী শ্রবণ করে স্বাধীনতার পথে চলি তবেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে যে আমরা সম্মান করি তাঁর প্রমাণ দিতে পারবো।

গান্ধিজী বলতেন—প্রত্যেক মাহুষের উচিত, কথা দিয়ে কথা রাখা এবং সকল অবস্থাতেই সময় অনুযায়ী কাজ করা।

মহাত্মাজী নিজের জীবনেও এই সময়ানুবর্তিতা যেনে চলার কল্প যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। সেই কল্প একটি ট্যাক-ঘড়ি সব সময়ই তাঁর কটিনজে পোঁজা থাকতেন, সারা ভারতের কাজের চাপেও তাঁর সময়ের ভুল হোত না।

১৯২৮ সালে একদিন বিকালে গান্ধিজী গিরেছিলেন গুজরাট বিভাগীঠে ছাত্রদের এক সভায়। সভা শেষ হতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। ছটার আগে গান্ধিজীর আশ্রমে কিরে বাবার কথা অথচ একখানিও গাড়ী নেই, সভ্যার আগে কিরিতে না পারলে গান্ধিজীকে সারাটা রাত উপবাসে থাকতে হবে। গান্ধিজী ঘড়িটি একবার দেখে নিরে বললেন—আর হুড়ি মিনিট মাত্র সময় আছে। তোমরা কেউ আমাকে একখানি সাইকেল ষোগাড় করে দিতে পার ?

—কুব দিতে পারি, কিন্তু এই বরসে এতটা পথ কি আপনি সাইকেলে বেতে পারবেন ?

আমাদের গান্ধিজী

—একখানা সাইকেল এনে দিয়েই দেখ না পারি কিনা ?

তখনই হু'খানি সাইকেল জোগাড় হয়ে গেল। গান্ধিজীর সঙ্গে ছিলেন কাকা কালেলকার। হু'জন সাইকেল হু'খানিতে উঠে বসলেন। একটি ছাত্র হেসে বললো—
লেখবেন বাপুজী ধাক্কা লাগাবেন না যেন।

বাপুজী হেসে বললেন—না না তোমাদের মত আমার অতো ভয় নেই। ঠিক সময় আমি আশ্রমে পৌঁছে যাব দেখো।

অনেকদিন সাইকেল চালানোর অভ্যাস নেই। ছেলেরা গান্ধিজীর গাড়ী ঠেলে নিয়ে চললো ধানিক পথ। বড় রাস্তায় এসে পড়তেই গান্ধিজী বললেন—আর দৌড়াতে হবে না, তোমরা এবার আমাকে ছেড়ে দাও !

—কিন্তু আপনি যেতে পারবেন তো ?

—দেখি না চেষ্টা করে।

ছেলেরা গান্ধিজীকে ছেড়ে দিল, গান্ধিজী বরাবর এগিয়ে গেলেন, হাত এতটুকু টললো না, সোজা পথে কাকা কালেলকারের সঙ্গে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গান্ধিজী সেদিন ঠিক সময়েই আশ্রমে এসে পৌঁছেছিলেন। সাহ্য-ভোজনেরও ব্যতিক্রম হয়নি।

হেসে গান্ধিজী বলেছিলেন—হর্ষ চন্দ্র নক্ষত্র নিজেদের কাজ বখারীতি করে বায় এতটুকু ব্যতিক্রম হয় না। আমরা,—যাহুঘরাই বা তেমন হতে পারবো না কেন।

ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে বিশ্বের মাঝে, বিশেষতঃ মার্কিনীদের চোখে ছোট করে ধরার জন্ত চার্লিস সাহেব চেষ্টার ক্রটি করেননি, তিনশত স্ব-ভারতীয় বক্তাকে ইন্টিম দূত-বাস থেকে রীতিমত বেতন দিয়ে রাখা হয়, তারা ছোটখাটো সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। বেভার্লি-নিকল্‌সের মত নাক-করা লেখকও এই দলে ছিল। তার বই "ভারতিকট অন ইণ্ডিয়াতে" সে লেখে :

সত্যের প্রতি গান্ধীর কোন নির্ভা নেই।

হিন্দু ধর্মের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

ভারতীয় সাংবাদিকদের কোন বুদ্ধি নেই।

ভারতে সত্যিকারের শিল্প বলে কিছু নেই।

ভারতের সংবাদ-পত্রগুলি গুজব, কুসংকার আর অজ্ঞতার ভরা।

এমন ধর্মের খবরও নাকি গুণের কাগজে ছাপা হয়েছিল যে সোলট্‌সবিলের সময় গান্ধিজী বিলাতে গিয়ে কোন তরঙ্গী নর্ডকীর সঙ্গে নেচেছিলেন।

আমাদের স্বাধীনতা

এই প্রোপাগান্ডার কাজে ভারত সরকার বছরে পঁচিশ লাখ আর ব্রিটিশ গবর্নেন্ট বছরে এক কোটি টাকা খরচ করতো, দশ হাজার লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক পেতো।

এ প্রোপাগান্ডার উপর বিশ্বাস রেখেই চার্চিল সাহেব সমস্ত বলেছিলেন—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার জন্য আমি ব্রিটিশ গবর্নেন্টের প্রধান মন্ত্রী হইনি।

কিন্তু ১৯৪৫ সালের ১০ই জুলাই এই দস্ত শেষ হয়ে গেল। চার্চিল সাহেবের গদি দখল করে বসলেন শ্রমিক দলের নেতা ক্লিভেন্ট এট্‌লি, আর আবেদীর আসন অধিকার করলেন লর্ড পেথিক-লরেন্স।

ডিসেম্বর মাসে বড়লাট ওয়াভেল সাহেব কলকাতায় এক বক্তৃতায় বললেন—‘ভারত ছাড়’ বললেই আলিবাবার চিঠিৎফাকের মত কাজ করবে না। রক্তপাত করে এসমস্যার সমাধান হবে না, সমাধান করা যাবেও না।...আমি একজন পুরানো সৈনিক, যুদ্ধের বীভৎসতা ও রক্তপাত সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে আমার ভালো ধারণা আছে। এই রক্তক্ষয়কে পরিহার করে চলতে হবে, পরিহার করতে আমরা পারবো। মিথ্যেমের মধ্যে আমরা বুঝাপড়া করবো। স্থির সংকল্প থাকলে তা আমরা পারবো। এই মহান দেশে হিন্দু মুসলমানকে পাশাপাশি বাস করতে হবে, তাদের সর্ভ তারাই স্থির করবে...

এই হিন্দু মুসলমান বিরোধের মূল সূত্র হচ্ছে মুসলীম-লীগ আর তার দলপতি মহম্মদ আলি জিন্না। মুসলমান জনসংখ্যা যদিও হিন্দুর সিকি ভাগেরও কম এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও মুসলমানদের ত্যাগ নগণ্য তথাপি সুযোগ সুবিধা ভোগ করার বেলা জিন্না মুসলমানদের জন্য সমান সমান দাবী করে। গোলটেবিল বৈঠকে সেজন্য মুসলীম-লীগ কংগ্রেসের বিরোধিতা করে। পরে জিন্না গান্ধিজীকে লেখে : আমি ছাথের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে ভারতীয়দের এক জাতি বলে গণ্য করে আপনি ভুল করেছেন, ভারতীয় ‘নেশনের’ অস্তিত্ব নেই। হুতরাং আপনার বিবেক-বুদ্ধিও ভ্রান্ত।...আপনার প্রবন্ধে যা কিছু লিখেছেন সবই কল্পনামাত্র। তার কারণ আপনি সেবাগ্রায়ে নিরিবিলা জীবন বাপন করেন এবং আপনার চিন্তা ও কার্যক্রম ‘অন্তরের বাণী’ দ্বারা পরিচালিত হয়। বাস্তবতা—সাধারণ লোকে বাক্য বলে ‘প্রত্যক্ষ রাজনীতি’—তার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ নেই বললেই হয়।...খটনার প্রবাহ ক্রমপ্রবাহমান। দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে হরিক্রম কাগজে আপনার চর্চা আলোচনা, বন্ধন, অহিংসা ও হুতাখাটা সম্পর্কে আপনার অবদূত নীতি ভারতের স্বাধীনতা আনতে পারবে না। কাজ ও রাজনীতিক দূরদর্শিতাই আমাদের অগ্র-গমনে সহায়তা করবে।...

আমাদের গান্ধীজী

গান্ধীজী তার উত্তরে লেখেন—এমন একদিন ছিল যখন প্রত্যেক মুসলমানই ভারতবর্ষকে নিজের মাতৃভূমি বলে মনে করতো। আলি-ডাইয়েরাও তা করতেন। সে মিথ্যাকথা ও ধান্দাবাজী, এ কথা মুহর্তেকের জন্ত বিশ্বাস করতে আমরা প্রস্তুত নই। সহকর্মীদের সম্বন্ধ করার চেয়ে আমি অজ্ঞ হতেও রাজী আছি।...আমি ছেলেবেলা থেকেই হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্যে বিশ্বাস করি।...আমি যখন আফ্রিকায় ছিলাম এক মুসলমান বকেলের মাথলা লড়ে তাদের জিতিয়ে দিই, তাদের আমি কখনও অবিশ্বাস করিনি। আমি আফ্রিকা থেকে হতাশ হয়ে অথবা পরাজিত হয়ে কিরিনি। আমার কোন কোন মুসলমান বন্ধু আমাকে যে গালি-গালাজ দেন তা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি জানি না আমি এমন কি করছি যা তাদের ক্ষুব্ধ করতে পারে।...আমি মুসলমানদের সঙ্গে আহায গ্রহণ করি। জাতি ধর্ম নির্বিচারে সকলের সঙ্গেই আমি আহায গ্রহণ করি। কাউকেই আমি ঘৃণা করি না, আমার অন্তরে ঘৃণার স্থান নেই।...জিন্না সাহেব অতীতে কংগ্রেসী ছিলেন, এখন তিনি ভুল পথে চলছেন বলে মনে হয়। আমি প্রার্থনা করি তিনি নীর্থজীবী হোন, এবং কান্না করি তিনি আশ্রয় পরেও বেঁচে থাকুন। এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন তিনি বুঝতে পারবেন আমি কোনদিন তাঁর প্রতি কোন অন্তায় করিনি, মুসলমানদের উপর কোন অবিচার করিনি। মুসলমানদের সততার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, যদি তারা আমাকে হত্যাও করে তথাপি আমি কোনদিন তাদের নিন্দা করবো না।...

কিন্তু জিন্নার কাছে নীতি ও যুক্তির কোন বালাই নেই। ট্যাংক্রিপ্‌সের কাছে তিনি স্পষ্ট বললেন—ভারতের স্বাধীনতা আমি চাই না।

আগা-খাঁ-গ্রাসাদের বন্দীবাস থেকে গান্ধীজী যখন জিন্নাকে সিংহাসন নতুন করে মুসলীম-লীগের সঙ্গে একটি বৃকাপাড়ার আলোচনা চালাবার উদ্দেশ্যে। তখন জিন্না তার ভাবার্থ করলো—মুসলীম-লীগকে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে নেবার এ একটি চাল মাত্র।

তথাপি গান্ধীজী কোনদিন জিন্না সম্পর্কে কোন কটুক্তি করেন নি, কারণ গান্ধীজীর নীতি ছিল :

ন পরেসং বিলোমানি, ন পরেসং কথা কথং

অশ্রুদ্রবো ব অভিক্ষেয্য কতানি অকতানি চ।

[পরের পরকথ্য বা কোন কথায় কর্ণপাত না করাই ভালো। তার চেয়ে নিজের ক্রুদ্ধ ও অকৃত কাণ্ড বিস্তারিত করে দেখা ও আত্ম দর্শনই প্রিয়।—বর্ষপদ]

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে বিলাত থেকে এলো পার্লামেন্টের কয়েক জন সদস্য। তারা ফিরে যাবার পর মার্চ মাসে এলেন তিনজন মন্ত্রী—ভারত সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্স, ব্যবসা সচিব স্যার ইয়াকোর্ড-ক্রিপ্‌স ও নৌবলার্ক মিটার এ. ডি. আলেকজান্ডার। দিল্লীর বড়লাট ডবনের কুড়ি খানি ঘর নিয়ে তাঁদের আপিস বসলো। ২৭ শে মার্চ থেকে ১২ই মে পর্যন্ত ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সঙ্গে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করলেন। কিন্তু শেষ অবধি মুসলীম-লীগের সঙ্গে তাঁদের বোঝাপাড়া হোল না।

মহাত্মা গান্ধিজীর সঙ্গে স্যার পেথিক-লরেন্স চার বার দেখা করেন। গান্ধিজী ছিলেন দিল্লীর ভাংগী পল্লীতে, ক্রিপ্‌স সাহেব সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, তারপর ১লা এপ্রিল লর্ড লরেন্স গান্ধিজীর সঙ্গে কথাবার্তা কইলেন ৭২ মিনিট।

৩রা এপ্রিল সকাল বেলা আবার গান্ধিজীর সঙ্গে কথা হোল।

৬ই মে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মন্ত্রী মিশন ও বড়লাট গান্ধিজীর সঙ্গে নব্বুই মিনিট আলোচনা করেন।

১১ই মে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আবার গান্ধিজীর সঙ্গে কথা হয়।

১৬ই মে মন্ত্রী-মিশন তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন—প্রদেশভিত্তিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগ করা হবে—ক, খ, গ। ক হোল হিন্দুপ্রধান প্রদেশ, খ হোল মুসলমান প্রধান প্রদেশ, গ হোল যেখানে দুই সম্প্রদায়ই প্রায় সমান।...সব প্রদেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গণপরিষদ গঠন করবে। তারা স্বাধীন ভারতের আইন-কানুন তৈরী করবে।...এই সময় এক অন্তর্বর্তী গবর্নেন্ট সাময়িকভাবে কাজ করবে। বৃটিশ বাহিনী ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে।...ভারতবাসীরা এক জাতি, হিন্দুধর্মে ও পাকিস্তানে ভাগ করা চলবে না।

গান্ধিজী হরিজন পত্রিকায় লিখলেন—আমরা যা ভেবেছিলাম তা হয়নি, তার কারণ আমাদের নিজের দুর্বলতা...যদিও ভয় পাবার কারণ আছে যে মন্ত্রীরা যুখে যা বলেছেন কাজে তা করবেন না, আমি কিন্তু তার কোন পূর্বাভাস দেখছি না।

গান্ধিজী বুঝেছিলেন ঠিকই, গোলযোগ বাধালো আমাদের দেশের লোকই—মুসলীম-লীগ ও তাদের নেতা জিন্না। তারা প্রথমেই দাবী করে মুসলমান-প্রধান ছ'টি প্রদেশে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করবে, তাদের গণপরিষদও করবে আলাদা। ভারতীয়েরা এক জাতি নয়। অন্তর্বর্তী সরকারেও যতগুলি মন্ত্রী থাকবে তার মধ্যে অর্ধেক লীগের লোক হওয়া চাই।...আরো অনেক আশঙ্কা তারা তুললো।

কিন্তু কংগ্রেসীরা এর কোনটিই মেনে নিতে পারলেন না।

আমাদের পাকিস্তানী

লীগাররা সেইজন্য প্রথমে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিল না। পরে লর্ড ওরাভেলের চেষ্টার যদিও তারা যত্ন নিল, তবু গণপরিষদে কিছুতেই যোগ দিল না।

লর্ড পেশিক-লরেন্স পাকিস্তান সম্পর্কে বলেছিলেন—সাম্প্রদায়িক সমস্ত সমাধান হিসাবে, একটি আলাদা মুসলীম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কথা আমরা মেনে নিতে পারি না। মুসলীম-লীগ যে পাকিস্তানের কথা বলছে, তাতে শুধু মুসলমান প্রজাই থাকবে না, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকও থাকবে শতকরা চল্লিশ জন, কোন কোন বিশেষ জায়গায় সংখ্যালঘুরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। যেমন কলিকাতা নগরীর কথাই ধরা যাক, এখানকার মুসলমান জনসংখ্যা তিনভাগের একভাগ মাত্র। তার উপর পাকিস্তান রাষ্ট্র যদি ভারত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সৈন্তদল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ভারতের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাবে।...সেই কারণে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করার উপদেশ দিতে আমরা পারি না।

মুসলীম-লীগ এর উত্তরে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করলো। জিন্না লীগের সভায় বললো—মন্ত্রী মিশনের বুদ্ধি পক্ষাঘাত গ্রস্ত। তাদের বিরতিতে না আছে কোন রাজনীতিক ধর্মবোধ, না আছে কোন সত্যতা ও নীতিজ্ঞান।...যার সত্যতা ও জ্ঞান বোধ আছে সেই বলবে মুসলীম-লীগ উচ্চতর ও মহত্তর বিচার বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত।...আমরা তার পরিবর্তে পেয়েছি অবজ্ঞা ও ঘৃণা। শুধু আমরাই কি বুদ্ধি, নীতি, সত্যতা ও সাধুতা মেনে চলবো, যখন অপর পক্ষে কংগ্রেস শঠতা করবে? ... কংগ্রেস ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনে আজ যে ঘৃণা জেগেছে, তা এর আগে আর কোন দিন জাগেনি।...আমরা আজ বুঝতে পেরেছি যে মুসলীম ভারতের পক্ষে এটা সবচেয়ে বড় আত্মবীর্ষ্য।...এখন আর আপোষের স্থান নেই, আমরা এখন এগিয়ে যাব। কংগ্রেস ও ব্রিটিশ তাদের পিছুল আমাদের পানে তুলে ধরেছে, ব্রিটিশের পিছুল আধিপত্যের আর কংগ্রেসের পিছুল গণসংগ্রাম ও অসহযোগিতায়। আমরাও পিছুল তৈরী করেছি, এবং সেই পিছুল ব্যবহার করার জন্য আমরাও আজ প্রস্তুত! মাহুভের বিচার বুদ্ধিতে যতটা বিচার করা চলে তা করে, এবং দায়িত্বের সমস্ত ঝুঁকি নিয়েই আমরা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করলাম।...

১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম স্থচিত হোল কলকাতা সহরে, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে, শত সহস্র নিরীহ নরনারীর রক্তে অনেক গৃহ রক্তাক্ত হোল, রক্তপথ হোল শব্দাকীর্ণ। অতীত দিনে দিল্লী-নগরীকে নাদির-শা যে ভাবে রক্তরঞ্জিত করেছিল, বাংলার লীগ মন্ত্রীরা কলিকাতার বুকে তার প্রতিবিম্ব কেলেলো।

আমাদের গান্ধিজী

কলিকাতার পরেই ১০ই অক্টোবর প্রত্যক্ষ-সংগ্রামীরা হানা দিল নোয়াখালি জেলায়। ২০০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপে ২০,০০০ মুসলমান গুতা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে হিন্দুদের উপর ব্যাপক ও বেশরোয়া আক্রমণ চালায়। তাদের আগে থেকেই তৈরী রাখা হয়েছিল। লীগ নেতারা তাদের অস্ত্র ও পেট্রল দিয়ে সাহায্য করে। নোয়াখালি থেকে হাংগামা ত্রিপুরাতেও ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ কোন বাধা দেয় নি। লীগ মন্ত্রীসভা হিসাব দেয় : হাংগামায় নোয়াখালিতে ১৭৮ জন ও ত্রিপুরাতে ৪০ জন খুন হয়। তাছাড়া মিলিটারী ও পুলিশের গুলিতে মরে ৬৭ জন। নোয়াখালিতে ২২৬৬টি গৃহ ও ত্রিপুরাতে ২১৭০টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। দু' জেলায় ২৫২০টি গৃহ ভস্মীভূত হয়, ত্রিপুরা জেলায় কুটির ভস্মীভূত হয় ৬৫২০টি। নোয়াখালিতে কতজন হিন্দুকে যে মুসলমান করা হয়, তার হিসাব নেই। ত্রিপুরাতে ধর্মান্তরিত লোকের সংখ্যা ৯৮৯৫ জন। কলিকাতা, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা থেকে কত মেয়ে যে অপহৃত হয় তার হিসাব কেউ রাখে না।

এই হিসাবটি মুসলীম-লীগের দেওয়া হিসাব, আসল ব্যাপার এর চেয়ে গুরুতর হওয়াই আভাবিক।

বহুদিন অবধি এই সব অঞ্চলে হিন্দুদের নিরাপদে চলাফেরা করা অসম্ভব ছিল। লোক দেখিয়ে পুলিশ নোয়াখালিতে ১০৬১ জনকে ও ত্রিপুরাতে ১১৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু তাদের মধ্যে ২০২+২১২ জনকে ছেড়ে দেয়। পাঁচদিন অবধি এই হাংগামার খবর নোয়াখালির বাইরে আসতে দেওয়া হয় নি।

খবর শুনে গান্ধিজী বেদনায় স্রিয়মান হয়ে গেলেন। তিনি তখন ছিলেন দিল্লীর ভাঙগী পল্লীতে। একদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় তিনি বললেন—যেদিন থেকে আমি নোয়াখালির খবর শুনেছি, সেইদিন থেকে আমি আমার কর্তব্যের কথা ভাবছি। ঈশ্বর আমাকে পথ দেখাবেন।

চল্লিশ কোটি নরনারীর রাষ্ট্র জীবনের জটিলতা তখন রাজধানীর বুকে জট পাকাচ্ছে মহাস্বাভাবী সেই জটের এক একটা গহ্বি উন্মোচনে ব্যস্ত। কিন্তু সেই রাজনীতিকে ছাপিয়ে উঠলো, দুরাগত শিশুর আর্ডনাদ, লাহিতা নারীর অশ্রুজল, গৃহহারা সর্ব-হারাদের দীর্ঘশ্বাস। ১৮ই অক্টোবর গান্ধিজী বললেন—আমি আগামী কাল কলিকাতায় রওনা হব, সেখান থেকে যাব নোয়াখালি। নারীর দুঃখের কাহিনী সর্বদাই আমাকে বিচলিত করে, আমি তাদের চোখের জল মুছাতে যাচ্ছি, তাদের সাহস দিতে যাচ্ছি। তারা তো কোন অপরাধ করেনি।

মহাস্বাভাবীর শরীর তখন অসুস্থ, রক্তের চাপে (ব্লাড প্রেসার) ভুগছেন। কিন্তু

আমাদের গাঙ্গিজী

ঐহিক স্বাস্থ্য কোন দিনই তাঁর কাছে কর্তব্যের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়নি, তিনি বললেন—পরী আমার ভাল নয়, নোয়াখালি বাওয়া খুবই কষ্টকর, তবু কর্তব্য আমাকে করছেই হবে।

সেবাগ্রামের আশ্রমিকদের তিনি নির্দেশ দিলেন—আশ্রমের পুরুষ ও নারী কর্মীদেরকে একক এক একটি উপক্রম গ্রামে গিয়ে সেখানকার নির্ধারিত সংখ্যালব্ধ সন্তানদের প্রশ্ন ও মানের রকমরূপে অবস্থান করতে হবে, এবং প্রয়োজন হলে নিজের জীবন বিনিয়োগও তাদের রক্ষা করতে হবে।

অনেক জ্ঞাতাকামী বন্ধু শ্রদ্ধা জানালো—রক্তপিপাসু নরঘাতকেরা যুক্তির কোন দ্বার ধারে না, সেদিন তারা একজন আশ্রম-কর্মীকে খুন করেছে।

মহাস্বামী বললেন—সেই জিঘাংসাকে জয় করার জন্তই আমার অভিযান, সেই প্রযুক্তিকে প্রশংসিত করার জন্তই আমার সাধনা!...

গাঙ্গিজী এলেন সোদপুরে [২৯. ১০. ৪৬]। সেখানে এক প্রার্থনা সভায় তিনি বললেন—শিশুকাল থেকেই আমি অস্ত্রায়কে ঘৃণা করতে শিখেছি, কিন্তু অস্ত্রায়কারীকে কোনদিনই ঘৃণা করিনি। মুসলমানেরা যদি কোন অস্ত্রায়ও করে থাকেন, তবু তাঁরা আমাবু বন্ধুই থাকবেন।

সোদপুর থেকে গাঙ্গিজী ৭ই নবেম্বর চৌমুহানী এসে পৌঁছলেন, সঙ্গে এলেন সন্ন্যাস সতীশ দাঁশগুপ্ত আর গাঙ্গিজীর মন্ত্রশিষ্যেরা। সেখান থেকে স্বল্প হোল পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পরিক্রমা।

নোয়াখালি জেলায় বিশেষ রেলপথ নেই। ত্রিপুরা জেলা থেকে স্বয়ংসহ সহর, আরেক দিকে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা থেকে কেশী সহর অবধি রেলপথ আছে। বাকী সবই কাঁচা রাস্তা। কেশী, চৌমুহানী, লামচর, লক্ষ্মীপুর, সোনাগাজী, সোনাইমুড়ী, কোম্পানী-গঞ্জ, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে পাকা রাস্তাও আছে। সন্দ্বীপ, টুমচর, চর-বেলে, চর-বারখিরা, চর-নলচিরা, চর-আমাহুজা, চর-লরেন্স প্রভৃতি দ্বীপগুলিও নোয়াখালির অন্তর্গত, সেখানে বাতাস্রাতের ব্যবস্থা জলপথে। মহাস্বামী এই সব অঞ্চলে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত পদব্রজে প্রায় চারশো মাইল পথ পরিভ্রমণ করেন।

নভেম্বর ৭ই	... চৌমুহানী
„ ৮ই	... গোপেরবাগ ও দত্তপাড়া
„ ১১ই	... নোয়াখোলা, সোনাচক, খিলপাড়া
„ ১২ই	... গোয়াভলী

আবাকের নাজিৰী

নভেম্বর ১৩ই	... লক্ষীপুর
„ ১৪ই	... কাখিরখিল
„ ১৫ই	... নন্দনপুর
„ ১৬ই	... করপাড়া
„ ১৭ই	... লক্ষ্মিরিহা ও অল্প একটি পরী
„ ১৯শে	... মধুপুর
„ ২০শে-২রা জানুয়ারী	... শ্রীরামপুর
„ ২৬শে	... রামগঞ্জ
জানুয়ারী ২রা	... চণ্ডীপুর
„ ৭ই	... যমিনপুর
„ ৮ই	... ফতেপুর
„ ৯ই	... দাসপাড়া
„ ১০ই	... জগৎপুর
„ ১১ই	... লামচর
„ ১২ই	... করপাড়া
„ ১৩ই	... সাহাপুর
„ ১৪ই	... ভাটিয়ালপুর
„ ১৫ই	... নারায়ণপুর
„ ১৬ই	... রামদেবপুর
„ ১৭ই	... পরকোট
„ ১৮ই	... বদলকোট
„ ১৯শে	... আতাখোরা
„ ২০শে	... শিরগী
„ ২১শে	... কেশুরী
„ ২২শে	... পানিয়াল
„ ২৩শে	... দলতা
„ ২৪শে	... মুরাইম
„ ২৫শে	... হীরাপুর
„ ২৬শে	... বাণশা
„ ২৭শে	... পাল্লা

আমাদের গাঙ্গিকী

আজহারী ২৮শে	... পাচগাঁও
,, ২৯শে	... জয়গ
,, ৩০শে	... আমকী
,, ৩১শে	... নবগ্রাম
ফেব্রুয়ারী ১লা	... আমিষপাড়া
,, ২রা	... সাতখরিয়া
,, ৩রা ও ৪ঠা	... সাধুরখিল
,, ৫ই	... শ্রীনগর
,, ৬ই	... ধর্মপুর
,, ৭ই	... প্রসাদপুর
,, ৮ই	... নন্দীগ্রাম
,, ৯ই, ১০ই	... বিজয়নগর
,, ১১ই	... হামটানী
,, ১২ই	... কাকিলাতলী
,, ১৩ই	... পূর্ব কেরোয়া
,, ১৪ই	... পশ্চিম কেরোয়া
,, ১৫ই, ১৬ই	... রায়পুরা
,, ১৭ই	... দেবীপুর
,, ১৮ই	... আলুনিয়া
,, ১৯শে	... বিরামপুর
,, ২০শে	... বিশকাটালী
,, ২১শে	... কমলাপুর
,, ২২শে	... চরকৃষ্ণপুর
,, ২৩শে	... চরসোলাদি
,, ২৪শে থেকে ১লা মার্চ পর্যন্ত	হাইমচর

সাধারণতঃ এই পরিক্রমাকে তিনটি পর্দায় ফেলা হয় : চৌমুহানী থেকে শ্রীরামপুর, অবধি সূচনা পর্ব (৭ই নভেম্বর থেকে ১লা আজহারী), শ্রীরামপুর থেকে সাধুরখিল অবধি প্রথম পর্দায় (২রা আজহারী থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী), এবং সাধুরখিল থেকে হাইমচর অবধি দ্বিতীয় পর্দায় (৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ) ।

গাঙ্গিকী বলেন—এ আমার তীর্থযাত্রা ।

এই তীর্থযাত্রার পথে অহিংসার শ্রেষ্ঠ সেবক ভারতের পুণ্যভূমিতে হিংসার যে নির্মম রূপ প্রত্যক্ষ করেন, বিশেষতাবীর ইতিহাসে তার ভুলনা নেই। ক্ষুদ্রত আতি সংগ্রাম বোধনা করে যুদ্ধে নায়ে, প্রতিকূলকে মানসিক প্রভুতির সবার দেয়, কিন্তু একই দেশের মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে পুণ্যভূমিকে পরিচিত নিজের প্রতিবেশীর উপর এমন হিংস্র হয়ে উঠতে পারে তা সত্যজগতের কল্পনাতীত, তার উপর যে দেশের নেতা অহিংসার একনিষ্ঠ সাধনা করে চল্লিশ কোটি নয়নারীকে স্বাধীনতার জোয়ারে এনে পৌঁছে দিয়েছেন, সেই দেশে, তাঁরই বর্তমানে। গান্ধিজী যেমনে, কত ব্যস্তির মধ্যে ও দেয়ালে তখনো রক্তের দাগ কালা হয়ে আছে, কত ঘরের কোণে কদালের শুণ, কত গৃহ ভস্মীভূত হয়ে শুধু ভয়শেষ পড়ে আছে। মহিলা এসে বলেছে—পারে করে তাদের মাথার সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়েছে, হাতের শাখা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, জোর করে রান্না করানো হয়েছে গোমাস। সর্বহারার বিধবা এসে নীরবে চোখের জল ফেলেছে। কস্তাহারা এসে বলেছে—আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে, আপনি তাকে ফিরিয়ে এনে দিন! সর্বহারার বৃদ্ধ এসে কঁদে বলেছে—সব ছিল কিন্তু আজ আর কেউ নেই, সাতপুকের ভিটাও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে!

কি বলে মহাশয়জী এদের সাধনা দেবেন! তাঁর বাণী স্তব্ধ হয়ে যায়! তিনি চারিপাশে আলোর দিশা খোঁজেন। তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হয়—চতুর্দিক অন্ধকার! আমাকে কাজ করতে হবে, না হয় কর্ম থেকে বিবর্ত হতে হবে। আমি দেখছি যে, এ-জাতীয় মর্যাদাসিক অবস্থায় আমার উপযুক্ত ধৈর্য ও কর্মকৌশল আছে বলে মনে হয় না। মানুষের দুর্গতি অযোগ্যতা আমাকে প্রাণশঃ অভিজ্ঞত করে ফেলে, আমি আমার নিজের অসহায়তার মশীড়া অঙ্কন করি।

ধীরে ধীরে তিনি সাধনার বাণী উচ্চারণ করেন—কৈদো না, শুধু কাদলেই হারানো জিনিষ ফিরে পাওয়া যায় না, এই পৃথিবীতে কিছুই অবিনশ্বর নয়। একদিন না একদিন সবই ভস্মে পরিণত হবে। একদিন আসবে যখন আমাকে ও তোমাকে চিত্তানলে ভস্মীভূত হতে হবে। স্বতরাং সাহস সঞ্চয় করে মানুষের মত মানুষ হও।

হাজার হাজার বছর আগে পাথরসারথী একদিন এই সত্যই উচ্চারণ করেছিলেন :

—গতান্বনঃ গতান্বনঃ নাহু শোচন্তি পণ্ডিতাঃ...

জাতস্ত হি ক্রবোয়ত্বাক্রবং কস্ম যতস্ত চ।...

অমন প্রচণ্ড শীতের মাঝেও গান্ধিজীর দিবসের কর্মসূচীর কোন পরিবর্তন হয়নি। রাত তিনটের সময় তিনি বখারীতি ঘুম থেকে উঠলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে বসন্তেন প্রার্থনায়, প্রার্থনার পর সামান্য কলের রস পান করতেন। তারপর এক ঘণ্টা বা

আমাদের গান্ধিজী

তার চেয়ে কিছু বেশী সময় তিনি চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন, ডায়েরী লিখতেন এবং চরকা কাটতেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সাতটার সময় পদব্রজে বেরিয়ে পড়তেন পল্লী ভ্রমণে। বন্ধুর পথে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক সময় পায়ে রক্তা নীল হয়ে যেত, নতুন গায়ে পৌঁছে গরম জলে পায়ের কাদামাটি ধুয়ে, কিছুক্ষণ তিনি গরম জলে পা ভুসিয়ে বসে থাকতেন। এই সময়টুকু সাংবাদিক শৈলেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি বাংলা ভাষা শিখতেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে বাংলা পাঠ শেষ করে বাব্বা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো তাদের সঙ্গে কথা কইতেন।

বেলা এগারোটার সময় একখানি চাপাটি, খানিকটা দুধ, আনা জ সিদ্ধ ও একটু মুকোজ আহার করতেন। এই চাপাটিখানি তৈরী হোত তিন ছটাক আটা, এক ছটাক সিদ্ধ তরকারী, একটু গোড়া আর একটু লবণ দিয়ে।

বেলা বারোটার সময় কিছুক্ষণ দেখে তৈলমর্দন হোত, এই সময়েও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা কইতেন। তারপর স্নান। স্নানের পর একটু ডাবের জল পান করতেন।

বেলা তিনটার সময় কোন মহিলা সভা, অথবা গ্রামসেবক সম্মেলন কর্মীদেরবে তিনি উপদেশ দিতেন। *

বিকাল পাঁচটার সময় বসতো প্রার্থনা সভা। প্রার্থনার পর স্থানীয় অধিবাসীদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তার উত্তর দিতেন, এবং বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করতেন।

সভাশেষে বেকতেন সাক্ষাৎমনে। হয়তো যেতেন কোন মুসলমান অথবা কোন হিন্দু বাড়ীতে। ঘড়ি ধরে ঠিক আধঘণ্টা হাঁটার পর তিনি কিরে আসতেন। সূর্যাস্তের আগে রাজির আহার শেষ করতেন। দুপুরে বা খেতেন এবেলাও ঠিক তাই।

রাত আটটার সময় খবরের কাগজ পড়ে তাঁকে শোনানো হোত। তারপর যেটুকু সময় তাঁর হাতে থাকতো স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন রাত নটার নিজা।

সবাই গান্ধিজীর কাছে থাকতো যে ট্যাক-ঘড়ি, সেই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে গান্ধিজীর দিবসের কাজ পরিচালিত হোত।

গান্ধিজী এই পল্লী পরিক্রমা করেছিলেন একান্ত একাকী। সঙ্গে অনেকেই যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু গান্ধিজী তাঁদেরকে নিরস্ত করেন, বলেন—কাজের বিরুদ্ধে আবার কোন অভিযোগ নেই, আমি শুধু পরীক্ষা করে দেখবো আমি সার্বাজীবন এ অহিংসার সাধনা করে এসেছি, সেই অহিংসা দিয়ে আমি রাজত্বের মনের অসামান্যবিকার

করতে পারি কি না। যাহুবে যাহুবে যে হানাহানি, যাহুবে যাহুবে যে ঘেব, যাহুবে হতে যাহুবে যে ভয় বিরাগ, সেই বিকার যাহুবে মন থেকে দূর করতে আমার অহিংসা কতটা কার্যকরী আমি জীবন-সারাফে তাই যাচাই করে যাব। একাজ বহুতে মিলে করার কাজ নয়, কাজেই আমাকে একাই এই পরীক্ষা করতে হবে। তাই আজ আমি একা চলেছি। আজ আমার পশ্চাতে আমার পাশে শতসংখ্য অল্পচরের প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির উপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে। তাই আমাকে জন-সাধারণের মাঝে অগ্রসর হতে হবে হিংসা ঘেব বিমুক্ত অন্তর নিয়ে। আমার অন্তরে কোন কলুবতা থাকলে আমার সাধনা ব্যর্থ হবে। তাই আমি দীনভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার মন থেকে সকল কালিমা দূর করেন, আমার আত্মায় তিনি যেন শক্তি দেন।...এই আমার তীর্থযাত্রা। সকল সংস্কার মুক্ত হয়ে সর্বদা দান করতে করতে দীন ভাবে নগ্নপদে তীর্থস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্থযাত্রীর আদর্শ। তাই আজ আমি নগ্নপদে চলেছি আমার তীর্থ পরিক্রমায়।...

গান্ধিজীর সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু, নাতনী মহু গান্ধী, উর্দু ভাষায় চিঠিপত্র লেখক সৈয়দ মহম্মদ আহমদ হুসর, আজাদ-হিন্দ ফৌজের কর্ণেল জীবন সিং এবং একদল সাংবাদিক। সাংবাদিকের দল যেন ভারী হয়ে না উঠে, সেইজন্ম পরে যারা এসেছিল তাদেরকে তিনি সটান বিদায় করে দেন, এর মধ্যে স্বজাতী ও বিদেশীর কোন পার্থক্য করেননি। যাত্রাজের হরিজন পত্রিকার প্রতিনিধিকেও চলে আসতে হয়েছে, আবার শিকাগো ডেনিনিউজের প্রতিনিধিকেও কিরে যেতে হয়েছে।

গান্ধিজীর সঙ্গে থাকতো গান্ধিজীর আগিস—একটি মাঝারী ধরনের টিনের বাকস আর একটি ছোট টাইপরাইটার মেশিন। এই বাকসটির মধ্যে থাকতো দরকারী যত কাগজ-পত্র আর তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন নির্মলকুমার বসু। দেশ-বিদেশ থেকে নানা ধরনের চিঠি নানা অভাব-অভিযোগের কথা প্রতিদিন গান্ধিজীর কাছে এসে পৌঁছাতো, তাছাড়া সংবাদপত্রে কত রকমের কত বিরূতি বেরতো। নির্মলবাবু প্রতিদিন সেই সমস্ত বাছাই করে খান চল্লিশেক চিঠি প্রত্যাহ গান্ধিজীকে দেখাতেন এবং গান্ধিজীর নির্দেশমত বেগুলির উত্তর দেওয়া প্রয়োজন উত্তর লিখে দিতেন।

এই চিঠির ব্যাপারে গান্ধিজীর কাছে ছোটবড় খ্যাতি অখ্যাতির বিচার ছিল না, উড়্ভিয়ার কংগ্রেস-সভানেত্রী মালতী চৌধুরীর চিঠির উত্তর দিতেন, আবার নোরাখালির অখ্যাত পন্নী ধর্মপুরের তেরো-চৌদ্দ বছরের এক ছোট মেয়ে কমরুন্নাগকে লিখতেও তাঁর সময়ের অভাব হয় নি।

আমাদের গান্ধিজী

বাংলা সরকারে নির্দেশ অনুযায়ী একদল পুলিশও থাকতো গান্ধিজীর পিছনে, তত্কালে। এই পুলিশ দলকে সরিয়ে নেবার জন্য গান্ধিজী বার বার অহরোধ জানান, কিন্তু পাছে মহাসত্বাধী ও তাঁর সঙ্গীরা কোন রকমে বিপর হয়ে পড়েন মেজন্ত বাংলা সরকার সে অহরোধ রাখেন নি।

গান্ধিজী বলেছিলেন—এখন আমি বাঙালী, এবং নোয়াখালীর অধিবাসী। আমি এখানে এসেছি তাদের কাজের অংশীদার হতে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতে।

বাঙালী গ্রামবাসীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলার জন্য, তিনি এই আটাত্তর বছর বয়সে আবার নতুন করে বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। বালিকা কমরুন্নেসাকে তিনি বাংলা ভাষাতেই চিঠি লিখেছিলেন :

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এত প্রশংসা করিয়াছ কেন যা, আমি তো সকলের যত একজন মানুষ। আমি অবিরত এই প্রার্থনাই করি—ঈশ্বর-আজ্ঞাভেরী নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান। ঈশ্বর তোমার নাম হে ভগবান, আপনি সকলকে শুভ মতি দান করুন। আমার অন্তরের এই প্রার্থনার সহিত তুমিও স্বীয় প্রার্থনা যোগ করিও।

ভক্তান্বিত—ইতি

মোঃ কঃ গান্ধী।

এই সম্মতির প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নি, নোয়াখালির চিন্তাশীল মুসলমানেরা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিল, পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছিল তাদের মনে। ভাটিয়ালপুরের এক মুসলমান গান্ধিজীর কাছে এসে বলে—মুসলমানেরা অনেক হিন্দু মন্দির ভেঙেছে কিন্তু ভবিষ্যতে কোন মন্দির আক্রান্ত হলে আমি আমার জীবন দিয়ে তা রক্ষা করবো।

কেম্বুরীতে মুসলমানেরা বলে—দুর্ঘর্ম আমি করি আর অন্তেই কল্লক দোষটা আমাদের সমগ্র মুসলমান সমাজের উপরেই এসে পড়েছে।

কাকিয়াতলীতে বসিকলা কেরানী নামে একজন মুসলমান বলে—আমরা শান্তি চাই, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। দুর্বৃত্তদের পাগলামির জন্য আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা যে ভুলভোগ ভুগেছে, আমরা তা থেকে একেবারে বাদ পড়িনি!

ওখানকার মুসলমান কর্মীরা বলে—সাধারণ পঞ্জীবাসী মুসলমান যাদেরকে একদিন

আবাহের গাছিকা

তুল বুকের কেপিয়ে তোলা হয়েছিল, তারা তাদের সব বুকে এক কলকর্ষের মত অগ্রগোচর করে, আবহা সকলেই এখন খাতি স্থাপনের মত উৎসুক।

এই ধরনের কথা গাছিকী আরো অনেকের মুখে শোনেন।

গাছিকী কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন—তোমরা মূলতঃই আইনের গ্রামে যাও ও তাদের সেবা কর। তাদের বুঝিয়ে দাও যে তোমরাই তাদের যথার্থ ভক্তাচার্যী প্রতিবেশী...আত্মনের পুরুষ ও নারী কর্মীগণকে একক এক একটি উপজাত গ্রামে গিয়ে সেখানকার নির্ধারিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাণ ও মানের রক্ষক রূপে অবস্থান করতে হবে। এই দুর্বল কাজে দায়িত্ব গ্রহণ করতে যদি কেউ অনিচ্ছুক হন, তিনি স্বচ্ছন্দে অন্য কোন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।...

এই নির্দেশ যেনে নিয়ে সেবাগ্রাম ও খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন, গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হয় :

১। শ্রীরামপুরে—মহাত্মা গান্ধী, তাঁর টেনোগ্রাফার শ্রীপরশুরাম ও সেক্রেটারী শ্রীনির্মল কুমার বহু। এটি পরে গাছিকীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বাধীন

কেন্দ্রের রূপ গ্রহণ করে।

২। চাঃগীরগাঁও—ভাস্কর সুনীলা নাথার ও শ্রীসৌরীন্দ্র কুমার বহু।

৩। কড়পাড়া—শ্রীমতী সুনীলা পাই ও শ্রীদেবী চৌধুরী।

৪। ভাটিয়ালপুর—শ্রীপ্যারীলাল ও শ্রীবিষ্ণুজেন সেন।

৫। পরকোট—শ্রীকান্ত গান্ধী ও শ্রীভূপালচন্দ্র কামার।

পরে এই কেন্দ্র রামদেবপুরে স্থানান্তরিত হয়।

৬। পানিমালা—শ্রীমতী আভা গান্ধীর পিতা শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়।

৭। চরমণ্ডল—শ্রীঠাকুর বাপা, শ্রীমতী আভা গান্ধী ও শ্রীঅরুণাশ্রু দে।

পরে এই কেন্দ্রটি ভেঙ্গে—হাইমচরে—শ্রীঠাকুর বাপা।

শিরগুী—শ্রীমতী আভাগান্ধী ও শ্রীঅরুণাশ্রু দে

৮। বান্দোরা—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সরকার

৯। দশঘরিয়া—শ্রীপ্রভুদাস প্যাটেল, ও শ্রীনাথেন্দ্র মিত্র।

১০। আমিষাপাড়া—শ্রীহৃদীর চন্দ্র লাহা ও শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস।

১১। কাজিরখিল—শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত।

প্রতিদিন কাজিরখিল ক্যাম্প থেকে শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের সম্পাদনায় 'পাণ্ডিত্যবিশন দিনলিপি' নামে একখানি খবরের কাগজ সাইক্লোরাইলে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হতো।

আমাদের গান্ধী

ভাঙে সৈন্যবাহিনী, কর্মীদের কার্যবাহী ও নির্দেশ দেওয়া থাকতো। একটি ব্যাটারী চলিত রেলিও বসানো হয়েছিল তাতে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সংবাদ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করে লোক মাঝে গান্ধীজীর কাছে পাঠানো হতো। একটি সভা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, এখানে রোগীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া কর্মীরা গাঁয়ে গাঁয়ে বনিয়াদী শিক্ষার কাজ ও গঠনমূলক কাজ চালাতে থাকেন।

কর্মীদের উৎসাহ দিয়ে গান্ধীজী বলেন—আমার চরিত্র যদি নিম্নলব্ধ হয়, মনে মুখে যদি আমি এক হই, তাহলে আমার কাজের ফল ফলবেই। আমার মৃত্যুতেও জা ক্ষয় হবে না। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সার্বজনীন জীবনে একই রূপ নিখুঁত ও পবিত্র হওয়া চাই। সেবার প্রেরণায় যদি তাঁরা কাজে লিপ্ত হয়ে থাকেন, দেখ মনে যদি তাঁরা পবিত্র হন, আমার নামের আকর্ষণে যদি তাঁরা আকৃষ্ট না হয়ে থাকেন, তবে আমার সহকর্মীদের সমবেত প্রায়শ্চিত্ত সময়ে ফলপ্রসূ হবেই হবে। কর্মীর মৃত্যুর সাথে তাঁর ভালকাজ ধুয়ে মুছে যায় এরূপ অন্ধ সংস্কার আমি কখনও মনে স্থান দিই না। পক্ষান্তরে ন্যতিকার খাটিকাজের ফল কর্মীর মৃত্যুর পর চিরকাল অমর হয়ে থাকে !

মহাত্মাজী বলেছিলেন—বিপুল শুভেচ্ছা নিয়ে নোয়াখালি এসেছি, আমি জানি নোয়াখালিতে যদি আমি ব্যর্থকাম হই, তাহলে আমার অহিংসানীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

কিন্তু নোয়াখালিতে মহাত্মাবের কার্যক্রম মোটেই সহজসাধ্য হয়নি। পানিয়ার প্রার্থনা সভায় পাঁচ হাজার হিন্দুমুসলমান সমবেত হয়েছে। মুরাইমের প্রার্থনা সভায় দশহাজার হিন্দুমুসলমান একত্র হয়েছে, আমিষাপাড়ায় পনেরো হাজার মুসলমান এসেছে গান্ধীজীর বাগী শুনতে। বৃদ্ধ মুসলমান এসে নত মস্তকে গান্ধীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছে। মুসলমানেরা স্বীকার করেছে—গান্ধীজী বর্তমান যুগে ভারতের কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতা! আবার তারই সঙ্গে দেখা দিয়েছে বিদ্বেষ। শিরগুীর সভায় যখন ‘আল্লা-হো-আকবর’ের সঙ্গে ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি উঠেছে তখন কোন এক মুসলমান উত্তেজিত হয়ে উঠে চীৎকার করে—এখানে যারা মুসলমান আছ তারা বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ কর না!

ডাক্তার হুসীলা নায়ার তখনই তাকে জিজ্ঞাসা করেন—আমরা হিন্দুরা ‘আল্লা-হো-আকবর’ ধ্বনি করতে পারি আপনাদের ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি করতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে ?

মুসলমানটি বলে—আপত্তির কারণ আছে।

কিন্তু কি সে কারণ তা সে বলতে পারে না

একদিকে দেখা গেছে বাক্ষরীতে অতি প্রত্যাশে গরীব মুসলমানেরা কাঁটা হাতে পথ পরিষ্কার করেছে মহাযানবের বাত্ৰা পথকে সুগম করে তোলার জন্য। কেউ তাদের সে কাজ করতে বলেনি, কেউ তাদের সেজন্য কোন পারিশ্রমিক দেয়নি, অন্তর থেকে তাদের আহ্বান এসেছে। আরেকদিকে দেখা গেছে কোথাও বড় বড় গাছের গার হাতে-লেখা পোষ্টার লাগানো :

তোমার বেখানে দরকার সেখানে বাও

ভণামি এখানে চলিবে না

পাকিস্তান মানিয়া লও

...

মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ

কায়দে আজম জিন্দাবাদ

পাকিস্তান কায়ম হউক

কংগ্রেস ধ্বংস হউক।

...

বিহারের কথা মনে কর

তাড়াতাড়ি জিপুরা ছাড়।

তোমায় বলি বারে বারে

তবুও তুমি ঘরে ঘরে

ভাল হবে ফিরে গেলে।

কোথাও বা রামধূনের রামনাম উচ্চারণে আপত্তি উঠেছে, কোথায় উঠেছে কোরাণ পাঠে—হিন্দুর কোরাণ পাঠে অধিকার নেই বলে। গান্ধিজী তার উত্তরে বলেছেন—নোয়াখালিতে আমি এক সম্প্রদায়কে বড় করে অপর সম্প্রদায়কে ছোট করতে আসিনি। আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সেবা করতে এসেছি। আমি যদি এখানে যরি, তবে আমি একথা বলে মরতে পারি যে আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সেবা করার জন্য এখানে এসেছি।... আমি নিজে হিন্দু, শুধু এই কারণেই আমি আমার অহিন্দু বন্ধুদের হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে বলি না। আমি নিজেকে খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, শিখ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বলে মনে করি। কারণ সকল ধর্মের ভাল জিনিষগুলি আমি গ্রহণের চেষ্টা করছি।

আমাদের গান্ধিজী

এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়ে দেয় দু'হাজার বছর আগের জেরুসালেমের আরেক সত্যব্রট। সর্বহারার বাণী—“Whither thou goest I will go, thy people shall be my people and thy god my god!” (তোমার পথই আমার পথ, তোমার আত্মীয়েরা আমারও আত্মীয়, তোমার ভগবান আমারও ভগবান।)

নোয়াখালিতে গান্ধিজীও ঠিক এই দিকেই চিন্তা করেন—বর্তমানে হিংসা, ঘৃণা ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহে পৃথিবী ভারাক্রান্ত ... আগে শুধু পরম ধর্ম সহিষ্ণুতায় বিন্যাস করতাম এখন এই সহিষ্ণুতা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে এখন সকল ধর্মকেই সমান বলে ভাবতে পারি।

একদল মানুষ গান্ধিজীকে সহিতে পারে নি। তারা অন্তরাল থেকে গান্ধিজীর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতে থাকে, কোথাও বা চলার পথে বিষ্ঠা লেপন করে রাখে, কোথাও সাকো ভেঙে দেয়, কোথাও বা মুহাম্মাদজীকে স্বাগতম জানবার জন্ত যে তোরণ তৈরী করা হয় রাতারাতি তা ভেঙে রাখে, মঙ্গলঘট ও কলাগাছ কেলে ছড়িয়ে দিয়ে যায়। এই দুর্বৃত্তদল যাদের মনে উদ্ভেজনা সৃষ্টি করতে চাইছিল, তারা কিন্তু এতে তেমনভাবে সাড়া দেয়নি, গান্ধিজী সেই পথে আসার আগে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীর দল পথ সাফ করে দিয়েছে, নতুন করে সাকো তৈরী করে দিয়েছে।

যারা নিরঙ্কর গ্রামবাসীদের মধ্যে হিন্দু-বিষেবের বিষ ঢুকিয়ে দিতে কৃত-সংকল্প হয়েছিল, তারা জানতো যে সংখ্যায় তারা যত কমই হোক না কেন, গ্রামবাসীরা তাদের কথতে পারবে না, গ্রামবাসীদের সে শিক্ষা নেই, তারা নিজেদের শক্তিকে চেনে না। শ্রীরামপুরে গান্ধিজী কথায় কথায় মুসলমানদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। গান্ধিজী জিজ্ঞাসা করেন—এই গ্রামে লোক সংখ্যা কত হবে?

—মুসলমান আছে প্রায় চৌদ্দ শো।

—ইস্কুল আছে কটি?

—বছর দুই আগে একটি ইস্কুল হয়েছিল, তাতে শ'দেড়েক ছাত্র পড়তো।

—তোমাদের মধ্যে বাংলা লিখতে পড়তে জানে ক'জন?

—চল্লিশ জন।

—য্যাটিক পাস করেছে কেউ?

—একজন।

—কোরাণ পড়েছে?

—আমাদের মধ্যে হাজার খানেক লোক কোরাণ আকৃতি করতে পারে কিন্তু মানে বোঝে না।

এই বাদের অবস্থা নেতৃত্ববিলাসী মুসলমানদের পক্ষে ধর্মের নামে মনোমত বা খুসি তাই ব্যাখ্যা করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা কত সহজ। তাই গান্ধিজী যখন তাদের কাছে কোরাণের বাণী ব্যাখ্যা করে শোনান—কোরাণে বলেছে ‘তুমি এই দুনিয়ার বেড়াতে এসেছ,—পথিক মাত্র। সেই ভাবেই চলেবে, মনে করবে তুমি যেন নেই, মরে-গেছ।’ এই বাণী অপেক্ষা উত্তম আর কিছু হতে পারে না। মৃত্যু তো আমাদের যে কোন মুহূর্তে হতে পারে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবার এ চমৎকার পথ।...হজরত মহম্মদ বলেছেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও সং তিনিই উত্তম, আর যে কোন অপকর্ম করে সে অধম। কথা দিয়ে কারুর বিচার করতে নেই, বিচার করতে হয় কাজ দিয়ে...হজরতের এই অমূল্য সাক্ষ্যের জন্য, কেবল মাত্র মুসলমানদের জন্য নয়।

দুবত্তেরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে, সত্যিকারের ধর্মকথা শোনাতে তো তারা চায় না কাজেই তারা আপত্তি তোলে—গান্ধিজীর কোরাণ পড়ার কোন অধিকার নেই।

নোয়াপাড়ায় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে।

কোথা থেকে একটি কুকুর এসে মহাস্বামীজীর সঙ্গ ধরে নানাভাবে সে গান্ধিজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, মুক পশু মহামানবকে কি যেন বলতে চায়, কি যেন জানাতে চায়।

গান্ধিজী ভ্রমণে বেরলে কুকুরটি আগে আগে তাঁর পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, মহামানব বোধ হয় তার অন্তরের কথাটি বুঝতে পারেন, অহুসরণ করেন কুকুরটিকে।

চৌধুরীদের পোষা কুকুর, চৌধুরী বাড়ীতে গান্ধিজীকে পৌঁছে দেয়। সে বাড়ীতে জনমানবের সাড়া নেই, একটি গৃহে শুধু এক রাশ মৃতের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কুকুরটি সেই কঙ্কালের পানে তাকায় আর গান্ধিজীর মুখের পানে মুখ তুলে আর্ত চীৎকার তোলে—ভো ভো ভো। বোধ হয় সে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববরণ্য মহাস্বামীর কাছে প্রশ্ন তুলতে চায়—কেন এমন হোল, কি এদের অপরাধ ?

এই কুকুরটি কয়েকদিন গান্ধিজীর সঙ্গে ছিল। সত্যনিষ্ঠ মানবের এই সাথীটি ছ’হাজার বছর আগের আরেক সত্যনিষ্ঠের কথা মনে করিয়ে দেয়। হয়তো সেদিন এই কুকুরটিরই কোন পূর্ব-পুরুষ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে স্বর্গের দরজা অবধি পৌঁছে ছিল,

সেই সংস্কার আজ তার পণ্ড-বোধকে সহজাত সামর্থ্য জুগিয়েছে যুগিতির প্রতিকূলে চিনে নিতে।

‘সার্জী’ ‘সামাদিসয়ের’ ও ‘একসেলসিয়র’ নামে তিনখানি কাগজের সম্পাদক ফরাসী সাংবাদিক মঁসিয়ে কার্টিয়ার ও মার্কিন ‘ক্রেণ্ডস, এম্বুলেন্স ইউনিটের’ হোরেস আলেকজাণ্ডার নোয়াখালিতে এসে গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করেন। কার্টিয়ার যখন গান্ধিজীর কাছে আসেন তখন তিনি স্বভাব-চিকিৎসায় চিকিৎসিত হচ্ছিলেন, কপালে বৃত্তিকার কলপ দিয়ে তিনি চোখ বৃজে পড়েছিলেন, ফরাসী ভাষাতেই তিনি কার্টিয়ারকে স্বাগতম জানালেন। গান্ধিজীর মুখ থেকে ফরাসী ভাষা শোনার প্রত্যাশা কার্টিয়ার করেন নি, তিনি বিশ্বিত হলেন কিন্তু খুসি কম হন নি। গান্ধিজী তাঁকে বললেন—ভিক্তর হুগোর ‘লা মিজারেবল’ আমি পড়েছি, প্যারিসের গলিপথে জিন ভালজিন হামাণ্ডি দিয়ে চলেছে—এই চিত্র এখনও আমার মনে ঝাঁকা আছে।

যুরোপ সম্পর্কে মহাত্মাজী ভবিষ্যৎবাণী করেন—হতে পারে যুরোপে সবাই হিংসাপরী, কিন্তু এইভাবে হিংসপন্থা অনুসরণ করতে থাকলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। হিটলার থেকে আরও জ্বরদন্ত হিটলার তাকে ধ্বংস করেছে এবং অনন্ত কাল ধরে এইরূপই চলাতে থাকবে।

হোরেস আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে গান্ধিজী আলাপ করেন জ্ঞান করতে করতে, জ্ঞানের ঘরে।

আটজন বৃটিশ সামরিক কর্মচারীও স্বদেশে ফিরে যাবার আগে সেদিন গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করে যান।

বৃটিশ-গিনির সাংবাদিক আয়ুব মহম্মদও সঙ্গীক নোয়াখালি এসে গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করেন।

গান্ধিজী নোয়াখালির বীভৎসতা জগতের মাঝে প্রচার করছেন মুসলীয় লীগাররা তা সহিতে পারলো না, তারা গান্ধিজীর মানবতার নীতি অস্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেনি, বার বার তারা গান্ধিজীকে উত্তাক্ত করেছে—আপনি বিহারে যান।

গান্ধিজী তার উত্তরে বলেন—নোয়াখালি থেকেই আমি বিহারের কাজ করছি।

গান্ধিজী জানতেন নোয়াখালি শান্ত হলে বিহারও শান্ত থাকবে। কারণ বিহারে যা কিছু ঘটেছিল তা নোয়াখালিরই প্রতিক্রিয়া। কলিকাতার পর নোয়াখালিতে প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের বীভৎসতা বিহারের হিন্দুদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। ছাপরা ও

কয়েকটি স্থানে হিন্দুরা 'নোয়াখালিকা বঙ্গলা শেও' বানি তুলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর চড়াও হয় (২৫শে অক্টোবর '৪৬)। চার হাজার বর্গ মাইল জুড়ে এই হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে এবং তিন লাখ মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু কংগ্রেসী পর্বকেষ্ট এই হাঙ্গামাকে বেশীদিন চলতে দেন নি। খবর পাওয়ামাত্রই বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও অফিস মন্ত্রীরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান (২৭শে অক্টোবর)। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও জয়প্রকাশ নারায়ণ সেখানে এসে পৌঁছান (২৯ ও ৩০ নভেম্বর)। প্রয়োজনমত পুলিশ গুলি চালায়, কলে চার শো জন হিন্দু নিহত হয়। ৫,৫৫১ জনকে গ্রেপ্তার করে ও ৬০,০০০ লোককে অভিযুক্ত করা হয়। কংগ্রেস-কর্মীরা চারিদিকে ভ্রমণ করেও হাঙ্গামা নিবারণ করার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টায় ২০০০ কর্মী হতাহত হন। গান্ধিজী বলেন—বিহার শান্ত না হলে তিনি আমরণ অনশন করবেন।

কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশ যা করে, বাংলার মুসলীম-লীগ মন্ত্রীরা তেমন কিছুই করে না, কিন্তু সেজন্য তারা এতটুকু লজ্জা পায় না, ফজলুল হক প্রভৃতি নেতারা কল্পিত অভিযোগ আর বিবৃতি প্রচার করতে শুরু করেন। তাদের খুসি করার জন্য নোয়াখালির অবস্থা পুরাপুরি শান্ত ও স্বাভাবিক হবার আগেই গান্ধিজীকে কিছুদিনের জন্য বিহারে যেতে হয়।

১২ই মার্চ থেকে বিহারের গাঁয়ে গাঁয়ে গান্ধিজী পল্লী পরিক্রমা শুরু করলেন। পঁচিশ দিন গান্ধিজী বিহারে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন খান আবদুল গফুর খান।

নোয়াখালিতে যা ঘটেছিল, বিহারেও ঘটেছিল ঠিক তাই। তবে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি গিয়েছিল উল্টে। নোয়াখালিতে মুসলমানেরা অভিযান চালিয়েছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে, বিহারে হিন্দুরা তার প্রতিশোধ তুলেছিল সেখানকার মুসলমানদের উপর। নোয়াখালির অত্যাচারিত হিন্দুরা যেমনভাবে গান্ধিজীর কাছে এসে চোখের জল ফেলেছিল, বিহারের দুর্গত মুসলমানেরা ঠিক তেমনভাবেই এসে দাঁড়িয়েছিল মহাত্মজীর দামনে। গান্ধিজী ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন—যারা বলছে যে বিহারে বা অস্থিষ্টিত হয়েছে তা নোয়াখালিরই প্রতিশোধ গ্রহণমাত্র—আমি দৃঢ়ভাবে বলবো যে তারা প্রতিশোধ গ্রহণের যথার্থ পন্থা জানে না। যে মনোবৃত্তির ফলে ভারতের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে শত্রু বলে মনে করে তা আত্মঘাতী!...অপর পক্ষ পক্ষ স্তরে নেমেছে বলে আপনারাও কি সেই স্তরে নামবেন! আপনারা যদি পুনরায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন তার পূর্বেই যেন আপনারা আমাকে হত্যা করেন।...অরিকাণ্ড ও নিরপরাধ ব্রীলোক

আমাদের গান্ধিজী

এক শিশুর হত্যা করাকে কেউ ভুল করে সাহসিকতার কাজ বলবে না, ইহা অতি ভয়ঙ্কর ভীকৃত্য।

উৎপীড়িত অশ্রুসজল মুসলমানদের মুখের পানে তাকিয়ে তিনি বলেন—সকল ধর্মেরই শিক্ষা এই যে সাহসের সঙ্গে দুঃখ সহ্যেতে হবে। আমার কাছে নোয়াখালিতে মুসলমানদের এবং বিহারের হিন্দুদের পাপের পরিমাণ একই এবং তাহারা সমভাবে নিন্দনীয়!

গান্ধিজী বাকীপুরে আসেন ৫ই মার্চ, সেখান থেকে ১০ই আসেন পাটনায়।

তারপর ১৩ই মার্চ—এবাজ্জা চক

১৪ই... খসরুপুর

১৭ই... মাসুরহি

২৪ শে... রাজঘাট

২৭ শে... ওকুড়ি

২৮ শে... আল্লাগঞ্জ (জহানাবাদ), মালাটি, গঙ্গাসাগর ও বেলা।

গান্ধিজী একটি আশ্রয়শিবিরও পরিদর্শন করেন, সেখানকার মুসলমানেরা দাবী জানায়—একটি বিশেষ অঞ্চল যেন মুসলমানদের বাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। মহাত্মাজী তার উত্তরে বলেন—কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে কেবল নিজেরা বাস করবার জন্য আপনারা গবর্নমেন্টের উপর চাপ দিতে পারেন না। নি কি জুরাবদি-সাহেবকে বলতে পারি যে নোয়াখালিতে কেবল হিন্দুদের থাকবার একটি অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া হোক! এইরূপ কোন দাবীর জন্য আমি নোয়াখালির হিন্দুদের কোনদিন উৎসাহিত করি নাই। আমি বরং তাদের বলেছি যে যদি তারা ভীত হয়ে পড়ে তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেলে তারা অস্ত্র চলে যেতে পারে। আর বিনিময়ে সম্পত্তি পেলে গবর্নমেন্ট ক্ষতিপূরণ দেবে নাই বা কেন! তেগনি আমি আপনাদের বলবো যে এইরূপ ব্যবস্থা আমার মনোমত নয়। এভাবে আপনাদের ঘর বাড়ী ছেড়ে যাওয়া তো ভীকৃত্য!

মন্ত্রীদের সাক্ষাৎ তিনি বলেন—যে সকল হিন্দুমন্ত্রী ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা যদি বলেন যে হিন্দুরা তাঁদের আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে, সেক্ষেত্রে তাঁদের আর মন্ত্রীদের পদে থাকা উচিত নয়—হিন্দুদের উন্নয়নের আশুনে তাঁদের পুড়ে মরারই বিধেয়। আসলে গবর্নমেন্টকে তো জ্বায়ে পক্ষ নিতে হবে; কোনরূপ অস্ত্র ব্যবহার করা তাঁদের চলে না।

গান্ধিজী দুর্গত বিহারীদের সাহায্যের জন্যও সর্বত্র আবেদন জানান।

আমাদের গান্ধীজী

আসবে শেষে আশার বেলা
তাই বলে কি রইবি খেদে,
ও তুই বারে বারে আলবি বাতি—
হরতো বাতি জলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না ।

ওনে তোমার মুখের বাণী—
আসবে ঘিরে বনের শ্রাণী,
তবু হরতো তোমার আপন ঘরে
পাশাপাশি হিয়া গলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না ।

বন্ধ দুয়ার দেখলি বলে
অমনি কি আসুবি চলে,
তোরে বারে বারে টলতে হবে
হরতো দুয়ার টলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না—

[—রবীন্দ্রনাথ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সব কাঁটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে মহাসম্মেলন বসলো দিল্লীতে ।
এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ জানানো হাল ।

সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে মহাত্মাজী এলেন ।

প্রথম দিন পয়লা এপ্রিল সম্মেলনের সমবেত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের
কয়েকটি প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন । প্রসঙ্গতঃ তিনি বললেন—এশিয়ার সকল দেশের
প্রতিনিধিগণ এখানে সমবেত হয়েছেন । ইউরোপ আমেরিকা অথবা যে সকল দেশ
বা জাতি এশিয়ার অন্তর্গত নয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য কি আপনারা
এখানে এসেছেন ! না, অবশ্যই সেরূপ কোন উদ্দেশ্য আপনারাদের নেই । একথা বলতে
আমার কোন বাধা নেই যে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ অহিংস উপায়ে তার স্বাধীনতা অর্জন
করে যদি সেই স্বাধীনতা পৃথিবীর কোন অংশের কোন জাতির স্বাধীনতা হরণ করার
কাজে নিযুক্ত করে তবে তা অতীব দুঃখের বিষয় হবে । ইউরোপের অধিবাসীরাই
এরূপ কাজ করেছে । তারা এই বিশাল মহাদেশের বিভিন্ন জাতিকে শোষণ করেছে ।
এশিয়াকে বাঁচতে হবে এবং পশ্চিমের অসংখ্য জাতির জায়গা স্বাধীনভাবে সে বাঁচবে
—সম্মেলন থেকে বিদায় নেবার আগে এই দৃঢ় সঙ্কল্প যদি আপনারা গ্রহণ না করেন

আমাদের গান্ধিজী

তবে তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে। আমি এই কথাই বলতে চাই যে এইরূপ সম্মেলন নিয়মিত ভাবে হওয়া চাই। যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন কোথায় তা অনুষ্ঠিত হবে, তা হলে বলবো ভারতভূমিই তার উপযুক্ত স্থান।

দ্বিতীয় দিন মহাত্মাজী সম্মেলনে তাঁর ভাষণ দিলেন। মহাত্মা বলেন—বঙ্গুগণ আপনারা ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ দেখেন নি। প্রকৃত ভারতীয় মহাত্মাওয়ার মধ্যে আপনারদের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, লাহোর, এবং অগ্রান্ত বড় বড় শহর তো পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত। যদি আপনারা সত্যই ভারতের শ্রেষ্ঠ রূপ দেখতে চান, তাহলে আপনারা গাঁয়ের ভাণ্ডীদের কুটীরে যান, সেখানে তা পাবেন। ভারতে এইরূপ সাত লাখ গ্রাম আছে এবং ৩৮ কোটি লোক এইসব গাঁয়ে বাস করে।... আমি ভারতের এক প্রান্ত হতে অগ্র প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছি। দেখেছি বহুস্তরের অসহায় রূপ, দেখেছি যাহুরের দীপ্তিহীন চোখ। এসকল যাহুর নিয়েই ভারতবর্ষ। ওই সকল নগর কুটীরে এবং এই আবর্জনাস্তূপের মধ্যেই ভাণ্ডীরা বাস করে। সেইখানেই আপনারা জ্ঞানের সারতত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারবেন।... যে সকল মহামানব পশ্চিমকে জ্ঞানদান করেন তাঁদের মধ্যে জোরোয়াটারই প্রথম, তিনি ছিলেন প্রাচ্যের লোক। বুদ্ধ তাঁর অনুগামী, তিনিও ভারতবর্ষ অর্থাৎ পূর্বদেশের লোক। বুদ্ধের পর এলেন বীশু, তিনিও পূর্বদেশের। বীশুর জন্মের পূর্বে ছিলেন মোজেস্। তাঁর জন্ম মিশরে হলেও আসলে তিনি প্যালেস্টাইনের লোক। বীশুর পরে এলেন মহম্মদ। আমি কৃষ্ণ রাম ও অগ্রান্ত জ্যোতিষীদের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তাই বলে তাদের দীপ্তি কম ছিল না।... পৃথিবীতে তো এমন কোন ব্যক্তি দেখিনা যারা উল্লিখিত মহাপুরুষদের তুল্য হতে পারেন। দুঃখের কথা বলতে হচ্ছে যে খৃষ্ট ধর্ম যখন পশ্চিম দেশে প্রচারিত হোল তখন তা দ্বিভুক্ত হোল।... এশিয়ার বাণী কি তাই আমি আপনারদের বোঝাতে চাই। পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে অথবা আশবিক বোমার পক্ষা অনুসরণ করে ইহা বোঝা যাবে না, আপনারা যদি পশ্চিম মহাদেশকে কোন বাণী দিতে চান তবে তা সত্য এবং প্রেমের বাণী হবে। আমি কেবল আপনারদের অন্তর অধিকার করতে চাই। এখন গণতন্ত্রের যুগ। যারা অত্যন্ত দরিদ্র তারাও আজ জেগে উঠেছে। এই সময়ে আপনারা দৃঢ়ভাবে আপনারদের বাণী প্রচার করতে পারবেন। আপনারা শোষিত হয়েছেন বলে প্রতিহিংসার দ্বারা আপনারা পশ্চিম-দেশ জয় করবেন না। প্রাচ্যের এই সকল মানীষিগণ যে বাণী রেখে গেছেন আপনারা যদি কেবল বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে তা বুঝতে চেষ্টা করেন এবং সেই বাণী হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করেন তাহলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে

আমাদের গান্ধিজী

শাস্তাত্মকে সম্পূর্ণভাবে জয় করা বাবে। আর পাশ্চাত্য এই বিষয় বেছায় আলিঙ্গন দাবে। পৃথিবী আজ জ্ঞানের তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠেছে।...পাশ্চাত্য আজ বেছে যে আণবিক বোমার ব্যবহারে কেবল পশ্চিম মহাদেশ নয়, সারা বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। বাইবেলে যে প্রাচ্যের কথা বলা হয়েছে তা বোধহয় আগন্তপ্রায়। মাপনাদের কাজ পৃথিবীবাসীকে তাদের শঠতা ও পাপের কথা জানিয়ে দেওয়া। মাপনাদের ও আমাদের শিক্ষাশুষ্করণ এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

প্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের মনে এই অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষীণকর্তৃ কি গান্ধীর রূপাংকন করেছিল তা বোঝা যায় সভাশেষে যখন তারা একে একে গান্ধিজীর কাছে আসেন তাঁদের দেশবাসীর জন্য আশীর্বাদ যাক্সা করতে।

ভিক্টরী প্রতিনিধিকে গান্ধিজী বললেন—বুদ্ধের বাণী জাগ্রত করে জোলাই মাপনাদের কর্তব্য।

আরব প্রতিনিধিকে গান্ধিজী বলেন—আপনারা ইহুদীদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করবেন।

ইহুদী প্রতিনিধিকে গান্ধিজী বলেন—আপনারা সম্ভ্রামূলক আন্দোলন থেকে বিরত হন। হিংসার পথে কোন শুভ ফল ফলবে না।

ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম প্রতিনিধিদের গান্ধিজী বলেন—তরবারীয়া দ্বারা যে ক্ষয় হবে, তরবারীতেই তার ক্ষয়ও হবে। হিংসার ভিত্তিতে কোন স্থায়ী কল্যাণ হতে পারে না।

বিদায় কালে প্রতিনিধিরা অমৃতকুমারী কাউরকে বললেন—আমরা যেসব মাহুষ দেখেছি, ইনি তাঁদের সকলের থেকে স্বতন্ত্র।

একজন বলেন—তাঁকে দেখবার সুযোগ না মিললে ভারত দর্শন আমাদের অসম্পূর্ণ থাকতো!

একজন মহিলা প্রতিনিধি বলেন—তোমাদের ভাগ্য ভালো যে তোমরা এমন নেতা পেয়েছ। এমন নেতার নেতৃত্ব পেলে আমাদের হানাহানি কাটাকাটি করতে হতো না।

‘একদা এ ভারতের কোন বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দ বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে—‘শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ

আমাদের গান্ধিজী

বিষ্য বাসবাসী, আমি জেনেছি তাঁদের,
মহান পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্পূর ; তাঁরে জেনে, তাঁর পথ চাছি
মৃত্যুরে লজ্জিতে পারো, অস্ত পথ নাহি ।
রে বৃত্ত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, অস্ত নাহি পথ ।

[—রবীন্দ্রনাথ

দিল্লী থেকে বড়লাটের চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য গান্ধিজী ও জিন্নার এক যুক্ত আবেদন প্রচারিত হয় :

সম্প্রতি যে সকল বে-আইনী ও হিংসাত্মক কাজ ভারতবর্ষের সুনামকে কলঙ্কিত করিয়াছে এবং নির্দোষ লোকদের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে—কাহারো আক্রমণ করিয়াছে আর কাহারো আক্রান্ত হইয়াছে সে বিচার এখন না করিয়া আমরা এই সকলের জন্য আমাদের অন্তরের গভীর বেদনা জানাইতেছি ।

রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগ করা আমরা সর্বকালের জন্য নিন্দা করি এবং ধর্ম বিশ্বাস যাহার ঘেরুপই হউক না কেন, ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়কে আমরা আবেদন জানাইতেছি যে তাহারো যে কেবল হিংসাত্মক ও শাস্তি শৃঙ্খলা নষ্টকারী কার্য করিতে বিরত থাকিবেন তাহাই নহে, কথায় ও লেখায় যেন তাহারো এমন শব্দ ব্যবহার না করেন যাহাতে লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে ।

(স্বাক্ষর)

এম, এ, জিন্না

(স্বাক্ষর)

এম, কে, গান্ধী

১৫ই এপ্রিল ১৯৪৭

এই আবেদন সম্পর্কে পরে গান্ধিজী বলেন—এই প্রকার আবেদন প্রচারের চেষ্টা করার জন্য বড়লাট সকলেরই ধন্যবাদের যোগ্য । তবে বড়লাটের মধ্যস্থতা ভিন্ন মিটার জিন্না ও আমি এই প্রকার আবেদন প্রচার করতে পারলে আরও ভালো হোত । যাই হোক মিটার জিন্না বড়লাটের নিকট এই প্রচার-পত্রে সহি করে আমার সম্মান অঙ্গীকার হয়েছেন । তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর স্ব-সম্প্রদায়কে তিনি সহজেই শাস্ত করতে পারেন । আমি হিন্দু হিসাবে কিছু ওতে স্বাক্ষর করিনি । কারণ আমি হিন্দু হিসাবে কোন কাজ করিনা । প্রত্যেক ধর্মই আমার সম্মান প্রিয়, আমি বিশ্বাস করি যে, সকল ধর্মের ডিভিই এক । ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করছি যে, তিনি ভারতবাসীকে এই সুমতি দিন যেন তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ হাতে বিরত হয় ।

দিল্লী থেকে গান্ধিজী আবার বিহারে এসেন। ১৫ই মে থেকে ২৪শে মে পর্যন্ত তাঁর আদেশে কয়েকটি অঞ্চল তিনি পরিক্রম করলেন :

১৬ই মে গুলজারী বাগ (পাটনা থেকে সাত মাইল)

১৯ শে মে বাঢ়ে (পাটনা থেকে চল্লিশ মাইল)

২০ শে মে হিলসার (পাটনা থেকে ছাব্বিশ মাইল)

২১ শে মে বিক্রম (পাটনা থেকে ত্রিশ মাইল)

২২ শে মে ক্ষতেশ্বর (পাটনা থেকে ষোল মাইল)

নোয়াখালিতে যেমন লীগপহীরা অভিযোগ তুলেছিল যে গান্ধিজী সেখানে হিন্দুদের সেবা করতে এসেছেন, বিহারেও তেমনি অভিযোগ উঠলো যে গান্ধিজী সেখানে মুসলমানদের ভোষণ করতে গেছেন। তার উত্তরে গান্ধিজী বাকীপুরের ময়দানে প্রার্থনা সভায় বললেন—সমগ্র জীবন আমি অম্মায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, কারও ভোষামোদ করা আমার জীবনের ধর্ম নয়। মহাত্মা সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাওয়াই আমার জীবন-ধর্ম। এর মধ্যে কোথাও ভোষামোদের স্থান নেই। কোন ব্যক্তি সভাবাদী, অহিংস, অকপট ও বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হলে সে কারও ভোষামোদ করতে পারে না।

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিবাক্ত নিঃশ্বাস

শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে বার্ষ পরিহাস—

বিধায় নেবার আগে তাই

ডাক দিয়ে যাই—

দানবের সাথে দার সংগ্রামের তরে

প্রস্তুত হতেছে যবে যবে !

[—রবীন্দ্রনাথ

বিহার থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে কাশ্মীর।

কাশ্মীরে গান্ধিজী তিনদিন ছিলেন, ১লা থেকে ৪ঠা আগষ্ট। আশ্রয় প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন, মহারাজা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। শ্রীনগরে দু'দিন ও জম্মুতে একদিন প্রার্থনা সভা বসে। স্বাধীন ভারতে কাশ্মীরের অবস্থা কি হবে সেই সম্পর্কে গান্ধিজী বলেন—যে দলিলটিকে অমৃতসর সন্ধিপত্র বলে গৌরব দেওয়া হয় তা দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। উহা আসলে একটি বিক্রয় কবান্দা মাত্র। ১৫ই আগষ্ট তারিখে তার আর কোন মূল্য থাকবে না বলে মনে হয়। উহাতে এক

আমাদের গান্ধিজী

পক্ষে ব্রিটিশ বড়লাট বিক্রোতা ও অপর পক্ষে মহারাজ গুলাব সিং ক্রোতা ছিলেন। এখন এই সন্ধিপত্রটি বাতিল হয়ে গেলে...সাধারণ বুদ্ধিমত্তেত কাশ্মীর ও জম্মু রাষ্ট্রের ভাগ্য কাশ্মীরের প্রজাদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। যত শীঘ্র এই ব্যবস্থা করা যায় ততই ভালো।.....

লীনগর থেকে সোদপুর—মহাভারতের উত্তর প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তে।

কলিকাতার নাগরিক জীবনে তখনও শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসেনি। মহাআত্মী বিভিন্ন উপক্রমত অঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করে দেখলেন। তারপর সুরাবদীর্ঘ কাছে প্রস্তাব করলেন—কলিকাতার দাঙ্গা নিবারণের জন্য আসুন আমরা উভয়ে একসঙ্গে শান্তি-অভিযানে বাহির হই, বিধ্বস্ত অঞ্চলের কোনও একটি পরিত্যক্ত গৃহে আমরা উভয়ে একই কামরায় বাস করবো। দু'জনেই একসঙ্গে দুর্গত হিন্দু মুসলমানের দুঃখের কাহিনী শুনবো।

দু'দিন পরে মহাআত্মী বেলঘাটায় এক মুসলমানের বাড়ীতে এসে উঠলেন (১৩ই আগষ্ট)। সহীদ সুরাবদীর্ঘকেও থাকতে হোল তাঁর সঙ্গে একই ঘরে। গান্ধিজীর সঙ্গে রইলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, আভা গান্ধী ও মাহু গান্ধী। কলিকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার উছোজা সুরাবদীর্ঘকে এতটা ঘনিষ্ঠ করে দেখা কলিকাতার হিন্দুরা সহিতে পারলো না। কোন কোন হিন্দু বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো, সাড়া তুললো—গান্ধিজী ফিরে যাও।

কিন্তু 'করেছে বা মরেছে' যার নির্দেশ তাঁর চিত্তের স্থিরতা এতো সহজে বিচলিত হয় না।

তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,

নাসাবুর্ধ্বিত্ব মতং ন ভিন্নম্।

ধর্মন্ত তস্বং নিহিতং গুহায়াং,

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

(তর্ক দিয়ে কর্তব্য নির্ণয় হয় না, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, এমন ঋষি নাই, যার মত ভিন্ন নয়। ধর্মের গুচতত্ত্ব গুহায় নিহিত, মহাজন যে পথে গমন করেন সেই পথের অনুসারী হওয়াই কর্তব্য।)

মহামানবের সত্য-ধর্মই শেষে জনগণের মনকে আলোকোদ্ভাসিত করলো। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হিন্দু মুসলমান পূর্ব শত্রুতা ভুলে গিয়ে পরস্পরকে সম্মানভাবে গ্রহণ করলো। হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করলো,

আবাদের গাঙ্কিজী

একসঙ্গে ভোরণ বাঁধলো, একসাথে পতাকা উড়ালো, হাত ধরে পাশাপাশি বাহির হয়ে পড়লো কলিকাতার রাস্তাপথে। গাঙ্কিজীর প্রেম ও নিষ্ঠা অলৌকিক সাফল্য যুক্ত হোল, যে কলিকাতা শহর থেকে সর্বপ্রথম দাক্ষার উদ্বোধন হয়েছিল সেই সহরেই সর্বপ্রথম মিলনের মহাতিথি উদ্‌ঘাপিত হোল।

এই মিলনকে স্থায়ী করার জন্য গাঙ্কিজী শহর ও শহরতলীতে ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। পনেরো দিন ধরে চললো, ১৭ই আগস্ট থেকে ৩১শে পর্যন্ত : নারিকেলডাঙ্গা, মোহোমেডান স্পোর্টিং গ্রাউণ্ড, সরকার বাগান, পোলক ষ্ট্রীট, পার্ক সার্কাস, দেশবন্ধু পার্ক, আলিপুর, গড়ের মাঠ, হাওড়া ময়দান, বালিগঞ্জ লেক ময়দান, মেটেবুজ, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ, টালিগঞ্জ পুলিশ লাইন, বারাসত, বাগমারী। প্রার্থনা সভায় সমবেত শতসহস্র জনগণের পানে তাকালে মনে হোত না, যে এই শহরের বুকে কোনদিন হিন্দু মুসলমানের মাঝে কোন বিষে ছিল, ক’দিন আগেও তারা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারতো না।

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাক্ষার অন্ততম হোতা সহীদ হুসাবদী একদিন সভার মাঝে বললো—মহাত্মা গাঙ্কীকে প্রকৃতই মহাত্মা বুঝতে পেরে আমি তাঁর পায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছি।

৩১শে আগস্ট রাত্রে ঘটলো ব্যতিক্রম। রাত্রে বেলঘাটার বাড়ীতে একজন হিন্দুকে নিয়ে আসা হোল; রব উঠলো—তাকে ছুরি মারা হয়েছে, কিন্তু তার দেহে ছুরিকাঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না।

পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল আবার সেই হাঙ্গামা। বারা অন্য সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করে তাদের পাড়ায় গিয়েছিল, অন্তর্কিত আক্রমণে তাদের মধ্যে নিহত হোল পকাশ জন, আহত হোল তিন শো।

গাঙ্কিজী বললেন—দাক্ষাকারীদের মাঝখানে চলে যাও। তাদের এই উন্মত্ততা থেকে নিরস্ত কর, অথবা সেই চেটায় প্রাণ দাও। কিন্তু ‘পারলাম না’ এই কথা বলার জন্য জীবন্ত কিরে এসো না। অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ, তাতে নেতৃহীনীদের উপর আত্মহত্যার আহ্বান এসে পড়েছে। আজ অবধি একমাত্র গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী ছাড়া অজ্ঞাত ও অখ্যাত সাধারণ লোকই এই সর্বধ্বংসী আগুনে আহুতি পড়েছে, ইহা তো যথেষ্ট নয়।

শান্তি সেনা দল বেরিয়ে পড়লো পথে, সাড়া তুললো—হিন্দু-মুসলমান এক হও!

নাথোদা মসজিদের কাছে শান্তি-সেনার প্রথম দলটি আক্রান্ত হোল। দলের

আমাদের গান্ধী

আগে ছিলেন শট্টনমিত্র ও তাঁর তিনজন সঙ্গী, শুধু তারা তাদের ছুরি বারলো। শট্টনমিত্র হাসপাতালে মারা গেলেন। গান্ধীজী বললেন—ভারতের স্বাধীনতাকে অস্বস্তি রাখতে হলে আরো অনেককে এরূপ ভক্ত আত্মত্যাগ করতে হবে।

শট্টনমিত্রের পরীকে তিনি লিখলেন—শট্টন মিত্র অমর হয়েছে। এরূপ মৃত্যু জ্ঞো হৃদয়ের নয়, বরং আনন্দের। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তুমি তাঁর প্রতি জোন্মার প্রেবের পরিচয় দিতে পার।

মৃত্যুবোলা তিনি জানালেন—যন স্থির করে কেলোছি, আমি অনশন আরম্ভ করবো।

রাত্রি ৮-১৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন, বললেন—বতদিন না এই অবস্থার পুনরায় প্রকৃত পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন আমি অনশন ত্যাগ করবো না। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে এইরূপ হানাহানি দেখা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয় বলে মনে করি।

আড়াই হাজার বছর আগে খেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে এক রাজার কুমার এমনি কটি-বস্ত্র গ্রহণ করে, জনগণের কল্যাণ কামনায় গয়ার এক অশথ গাছের তলে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

ইহাসনে শুগতু মে শরীরম্
অগস্থি মাংসং প্রলয়ক যাতু
অশ্রাপ্য বোধিম্ বহুকল্প দুর্ভাং
নৈবাসনাং কায়ঃ অন্তলিগ্নতে ॥

(এই আসনেই আমার দেহ ধ্বংস হোক, কিন্তু মানবসমাজে বহুযুগের আকান্ধিত মুক্তির সন্ধান না পেলে আমি আর এখান থেকে উঠবো না।—ভগবান তথাগত)

এক বন্ধু গান্ধীজীকে এসে বললেন—একটু অপেক্ষা করে দেখলে কি ভালো হোত না?

গান্ধীজী বললেন—পরে করলে অত্যন্ত দেরী হয়ে যাবে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিপক্ষনক অবস্থায় ফেলে রাখা যেতে পারে না। আমার অনশন থেকে কোন মঙ্গল লাভ করতে হলে অমঙ্গলকে রোধ করার জন্তই তা করতে হবে। কলকাতাকে আয়ত্রে আনা গেলে পাঞ্জাবের ব্যবস্থাও সহজ হবে। কিন্তু এখন পা টললে আশ্রয় ছড়িয়ে পড়বে। এবং আমি পরিষ্কার দেখছি শত্রুই দুই বা তিনটি শক্তি

আমাদের গাঙ্ঘিজী

আমাদের উপর এসে পড়ে আমাদের এই কলঙ্কারী বাধীনতার অরকে শেষ করে দেবে।

—কিন্তু যখন আপনার যদি বৃত্ত্য হয়, তাহলে আগুন ত আরো ভয়ঙ্কর হবে কেন ?

—আমাকে অন্ততঃ তা দেখতে হবে না। কিন্তু আমার খেঁচু করবার জাতি করা হবে। মাদ্রাসের হাতে এর চেয়ে বেশী কিছু করবার নেই।

অনশনের তৃতীয় দিনে মুসলীম লীগের এক সম্মত এসে গাঙ্ঘিজীকে বললেন—
আমাদের মাঝে আপনার উপস্থিতিই আমাদের এক বড় সম্পদ। ইহাই আমাদের নিরপত্তার নিশ্চয়তা। আমাদের এ' থেকে বঞ্চিত করবেন না।

গাঙ্ঘিজী বললেন—সে দিন তো আমার উপস্থিতির জন্য দাখাকারীরা খামে নি। তাদের কাছে তখন আমার কথার কোন ফলই হয় নি। আমার অনশন তখনই ভঙ হবে, যখন এই আগুন নিভবে এবং গত পনেরো দিনের সেই স্বাভাবিক অকলঙ্ক শান্তি আবার ফিরে আসবে। মুসলমানেরা যদি প্রকৃতই আমাকে ভালবাসে এবং আমাকে তাদের সম্পদ বলে মনে করে তবে তারা সমস্ত কলকাতা যদি কেপে বায় তথাপি নিজের প্রতিহিংসা ও প্রতিঘাত-বৃত্তির নিকট পরাজয় না মেনে আমার প্রতি তাদের এই বিশ্বাস প্রমাণ করে দেবে। ইতিমধ্যে আমার এই সংকটময় পরীক্ষা চলতে থাকবে।

পরে গাঙ্ঘিজী বলেন—চুক্তিকারিগণ আমাকে বাঁচাবার জন্য নয়, নিজের স্বয়ং পরিবর্তন করে অন্তায় থেকে বিরত হোক। সকলেই বুঝুক একটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা শান্তি আমাকে সম্ভব করতে পারবে না। একটি সাময়িক শান্তির পর আবার আরও ভয়ঙ্কর আগুন জলে উঠবে তা আমি চাই না। তা যদি হয় তবে আমাকে সর্বহীন অনশন গ্রহণ করে মরতে হবে।

কিন্তু কলিকাতা-বাসী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানবকে সম্রাট অন্তরে ব্যক্তিগত ক্ষয় কতির অনেক উপরে স্থান দিয়েছিল। ছাত্র, শ্রমিক ও কেরানীরা দলে দলে এগিয়ে এলেন অশান্তি শেষ করার জন্য, সমস্ত উপকৃত অঞ্চল দিয়ে শান্তি শোভাবাজী বেকলো।

শোভাবাজীর পথ কিন্তু সর্বত্র সরল সাক্ষ্যময় হোল না। পার্লামেন্টে গম্যমান একদল শোভাবাজী আক্রান্ত হোল (৩রা সেপ্টেম্বর ৪৭), তাদের বাঁচাতে গিয়ে কংগ্রেস-কর্মী স্বতীশ বন্দোপাধ্যায়, তুশীল দাসগুপ্ত, ও বীরেশ্বর ঘোষ ছোঁয়ার আঘাতে প্রাণ দিলেন। গাঙ্ঘিজী বললেন—তাই সম্রাটকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য এক্ষণ নির্দোষ জীবন আহুতি দেবার প্রয়োজন আছে !

আমাদের গান্ধিজী

সত্যই প্রয়োজন ছিল ; বাঙালী আতি গান্ধিজীর নির্দেশকে সার্থক করে তোলার জন্য কি চরম মূল্য দিতে পারে, তা প্রামাণিত হোল। স্বাধীনতার অপ্রতীহত গতিকে মুষ্টিমেয় গুণা প্রতিহত করতে পারলো না। কলিকাতায় আবার শান্তি ফিরে এলো। শত শত যুবক এসে গান্ধিজীর কাছে যত বে-আইনি অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করলো, বললো—বাপুজী, আমরা আপনার নিকট শান্তি চাই।

মহাত্মাজী বললেন—তোমাদের কঠোর শান্তি দোষ। শহরের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তোমাদেরই গ্রহণ করতে হবে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ২-১৫ মিনিটের সময় গান্ধিজী অনশন ভঙ্গ করলেন। সন্ধ্যাত ও প্রার্থনার পর ডাক্তার দীনশা মেহতা লেবু রস তৈরী করে দিলেন, সুরাবর্দ্ধীর হাতে গান্ধিজী সেই মিষ্টরস পান করলেন।

গান্ধিজীর কলিকাতার কাজ শেষ হোল।

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কতু নহে অঙ্গ।

অহিংসা নিরমাদি বুলে কৃষ্ণ সঙ্গ।

* * *

সর্বাকর্ষক সর্বাহ্বাদক মহারসায়ন।

আপনার বলে করে সর্ববিস্মরণ।

ভক্তি স্থখ মুক্তি সিদ্ধি ছড়ায় বার গন্ধে।

অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণ কুপার বাক্ষে।

শাস্ত্র যুক্তি নাহি ইহা সিদ্ধান্ত বিচার।

এই স্বভাব গুণে যাতে মাধুর্যের সার।

* * *

ঐশ্বর্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।

ভক্ত বাৎসল্য আত্মা পর্যন্ত বদান্ততা।

অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।

কারও মন কোনগুণে করে আকর্ষণ।

[—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গান্ধিজী এলেন দিল্লীতে।

রাজধানীর সাম্রাজ্য তখন সাম্রাজ্য-আইনের বিঘ্নস্তায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

১৫ই আগস্ট ভারতভূমিকে খণ্ডিত করে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছে। নবগঠিত মুসলীয়-প্রধান রাষ্ট্র কমতা লাভ করেই পশ্চিম পাকিস্তান, সিন্ধ, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানেরা হিন্দুর ঘরে ঘরে হানা দিয়েছে, অতর্কিতে হত্যার অভিযান

চলিয়েছে, লুণ্ঠ করেছে, নেয়েদের অপমান করেছে, বুহে বুহে আগুন জ্বলিয়েছে। যারা কোন রকমে বাঁচলো তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে জুঁ আশ নিয়ে পলায়ন করে, ঘোঁটারে ও বিমানে নিকরেশের পথে বাজা করলো।

কিন্তু ভারতে আসার পথ নিরাপদ ছিল না। সীমান্ত অতিক্রম করাই হোল এক নির্ভয় সমস্যা। শেষে লোক বিনিময়ের ব্যবস্থা হোল,—এখান থেকে মুসলমানেরা যাবে তবে ওখান থেকে হিন্দুদের ছাড়া হবে। দু'টি হুজুরত আভির বন্দী বিনিময়ের মত।

বিশ শতাব্দীতে ধর্মের নামে এমন বীভৎস হত্যাযজ্ঞান পৃথিবীর কোন দেশকে কলঙ্কিত করেনি! চার্লিস বহুদিন ধরে এই ব্যাপারেরই আভাষ দিয়েছিল, পাকিস্তানীরা সেই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুললো !!

সর্বহারার দল ভারতীয় ইউনিয়নে এসে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠলো, দিল্লী অকলে মুসলমানদের জীবন হয়ে উঠলো বিপন্ন। বহু মুসলমান ঘর বাড়ী ছেড়ে আশ্রয়-শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিল।

দিল্লী পৌছেই মহাত্মাজী মহরের প্রায় চল্লিশ মাইল পরিভ্রমণ করলেন, বললেন—প্রতিশোধ কখনই প্রতিকার নয়। এতে আসল ব্যাধিই আরও দুর্ব্যায়গ্য হয়ে উঠবে। যারা নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যাপৃত, আমি তাদের নিবৃত্ত হতে একান্ত অনুরোধ করছি।... দিল্লীর অবস্থা শাস্ত করবার জন্য আমি 'করছে ইয়ে ময়েছে' নীতির প্রয়োগ করবো।

প্রতিদিন তিনি মুসলীম আশ্রয়প্রার্থী-শিবিরগুলি পরিদর্শন করতে লাগলেন, নরনারী ও শিশুদের সাহায্য দিয়ে তিনি বললেন—এতদিন যারা ভ্রাতৃত্বাবে পাশাপাশি বাস করছিল, আলিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে যাদের রক্ত একত্র প্রবাহিত হয়েছিল, তারা কিরূপে যে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হতে পারে, তা ভাবতেও কষ্ট বোধ হয়! হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীরা পশ্চিম পাক্সাব হতে যে ভাবে দলে দলে পূর্ব পাক্সাবে চলে আসছে তা চিন্তা করলেও বিহ্বল হতে হয়। অগতের ইতিহাসে এর তুলনা নেই!

হিন্দু ও শিখদের গাঙ্গিজী বললেন—পাকিস্তান হতে অমুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে ভারতবর্ষ থেকে মুসলমানদের বিতাড়ণ করা ঠিক হবে না। পাকিস্তান তুল পথ গ্রহণ করেছে বলে ভারতবর্ষ কেন সে তুল কাজ করবে? তবে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর যে অত্যাচার চলছে, তা উপেক্ষা করার কথা আমি ভারত গবর্নেন্টকে বলিনি। সেখানকার হিন্দু ও শিখদের যথাসাধ্য রক্ষা করতে ভারতসরকার বাধ্য। কিন্তু পাকিস্তানের পথ অনুসরণ করে ভারতবর্ষ হতে মুসলমান বিতাড়ণ ঠিক নয়। তবে যে সকল মুসলমান এখানে থাকতে চায় না,

সাঁহাবাৰে সাহিবী

ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ সীমান্ত গৰ্ভত পৌছে দেখা কৰ্তব্য। আজি চলিছে ভাৰতে মুসলমান-
দেৱ ৰাখা হ'বে না, আজি বন্ধন মুসলমানদেৱ বিৰুদ্ধে এই ধৰ্ম উঠেছে, কাল পাৰ্শী,
খুটান ও ইউৰোপীয়দেৱ অবস্থা কি হ'বে? অনেক বন্ধু আমাৰ ১২৫ বছৰ বাঁচবাৰ
আশা ৰাখেন, কিন্তু ভাৰতৰ এই ঘেৰ ও হানাহানি দেখে আমাৰ আৰ এক মুহূৰ্ত
বাঁচবাৰ ইচ্ছা নেই।

ব্যথিত বেদনাৰ্ত ৰাপুজী প্ৰতিনিয়ত ভগবানেৰ নিকট প্ৰাৰ্থনা কৰতে লাগলেন—
শান্তি যদি না দাও, আমাকে তুলে লও!

২২। অক্টোবৰ জয়দিবসে গান্ধিজী বললেন—১২৫ বছৰ বাঁচবাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ
কৰে আমি যদি ঔদ্ধত্য প্ৰকাশ কৰে থাকি, তবে বৰ্তমানে এই পৰিস্থিতিত অবস্থায়
সে ইচ্ছা ত্যাগ কৰাৰ মত নম্বতাও আমাৰ আছে। চাৰিদিকে এই হানাহানি, ঘেৰ
হিংসা দেখে আৰ বাঁচতে ইচ্ছা হয় না, তথাপি কেঁদে বলছি,—আমাৰ নয় শুধু
তোমাৰ ইচ্ছাই পূৰ্ণ হোক, ভগবান! তিনি যদি আমাকে চান, তিনি এখনও
কিছুকাল আমাকে এই পৃথিবীতে ৰাখবেন।

দিৱীৰ পথে পথে জয়ধ্বনি উঠলো—মহাত্মা গান্ধিকী জয়!

গান্ধিজী বললেন—যাৱা আমাৰ জয়ধ্বনি কৰছে তারা জানে না যে আজি আমাৰ
সম্বন্ধে ওই ধ্বনি কৰা মিথ্যা। হিন্দু ও মুসলমান যদি প্ৰসঙ্গত শান্তিতে বাস না
কৰে তবে আমাৰ আৰ বেঁচে থাকাৰ সাধ নেই। একতায় বল, আৰ দ্বন্দ্বে বলক্ষয়,
ইহা অৰ্থমি লোককে প্ৰাণপণে বুঝাবাৰ চেষ্টা কৰছি। কিন্তু সে সাধনা যদি ফলপ্ৰসূ
না হয় তবে ফলহীন বৃক্ষৰ মতই আমাৰ দেহৰ অবসান হোক!

দাহু এঁকে আতমা সাহিব হৈ সব নাহি।

সাহিবকে নাতে মিলে ভেধ পংখকে নাহি।

জব প্ৰাণ পৈছানি আপ কোঁ আতম সব তায়।

সিৱজনহাৱা সবনকা ভা সৌ সব লায়।

পূৰণ ব্ৰহ্ম বিচাৰি লে ছুতিয় তাব কৰি দূৰ।

সব খটি সাহিব দেখিয়ে ৰাম ৰজা তৱপূৰ।—

[হে দাহু, একই আত্মা সবাৰ, প্ৰভু বিৰাজিত সবাৰই মথ্যে; প্ৰভুৰ সঙ্গকেই
আত্মা সবাৰ পাৰি মিলতে, ধৰ্মেৰ ভেধ (কেশ) ও পছের (মত ও সম্প্ৰদায়ের) দিক
দিয়াই মিলন অসম্ভৱ। প্ৰাণ যখন আপনাকে সকলোৰ মথ্যে চিনতে পাৰিলে,

তখন সব বাহুবলী ভাই ; তিনিই সবার অমলকটী, সবাইকে ভাই জেনে তাঁর সঙ্গে প্রেম-খান কর যুক্ত । পূর্বপ্রশ্নের দিক দিয়ে সকলকে লও জেনে, আত্মপূর বৈতরণ্য দূর কর, সকল ঘটেই দেব প্রভু বিরাজিত, সর্বঘটেই রাম ভরপুর বিরাজমান ।— দাহুর বাণী]

গান্ধিজী দিল্লী ও কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়-শিবিরগুলি দেখলেন । অক্টোবরের দীর্ঘ তখন উত্তর ভারতের বৃকে ঘনীভূত হচ্ছে, সর্বহারাদের জন্য গান্ধিজী দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন—কম্বল দাও !

ঝম্ ঝম্ করে দিল্লীর বৃকে বৃষ্টি নামে, গান্ধিজী অন্তর চোখে তাকিয়ে থাকেন মেঘময় আকাশের পানে, বজ্রের গুরু গুরু গর্জন তাঁর মনকে আহত করে, সর্বহারাদের চিন্তায় ভারী হয়ে ওঠে তাঁর বৃক । দিল্লীর প্রার্থনা-সভার প্রান্তরে তাঁর বাখাতুর কণ ধ্বনিত হয়—গত রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে । বৃষ্টির সঙ্গে প্রাণ জুড়ায় । তাতে সঞ্জীবনী শক্তি আছে । কিন্তু সেই শব্দে মন বেদনায় ভারী হয়ে উঠলো : দিল্লীর নানাস্থানে অবস্থিত অনাবৃত আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয়প্রার্থীরা এখন কি ভাবে আছে ? পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থীরা গৃহহীন, আশ্রয়হীন, কার পাপে তাদের এই দশা ? স্তন্যতে পেলাম, ৫৭ মাইল লম্বা এক সৈনিক-রক্ষিত হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদের পূর্ব পাঞ্জাবে আসছে । সুস্থ মস্তিষ্কে তা ভাবা কঠিন । জগতের ইতিহাসে এরূপ ব্যাপার পূর্বে কখনও ঘটে নাই ! মানুষের নিষ্ঠুরতার জগুই না মানুষের এই দশা ? আশ্রয়-প্রার্থীদের না আছে মাথা গুঁজবার ঠাই, না আছে পেটে অন্ন । আশ্রয়কেন্দ্রে হাঁটুজলে রাত্রি কাটানোই কি তাদের ভবিষ্যতের লিখন ? দিনটা ছিল মৌন দিবস । আত্মস্থ হয়ে ভেবেছিলাম দিল্লীর লোকেরা কি পাগল হয়েছে ? তাদের যত্নস্ব কি লোপ পেয়েছে ? লাখ লাখ হিন্দু ও লাখ লাখ মুসলমান নিজ নিজ জন্মভূমি ছেড়ে যাবে, তা আমার নিকট অভাবনীয় ! এই পথে চলতে যদি আর কেউ না থাকে, আমি একাই চলতে পারবো, এ বিশ্বাস আমার আছে ।

যদি কেউ কথা না কয়—

(ওরে ওরে ও অভাগা !)

যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে

সবাই করে তর—

আমাদের গাঙ্কিজী

তবে পরাণ পূলে

ও ভুই বুধ কুটে তোর মনের কথা

একলা বলো রে

× ×

যদি ঝড় বাধলে আঁধার রাতে—

জরার সেম ঘরে

তবে বন্ধানলে

আপন বুকের পাঁজর আলিয়ে নিয়ে

একলা জলো রে ।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

তবে একলা চলো রে ।

[—রবীন্দ্রনাথ

আর্জ সর্বহারাদের চোখের জল ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধ জনগণের মনে কল্পনা জাগাতে পারে না, তবে কি মাৎসর্ঘ্যের কাছে মনুষ্যত্ব পরাজয় মানবে—তবে কি অন্যায়ের বেদীমূলে সত্য্যগ্রহী মাথা নত করবে ?

মনুষ্যত্ব সাড়া তুললো—না না । করবো, না হয় মরবো—করেছে ইয়ে মরেছে !

১৩ই জানুয়ারী ১১টার সময় গাঙ্কিজী আমরণ অনশন শুরু করলেন । বললেন—যখন বুঝবো যে বাইরের চাপ ব্যতীতই কর্তব্য বোধে অহুপ্রাণিত হয়ে দিল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তরের মিলন হয়েছে, তখনই আমি অনশন ত্যাগ করবো ।

সারা ভারত আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো । এই তো সেদিন তিনি কলকাতায় অনশন করেছেন, এখনও চার মাস হয়নি, ওই ক্ষীণ দেহে আর কত সহ্য করবে ? দেশের নেতারা ও জনসাধারণ প্রকৃত মিলনের জন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠলো ।

অহরলাল প্রতিশ্রুতি দিলেন—সাতদিনের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থীদের নিজ নিজ বাসস্থানে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবেন !

দিল্লীর শাস্তি-কমিটি মহাত্মার কাছে প্রতিশ্রুতি দিল—আমরা মুসলমানদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করে চলবো এবং দিল্লীতে যে সব ঘটনা ঘটছে তা আর কখনও ঘটতে দোব না !

দিল্লীর জুলাখ নাগরিক এক প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করলো ।

পাকিস্তান ভারত সরকারের কাছ থেকে ৫৫ কোটি টাকা পেতো, কিন্তু তারা অন্তায়ভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করার জন্য ভারত সরকার সে টাকা আটকে রেখেছিলেন,

মিলনের পথ সহজ করার জন্য গান্ধিজী সে টাকা ভারত সরকারকে দিয়ে দিতে বললেন।

মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও গুফায়ে গান্ধিজীর বীর্ষভীষন স্মরণ করে প্রার্থনা করা হোল।

পাঁচদিন পরে গান্ধিজী অনশন ভঙ্গ করলেন।—১৮ই জানুয়ারী বেলা ১২-৪০ মিনিটে মৌলানা আজাদের হাতে তিনি সুকোজ মিশানো কমলা লেবুর রস গ্রহণ করলেন।

কিন্তু এতো করেও গান্ধিজী পাকিস্তানীদের চিত্ত জয় করতে পারলেন না। যখন তিনি দিল্লীতে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য অনশন করছিলেন তখন পাঞ্জাবের পাকিস্তানীরা গুজরাটে (পাঞ্জাব) একখানি ট্রেন আক্রমণ করলো, সেই ট্রেনে দু-হাজার হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থী আসছিল ভারতে, তাদের প্রত্যেককে পাকিস্তানীরা হত্যা করলো!

একদল হিন্দু ও শিখ এই ব্যাপারে গান্ধিজীর উপর বিরূপ হয়ে উঠলো, অভিযোগ তুললো—মহাত্মাজী মুসলমানদের তোবামোদ করছেন, তাঁর অনশন পক্ষপাতমূলক!

গান্ধিজী বললেন—যারা আমাকে হিন্দু ও শিখের শত্রু বলেন তাঁরা আমাকে জ্ঞানেন না। আমি কান্দুর শত্রু হতে পারি না, হিন্দু ও শিখের তো নয়ই।...পাকিস্তানের মুসলমানেরা বাই কক্ক, আপনারা যেন আপনাদের হাত মলিন করবেন না,... অস্ত্রাঘের পাল্টা জবাবে অস্ত্রায় করলে অস্ত্রায় কখনও স্ত্রায় হয় না।...

কিন্তু গান্ধিজীকে বোম্বার মত মনস্তিভা সর্বহারাদের ছিল না, ২০শে জানুয়ারী যখন তিনি বিড়লাভবনের প্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা করছেন, এমন সময় তাঁর পনেরো গজ দূরে একটি দেশী বোমা এসে ফেটে পড়লো। বোমাটি গান্ধিজীকে লক্ষ্য করেই ছুড়েছিল পাঞ্জাবের এক সর্বহারা। গান্ধিজী কিন্তু এতটুকু চঞ্চল হলেন না, শাস্তভাবে তিনি প্রার্থনা শেষ করলেন।

গান্ধিজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র!

ইনস্পেক্টর-জেনারেল বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। গান্ধিজী বললেন—প্রার্থনা সভা সকলের জন্য উন্মুক্ত—অবারিত, যরতে হয় তো সেখানেই যরবো!

ককুরা বললেন—আজ্ঞা নিয়ে এ খেলা কেন!

আমাদের গান্ধিজী

ভক্তেরা বললেন—আপনি আপনার কাজ করুন, গোয়েন্দাদের তাদের কাজ করতে দিন।

কিন্তু গান্ধিজী রাজী হলেন না, বললেন—বহু চিন্তার পর সম্যক উপলব্ধি করেছি যে মৃত্যু জীবনের রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই মৃত্যুকে যখনই মুখোমুখি পাব, তখনই তাকে আলিঙ্গন করবো।...পূর্বেও আমার জীবন নাশের চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন, আক্রমণকারী কার্যের জন্য অহতাপ করেছে। পৃথিবী হাতে একজন পাপিষ্ঠকে অপসারিত করার জন্য কেউ যদি আমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে, তাহলে সে গুলিতে আসল গান্ধী নিহত হবেন না। আক্রমণকারীর চোখে বাক পাপিষ্ঠ বলে মনে হয়েছে, সে-ই মারা পড়বে। যারা আমার প্রতি দোষারোপ করছে তাদের প্রতি আমি যেন ক্রুদ্ধ না হই এবং তাঁদের হাতে মৃত্যু হলেও যেন তাদের অমঙ্গল চিন্তা না করি। ঈশ্বর যেন আমাকে সেইরূপ মানসিক শক্তি দেন। আমার মত আরোও শত সহস্র ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করুক কিন্তু সত্য যেন কিছুতেই বিনষ্ট না হয়।

যে বোমা ছুড়েছিল সে ধরা পড়ে, তার সম্পর্কে গান্ধিজী পুলিশের ইনসপেক্টার জেনারেলকে বলেন—তাকে যেন কোন রকম পীড়ন করা না হয়। তাকে বুঝিয়ে সংপথে আনার চেষ্টা করাই উচিত।

কিন্তু মহাত্মার মহত্ব তখনও সবাই বুঝলো না, বিরোধীরা সাড়া তুল না—পাকিস্তানে গিয়ে তিনি শান্তি প্রচার করুন না কেন।

২৫শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় গান্ধিজী বললেন—পাকিস্তান একটি ভিন্ন রাষ্ট্র, সুতরাং পাকিস্তান সরকারের অহুমতি পেলেই আমি পাকিস্তানের দুর্গত অঞ্চলে যাব।

কিন্তু—

না পাইয়াছে হিন্দু পন্থের সম্মান,
না পাইয়াছে মুসলমান ধর্মের গৌরব,
সত্য ধর্ম বিহনে,
রাস রহিম নাম লইয়া মারামারি করে
আমরা না হিন্দু, না মুসলমান,
উভয়েই হইয়াছি সমস্তানের দাস।

[—ওক নামক।

এই শব্দতানির যবনিকা ছিন্ন করে আলোকের ইচ্ছিত যিনি দেখেন, শব্দতানির

আমাদের গাঙ্কিজী

হুলাহুল আকণ্ঠ তাঁকে পান করতে হবে, গাঙ্কিজী সেজন্য প্রস্তুত ছিলেন, হরিজনে তিনি লিখেছিলেন—পাপীর জন্ত নিষাপ লোককে দুঃখ ভোগ করতে হয়, এই কি আমাদের বিধিলিপি নয়! এ বিধি তো ভালই। কারণ নিষাপ লোকের দুঃখ-দহনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী সমৃদ্ধতর ও পবিত্রতর হয়েছে।

মহামানব দূর থেকে শুনতে পান দখীচির আহ্বান—কৈলাস শিখর হতে কুরাগত ভৈরবের মহাসঙ্গীতের মত :

হিংসার উন্নত পৃথী, নিত্য নিরুর বন
খোর হুটল পছ তার লোভ অটল বন
নৃতন তব জন্ম লাগি কাতর বস্ত প্রাণী
কর গ্রাণ মহাগ্রাণ, আন অমৃত বাণী,
এস নানবীর দাও ভ্যাগ কঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ত লও সবার অহঙ্কার ভিক্ষা
লোক লোক ভুলুক শোক খণন কর মোহ
উচ্ছল হোক জ্ঞান স্বর্ষ উদয় সমারোহ
গ্রাণ লভুক সকল ভুবন, নরন লভুক অন্ধ
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পূণ্য
করশাযন, ধরণীভল কর কলক শূন্য...

[—রবীন্দ্রনাথ

মহাত্মাজীর ললাট নূতন দিনের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, তৃতীয় নয়ন উন্মীলন করে তিনি ভাবীকালের নির্দেশ দেখতে পেলেন, জাতিকে তিনি বললেন—
আমি অশান্তির মধ্যে শান্তি খুঁজে বের করবো! অন্ধকারের মধ্যে আলোক খুঁজে বের করবো। নৈরাশ্রের মধ্যে আশার বাণী শোনাবো।

২২ শে জানুয়ারী।

কাজ শুধু কাজ।

সন্ধ্যার প্রার্থনা সভায় একজন এসে নাম সহি চাইল, বললো—আপনি তো ২২ তারিখে ওয়ার্ধা চলে যাচ্ছেন।

গাঙ্কিজী বললেন—কে একথা বললো?

—খবরের কাগজে দেখলাম।

আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজী হেসে বললেন—আমিও গান্ধী সম্বন্ধে ঐ কথা যেখেছি, কিন্তু সে গান্ধী কে আমি জানি না।

(তবে কি গান্ধিজী তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন ?)

সন্ধ্যার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখনও তাঁর হাতে একটি কাজ বাকী। কংগ্রেস গঠনতন্ত্র তৈরী করার ভার নিয়েছেন, তারই কাগজপত্র এখনও দেখা হয় নি, আত্মকে বলেন—আমার মাথা ঘুরছে, তবুও কাজ আমি শেষ করবই। আমাকে দেখছি রাজি জাগরণ করতে হবে।

গঠন-তন্ত্রের খসড়া দেখা যখন শেষ হোল, রাত তখন সওয়া ন'টা।

প্রাস্ত দেহ শয্যায় এলিয়ে দেবার জগ্ন তিনি উন্মুখ, এমন সময় একটি মেয়ে বললো—বাপুজী আজ তো আপনি অঙ্গচালনা করলেন না!

—আচ্ছা, তোমরা যখন বলছ তখন আমি তা করবো।

প্রতিরাজে শয়নের আগে দুটি মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে প্যারালাল-বারে ওঠা-নামার মত বার কয়েক তিনি ব্যাখ্যা করে নিতেন, আজ আর সে কাজে তেমন উৎসাহ ছিল না, আজ বার তিনেক ওঠানামা করুই তিনি ছেড়ে দিলেন।

বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত চারিপাশের মেয়েদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা কইতেন। আজ তিনি বললেন—মেয়েদের আমি আমার 'ব্রমণের লাঠি' হতে দিই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার তাতে প্রয়োজন নেই। কোন কিছুই জগ্ন কারও উপর নির্ভর না করতে আমি বহুকাল নিজেকে অভ্যস্ত করে নিয়েছি। মেয়েরা যেমন তাদের বাপের কাছে থাকে, আমার কাছে তেমনই আসে এবং আমাকে ঘিরে ধরে। আমার তা ভালো লাগে, কিন্তু আসলে আমি একেবারে উদাসীন।

কথা বলতে বলতে কোন একসময় তিনি একটু আনমনা হয়ে গেলেন, ধীরে ধীরে আবৃত্তি করেন একটি গুজরাটি কবিতার দুটি বচন—অদ্ভুত এই পৃথিবী, আর কতকাল খেলবো এই খেলা...

(তবে কি গান্ধিজী তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন ?)

নিকটের লোকেরা তাঁর হাত পা মালিশ করতে করতে কোন এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে প্রার্থনা সভা শেষে পার্শ্বচর বিবাহকে বললেন—আজ সব জরুরী চিঠিগুলি আমাকে দেবে, সারাদিনে আমি সেগুলির কাজ শেষ করে ফেলবো।

আমাদের গান্ধিজী

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রটি প্যারীলালের হাতে দিলেন, বললেন—খুব ভালো করে পড়ে দেখ, চিন্তা ধারার কীক যদি কোথাও পাও, তবে তা পূরণ করে দিও—

তারপর বাংলা পাঠ।

সাড়ে ন' টার সময় প্রাতঃকালীন আহার : ছাগছড়, সিদ্ধ ও কাঁচা আনাড়, কমলা লেবু, আদা, টকলেবু ও ঘৃতকুমারীর নির্ধারিত।

কথায় কথায় পূর্ববঙ্গের ঐখ্যালঘুদের সরিয়ে আনা সম্পর্কে বললেন—আমরা বারা জীবন পণে শান্তি ও ঐক্যের ত্রুত গ্রহণ করেছি তাদের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। হয়তো শেষ পর্যন্ত খুব অল্প লোকই অবশিষ্ট থাকবে, কিন্তু দুর্বলতার মধ্যে শক্তির সন্ধান করতে হলে এছাড়া আর পথ নেই। সশস্ত্র যুদ্ধে কি বোম্বার সংখ্যা কমে যায় না! অহিংস সংগ্রামেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কি করে?

তুমি যদি একা নিজের কাজটুকু সুসম্পন্ন করতে পারো তবে সঙ্গীদের সকলের কাজও অগ্রসর হবে।...

স্বধীর স্বাভায়ে বললেন—একদল লোক সর্দার প্যাটেলকে সাম্প্রদায়িকতা-বাদী বলে নির্দোষ করে ও জহরলালের স্বখ্যাতি করে দু'জনের মাঝে ভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

গান্ধিজী বললেন—এই কুট চালের কথা আমি জানি, এবিষয়ে কি করা যেতে পারে তাই আমি চিন্তা করছি!

তারপর বৌলানা আত্মদ এলেন।

তারপর এলেন কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং সিস্টেমের সংবাদদাতা মার্গারেট ব্লুফোর্ডাইট, কথায় কথায় তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনি সব সময়ই বলে থাকেন আপনি একশো পঁচিশ বছর বাঁচবেন, কিসে আপনার এমন আশা হোল?

ম্নান হেসে বাপুজী বললেন—সে আশা আমি ত্যাগ করেছি।

মার্গারেট বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কেন?

গান্ধিজী বলেন—সমগ্র বিশ্ব আজ হিংসায় উন্নত, চারিদিকে চলেছে অত্যাচার আর ব্যভিচারের তাণ্ডবলীলা। অত্যাচারের মধ্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

একটু থেমে কি যেন ভাবলেন, তারপর উদাসভাবে বললেন—আমার সেবার যদি প্রয়োজন থাকে, তবে আমি একশো পঁচিশ বছর পর্যন্তই বাঁচবো!

তারপর এলেন গণ্ডিতজী, এলেন সর্দারজী। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই গান্ধিজী তাঁর বৈকালিক আহার শেষ করলেন। তারপর আভা ও বাহুর কাঁধে ভর দিয়ে প্রার্থনা সভায় যাবার জন্ত বাহির হয়ে পড়লেন, বাড়ির পানে তাকিয়ে

আমাদের গান্ধিজী

বললেন—কশ মিনিট দেবী হয়ে গেল, দেবী হওয়াটা আমার বড় খারাপ লাগে।
ঠিক পাঁচটার সময় আমি প্রার্থনা সভায় থাকতে চাই!

কথা বলতে বলতে গান্ধিজী সভার মাঝে এসে দাঁড়ালেন। দু'পাশে জনতা, তার হাত দিয়ে যেকের উপর যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে অগ্রসর হতে হতে জনমণ্ডলীকে প্রতিনিয়ন্ত্রণ জানালেন। এমন সময় বী দিক থেকে জনতার ভীড় ঠেলে একজন লোক সামনে পথের উপর এসে পড়লো। মাহু ভাবলো সে বাপুজীর পায়ের ধূলা নেবার জন্য অগ্রসর হয়ে আসছে, তাই আপত্তি জানিয়ে বললো—প্রার্থনার সময় অতীত হয়ে গেছে!

লোকটি সে কথা গ্রাহ্য করলো না, মাহু তার হাত ধরে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো, সে ঝাঁকানি দিয়ে মাহুকে সরিয়ে দিল। তার ঝটকায় মাহুর হাতে যে আশ্রম-ভজ্ঞনাবলী ও বাপুর পিকদানী ও মালা ছিল তা পড়ে গেল। মাহু সেগুলি কুড়িয়ে নেবার জন্য নত হয়েছিল, তখন লোকটি একেবারে গান্ধিজীর সামনে এসে দাঁড়ালো, তার হাতে ছিল সাত নলা অটোমেটিক পিস্তল, পর পর তিনটি গুলি চালালো গান্ধিজীর উপর। প্রথম গুলিটি লাগলো গান্ধিজীর পেটের ডান দিকে, নাভির আড়াই ইঞ্চি উপরে। দ্বিতীয় গুলিটি দক্ষিণ পাকের সপ্তম স্থানে। তৃতীয় গুলিটি লাগলো গান্ধিজীর বুকে। প্রথম ও দ্বিতীয় গুলি শরীর ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বাহির হয়ে যায়। তৃতীয়টি ফুসফুসের ভিতর থেকে যায়।

প্রথম গুলি খেয়ে গান্ধিজী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দ্বিতীয় গুলি খেয়ে তিনি 'হা রাম' বলে পড়ে গেলেন।

মাহু ও আভা একত্রে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, বাগানের মালী ছুটে এলো—
একি! একি!!

একটি রক্তাক্ত রেখা ধীরে ধীরে গান্ধিজীর শুভ্র বসনকে রঞ্জিত করে তুললো।

ডাক্তার রাজ সভারওয়াল ছিলেন পিছনে, বাপুজীর মাথাটি তুলে তিনি মেয়েটির কোলের উপর রাখলেন, তারপর বজুরা নিষ্পন্দ দেহটিকে ধরাধরি করে নিয়ে এলেন ভিতরে, বিছানার উপর শুইয়ে দিলেন। একটু গরম জল ও মধু খাওয়াবার চেষ্টা হোল, কিন্তু তা গলা দিয়ে নাযলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেহ নিষ্পন্দ হয়ে গেল।

প্যাটেল ছুটে এলেন, মাথা হাত দিয়ে বসে পড়লেন মহাত্মাজীর প্রাণহীন দেহের পাশে। জ্বরলাল ছুটে এলেন, বাপুজীর বসনে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন নিম্নর মত।

আমাদের গান্ধিজী

কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস এলেন।

তারপর এলেন জয়রাম দাস, অমৃত কাউর, কপালনী।

মাউন্টব্যাকটেন এসে চোখ মুছলেন।

চারিপাশে উঠলো কাদার স্বর, মুর্ছিত বেদনার বিষণ্ণতা ধরখানিকে স্তব্ধ করে দিল, তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাসের মত ধ্বনিত হোল :

রঘুপতি রাবব রাজারাম

পতিত পাবন সীতারাম।

নিখিল ভারত বেতার কেন্দ্রে সহসা প্রোগ্রাম থেমে গেল। তীক্ষ্ণ ককশ স্বর ধ্বনিত হোল—মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলির আঘাতে নিহত হয়েছেন। পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন……পর পর চারটি গুলি ছোড়া হয়, একটি তাঁর বুকের দক্ষিণ পাশে, দুটি তাঁর পেটে বিদ্ধ হয়……ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন।

নগরে নগরে কর্মমুখর জন-কোলাহল শুরু হয়ে গেল, ভারতের জনগণ সহসা কি যেন হারিয়ে ফেললো—গান্ধিজী নেই! মহাত্মাজী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন!! অহিংস সত্যগ্রহী মানবতার সেবায় বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার হিংস্র বিষ নিজের বুকে গ্রহণ করে বিদায় নিয়েছেন, ১৯৪৭ বছর পরে যিষ্ঠ আবার প্রাণ দিয়ে গেলেন!!! দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সবার অন্তরে একই প্রার্থনা গুমরে ওঠে—কমা কর ভগবান, আমাদের কমা কর! কমা কর, মহামানব মহাত্মা! অহিংসার প্রশান্ত বুকে এই হিংস্র পাপের কর অবসান!...

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন।

মজকেরপুরের সিভিল কোর্টের দিওন মহম্মদ ইসমাইল চলছিলেন পথ দিয়ে, খবর শুনেই তিনি চমকে উঠলেন, পথের উপর আছড়ে পড়লেন আর উঠলেন না।

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন।

আমসেদপুরে মজুরদের সভা বসেছিল, খবর শুনেই কয়েকজন মজুর মুর্ছিত হয়ে পড়লেন, একজনের মুর্ছা আর ভাঙলো না।

—গান্ধিজী নিহত হয়েছেন।

বীরাটের এক বইয়ের দোকানে বসে ধর্মবীর বই বিক্রী করছিলেন, খবর শুনেই তিনি পড়ে গেলেন, হৃদস্পন্দন থেমে গেল।

আবাবের গাছিকী

—গাছিকী নিহত হয়েছেন !

গাজান জেলার বিশিষ্ট কর্মী শ্রীমতী ইয়েলারী সান্নায়া খবর শুনে খবর খবর করে কেঁদে ফেললেন, তারপরেই লুটিয়ে পড়লেন ধুলায়, আর উঠলেন না।

—গাছিকী নিহত হয়েছেন !

রফি আমেদ কিদোয়াইয়ের বৃদ্ধ পিতা ইমুতিয়াদ আলি কিদোয়াই অস্থির ছিলেন, খবর শুনেই তিনি খবর খবর করে কেঁদে উঠলেন, পরক্ষণেই সব স্থির হয়ে গেল।

—গাছিকী নিহত হয়েছেন !

বিজয়নগরম্ মহারাজ-কলেজের অধ্যাপক কে, আর, সুব্রহ্মণ্যম্ খবর শুনে চমকে উঠলেন, বুক ঠেসে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হয়ে এলো, সেদিন তিনি কিছুই খেতে পারলেন না, পরদিন তাঁর হার্টফেল করলো।

—গাছিকী নিহত হয়েছেন !

বাংলাগোর উলস্বরের আকুলানন্দ নামে একজন লোক খবর শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, আর উঠলেন না।

—গাছিকী নিহত হয়েছেন !

বোম্বাইয়ের এপোলো বন্দরে এক যুবক খবর শুনেই সমুদ্রের সৈকতে বসে পড়লেন, দূরের দিগন্তে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন কে জানে, সহসা তাঁর মনে হোল এই হিংসা-কলঙ্কিত পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না, পকেট থেকে নোট বইখানি বের করে তিনি লিখলেন ‘মহাত্মাকীর সঙ্গেই আমি চললুম !’ তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাগরের বুকে !

পুলিশের চোখে পড়েছিল, যথাসময় তাঁকে উদ্ধার না করলে সে জলে ডুবেই মরতো।

—গাছিকী নিহত হয়েছেন !

বারাণসীর পথে পথে এক অন্ধ-ভিখারী ভিক্ষা করছিলেন, সংবাদ শুনে তিনি পথের উপরেই বসে পড়লেন, অন্ধের চোখ থেকে নেবে এলো অশ্রুর বাদল। তাঁর কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গেল, ভিক্ষা করার প্রয়োজন আর তাঁর রইলো না, সহসা যেন তিনি উপলব্ধি করলেন, এ পৃথিবীতে জীবন ধারণের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি আহ্বার ত্যাগ করলেন। কদিন পরে নিশ্চেষ্টে তিনি দেহরক্ষা করলেন।

—গাছিকী নিহত হয়েছেন !

মজঃদ্রপুর জেলার শালগঞ্জ গ্রামের পঞ্চাশ বছর বয়সের এক নাপিত মিথ ঠাকুর খবর শুনে আহ্বার ত্যাগ করলেন, বললেন—‘গাছিকী বিহীন জগতে বেঁচে

আবাসের গাঙ্গুলী

থকে লাভ কি ? কদিনের মধ্যেই যুদ্ধের কালো ছায়া ঘনিষে উঠলো তাঁর উপর, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তিনি বললেন—আমার উদ্বেগ সফল হতে চলেছে !

—গাঙ্গুলী নিহত হয়েছেন !

কুন্তকোন্মের পদযাচী নামে এক ব্যবসায়ী খবরটি শুনে কেমন বেন হয়ে গেলেন—দেবতার কমা-হুম্মর দেহে আততায়ী আঘাত করলো ! হাতের কাছে বা পেলেন তাই দিয়ে তিনি আঘাত করতে লাগলেন নিজের দেহে । আঘাত করতে করতে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন, চারিপাশের লোক ছুটে এসে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল ।

—মহাস্বামী নিহত হয়েছেন ! এক মারাঠী গুলি করে তাঁকে খুন করেছে !

শ্রীসানে গুরুজী বোম্বাইয়ের মারাঠী সমাজতান্ত্রিক নেতা, স্বজাতির এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি একুশ দিন অনশন শুরু করলেন ।

রেডিওতে পণ্ডিতজীর ভগ্নধর ভেসে এলো—বন্ধু ও সাথীগণ ! আপনাদের আমি জিজ্ঞাস্য কি শোনাব ? কেমন করে বলবো আমাদের প্রিয় নেতা আমাদের বাপুজী আর ইহজগতে নেই !...

কমা করো বৈধ ধরো, হটক হুম্মরতর

বিদায়ের ক্ষণ ।

যত্ন নর ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়,

শুধু সমাপন ।

শুধু হৃদয় হতে স্মৃতি, শুধু বাধা হতে গীতি

ভরী হতে তীর,

খেলা হতে খেলা-প্রাপ্তি, বাসনা হইতে শান্তি,

নত হতে বীড় ।

দিনান্তের নয় কর, পড়ুক মাধার পর,

জাঁখিপারে ঘুম,

হৃদয়ের পত্রপুটে গোপনে উঠুক কুটে

নিশার কুবন ।

আরতির শব্দ রবে নাথিরা আত্মক তবে

পূর্ণ গল্পিয়ার,

হালি নয়, অলং নয়, উমার বৈরাগ্যের

বিশাল খিলার ।

* * *

আমাদের গান্ধিজী

হে মহাত্মার শেখ, হে বিদায় অনিবেদ,
 হে সোমা বিদায়,
 কণেক দাঁড়াও হির মুহায়ে নয়ন-নীল
 করো আশীর্বাদ ।
 কণেক দাঁড়াও হির, পদভলে নমি শির
 তব বাজাপথে,
 নিরুপ প্রদীপ ধরি' নিঃশব্দে আরতি করি
 নিশ্চয় জগতে ।

[—রবীন্দ্রনাথ

গান্ধী-হীন রাজি নেবে এলো ভারতের উষর রাজধানীর বুকে ।

বিড়লা ভবনের বাহিরে জনতার ভীড়, মহাত্মাজীর মুখখানি তারা একবার
 দেখতে চায় । উজ্জল আলোয় উদ্ভাসিত হোল প্রশান্ত কমা হৃদয় মুখখানি ।
 জনতা ধনি তুললো—মহাত্মা গান্ধিজী কি জয় !

মুহু ভেসে আসে হৃৎচোতা ও নন্দিতা কৃপালনীর কণ্ঠ :

—জীবন বধন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসে...

ভেসে আসে ভবনের সুর :

—বৈক্য জন তো ভেনে কহীয়ে...

ভেসে আসে ভগবৎগীতার শ্লোক :

—ন জায়তে ত্রিযতে বা কদাচিত্ নায়ং কুত্ৰা ভবিতা বা ন কৃমঃ ।

—অজো নিত্যঃ বাসতোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥...

চারিপাশের বাতাস যেন কান্নায় কেঁপে কেঁপে ওঠে ।

৩১ শে জাহ্নবরী । রান্না রিক্ত দিন । মেঘের আড়ালে বেদনায়ালিন সূর্য রান্না
 হয়ে থাকে ।

বিড়লা ভবন থেকে বমুনার তীর অবধি স্তম্ভ শোকার্ত শোকারণ্য ।

বেলা পৌনে বায়োটা । মহাত্মাজীর দেহ যয়ে নিয়ে এলেন মাহু গান্ধী,
 পিয়ারীলাল ও কয়েকটি ভক্ত । পিছনে পণ্ডিতজী, সর্দারজী ও অস্ত্রান্ত যন্ত্রিগণ । ধীরে
 ধীরে দেহটিকে তুলে রেওয়া হোল সেনাবিভাগের একখানি পুষ্পসজ্জিত শকটের
 উপর । স্তম্ভ থকর ভূবিত দেহ । শুধু মুখখানি গুলিবিদ্ধ বক অবধি অনাহত ।
 শকটের পা-বানির উপর দাঁড়িয়ে একপাশে পণ্ডিতজী, আরেকপাশে সর্দার বলদেও

আমাদের গান্ধী

সাহে, সামনে বসে আছেন দেবদাস গান্ধী। পায়ে কাঁচ বসলেন সর্দারজী ও আমদাস গান্ধী, পাশে পাশে চললেন আচার্য কৃপালনী ও শিয়ারীলাল। পিছনে স্বাক্ষরপ্রসাদ এবং কত জানী ও গুলীজন ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেলেন। ভারতীয় বিমান ও নৌবাহিনীর লোকেরা শকটখানি এগিয়ে নিয়ে চললো। বিকৃত জনতা উদ্বেল হয়ে উঠলো—মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়!

শীঘ্র বেজে উঠলো, পুষ্পাঞ্জলিতে ছেয়ে গেল শবাধার, যাত্রা হোল শুরু।

মহা-ভারতের মহামানবের মহাপ্রস্থান।

শোকযাত্রা চলছে বীরে বীরে। সাড়ে পাঁচ মাইল পথ। দু'পাশে লক্ষ লক্ষ মান জনতা, নরপদ, শুক মূখ, আরক্ত চোখ, অবিস্মৃত কেশ, ছোট বড় ভেদ নেই, অর্থের পার্থক্য নেই, বর্ণের বিচার নেই—শুধুই মাহুয, একান্ত-আত্মীয় হারা শোকাক্ত অমৃতের পুত্র।

বেলা ৪-২০ মিনিটের সময় যাত্রীবল এসে পৌঁছালো রাজবাটে।

চিতা প্রস্তুত ছিল। তিন ফুট উঁচু, ১০ কীট চওড়া, ১২ কীট লম্বা চন্দনকাঠের বেদীর উপর দেহজী স্থাপিত হোল। বহুনার পবিত্র জল ছিটিয়ে দেওয়া হোল চিতার উপর। নরপদে প্রদাহনত বস্তুকে এগিয়ে এলেন চীনের রাষ্ট্রদূত, বীরে বীরে একটি পুষ্পস্তবক রাখলেন তাঁর পদপ্রান্তে। পণ্ডিত রামধন শর্মা বৈদিক ত্রোজ শুরু করলেন, পুত্র রামদাস কন্পিত হস্তে এগিয়ে এলেন শেষ কৃত্যের জন্ত।

চিতারি শিখা লেলিহান হয়ে উঠলো! পনেরো মণ চন্দন কাঠ, চার মণ ঘি, দু'মণ ধূপধূনা, একমণ নারিকেল, পনেরো সের কর্পূর সংযোগে অগ্নিদেব উগ্র হয়ে উঠলেন মহামানবের শেষ সঞ্চয়টুকু অনন্তলোকে লীন করে দেবার জন্ত। একশো মজ দূরে বেটনীর পাশ থেকে ভেসে এলো কান্নার রেশ, হৃগন্ধি চন্দনের স্মৃতি ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। জনতা উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো—মহাত্মা গান্ধী অমর হোগে!

চিতার পাশে রানমুখে নিঃশব্দ চোখে বসে আছেন ভারতের বড়লাট লর্ড হাউটব্যার্টেন, লেডি হাউটব্যার্টেন ও তাঁদের মেয়ে পামেলা। পাশে মৌলানা আব্বাস, সর্দার প্যাটেল। সর্দারজীর পাশে বসে একটি ছোট মেয়ে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কাঁদছে, সর্দারজী বীরে বীরে তার মাথার সঙ্গেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। পণ্ডিতজী পাড়িয়ে আছেন একান্ত নিঃসঙ্গ, শ্রান্ত, বেদনার ভারে তাঁর গলুবেই হয়ে পড়েছে। চিতার লেলিহান শিখা আকাশকে লাল করে দিচ্ছে। লাখ লাখ জনের বেদনা মুগ্ধ হয়ে উঠেছে :

রাজারাম জী সীতারাম।

পণ্ডিত পাবন সীতারাম।

আমাদের পাণ্ডিত্য

সাত্তে চার থেকে ছুটি, দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।

অলিতেহে সমুখে তোমার
লোলুপ-চিত্তাশি-শিখা লেহি লেহি বিরাট অক্ষর

... ..

হে বৈরাগী কর পাণ্ডি পাঠ !
উদার উদাস কঠ বাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
বাক নবী পার হরে, বাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি যাঠ।
হে বৈরাগী কর পাঠ।

... ..

তোমার গেরমা বস্ত্রাঙ্কল
দাও পাণ্ডি নতহলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
অরা মুখা মুখা কুলা, লক্ষ কোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাণ্ডি গেরমা অঙ্কল।

[—রবীন্দ্রনাথ

সমগ্র ভারত তেরো দিন শোক করলো।

চিডাম্বর তাম্রপাত্রে ভারতের তীর্থে তীর্থে পাঠানো হোল পবিত্র নীতি
বিসর্জন দেবার অন্ত—কল্যাণী থেকে মানস সরোবর। ভারতের বাহিরেও
গেল—কলম্বো, রেজুন, সিংপুর...

অহরলাল এলাহাবাদের ত্রিবেণী সম্মুখে এলেন চিডাম্বর বিসর্জন দিতে,
মহামানবের উদ্দেশে তিনি শেষ প্রণাম জানিয়ে বললেন—শেষ বাজা ফুরালো। তীর্থ
পথের হোল অবসান। পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল মহাত্মা গান্ধী আমাদের এই
বিশাল দেশের সর্বত্র বিচরণ করেছেন। হিমালয় থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত
প্রদেশ, ব্রহ্মপুত্র থেকে কল্যাণী, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম প্রত্যেক অংশে
—প্রত্যেক কোণে শুধু পরিদর্শক বা প্রমোদ ভ্রমণকারী রূপে নয়, ভারতের জন-
সাধারণকে বুঝতে এবং তাদের সেবা করতে তিনি এই দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ
করেছিলেন। ইতিহাসে আর কোন লোক এত অধিক ভ্রমণ করেছেন কিনা
সন্দেহ। সাধারণ লোককে এতো গভীরভাবে অন্তর্দৃষ্টি করেছেন নাই, বা এতো

আমাদের গান্ধিজী

আন্তরিকভাবে সেবাও করেন নাই। এখন তাঁর এই পৃথিবীর যাত্রা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের পথ আরও বাকী।

আমাদের অনেকেই শোকে মুহমান। ইহা ভ্রাতৃসংকট এবং বাতাবিক, কিন্তু আমরা শোক করবো কেন? শোক কি তাঁর জন্ত?—না অস্ত্র কিছুর জন্ত? তাঁর জীবনে এবং তাঁর মৃত্যুতে তিনি যে জ্যোতি বিস্তার করে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশকে আলোকিত করতে থাকবে। তবে আমরা শোক করবো কেন? দুঃখে তাঁর জন্ত নয়—দুঃখ আমাদের জন্ত। আমাদের নিজের দুর্বলতা, আমাদের অন্তরের বিষ-বিদ্বেষ—আমাদের মধ্যে ভেদ-বিরোধ—সংঘাত সংঘর্ষই দুঃখের কারণ। এই সকল পাপ দূর করার জন্তই মহাত্মা গান্ধী জীবন দিয়েছেন। গত ক'মাস ধরে এই কাজেই তাঁর জীবনের শক্তি ও সেবা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। তাঁর নামের জন্তই কি তাঁকে আমরা সম্মান করি—না তাঁর উপদেশ, তাঁর শিক্ষা এবং যার জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন—বিশেষভাবে যে জন্য জীবন দিয়েছেন—তাঁর প্রতি আমাদের এই সম্মান?

গম্ভীর এই তটভূমিতে দাঁড়িয়ে আত্মন আমরা আমাদের অন্তরের সন্ধান লই এবং নিজেকেই প্রশ্ন করি—গান্ধিজী আমাদের যে পথ দেখিয়েছেন তা আমরা কতদূর অনুসরণ করেছি? অন্যের সঙ্গে শান্তি ও সহযোগিতায় বসবাস করবার কি চেষ্টা করেছি? এখনও যদি আমরা সেই পথ ধরে চলি, তবে তা আমাদের ও আমাদের দেশের মঙ্গল আনবে। আমাদের দেশে এখন এক বিরাট পুরুষ জয়গ্রহণ করেছিলেন বিনি আলোক বর্তিকার ন্যায় শুধু ভারতবর্ষকেই পথ দেখান নাই—সমগ্র জগৎকে আলোক দেখিয়েছেন। তথাপি আমাদের এক ভাইয়ের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কেন এমন হলো? মনে হতে পারে এ উদ্ভাদের কাছ! কিন্তু এই শোকাবহ ঘটনার তাতেই ব্যাখ্যা হয়ে যায় না। বিষে ও শত্রুতার বিবাক্ত বীজ বপন করা হয়েছিল বলেই ইহা সম্ভব হয়েছে। এই বিষ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আমাদের অনেকের মন বিবাক্ত করে দিয়েছে। সেই বিষ হতেই এই বিষের চারা গজিয়ে উঠেছে। শৃণা ও বিদ্বেষের এই বিষ দূর করা আমাদের সকলের কর্তব্য। গান্ধিজীর কাছ থেকে আমরা যদি কোন শিক্ষালাভ করে থাকি তাহলে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে পারি না। কোন ব্যক্তিই আমাদের শত্রু নয়। ব্যক্তির মধ্যে যে বিষের ক্রিয়া চলে তাহাই আমাদের শত্রু। উহা আমাদের শেষ কর্তব্যই হবে। ক্ষীণ আমরা, দুর্বল আমরা, কিন্তু গান্ধিজীর শক্তি আমাদের মধ্যে কিছু সঞ্চারিত হয়েছে। তার প্রতিকলিত মহিমার আরাও

আমাদের গাছিকী

শক্তির হয়েছি। শক্তি ও ঐশ্বর সম্পদ তাঁরই এক সে পথ যিনি দেখিয়েছেন, তাঁও তাঁরই। সেই পথ অনুসরণের চেষ্টায় আমরা অনেক হৌচট খেয়েছি, যে পথে তিনি আমাদের জনসেবা করতে শিখিয়েছেন সেই পথে চলতে গিয়ে আমরা বার বার পড়ে গেছি। আমাদের সেই শক্তির স্তম্ভ আর নেই—কিন্তু তাই-বা বলি কেন? তাঁর প্রতিমূর্তি এখানে সমবেত লাখ লাখ নরনারীর মনোমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কোটি কোটি দেশবাসী, বারো এখানে উপস্থিত আছেন, অথবা বাহিরে রয়েছেন, কখনও তাঁকে ভুলতে পারবেন না। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়রা তাঁকে দেখে নাই, অথবা তাঁর কথা শুনে নাই। তাদের চিত্রপটেও সেই মূর্তি ধারণ করবে। কারণ সেই মূর্তি এখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ।

ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্বে গান্ধী-যুগ বলিতে যা বুঝায় তা আরম্ভ হয়েছিল, আজ তা শেষ হোল। তবু হয়তো ভুল বলছি।—সে যুগের অবসান হয়নি। হয়তো প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিবর্তিত আকারে উহা আরম্ভ হোল। এতদিন আমরা উপদেশ ও আশ্রয়লাভের জন্য তাঁর দিকে ঝুঁকেছি। এখন থেকে আমাদের নিজেদের পায় পাড়িয়ে নিজেদের উপর নির্ভর করতে হবে। তাঁর স্মৃতি যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর শিক্ষা যেন আমাদের পথ সমুজ্জ্বল করে। বার বার তিনি আমাদের এই বাণী শুনিতে গেছেন—‘হৃদয় হতে হিংসা ও ভয়ের মূল উৎপাটন কর। হিংসা ও অজ্ঞানত্বের অবসান ঘটও। দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখ!’

তিনি আমাদের স্বাধীনতা এনেছেন, যে পথে তা এনেছেন তা দেখে জগৎ বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে আমরা আমাদের শিক্ষকের শিক্ষা ভুলেছি। গোঁড়ামি ও অন্ধ উন্নয়নতার প্রবাহ জনসাধারণকে পেয়ে বসেছে এবং আমরা ভারতের সুনাম কলঙ্কিত করেছি। আমাদের বহু যুবক বিদ্রোহ হয়ে বিপথ-গামী হয়েছে। আমরা কি তাদের তাড়িয়ে দোব—না ধ্বংস করবো? তারা আমাদের আপনারই লোক। আমাদের তাদের চিত্ত জয় করতে হবে। এবং তাদের চিন্তা ও কর্ম বাতে সুপথে পরিচালিত হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমাদের সর্বনাশ এনেছে। সতর্কতা সহকারে যথাসময় আমরা যদি কাজ না করি, তাহলে উহা আমাদের স্বাধীনতা ধ্বংস করবে। এই বিপদ সম্পর্কে সজাগ রাখবার জন্যই গাছিকী ছ’তিন সপ্তাহ আগে তাঁর শেষ অনশন করেছিলেন। তাঁর আত্মবিসর্জন সমগ্র জাতির বিবেক উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা তাঁর কাছে সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। শুধু তখনই তিনি তাঁর অনশন ডাক করেছিলেন।

আমাদের স্বাধীনতা

গান্ধিজী সত্তাহে একদিন করে কথা বন্ধ রাখতেন। আর তাঁর কঠোর চিরদিনের নীতিই হয়ে গেল। এই নীতিবতার শেষ নেই—তথাপি সেই কঠোর আমাদের গণ, আমাদের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হচ্ছে। আমাদের দেশবাসীর চিন্তে ও মনে ভারত সীমান্তের বহু দূরের অধিবাসীদের চিন্তে যুগ যুগ ধরে উঠা প্রতিফলিত থাকবে। কারণ, সেই স্বর সত্যের কণ্ঠস্বর। সত্য কখন কখন দাবিয়ে। সম্ভব হতে পারে, কিন্তু দমন বা দলন অসম্ভব। হিংসা তাঁর কাছে ছিল সত্যের রীত। হুতরাং তিনি শুধু বাহুবলের হিংসার বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে বলেন নি, মন ও মস্তিষ্কের হিংসার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে বলেছেন। এই হিংসা, এই অস্ত্রবর্ষ যদি আমরা গণ না করি, অপরের প্রতি অসীম ধৈর্য ও বদ্ধ রাখতে না শিখি, জাতি হিসাবে হলে ধ্বংস আমাদের অনিবার্য। হিংসার পথ বিপদসঙ্কুল, হিংসা থাকতে স্বাধীনতা স্থায়ী হতে পারে না। যদি আমাদের মনে হিংসা ও সংঘর্ষের মনোভাব থাকে, হলে 'স্বরাজ' ও স্বাধীনতার কথা অর্থহীন হয়ে যায়। এই জনতার মধ্যে বহু গাভিণী রয়েছেন। আমাদের এই দেশের সম্মান, সত্যতা ও দেশরক্ষা তাঁদেরই রবময় দায়িত্ব। তাঁরা যদি একসঙ্গে চলেন, একসঙ্গে কাজ করেন, তা হলেই ইহা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাঁরা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পর লেগে থাকেন তাহলে দেশের শক্তিরই বা কি মূল্য, দেশ-সেবাই বা সম্ভব হবে কিভাবে?

গণতন্ত্র চাহে আহুগত্যা, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক সম্মান রক্ষা। স্বাধীনতা চাহে পরের স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা। পারস্পরিক আলোচনা ও বুঝাবার চেষ্টা দ্বারাই তাত্ত্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়, হিংসাত্মক পন্থায় নয়। যদি কোন সরকারের প্রতি বসাদধারণের সমর্থন না থাকে, তাহলে যাদের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন আছে, তাদের দ্বারাই আরেক সরকার স্থান গ্রহণ করেন। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিই—রা জানে যে, তাদের প্রতিই জনসাধারণের সমর্থন নেই, তাই মুড়ের স্থায় মনে রেখে, হিংসাত্মক কার্য দ্বারা তারা তাদের কার্যোদ্ধার করতে পারবে। ইহা শুধু সম্পূর্ণ ভুল নয়, মূর্থতাও বটে। কারণ, সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর এই হিংসাত্মক জুলুমবাজীর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হিংসুক তে প্ররোচিত করে। এই শোচনীয় শোকাবহ ঘটনা সম্ভব হবার কারণ এই যে, হিংসুক লোক (তাদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন) এই দেশের দাবহাওয়া বিঘ্নিত করে তুলেছে। এই বিষয়ের মূল উৎপাতন করা সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই কর্তব্য। ভয়াবহ মূল্যের বিনিময়ে আমাদের শিকাগো হোল। আমাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন, যিনি গান্ধিজীর মৃত্যুর পরে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ

আমাদের গান্ধীজী

লাভবান হয়েছি। শক্তি ও ঐশ্বর্য সম্পদ তাঁরই এবং সে পথ যিনি দেখিয়েছেন, তা'ও তাঁরই। সেই পথ অঙ্গসংরক্ষণের চেতায় আমরা অনেক হোঁচট খেয়েছি, যে পথে তিনি আমাদের জনসেবা করতে শিখিয়েছেন সেই পথে চলতে গিয়ে আমরা বার বার পড়ে গেছি। আমাদের সেই শক্তির স্তম্ভ আর নেই—কিন্তু তাই-বা বলি কেন? তাঁর প্রতিমূর্তি এখানে সমবেত লাখ লাখ নরনারীর মনোমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কোটি কোটি দেশবাসী, ধারা এখানে উপস্থিত আছেন, অথবা বাহিরে রয়েছেন, কখনও তাঁকে ভুলতে পারবেন না। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তাঁকে দেখে নাই, অথবা তাঁর কথা শুনে নাই। তাদের চিত্রপটেও সেই মূর্তি ধারণ করবে। কারণ সেই মূর্তি এখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ।

খ্রিস্ট বা চম্লিশ বৎসর পূর্বে গান্ধী-যুগ বলিতে যা বুঝায় তা আরম্ভ হয়েছিল, আজ তা শেষ হোল। তবু হয়তো ভুল বলছি।—সে যুগের অবসান হয়নি। হয়তো প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিবর্তিত আকারে উহা আরম্ভ হোল। এতদিন আমরা উপদেশ ও আশ্রয়লাভের জন্য তাঁর দিকে ঝুঁকিছি। এখন থেকে আমাদের নিজদের পায় দাঁড়িয়ে নিজদের উপর নির্ভর করতে হবে। তাঁর স্মৃতি যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর শিক্ষা যেন আমাদের পথ সুসম্ভল করে। বার বার তিনি আমাদের এই বাণী শুনিয়ে গেছেন—‘হৃদয় হতে হিংসা ও ভয়ের মূল উৎপাতন কর। হিংসা ও অস্ত্রশস্ত্রের অবসান ঘটান। দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখ!’

তিনি আমাদের স্বাধীনতা এনেছেন, যে পথে তা এনেছেন তা দেখে জগৎ বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে আমরা আমাদের শিক্ষকের শিক্ষা ভুলেছি। গোঁড়ামি ও অন্ধ উন্নততার প্রবাহ জনসাধারণকে পেয়ে ধসেছে এবং আমরা ভারতের সুনাম কলঙ্কিত করেছি। আমাদের বহু যুবক বিভ্রান্ত হয়ে বিপথ-গামী হয়েছে। আমরা কি তাদের তাড়িয়ে দাব—না ধ্বংস করবো? তারা আমাদের আপনাই লোক। আমাদের তাদের চিন্তা জয় করতে হবে। এবং তাদের চিন্তা ও কর্ম যাতে সুপথে পরিচালিত হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমাদের সর্বনাশ এনেছে। সতর্কতা সহকারে যথাসময় আমরা যদি কাজ না করি, তাহলে উহা আমাদের স্বাধীনতা ধ্বংস করবে। এই বিপদ সম্পর্কে সজাগ রাখবার জন্যই গান্ধীজী হুঁ তিনি সপ্তাহ আগে তাঁর শেষ অনশন করেছিলেন। তাঁর আত্মবিসর্জন সমগ্র জাতির বিবেক উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা তাঁর কাছে সবারূপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। শুধু তখনই তিনি তাঁর অনশন শুরু করেছিলেন।

আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজী সপ্তাহে একদিন করে কথা বন্ধ রাখতেন। আজ তাঁর কঠ চিরদিনের জন্যই নীরব হয়ে গেল। এই নীরবতার শেষ নেই—তথাপি সেই কঠ আমাদের শ্রবণে, আমাদের অন্তঃকরণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের দেশবাসীর চিন্তে ও মনে এক ভারত সীমান্তের বহু দূরের অধিবাসীদের চিন্তে যুগ যুগ ধরে উহা প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। কারণ, সেই স্বর সত্যের কণ্ঠস্বর। সত্য কখন কখন দাবিয়ে রাখা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু দমন বা দলন অসম্ভব। হিংসা তাঁর কাছে ছিল সত্যের বিপরীত। সুতরাং তিনি শুধু বাহুবলের হিংসার বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে বলেন নি, মন ও হৃদয়ের হিংসার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে বলেছেন। এই হিংসা, এই অস্ত্রধ্বং যদি আমরা ত্যাগ না করি, অপরের প্রতি অসীম ঘৈর্ষ ও বন্ধুত্ব রাখতে না শিখি, জাতি হিসাবে তা হলে ধ্বংস আমাদের অনিবার্য। হিংসার পথ বিপদসঙ্কুল, হিংসা থাকতে স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। যদি আমাদের মনে হিংসা ও সংঘর্ষের মনোভাব থাকে, তাহলে ‘স্বরাজ’ ও স্বাধীনতার কথা অর্থহীন হয়ে যায়। এই জনতার মধ্যে বহু সেনাবাহিনী রয়েছে। আমাদের এই দেশের সম্মান, সততা ও দেশরক্ষা তাঁদেরই গৌরবময় দায়িত্ব। তাঁরা যদি একসঙ্গে চলেন, একসঙ্গে কাজ করেন, তা হলেই ইহা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাঁরা যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পর লেগে থাকেন তাহলে তাঁদের শক্তিরই বা কি মূল্য, দেশ-সেবাই বা সম্ভব হবে কিভাবে ?

গণতন্ত্র চাহে আত্মগত্যা, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক সম্মান রক্ষা। স্বাধীনতা চাহে অপরের স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা। পারস্পরিক আলোচনা ও ব্যাবহার চেষ্টা দ্বারাই গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়, হিংসাত্মক পন্থায় নয়। যদি কোন সরকারের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন না থাকে, তাহলে যাদের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন আছে, তাদের দ্বারাই আরেক সরকার স্থান গ্রহণ করেন। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিই—যারা জানে যে, তাদের প্রতিই জনসাধারণের সমর্থন নেই, তারাই মূঢ়ের জ্ঞায় মনে করে যে, হিংসাত্মক কার্য দ্বারা তারা তাদের কার্যোদ্ধার করতে পারবে। ইহা শুধু সম্পূর্ণ ভুল নয়, মূর্খতাও বটে। কারণ, সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর এই হিংসাত্মক জুলুমবাজীর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হিংসুক হতে প্ররোচিত করে। এই শোচনীয় শোকাবহ ঘটনা সম্ভব হবার কারণ এই যে, বহু লোক (তাদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন) এই দেশের আবহাওয়া বিধাক্ত করে তুলেছে। এই বিধের মূল উৎপাতন করা সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই কর্তব্য। ভয়াবহ মূল্যের বিনিময়ে আমাদের শিক্ষালভ হোল। আমাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন, যিনি গান্ধিজীর মৃত্যুর পরে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ

আমাদের গান্ধিজী

করায় সংকল্প গ্রহণ করবেন না ? আমাদের এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মানব সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যে আদর্শের জন্ত জীবন দিলেন, তা কি আপনারা পালন করবেন না ? আপনারা—আমি এবং আমরা সকলেই এই পবিত্র গঙ্গা নদীর বালুতট হতে ফিরে যাব। আমরা সকলেই বিষম এবং নিঃসংগ বোধ করবো। আমাদের গান্ধিজীকে আর আমরা দেখতে পাব না। সংশয়ের দিনে, সন্ধ্যার সময়, সমস্তার ঘনাক্ষারে আমরা যখন বিমূঢ় বোধ করতাম তখন পরামর্শ ও উপদেশের জন্ত তাঁর কাছে ছুটে যেতাম। এখন আর আমাদের উপদেশ দেবার কেউ নেই। আমাদের বোঝাই বা কে গ্রহণ করবে ? কেবল আমি অথবা আমাদের জায় অল্প কয়েকজন লোকই তাঁর নিকট যেতাম না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দেশবাসী তাঁকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও উপদেষ্টা মনে করতেন। আমাদের সকলেরই মনে হোত, আমরা যেন তাঁর সন্তান। তাঁকে জাতির জনক হিসাবে অভিহিত করা ঠিকই হয়েছে। পিতার মৃত্যুতে যেমন পরিবার শোকাচ্ছন্ন হয়, তেমনি জাতির জনক মহাত্মার মৃত্যুতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। এই নদীতট হতে নিঃসংগ বিষম অবস্থায় আমরা ঘরে ফিরে যাব, কিন্তু সেই সংগে গর্ব বোধ করবো এই ভেবে যে, আমরা আমাদের বন্ধুরূপে, স্নেতারূপে এবং প্রধান পরিচালকরূপে এই বিশাল ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম, যিনি সত্যের পথে, স্বাধীনতার পথে আমাদের উদ্দেশ্য হতে উদ্দেশ্যে ধরেছেন। এবং তিনি যে সংগ্রামের পথ দেখিয়েছেন, তা সত্যের পথ। হিমালয়ের শীর্ষে পরম প্রশান্তিতে বসে থাকার পথ তাঁর নয়। তিনি আমাদের যে পথ দেখিয়েছেন সে পথ সংগ্রামের পথ,—অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, অন্ধারের বিরুদ্ধে জ্ঞানের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এই পথে পলায়ন বা বিশ্রাম চাইলে চলবে না। তাঁকে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা পালন করতে হবে। সত্যের পথে, ধর্মের পথে আমরা যেন অগ্রসর হই। ভারতবর্ষকে যেন আমরা এমন এক বিশাল দেশে পরিণত করতে পারি, যেখানে সমৃদ্ধি এবং পারম্পরিক ঐক্য প্রাধান্য লাভ করে। নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ সম্মানে এবং স্বাধীনতায় বসবাস করতে পারে। কতবার আমরা ধ্বনি করেছি—‘মহাত্মা গান্ধিজী জয় !’ কিন্তু আজ সে ধ্বনি করতে আমরা অধোবদন হয়ে ভাবি, কত ছোট হয়ে গেছি আমরা। তাঁর কাছে অস্বাধীন বলতে জনসাধারণের স্বাধীনতা ও উন্নতির অর্থকনি বোঝাতো।

গান্ধিজী আমাদের জন্ত কোন শ্রেণীর জয় চেয়েছিলেন ? হিংসা, প্রতারণা,

আমাদের গান্ধিজী

বিশ্বাসঘাতকতা ও অসহুপায় দ্বারা অর্জিত জয় বা অনেকেরই কাব্য, তা তিনি এদেশ-বাসীর জন্য চান নি। সে ধরনের জয় কখনও স্থায়ী হয় না। সত্যের শৈলমূলে যে জয়ের ভিত্তি সেই জয়ই স্থায়ী হয়ে থাকে। গান্ধিজী আমাদের সংগ্রামের এবং রাজনৈতিক যুদ্ধের এক নতুন পদ্ধতি দিয়েছেন। দেশবাসীকে দেখিয়েছেন এক নতুন ধরনের ডিপ্লোমেসি। তিনি রাজনীতিতে সত্য, সদিচ্ছা ও অহিংসার সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। রাজনৈতিক মতবাদ অথবা ধর্মমত বাই হোক, তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকে ভাইরূপে, বন্ধুরূপে ও সহ-নাগরিকরূপে গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন। ভারত-জননীর সন্তান আমরা, আমাদের সকলকেই এখানে আ-মরণ বাস করতে হবে। আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, সকলেই তার সমান অংশীদার। ত্রিশ কোটি হোক অথবা চল্লিশ কোটি হোক, স্বাধীন ভারতের আশীর্বাদ সকলেরই সমভাবে প্রাপ্য। কয়েকজন ভাগ্যবানের সুবিধার জন্য মহাত্মাজী চেষ্টা করেন নাই অথবা জীবন দেন নাই। তাঁর সেই আদর্শের জন্য সেইভাবে আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই আমরা 'মহাত্মা গান্ধিজী কী জয়' ধ্বনি করতে পারবো।

পণ্ডিতজী চিতাভস্ম নদী নীরে বিসর্জন দিলেন।

শুষ্ক জনতার স্নান কর্তৃক আকাশে বাতাসে বেদনার মূর্ছনা তুললো—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন নীতারাম।
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম,
সবকো সম্মতি দে ভগবান।
আল্লা মজদী জিহোভা রাম,
এক হী মালিক তুবে প্রণাম।
হিন্দু মুসলমান এক ইন্সান্
সব ছায় তেরে হী সন্তান।

বত কিছু ভালো মন্দ, বত কিছু ঝিঝাঝ
কিছু আর নাই।

বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহ সাথে সব ক্রান্তি
হরে বাক ছাই।

× × ×
বিহা! আনিয়াহ আজি বসন্ত কুহুমরাজি
দিতে উপহার,
নীরবে আকুল চোখে কেলিতেছ বুখা শোকে
নরনাশকার।

আমাদের গান্ধিজী

ছিলে বারো রোবন্ডরে বৃথা এতদিন পরে
করিছ মার্জনা ।

অসীম নিস্তক দেশে, চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সাধনা ॥

x

x

x

আপন মনের মতো সংকীর্ণ বিচার যত
রেখে দাও আজ ।

ভুলে যাও কিছুক্ষণ প্রত্যাহের আরোজন
সংসারের কাজ ।

আজি ক্ষণেকের তরে বসি বাতায়ন 'পরে
বাহিরেতে চাহ ।

অসীম আকাশ হতে বহিয়া আহুক শ্রোতে
বৃহৎ প্রবাহ ॥

x

x

x

বাণিশ্রী সমস্ত বিধে দেখে তারে সর্ব দৃষ্টে
বৃহৎ করিয়া

জীবনের ধৃতি ধরে দেখে তারে দূরে ধরে
সমুখে ধরিয়া ।

পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে
মাগিয়ো না তারে ।

ধাক ভব ক্ষুদ্র ঝাপ ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে ॥

x

x

x

ওই হেরো সীমা হারা গগনের গ্রহ তারা
অসংখ্য জগৎ

ওরি মাঝে পরিশ্রান্ত হয়তো সে একা পাহ
ধুঁজিতেছে পথ

ওই দূর দূরান্তরে অজ্ঞাত ভুবন পরে
কত কোনখানে

আর কি গো দেখা হবে আর কি সে কথা কবে
কেহ নাহি জানে ॥

[—রবীন্দ্রনাথ

— ঐ শান্তি ঐ শান্তি ঐ শান্তি —

মাদানোর গান্ধী

জীবন-পঞ্জী

১৮৬২—২রা অক্টোবর—কাথিয়াবাড়ের পোরবন্দরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা করমচাঁদ গান্ধী, মাতা পুতলীবাই।...তিন ভাই, এক বোন—গান্ধী কনিষ্ঠ...

১৮৭৬—রাজকোটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ...

১৮৮১—রাজকোটের কাথিয়াবাড় হাইস্কুলে প্রবেশ...মাংসভক্ষণ ও মৃগপান...পরে পিতার কাছে মার্জনা শিক্ষা...

১৮৮৩—বিবাহ—পত্নী গোকুলদাস মাকনজীর কন্যা কস্তুরবাই...

১৮৮৫—পিতৃবিয়োগ...

১৮৮৭—প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ...ডবনগরের শ্রামলদাস কলেজে প্রবেশ...

১৮৮৮—সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা...মাতার কাছে নিরামিষ ভক্ষণের প্রতিজ্ঞা...

১৮৮৯—বিলাতের ন্যাটিক পরীক্ষায় প্রথম বারে ফেল করে দ্বিতীয় বারে উত্তীর্ণ...

১৮৯১—১০ই জুন—ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ...১২ই জুন বিলাত ত্যাগ...হাড-বিয়োগের সংবাদ...রাজকোট ও বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ...

১৮৯৩—এপ্রিল মাসে আবদুল্লা-এণ্ড-কোম্পানীর চাকুরী লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা...জুন মাসে নাটালে 'কুলি ব্যারিষ্টার' হিসাবে প্রথম জাতীয় ট্রেনে অগমনিতি...স্বাভাবিকতনের পথে গাড়োয়ান কতৃক কর্তব্যদর্শন...জোহানেসবার্গের গ্র্যাণ্ড-গ্র্যান্ডাল-হোটেল কতৃক কালাআবধীকে স্থান দিতে অস্বীকার...বাইবেল, কোরাণ, জিন্দাবেস্তা ও উপনিষদ পাঠ...ভারতীয়দের সম্মানবদ্ধ করার চেষ্টা...

১৮৯৪—নাটালে ভারতীয়দের ভোটাধিকার লোপের চেষ্টা, গান্ধী কতৃক ভারতীয় সম্বন্ধ গঠন ও দশহাজার প্রবাসী ভারতীয়ের সাক্ষরিত আবেদন পত্র বিলাতে প্রেরণ...নাটালী স্থলীয় কোর্টে ওকালতি আরম্ভ...সাহেবদের আশ্রয়...২২শে মে নাটাল-ইণ্ডিয়ান-কংগ্রেসের জন্ম ও নাটাল-শিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৬—ভারতে আগমন—স্বার কিরোজনা মেটা, বদরুদ্দিন তায়েবজী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, লোকমাত্র বালগঙ্গাধর তিলক, মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে পরিচয়...দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ...দক্ষিণ আফ্রিকার সাহেবদের অসন্তোষ...

আমাদের গান্ধিজী

- ১৮২৭—১৩ই জাফরারী—দ্বী ও দুটি পুত্র লইয়া ভারবানে অবতরণ...প্রহার...
পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের পক্ষী কতৃক প্রাণরক্ষা...পুলিশের সহায়তায়
কস্তুরজীর গৃহে গমন...জনতা কতৃক সে বাড়ী আক্রান্ত...পুলিশের
হস্তবেশে পলায়ন...পরে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ
আনতে অস্বীকার করেন, বলেন—‘বখাসময় তারা তাদের তুল
বুঝতে পারবে!’...স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা—চুলছাঁটা কাপড়কাটা সহজে
করণ...
- ১৮২৯—বুণের বুকে ১১০০ প্রবাসী ভারতীয় লইয়া সেবা-বাহিনী গঠন...
- ১৯০১—ভারতে প্রত্যাবর্তন কালে উপহার গ্রহণে আপত্তি—অপরিগ্রহ ব্রত...
কলিকাতা-কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ...দক্ষিণ
আফ্রিকা সম্পর্কে কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণ...
- ১৯০২—ব্রহ্মদেশে গমন—বেশ পরিবর্তন—তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ—কালীতে আনি-
বেশান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ...
- ১৯০৩—আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়...এপ্রিল মাসে ট্রান্সভালে এটনি হিসাবে ব্যবসায়
আরম্ভ...গীতা, বিবেকানন্দের রাজযোগ, পাতঞ্জলির যোগসূত্র প্রভৃতি
অধ্যয়ন...অপরিগ্রহ ও সমভাব ব্রত গ্রহণ...দশহাজার টাকার জীবনবীমা
‘অপ্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ’...‘কিনিক্স আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা...
- ১৯০৪—ইংরাজী, তামিল, গুজরাটী, হিন্দী চারিভাষায় ‘ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন’ সাপ্তাহিক
পত্রিকার প্রকাশ...
- ১৯০৬—জুলু বিদ্রোহ...ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন...ব্রহ্মচর্য গ্রহণ...দক্ষিণ আফ্রিকা
সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে বিলাত যাত্রা...
- ১৯০৭—প্রতিরোধ সত্যাগ্রহ...ভারতীয়দের দলে দলে কারাবরণ...
- ১৯০৮—১০ই জাফরারী গান্ধিজীর বিচার—দু’মাসের জঙ্গ জোহানেনসবার্গ জেলে...
সাইন্সের সঙ্গে আলোচনা ও যুক্তি...১০ই ফেব্রুয়ারী মীর আলম কতৃক
প্রহৃত...অসহতার মধ্যেই ছাড়পত্র গ্রহণ...অক্টোবর মাসে নতুন করে
আন্দোলন আরম্ভ ও দু’মাসের জঙ্গ কারাদণ্ড...
- ১৯০৯—জুন মাস থেকে নভেম্বর অবধি বিলাতে অবস্থান...টলষ্টয়ের সঙ্গে পত্রালাপ
...‘হিন্দু স্বরাজ’ বই প্রণয়ন...
- ১৯১০—আর্থান-বন্ধু কালেনবাকের বাগানে ‘টলষ্টয় কার্ণের’ প্রতিষ্ঠা...স্বাবলম্বী
হবার জঙ্গ মুচির কাজ শেখা...

আন্দোলনের সাক্ষী

- ১১২—গোথেলের দক্ষিণ আফ্রিকার আগমন ও টলটল কার্বে অবস্থান...
- ১১৩—মাথাপিছু বার্ষিক ৪৫ টাকা কর ও হিন্দু বিবাহ আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ...কম্বুজবীর কারাদণ্ড...২০৩ জন গুরুত্ব, ১২৭ জন নারী ও ৫৭ জন শিশু সত্যাগ্রহী নিয়ে গান্ধীভাইয়ের সত্যাগ্রহ অভিযান, ব্রাহ্মজ্যোতির পথে চারিদিনের মধ্যে তিনবার গ্রেপ্তার ও হুঁকুমার মর্দার ও তিনমাস কারাদণ্ড...একমাস পাঁচদিন পরে বিনামূল্যে মুক্তিলাভ...এগুরুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সাহেবের দক্ষিণ আফ্রিকার গমন...
- ১১৪—আন্দোলিকদের নৈতিক অধোগতির প্রায়শ্চিত্তের জন্য ১৪ দিন উপবাস...এগুরুত্ব-আটল-গান্ধী চুক্তি—দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকার স্বীকার...জুলাই মাসে কম্বুজবী ও কালেনবাকের সহিত বিলাত যাত্রা...হ' সপ্তাহ 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' ব্যবস্থা সম্পর্কে অস্বীকৃতি...সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে পরিচয়...মুরিসি-আক্রান্ত ও ভারতে প্রত্যাবর্তন...
- ১১৫—'কাইজার-ই-হিন্দ পদক' লাভ...গোথেলের 'ভারত সেবক সমিতির' আশ্রমে...শান্তিনিকেতনে...রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'মহাত্মা' বলে উল্লেখ...হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গমন ও স্থায়ী ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়...কোচরাতে ২৫ জন সহকর্মী নিয়ে 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা...বিরাম গায়ের গুরু ব্যবস্থার প্রতিবিধান...হরিজন দুর্ভাগ্যবীরের স্ত্রী ও কন্যাকে আশ্রম দেওয়ার বন্ধুবান্ধব কর্তৃক সমাজ-চ্যুত...জ্ঞান সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বোম্বাই কংগ্রেসের 'সাবজেক্ট কমিটিতে' সদস্য মনোনীত...
- ১১৬—কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব ও লখনৌ-কংগ্রেসে যোগদান—পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়...
- ১১৭—চম্পারন সত্যাগ্রহ...রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়—কুপালনী, মহাদেব দেশাই, নরহরি পারিখ...জুন মাসে সবরমতীর তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা... 'সোভাল সার্ভিস লীগে' সভাপতিত্ব...
- ১১৮—আমেরিকাবাসে বঙ্গভূমির সত্যাগ্রহ...শংকরলাল ব্যাংকার, বল্লভভাই প্যাটেল আশালাল সরভাই, অননন্দা বেন প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়...খেড়া সত্যাগ্রহ...মুসলিম লীগের সভার যোগদান...বড়লাটের হুকুমের বিরুদ্ধে হিন্দী ভাষার বক্তৃতা দান...মুন্সে সৈনিক সংগ্রহের চেষ্টা...বঙ্গবাসীর অস্বস্তি...

আমাদের গান্ধিজী

- ১২১৯—অস্ত্রোপচার...জীবনে প্রথম ভারতীয়-ব্যবস্থা-পরিষদের বিতর্ক সভার দর্শক...
রাউলট আইনের প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা...দিল্লী বাবার পথে গ্রেপ্তার
করে বোম্বাইয়ে প্রেরণ, পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষেধ...নড়িয়াদে জনতার উচ্ছ্বস-
তার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তিন দিন উপবাস...‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ ও ‘নব জীবন’
পত্রিকা স্বরের সম্পাদক...জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান
কমিটিতে মালব্যাজী, মতিলাল নেহরু, স্বামী প্রক্‌শানন্দ ও দেশবন্ধুর সংগে ঘনিষ্ঠ
যোগাযোগ...নিখিল ভারত খিলাফত সম্মেলনের সভাপতি...জালিয়ান-
ওয়ালাবাগ-স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের প্রধান কর্মকর্তা...
- ১২২০—আবুল কালাম আজাদের সংগে প্রথম পরিচয়...জালিয়ানওয়ালাবাগের
প্রতিবাদে ‘কাইজার-ই-হিন্দ মেডেল’ ও ‘বুওর-মুন্স-মেডেল’ ফেরৎ দেওয়া...
প্যারীলালের সহযোগিতা...গান্ধিজী কর্তৃক কংগ্রেসের নিয়ম-কানুন প্রণয়ন
...দৈনিক আধ ঘণ্টা সূতা কাটার ব্রত গ্রহণ...
- ১২২১—‘তিলক-স্বরাজ্য-ফাণ্ডের’ জন্ম ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ...শেঠ যমুনালাল
বাকাজ ‘রাও বাহাদুর’ পদবী ভ্যাগ করে গান্ধিজীর কাজে বোগ দেন ও
‘তিলক-স্বরাজ্য-ফাণ্ডে’ এক লক্ষ টাকা দেন...বোম্বাইয়ে প্রথম খাদি ভাণ্ডারের
উদ্বোধন, কলকাতায় শ্রাশান্তাল-কলেজের উদ্বোধন...আসাম চা বাগানের
ধর্মঘটের ব্যাধারে নতুন বড়লাট লর্ড রেডিংয়ের সংগে দীর্ঘ আলোচনা...
সারা ভারতে ২০ লক্ষ চরকার প্রবর্তন...বোম্বাইয়ে বিলিভী বস্ত্রের বহু সংসদ
...মুম্বাজের ভারতে আগমনের দিন হরতাল পালনের ব্যাপারে লক্ষ্মী-
হাংগামা ও তার প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে গান্ধিজীর পাঁচ দিন উপবাস...
অসহযোগ আন্দোলন...২০ হাজার কংগ্রেস-কর্মীর কারাবরণ...কংগ্রেস
কর্তৃক গান্ধিজীকে সর্বাধিনায়ক হিসাবে মনোনয়ন...
- ১২২২—চৌরীচৌরার চূর্ণচূর্ণা, গান্ধিজীর পাঁচ দিন অনশন ও আন্দোলন
স্বগিত রাখা...গ্রেপ্তার ও ছ’ বছর কারাদণ্ড...জেলখানায় আত্মজীবনী
প্রণয়ন...
- ১২২৪—এপেন্ডিসাইটিস অপারেশন...কারামুক্তি...জুহর সাগর তটে...দেশবন্ধু ও মতি
লালের কৌনসিল-প্রবেশ নীতির সমর্থন...দিল্লী, গুলবর্গা, নাগপুর, লখনৌ,
শাজাহানপুর, এলাহাবাদ, জম্মলপুর ও কোহাট দাংগার কলে গান্ধিজীর
২১ দিন অনশন এবং দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলির গৃহে সর্বদলের নেতৃ-
সম্মেলন...বেলগাঁও-কংগ্রেসে সভাপতিত্ব...

আবাদের গান্ধিজী

- ১২২৫—সারা ভারত ভ্রমণ...ভাইকমে অন্ধ্রদেশের সত্যাগ্রহ...গান্ধিনিকেতনে...দেশ-বন্ধুর মৃত্যুতে বাংলা দেশ থেকে দশ লাখ টাকা সংগ্রহ ও 'চিন্তনরত্ন সেবা-সদন' প্রতিষ্ঠা...নিখিল ভারত কাটুনী-সংঘের প্রতিষ্ঠা...আশ্রমিকদের অনাচারের প্রায়শ্চিত্তকল্পে সাত দিন অনশন...
- ১২২৬—স্বামী প্রহ্লাদানন্দের অপহৃত মৃত্যুতে গান্ধিজী কর্তৃক কংগ্রেসে শোক-প্রস্তাব উত্থাপন ও স্বাধীনতা প্রস্তাবের বিরোধীতা...
- ১২২৭—সিংহল ভ্রমণ ও বাদি প্রচারে অর্থ-সংগ্রহ...
- ১২২৮—সাইমন-কমিশন বয়কট...বল্লভভাই কর্তৃক বরদৌলি সত্যাগ্রহ...কংগ্রেস অধিবেশনে এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব...
- ১২২৯—ইউরোপ যাবার আয়তন প্রত্যাখ্যান...কলিকাতায় বিলাতী কাপড়ের বন্ধুত্ব-সব করার জন্ত ১ টাকা জরিমানা...ব্রহ্মদেশে...সর্বদল সম্মেলনে বড়লাটের উপর আস্থা স্থাপনের প্রস্তাব...দিল্লীতে বড়লাটের সংগে গান্ধিজী, মতিলাল, সাপ্‌ক, বিঠলভাই ও জিন্নার সাক্ষাৎকারও বড়লাট কর্তৃক ডোমিনিয়ন-স্ট্যাটাস সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলার অক্ষমতা জ্ঞাপন...গান্ধিজীর অমু-প্রেরণায় কংগ্রেসের বৈঠকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ...
- ১২৩০—ইয়ং ইণ্ডিয়ান ১১ দফা শর্ত প্রকাশ, ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক...৭৯ জন আশ্রমিক নিয়ে ১২ই মার্চ দাণ্ডি অভিযান শুরু...২০০ মাইল পদব্রজে অভি-ক্রম, ৬ই এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটায় লবণ আইন অমান্ত...কুড়াবজ্র, বল্লভভাই, জহরলাল, মতিলাল গ্রেপ্তার...পেশোয়ার, মাদ্রাজ, বাংলা, করাচী, শিরোনা, রত্নগিরি, পাটনা, কলকাতা, বোলপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান আইন অমান্তের পুরোভাগে...করাচিতে রাষ্ট্র পৌশে একটার সময় গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার...মুক্তির জন্ত ১০২ জন বার্ষিক পাজীর আবেদন...পানামায় ২৪ ঘণ্টা ব্যাপি হরতাল...এক লাখ লোকের কারাদণ্ড...পেশো-য়ারে নিরস্ত্র নাগরিকদের প্রতি গুলি চালাতে গাড়োয়ালি সৈন্তের অস্বীকৃতি...স্তার তেজ বাহাদুর সাপ্‌ক ও মুকুন্দরাম রাও জয়াকরের মধ্যস্থতায় গান্ধিজী ও ভারত সরকারের মধ্যে মিটমাট করার চেষ্টা ব্যর্থ...কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন...
- ১২৩১—২৫শে জানুয়ারী মুক্তিলাভ...চার্লস কর্তৃক 'অর্থনৈতিক সন্ন্যাসী' বলে কবিতা...বড়লাট আকইনের সংগে চুক্তি...ভগৎ সিং, রাজগুরু ও গুরুদেবের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ...গুজরাট বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা...জাতীয়

আমাদের গাফিলত

সভাকার সমিতি...নতুন বড়লাট ওয়েলিংটনের সঙ্গে আলোচনা...দ্বিতীয়
গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য 'রাজপুতনা' জাহাজে ১১শে আগস্ট
কিশোর বাজা...যাবার পথে সম্মান...লণ্ডনে কিস্তি হলে অবস্থান...গান্ধী
খুড়ো...আমেরিকার উদ্দেশ্যে বেতার বক্তৃতা...সদ্রাট পঞ্চম জর্জ ও মহারাজী
মেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ...ম্যাক্‌ডোনা, ইটন, অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থানে
সম্মতি...বার্ণার্ড শ', লয়েড জর্জ, চার্লি চ্যাপলিন, হারল্ড ল্যাস্কি, আর্থার
হেথারলন, ক্যান্টারবারীর রাজক-প্রধান প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ...আমেরিকা,
ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, প্যাগেটাইন, মিশর, হাংগারী, ডেনমার্ক ও আয়ার-
ল্যাণ্ড থেকে আমন্ত্রিত...৫ই ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগ, ফেরার পথে রোম, বেলজার
সঙ্গে ও মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ...২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে পদার্পণ...

১৯৩২—৬ দিন ধরে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা...৪ঠা জানুয়ারী রাত তিনটার সময়
গ্রেপ্তার...ম্যাকডোনালাড সাহেবের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদে
২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর অবধি অনশন—হিন্দু নেতৃ সম্মেলন,
অম্পুজদের হরিজন আখ্যা দীন...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে অনশন ভঙ্গ...
২২শে ডিসেম্বর আপ্পা সাহেবের প্রতি সহানুভূতিশূচক উপবাস...

১৯৩৩—হরিজন-দেবক-সংঘের প্রতিষ্ঠা, ও 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ...আন্তর্জাতিক
জন্ত ৮ই মে থেকে ২১ দিন উপবাস...৬' সপ্তাহের জন্ত আইন অমান্য
আন্দোলন স্থগিতের নির্দেশ...সবরমতী আশ্রম হরিজনদের উদ্দেশ্যে দান...
১লা আগস্ট রাসে যাবার পথে ৩৪ জন আশ্রমিকসহ গ্রেপ্তার...৩ দিন পরে
মুক্তি, আদেশ অমান্য করার জন্ত আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার গ্রেপ্তার ও এক
বছর কারাদণ্ড...১৬ই আগস্ট অনশন আরম্ভ...২০শে আগস্ট সেহন
হাসপাতালে প্রেরিত...২৩শে মুক্তিলাভ...হরিজন উন্নয়নের জন্ত ভারত
পরিষ্কার ও আট লাখ টাকা সংগ্রহ...

১৯৩৪—বিহার ভূমিকম্পে বিহার ভ্রমণ...আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত...পুনার
পথে মহাত্মাজীর মোটারের উদ্দেশ্যে বোম্বা নিক্ষেপ...হরিজন কর্মী কতৃক
আন্দোলন বিরোধীরা মাথায় বক্সি প্রহার ও তার প্রায়শ্চিত্তের জন্ত জুলাই
মাসে সাত দিন গাফিলত অনশন...নিখিল-ভারতগ্রামোদ্ধোগ-সংঘের
প্রতিষ্ঠা...কংগ্রেস থেকে চার আনার সমস্তপদ ত্যাগ...

১৯৩৫—সমস্ত বকেরা কাজ শেষ করার জন্ত ২৬শে মার্চ চার সপ্তাহ যৌনাবলম্বন...
ইন্দোরে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি...সেবাগ্রামে আশ্রমের পত্তন...

আগমনের ব্যক্তিগত

- ১২০৬—জাপানী কবি ইয়োনে নকুচি ও কবি জিবকা কোমুর সেবাগ্রামে আগমন ও জাপান বাবার আবরণ...অনু-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের নেত্রী মার্গারেট সিংগারের সাক্ষাৎকার...নিগ্রো প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা...বন সত্যের আয়বিক দুর্বলতার অসুস্থ...গান্ধী সেবা-সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব...নাগপুরে নির্ধিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব...জাতীয় শিক্ষাসম্মেলনে সভাপতিত্ব...হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য হরিজনে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ...
- ১২০৭—নতুন আইনে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত...গান্ধিজীর নির্দেশ—মার্ক নিবারণ, কৃষি-ঋণ লাঘব, প্রাথমিক শিক্ষা, কারাগার সংশোধন...কলিকাতায় রবীন্দ্র-নাথের সংগে সাক্ষাৎ...ত্রিবাংকুরে ভ্রমণ—মন্দির দ্বার উন্মুক্ত...মাদ্রাজে ভারতীয় সাহিত্য-পরিষদে সভাপতিত্ব...কর্ণাটের গান্ধী সেবা সংঘে সভাপতিত্ব...ওয়ার্ধার শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও নয়া তালিমীর পরিকল্পনা...অসুস্থতার জন্য জুহতে অবস্থান...রক্তের চাপ বৃদ্ধি...
- ১২০৮—সেবাগ্রামে প্রত্যাবর্তন...লর্ড লোথিয়ান ও তাকাওকার আগমন...পেশোয়ার ভ্রমণ...দালাং গান্ধী সেবা সংঘে সভাপতিত্ব...সেবাগ্রামে বড়দিন উৎসব...চেক ও জার্মান ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন...মিউনিক চুক্তির সমালোচনা...রাজবন্দীদের মুক্তির চেষ্টায় কলিকাতায় আগমন, বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীদের সংগে সাক্ষাৎকার ও লার্ট সাহেবের সংগে আলোচনা...
- ১২০৯—ভাট্কার কাগাওয়ার আগমন...ঠাকুর সাহেবের চুক্তি ভংগে রাজকোটে গান্ধিজীর পাঁচ দিন অনশন...সুভাষচন্দ্রের সংগে মতানৈক্য...রাজবন্দীদের মুক্তির চেষ্টায় কলিকাতায় আগমন ও আলোচনা...সুভাষচন্দ্রকে উপদেশ...ওয়ার্ধার কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ও মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগের নির্দেশ...বড়লাটের সংগে আলোচনা...হরিজনে গণপরিষদ গঠন করার উল্লেখ...সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সম্পাদনায় 'গান্ধী জয়ন্তী' পুস্তক প্রকাশ...মালিকান্দ্যার গান্ধী সেবা সংঘের অধিবেশনে যোগদান...
- ১২১০—শান্তিনিকেতনে আগমন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গান্ধী দম্পতিকে আশ্রয়স্থলে অভিনন্দন...অসুস্থ দীনবন্ধু এগুরুজের সংগে কলিকাতার হাসপাতালে সাক্ষাৎকার...বড়লাটের সংগে সিমলায় ছুঁবার দীর্ঘ আলোচনা...কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সত্যগ্রহ আন্দোলনে রূপান্তরিত করার নির্দেশ...বিনোবা ভাবেকে দিয়ে ব্যক্তিগত সত্যগ্রহের স্বর...জহরলাল ও আকাদের কারা-

আবাদের গাঙ্গী

১৯৩০—প্রেস আইনের প্রতিবাদে 'হরিজন', 'হরিজন বন্ধু' ও 'হরিজন সেবক' প্রকাশ বন্ধ...

১৯৪১—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ...বরদৌলিতে বঙ্গভাষাইয়ের আশ্রমে মাস খানেক অবস্থান...২৫০০০ জন সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড ও ছ' লাখ টাকা জরিমানা...কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি...

১৯৪২—বীনবন্ধু এগুরুজ শ্রুতি তহবিলে ৫ লাখ টাকা সংগ্রহ...মার্কিন সাংবাদিক লুই কিসারের সাত দিন সেবাগ্রামে অবস্থান...চিয়াং কাইশেক দম্পতির সংগে কলিকাতায় সাক্ষাৎকার...ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের সংগে আলোচনা...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি লুই জনসনের সংগে আলোচনা...১৫ মাস পরে হরি-জনের পুনঃ প্রকাশ...জহরলালকে নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা...বোম্বাইয়ে ৮ই আগস্ট 'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত, সেই রাত্রেই গ্রেপ্তার ও পুণার আগা থা প্রাসাদে বন্দী...আগা থা প্রাসাদে সেক্রেটারী মহাদেব দেশাঠের মৃত্যু...ভারতবাসী আন্দোলন...চিমুর অত্যাচারের প্রতিবাদে অধ্যাপক ভাঁসালির অনশন...বাংলার অর্থ সচিব ডাক্তার জামাপ্রসাদের পদত্যাগ...

১৯৪৩—সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদে ২১ দিন অনশন...বড়লাটের মন্ত্রীসভা থেকে স্তার এইচ, পি, যোদী, নলিনীরঞ্জন সরকার ও মাধব শ্রীহরি আনের পদত্যাগ...

১৯৪৪—২২শে ফেব্রুয়ারী আগা থা প্রাসাদে কস্তুরবা'র মৃত্যু...ম্যালেরিয়া অসুস্থ...৬ই মে সকাল ৮টায় বিনাস্তে মুক্তিলাভ...জুহর গাঙ্গী-গ্রামে ২৫ দিন যৌনী হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ...২১শে মে জীবনে প্রথম সর্বাক চিত্র দর্শন—'মিশন-টু-মস্কো' গাঙ্গী-গ্রামে বিশেষভাবে দেখাবার ব্যবস্থা...বোম্বাই ডক বিক্ষোভে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন...পাকিস্তান সম্পর্কে জিন্নার সংগে আলোচনা...সেবাগ্রামে রবীন্দ্র মৃত্যু-বার্ষিকী ও গাঙ্গী-জন্মতিথি উৎসব...কস্তুরবা শ্রুতি-ভাণ্ডারে ১১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত...

১৯৪৫—সাম্প্রদায়িকতা নিবারণকল্পে জিন্নার সংগে আলোচনা...সমস্ত কংগ্রেসী নেতার মুক্তিলাভ, সিমলায় গাঙ্গী ও কংগ্রেসী নেতাদের সংগে বড়লাটের আলোচনা...

১৯৪৬—ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার তিনজন সদস্য স্তার পেথিক লরেন্স, স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স ও জেনারেল আলেকজান্ডারের ভারতে আগমন, গাঙ্গীজীর সংগে আলোচনা

আবাকের নাজিরা

—সপরিবার, অসংখ্য সন্তান, নাজিরান ও ভারতের স্বাধীনতা সঙ্গরে
আলোচনা...১৯ই আগস্ট মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' ফেব্রু—কলি-
কাতা থেকে নাজিরশাহী হত্যাকাণ্ডের হুক...

১৯৪৭—সাপ্তাহিক বীজসজা নিবারণের জন্য নোয়াখালি ও বিহারে পঞ্চদশে পল্লী
পরিদর্শন...কান্দীর পরিদর্শন...দিল্লীতে দাংগা নিবারণের জন্য ৫ই এপ্রিল
একদিনের জন্য অনশন...কলিকাতায় ১লা সেপ্টেম্বর থেকে তিন দিন অনশন
...স্বাধীন ভারতের সূচনা...পাকিস্তান ও কান্দীরে পাকিস্তানীদের অত্যাচার
ও কান্দীর আক্রমণ...বুধ...১লা এপ্রিল দিল্লীতে এশিয়া সম্মেলনে বক্তৃতা
—অথও বিশ্ব গঠনের জন্য এশিয়াবাসীর কাছে আবেদন...

১৯৪৮—দিল্লীতে সাপ্তাহিক যৈত্রী স্থাপনের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা...১৩ই জানুয়ারী
৫ দিনের জন্য অনশন...২০শে জানুয়ারী ১৫ গজ দূর থেকে বোমা বিস্ফোরণ
...৩০শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় বাবার পথে আততায়ীর গুলিতে আহত,
বিড়লা ভবনে প্রাণ ত্যাগ...১২ই ফেব্রুয়ারী ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে
চিত্তাভঙ্গ বিসর্জন...ভারতের বাহিরেও চিত্তাভঙ্গ প্রেরণ...বিশ্বের শোক...

সত্যাপ্রহ-অভিধান

১২০৬—(প্রথমবার)—দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভাল গবর্ণমেন্টের গেজেটে এশিয়াটিক অর্ডিন্যান্সের খসড়া প্রকাশিত হয়। এই আইনের মূল কথা ছিল, ট্রান্সভালে ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করা ও যারা সেখানে আছে তাদের প্রতি দাঙ্গী আসামীর মত ব্যবহার করা। ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে গান্ধিজী এই আইন-অমাত্র আন্দোলন শুরু করেন। শ'ছয়েক ভারতীয় জেলে যাবার পরে ৩০শে জানুয়ারী, ১২০৭ সালে জেনারেল স্মার্টসের সংগে তাঁর চুক্তি হয়...

১২০৮—(দ্বিতীয়বার)—স্মার্টস সাহেব কাল-কাহন তুলে দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রাখলেন না। আবার সত্যাপ্রহ শুরু হোল। দু' হাজার ভারতীয় প্রকাশ্য সভায় তাদের পরিচয়-পত্র পুড়িয়ে ফেললো। পুলিশ কত লোককে জেলে পুরলো, জরিমানা করলো, ভারতীয় মজুরদের বেত্রাঘাত করা হোল, গুলি চালানো হোল, কিন্তু আন্দোলন কমলো না...

১২১৩—(তৃতীয়বার)—মাথা পিছু তিন পাউণ্ড (৪৫ টাকা) বার্ষিক করের বিরুদ্ধে ২২৩২ জন ভারতীয় নরনারী ও শিশু সংগে নিয়ে নাভালের নিউক্যাসল থেকে ট্রান্সভালের পথে গান্ধিজীর অভিধান...চার দিনের মধ্যে তিনবার গ্রেপ্তার এবং দু' দফায় এক মাস ও তিন মাস কারাদণ্ড...এক মাস পাঁচ দিন পরে বিনাসর্তে মুক্তিলাভ...

১২১৪—(চতুর্থবার)—গুজরাটে বিরাম গাঁয়ে শুধু আদায়ের বিরুদ্ধে সত্যাপ্রহ, ভারত সরকার কর্তৃক স্ব-বন্দোবস্ত...

১২১৭—(পঞ্চমবার)—বিহারের চম্পারণ জেলায় নীলকুঠার সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিধান...ছ' মাসের মধ্যে ভারত সরকার কর্তৃক সর্ব বিষয়ের প্রতিকার...

১২১৭—(ষষ্ঠবার)—ভারত থেকে বিদেশে মজুর পাঠাবার বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের সংকল্প, জাহাজে জাহাজে পিকেটিং করার প্রস্তাব...ভারত সরকার কর্তৃক কুলি পাঠানো বন্ধ...

১২১৮—(সপ্তমবার)—আমেদাবাদে মিল শ্রমিকদের প্রথম শ্রমিক-সংঘ গঠন...বেতন বৃদ্ধির অন্ত বাইশ দিন ধর্মঘট...তিন দিন অনশন...শ্রমিকদের শতকরা ৩৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি...

আবাকের গাছিকী

- ১১১৮—(অষ্টমবার)—গুজরাটে'র খেড়া জেলায় ছুঁড়িক-পীড়িত চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য সরকারী জুলুমের প্রতিবাদ...খাজনা কমানোর জন্য আন্দোলন ও জয়লাভ...
- ১১১৯—(নবমবার)—রাউলট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ...৬ই এপ্রিল হরতাল ঘোষণা...জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ সভায় মিলিটারীর গুলি চালনা, ৪০০ জন নিহত, ১২০০ আহত...
- ১১২০—(দশম বার)—সেপ্টেম্বর মাসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু...৩০,০০০ সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড...চৌরীচৌরায় থানা জালিয়ে দেবার পর আন্দোলন স্থগিত... গাছিকীর ছ'বছর কারাদণ্ড...
- ১১২১—(একাদশবার)—আকালী শিখেরা পানজাবের 'গুরুদাস বাগ' তীর্থ দখল করার জন্য অভিযান করে। এই তীর্থ স্থানটি উদাসী শিখদের অধিকারে ছিল, তারা পুলিশের সাহায্য নেয়। দিনের পর দিন সত্যাগ্রহীরা হাত জোড় করে সত্যাগ্রহ করে পুলিশের মার খায় কিন্তু প্রতিবাদ করে না। শেষে স্ত্রীর গংগারাম 'বাগটি' ভাঙা নিয়ে আকালীদের হাতে সমর্পন করেন...
- ১১২২—(দ্বাদশবার)—ত্রিবাংকুর রাজ্যে ডাইকনে অস্পৃশ্যদের সত্যাগ্রহ। সেখানে অস্পৃশ্যদের রাস্তা দিয়ে চলার অধিকার ছিল না, গাছিকীর নির্দেশে সত্যাগ্রহীরা হাত জোড় করে পথে বসে রইল ও শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলো...
- ১১২৩—(ত্রয়োদশবার)—মাত্রাজে সিপাহী-যুদ্ধের যুগের অত্যাচারী সেনাপতি 'নীল সাহেবের' মর্মরমূর্তি অপসারণের দাবী...কিছুদিন চলার পর সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখা হয়, দশ বছর বাদে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সেই মূর্তি অপসারিত করেন...
- ১১২৪—(চতুর্দশবার)—গুজরাটে বরদৌলি তালুকে খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রজাদের আন্দোলন...গাছিকীর আশীর্বাদ নিয়ে সর্দার বনভভাইয়ের নেতৃত্বে...সরকার কর্তৃক অহুসদ্ধান ও প্রজাদের দাবী স্বীকার...
- ১১২৫—(পঞ্চদশবার)—জেলের মধ্যে অনাচারের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে বীরট বড়মন্ড নামলার আসামী যতীন্দ্রনাথ দাসের ৬৩ দিন অনশন সত্যাগ্রহ করে বৃত্ত্যবরণ...
- ১১২৬—(ষোড়শবার)—আইন অব্যাহত আন্দোলনের শুরু...পদব্রজে সবরমতী আশ্রম থেকে ১০০ কোশ পথ অতিক্রম করে দাণ্ডি গমন ও লবণ-আইন অব্যাহত...

আম্মোলন গাঙ্কী

সারা ভারতে আম্মোলন...সন্ধ্যিক লোকের কারাদণ্ড...পুলিশের গুলি চালনা...এই মে গ্রেপ্তার ও যারকো জেলে নীত...

১২৩১—(সপ্তদশবার)—কর্ণাটের চাষীদের কর যত্নের আম্মোলন...জমি জমা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ও নীলাম...শেষে সরকার কর্তৃক কৃষকদের দাবী স্বীকার...

১২৩২—(অষ্টাদশবার)...গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এসে নতুন করে আইন অব্যাহত আরম্ভের নির্দেশ...১২৩২য়ের ৪ঠা জানুয়ারী গ্রেপ্তার...এক লাখ লোকের কারাদণ্ড, পেশোয়ারে গুলি চালনা...শেষে গণ-আম্মোলন বন্ধ করে ব্যক্তিগত-আম্মোলনের নির্দেশ...১২৩৪ সালে গাঙ্কীর নির্দেশে আম্মোলন স্থগিত...

১২৩৩—(উনবিংশবার)—রাজবন্দীদের অনশন-সত্যাগ্রহ.....তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য গাঙ্কীর দুবার কলিকাতায় আগমন ও তাদের মুক্তিদানের চেষ্টা...

১২৪০—(বিংশবার)—শ্রীবিনোবা ভাবেকে দিয়ে একক সত্যাগ্রহের উদ্বোধন...ত্রিশ হাজার কর্মীর কারাবরণ...

১২৪২—(একবিংশবার)—‘ভারত ছাড়ো’ অভিবান...নেতাদের কারাবরণ, সমগ্র ভারত রক্ত-প্রাণিত...

১২৪৭—সাম্প্রদায়িক রক্তপাত নিবারণ করে নোয়াখালি ও বিহারে পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পরিক্রমা...

কান্নাবন্ধন

- ১২০৮—ট্রান্সভাল ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ অমান্ত করার অপরাধে জোহানেসবার্গে দু'মাস কারাদণ্ড কিন্তু জেলে ছিলেন ১০ই জানুয়ারী থেকে ৩০শে জানুয়ারী অবধি...
- ভোকস্ট্রট ও প্রিটোরিয়ার জেলখানায় দু'মাস কারাবাস—১৬ই আগস্ট থেকে ৬ই নভেম্বর...
- ১২১০—নিউক্যাসল থেকে নাতাল বাবার পথে চারবার গ্রেপ্তার... দু'দফা বিচারে ন'মাস ও তিনমাস কারাদণ্ড কিন্তু জেলে থাকতে হয় ১৭ই নভেম্বর থেকে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত...
- ১২২২—ইয়ং ইণ্ডিয়া কাংগ্রেসে তিনটি প্রবন্ধ লেখার জন্য ছ'বছর কারাদণ্ডের আদেশ কিন্তু জেলে থাকতে হয় ১২২২য়ের ১০ই মার্চ থেকে ১২২৪য়ের ৭ই ফেব্রুয়ারী অবধি...
- ১২৩০—লবণ-আইন অমান্ত করার অপরাধে বিনা বিচারে বন্দী—১২৩০য়ের ৫ই মে থেকে ১২৩১য়ের ২৬শে জানুয়ারী অবধি কারাবাস...
- ১২৩২—দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে কিরে আসার পর বিনা বিচারে বন্দী— ১২৩২য়ের ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ১২৩৩য়ের ৮ই মে পর্যন্ত কারাবাস...
- ১২৩৩—একক সভ্যাগ্রহ আন্দোলন চালাবার অপরাধে ৩১শে মে থেকে ৪ঠা আগস্ট অবধি কারাবাস...
- ১২৩৩—সরকারী নির্দেশ অমান্ত করার অপরাধে একবছর কারাদণ্ড কিন্তু জেলে থাকতে হয় ৪ঠা আগস্ট থেকে ২৩শে আগস্ট পর্যন্ত...
- ১২৪২—'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাবের পর বিনা বিচারে বন্দী—১২৪২য়ের ২ই আগস্ট থেকে ১২৪৪য়ের ৫ই মে অবধি আগা থা-প্রাসাদে অন্তরীণ...

অনশন

- ১২১৩—দক্ষিণ আফ্রিকায় কিনিক্স্ আশ্রমে দু'জন আশ্রমিকের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্ত এক সপ্তাহ অনশন ও পরে সাত্বে চার মাস পর্যন্ত দৈনিক একবার অন্নগ্রহণ...
- ১২১৪—কিনিক্স্ আশ্রমিকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্ত চৌদ্দদিন অনশন...
- ১২১৮—আমেদাবাদ মিল-যজ্ঞতরুদের পক্ষে ধর্মঘটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার জন্ত তিনদিন উপবাস—১২, ১৩, ১৪ই মার্চ...
- ১২১৯—নাড়িয়াদে রেল লাইন তুলে দেবার চেষ্টা হয়েছে শুনে ১৩ই এপ্রিল থেকে তিনদিনের জন্ত অনশন...
- ১২২১—যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে নানাস্থানে দাংগাহাংগাঝা হয়, তা বন্ধ করার জন্ত বোম্বাইয়ে ২ই নভেম্বর থেকে পাঁচ দিনের জন্ত অনশন...
- ১২২২—চৌরীচোরার দুর্ঘটনার জন্ত বরদোলিতে ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঁচদিনের জন্ত অনশন...
- ১২২৪—কোহাটে হিন্দু-মুসলমান দাংগার জন্ত দিল্লীতে ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে একশ দিনের জন্ত অনশন...
- ১২২৫—সবরমতী আশ্রমের বাসিন্দাদের অগ্নায় কাজের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্ত ২৪শে নভেম্বর থেকে সাতদিন অনশন...
- ১২৩২—ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করে ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে যেরোডা জেলখানায় আমরণ অনশন শুরু করেন, শেষে ২৬শে সেপ্টেম্বর গবর্নমেন্টের প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় তিনি আহার গ্রহণ করেন...
- ১২৩২—আব্বা সাহেব পটবর্ধন জেলখানায় মেথরের কাজ করতে চান, কিন্তু জেলের কর্তারা অহুমতি না দেওয়ায় তিনি অনশন শুরু করেন। গান্ধিজী তখন যেরোডা জেলে, তিনিও ২২শে ডিসেম্বর থেকে সহানুভূতিসূচক উপবাস শুরু করেন। দু'দিনের মধ্যেই জেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গিটমাট হয়ে যায়...
- ১২৩৩—আত্মত্যাগ করার জন্ত যেরোডা জেলে ৮ই মে থেকে একশ দিন উপবাস। প্রথমদিনেই গান্ধিজীকে গবর্নমেন্ট মুক্তি দেন, পুণার 'পর্ণকুঠীতে' তিনি উপবাস শেষ করেন...
- ১২৩৩—হরিজনদের সেবার উদ্দেশ্যে জেলে ১৬ই আগষ্ট থেকে অনশন শুরু...

আমাদের গান্ধিজী

- চারদিন উপবাস করার পর তাঁকে সেখান হামশাফালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৩শে আগস্ট অবস্থা সংকটজনক বেগে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়...
- ১৯৩৪—হরিজন সেবকদের সংগে বিয়োবীদলের বাঙ্গালাআমি হওয়ার জুলাই মাসে গান্ধিজীর সাতদিন অনশন...
- ১৯৩৭—রাজবন্দীদের প্রতি সহানুভূতি আনিতে কলিকাতায় ২৬শে অক্টোবর একদিনের জল অনশন...
- ১৯৩৯—রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতি-ভংগের প্রতিবাদে ৩রা মার্চ থেকে রাজকোটে অনশন শুরু করেন, বড়লাট মধ্যস্থতা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পঞ্চমদিনে আহার গ্রহণ...
- ১৯৪৩—ভারত-ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার সভ্যগ্রহীদের উপর যে দোষারোপ করেন তার প্রতিবাদে গান্ধিজী আগা-খাঁ-প্রাসাদে ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে একশদিন অনশন করেন...
- ১৯৪৭—৫ই এপ্রিল হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা কলে চব্বিশ ঘণ্টা অনশন করেন, বড়লাটের চেম্বার সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিষেধ করে গান্ধিজী ও জিন্নার যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়...
- ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার বেলেঘাটায় হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের জল অনিদিষ্ট কালের জল অনশন আরম্ভ, ৪ঠা তারিখে রাত নটায় অনশন ভংগ...
- ১৯৪৮—দিল্লী ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের পুনর্বাসতি কাজ সম্পন্ন করার জল ১৩ই জানুয়ারী থেকে আমরণ অনশন আরম্ভ। সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসে পাঁচ দিন পরে আহার গ্রহণ...

অর্থ-সংগ্রহ

- ১। জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতি-তহবিল...
- ২। তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডার—১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা...
- ৩। দেশবন্ধু স্মৃতি-তহবিল—১০ লক্ষ টাকা...
- ৪। হরিজন তহবিল...
- ৫। দীনবন্ধু এণ্ডরুন্স স্মৃতি-তহবিল—৫ লক্ষ টাকা...
- ৬। কস্তুরবা স্মৃতি-তহবিলে ১৯৪৪ সালের ২রা অক্টোবর ১৫-তম জন্ম-
তিথিতে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা উপহার...
- ৭। সর্বহারা পুনর্বসতি তহবিলে নোয়াখালি পরিক্রমার সময় ৩ লক্ষ টা...

আশ্রম প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণ আফ্রিকায়—

১৯০৩ সালে ফিনিক্স আশ্রম

১৯১০ সালে টেলটয় ফার্ম

ভারতবর্ষে—

১৯১৫ সালে সবারমতি আশ্রম

১৯৩৬ সালে সেবাগ্রাম আশ্রম

সাময়িক পত্রের সম্পাদনা

১৯০৪—ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন—ইংরাজী, হিন্দী, তামিল ও গুজরাটি ভাষায়

১৯১৯—ইয়ং ইণ্ডিয়া—চারি ভাষায়

—নবজীবন

১৯২০—হরিজন

চিত্তাভ্য বিসর্জন

বাঃ সা—ব্যারাকপুর—গঙ্গা
 নোয়াখালি—মেঘনা
 লাক্ষ্মীবন্দ (ঢাকা)—ব্রহ্মপুত্র
 ত্রিপুরা—নর্মদা
 বিহার—গড়মুক্তেশ্বর—গঙ্গা
 পাটনা—গঙ্গা
 মজফেরপুর—গণ্ডক
 গয়া—ফল্গু
 ভাগলপুর—গঙ্গা
 রাঁচী—সুবর্ণরেখা
 উড়িষ্যা—কটক—মহানদী
 পুরী—বঙ্গোপসাগর
 আসাম—গৌহাটি—ব্রহ্মপুত্র
 শিলচর—বরাক
 তেজপুর—ব্রহ্মপুত্র
 শিবসাগর—ব্রহ্মপুত্র
 ডিব্রুগড়—ব্রহ্মপুত্র
 যুক্তপ্রদেশ—হরিদ্বার—গঙ্গা
 যথুরা—যমুনা
 অযোধ্যা—সরযু
 বেনারস—গঙ্গা
 এলাহাবাদ—গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গম
 রামপুর—....
 বোম্বাই—বোম্বাই—আরব সাগর
 আমেদাবাদ—সবরমতী
 সেবাগ্রাম—গোমতী
 নাসিক—গোদাবরী
 সুরাট—তাস্তী
 গোকর্ণ—আরবসাগর

আমাদের গান্ধিজী

শাজাব—জলজর—শতদ্রু নদী

দেশীয় রাজ্য—জম্মু—বিতস্তা

গোয়ালিয়র—শিপ্রা

ওয়ারাঙ্গল (হায়দরাবাদ)—গোদাবরী

মহীশূর—কাবেরী

ইন্দোর—...

পুণর—পুণর

রাজকোট—আরব সাগর

জুনাগড়—আরবসাগর

পোরবন্দর—আরবসাগর

ভূতা—আরবসাগর

মাদ্রাজ—মাদ্রাজ—বঙ্গোপসাগর

শ্রীরঙ্গম—কাবেরী

কল্লুকুমারী—ভারতসাগর

রাবৈখর—ভারতসাগর

ভরতপূজা—ভারতসাগর

বেঙ্গওয়াদা—কৃষ্ণা

নরসিংওয়াদি—কৃষ্ণা

ফরাসী-ভারত—মাহে—আরবসাগর

ভারতের বাহিরে—মানস সরোবর—মানস সরোবর

রেকুণ (অন্ধদেশ)—ইরাবুতী

কলছো (সিংহল)—ভারতসাগর

সিংহপুর—প্রশান্ত মহাসাগর

ফিনিক্স—(দক্ষিণ আফ্রিকা)—আমেজানি নদী

In my opinion we
 have neither father
 nor mother neither
 wife nor children
 we belong to India
 & every old man calls
 out to us for service.
 As therefore the
 Professor's father
 has other nurses
 he should with-
 draw in the
 gentlest manner
 possible believing
 that service of India
 includes service
 of his father. If his
 father was without
 nursing, service
 of him would
 have been service
 of India. M.K.G.

In my opinion we
 have neither father
 nor mother neither
 wife nor children.
 We belong to India
 & every old man calls
 out to us for service.
 As therefore the
 professor's father
 has other nurses
 he should with-
 draw in the
 gentlest manner
 possible believing
 that service of India
 includes service
 of his father. If his
 father was without
 nursing, service
 of him would
 have been service
 of India. M. K. G.

(আমার মতে আমাদের পিতা নাই মাতা নাই স্ত্রী নাই পুত্র নাই, আমরা ভারতবর্ষের সম্পত্তি। ভারতের প্রতিটি বৃদ্ধ আমাদের কাছে সেবা পাবার দাবী জানাচ্ছে। অতএব অধ্যাপকের পিতাকে সেবা করার জন্ত যখন অল্প লোক আছে, তখন দেশ সেবা করলে পিতারও সেবা হবে এই বিশ্বাস রেখে যতদূর সম্ভব নম্রভাবে তাঁর সরে আসা উচিত। যদি তাঁর পিতাকে সেবা করার কেউ না থাকতো তাহলে তাঁর পক্ষে পিতৃ-সেবাই দেশ-সেবা বলে গণ্য হতো।

ম. ক. গ.)

* আচার্য জীবনরাম ভগবানদাস কৃপালনী সম্পর্কে লিখিত।

प्रातीय भाषाओं के स्थान
 नहीं, बल्की उनको सिवाय
 मन्त्र प्रातीय विनिमय के
 लिये एक राष्ट्रभाषा
 समस्त भारतको लिये
 जरूरी है वह भाषा केवल
 हिंदी हिंदुस्तानी हो सकती है
 मो. क. गांधी

प्रातीय भाषाओंके स्थानमें
 नहीं बल्की उनको सिवाय
 मन्त्र प्रातीय विनिमयके
 लिये एक राष्ट्रभाषा
 समस्त भारतको लिये
 जरूरी है वह भाषा केवल
 हिंदी हिंदुस्तानी हो सकती है

मो. क. गांधी

भारतीय भाषाओं के स्थानमें
 नहीं, बल्की उनको सिवाय
 मन्त्र प्रातीय विनिमयके
 लिये एक राष्ट्रभाषा
 समस्त भारतको लिये
 जरूरी है वह भाषा केवल
 हिंदी हिंदुस्तानी हो सकती है।

मो. क. गांधी

(आधुनिक भाषाएं बोलने में, परन्तु विभिन्न प्रदेशों के भाषा विनिमय के लिये एक राष्ट्र-
 भाषा का अभाव अशुभ है, अतः हिन्दुस्तानी ही सही राष्ट्रभाषा होना चाहिये।

मो. क. गांधी

মালী

I will give you a talisman.

Whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions?

Then you will find your doubts and your self melting away.

নতুন মালী
৩৩৭. ৪-নাকী

(আমি তোমাদের একটি রক্ষা-কবচ দোব। যখনই তোমরা কোন সময়ে পড়বে, অথবা যখন নিজের কথাটাই বড় বলে মনে হবে, তখনই নিম্নলিখিত পরীক্ষা প্রয়োগ করবে। সবচেয়ে গরীব ও সবচেয়ে দুর্বল যে মানুষটিকে তুমি দেখেছ তার মুখানি স্মরণ করে নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে যে যে-কাজ তুমি করতে মনস্থ করছ তা সেই লোকটির কোন উপকারে লাগবে কি না। তার দ্বারা তার কিছু লাভ হবে কি? তার জীবন ও ভবিষ্যৎকে আয়ত্ব করার মত সামর্থ্য কিরে পাবে কি? অর্থাৎ, বুদ্ধিভিত্তিক, আধ্যাত্মিক দুখার দ্বিধিত লক্ষ লক্ষ জনগণের স্বরাজ আসবে কি সেই পথে?

তখনই তুমি দেখবে তোমার সমস্ত দুঃখ ও অর্থ প্রবীড়িত হয়ে যাচ্ছে।—মো, ক, গান্ধী)

কর বংশধরের পরাধীনতার সূচিত স্বাক্ষর আমাদের সাক্ষ্য করতে হবে। হুমতো না স্বীকরণ করে খাটোকেও তা খেতে হবে না। আমাদের বিচার করা যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে হুমতো প্রত্যাশা সহজে আমরা করে নেতামি না। বহু-কর্তার সম্মুখে তখন বেঁচে, উচ্চ-উচ্চল অবস্থানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমাদের হুমতাদার প্রকার অতিক্রম করতে হবে। অধ্যাবসায় সহকারে কতদিন-কতদিনে থাকি, কতদিনে আমাদের মধ্যেই জয় রয়েছে। এইরূপ বিশ্বাস ও সাহস অবলম্বন করে থাকলে সমস্ত নতুন যুগের অত্যাশ্রয় হবে।

ভয় ও অহিংসা—

আমার মত শত শত লোক নষ্ট হয়ে যাক, তবু সত্যের জয় হোক।

পৃথিবীর দীনতম মানুষ বা ভোগ করতে পারে না, সত্যকারের অহিংসা-ক্রান্তীর আকাংখা করা অসম্ভব।

মনে লোভ না থাকলে অস্ত্রের প্রয়োজন হোত না।

ক্রোধে উন্নত হলে কোনই লাভ হবে না। ক্রোধ থেকে আক্রোশ জন্মে, আর আক্রোশের ফলেই বীভৎস ব্যাপার ঘটে।

ভারতবর্ষ তো পৃথিবীর উপহালের পাত্র হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর লোক আজ জিজ্ঞাসা করছে—আজ কোথায় তোমার অহিংসা, যে অহিংসা দ্বারা তুমি তোমার স্বাধীনতা অর্জন করেছ? আমার তো এই প্রশ্ন শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। স্বাধীন ভারত কি পৃথিবীকে শান্তির শিক্ষা দেবে অথবা যে হিংসায় ও ঘৃণায় পৃথিবী মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে, ভারতও পৃথিবীকে সেই ভয়ঙ্কর কথা শোনাবে? আমার বিশ্বাস, ভুল বোঝার ফলেই আমাদের অধিকাংশ দুঃখ উপস্থিত হয়ে থাকে। ভেবে-চিন্তে আমাদের কথা বলা উচিত, অথবা একটা কথাও বলতে নেই। আমাদের চিন্তা আমাদের কথায় ঠিক ঠিক প্রতিফলিত হওয়া চাই এবং কথা প্রতিফলিত হবে কর্মে।

অহিংসা দুর্বলের অঙ্গ নয়, সবলের শক্তি। তোমার আধ্যাত্মিকতা যেন শুধু অলস চিন্তাতেই পর্ববসিত না হয়। শত্রুর সংগে সংগ্রামের শক্তিও যেন তার মধ্যে নিহিত থাকে।

আত্মীয়-স্বজনকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে বিপদ থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়া অহিংসা নয়। কাপুরুষতার চেয়ে হিংসাও বাহ্যনীয়।

ভালবাসার আশুনে সর্বাপেক্ষা কঠিন জিনিষও গলে যায়, যদি না গলে বুঝতে হবে আশুনের জোর কম।

পারীক্ষিক সামর্থ্যই শক্তির উপাদান নয়, অথবা ইচ্ছাই তার প্রমাণ।

অল্প বয়স হাত থেকে ফেলে দিয়েছি, তখন শত্রুকে অন্তরের ভালবাসা ছাড়া আর কি দিতে পারি ?

যারা অহিসেভাবে বুদ্ধ করে তারা অজয়, কারণ মেশিনগান বা রাইফেলের সংখ্যার উপর তাদের শক্তি নির্ভর করে না।

মাহুবকে একবার প্রাণে মেরে ফেললে সে শান্তিকে সংশোধন করার আর উপায় থাকে না। ঈশ্বরই শুধু প্রাণ নিতে পারেন, কারণ তিনি প্রাণ দিতেও পারেন।

আমার জীবনের মূলমন্ত্রের প্রথম ও শেষ কথা অহিংসা।

অহিংসা আমার কাছে শুধু দার্শনিক তত্ত্ব নয়, এ আমার প্রাণস্বরূপ। সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, একমাত্র অহিংসার পথেই মাহুবকে বাঁচানো যায়।

কেহ আমাকে চপেটাঘাত করলে তাকে ক্ষমা করার মত উদারতা যদি আমার না থাকে, তবে তাকে পাঁটা চপেটাঘাত করার একটা অর্থ হয়, কিন্তু আক্রমণকারী যদি পালিয়ে যায় এবং আমি যদি তার বন্ধুকে মারি, তবে তা আমার পক্ষে অভিশয় নীচতার কাজ। রক্তের বদলে রক্ত চাওয়া বর্বরতা, কারো ধারণা মহাভারতে প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান আছে। কিন্তু মহাভারতের প্রকৃত শিক্ষা হোল, বাহু বলের দ্বারা লব্ধ জয় প্রকৃত জয় নয়। শ্বাণ্ডবদের জয় আসার বস্তু যাত্র।

অহিংসার শব্দ-গত অর্থ হোল 'বধ না করা'। কিন্তু আমার কাছে এর অর্থ আরো অনেক ব্যাপক—মহত্তর ও অসীম। এর সত্যিকারের অর্থ হোল, তুমি কাউকেই আঘাত করবে না। শত্রুর সংস্পর্শে এসেও তুমি কোন নির্মম চিন্তা মনে স্থান দেবে না। এই আদর্শে আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি যে, সত্য ছাড়া আর কোন ভগবান নেই।

আমি অহিংসাবাদী, আমি আমার শত্রুকেও ভালবাসবো। সত্য ও নির্ভীকতা কার্যকরী অহিংসার অন্তর্ভুক্ত। অহিংসাবাদী ভীক হতে পারে না। অহিংসায় সব চেয়ে বেশী সাহসের প্রয়োজন হয়। আমরা যদি আজ অমাহুব হয়ে থাকি, তা হয়েছি, কারণ আমরা বে আঘাত করতে জানি না তা নয়, কারণ আমরা যন্ত্রে ভয় পাই।

যদি এক শব্দ অহিংস থাকে তবে কোন হাংগামা হতে পারে না। হাংগার সময় চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত নেবার নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। বোমাই

ও অস্বাভাবিক অঞ্চলের সাম্প্রতিক দাংগায় তা প্রমাণিত হয়েছে। একজন হিন্দুকে হত্যা করা হলে তৎক্ষণাৎ আরেকজন মুসলমানকে হত্যা করা হয়। আবার একজন মুসলমানকে হত্যা করা হলে আরেকজন হিন্দুর জীবনাশ্ব ঘটে। একে উন্নততা ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না। প্রতিশোধ গ্রহণ করে প্রতিকার করা চলে না। কেবলমাত্র অহিংসাই সাম্প্রদায়িক উন্নততার প্রতিকার করতে পারে।

দেহ ও মনকে কার্যক্ষম রাখার জন্য যেটুকু দরকার তাই মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন। মানুষের একটি মাত্র করণীয় কাজ আছে, তা পরম সত্যকে আবিষ্কার করা। মানব সমাজের আর কোন কাজ নেই। তারা আর কিছু করলে নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনবে।

সত্য শুধু অশ্রু ও ভাস্কর, একদিন তা প্রকাশ পাবেই। সত্যকে পালিশ করার দরকার হয় না। সত্যের অতিরঞ্জন চলে না। সত্যকে খাটো করা যায় না। ছেলেরা খেলাচ্ছলে স্রুকে আড়াল করে, কিন্তু স্রু তাতে ঢাকা পড়ে না।

কেবল সত্যই আছে, উহা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও বস্তু পৃথিবীতে নাই।... সত্যের অমূল্যত্বের উপায় বা সাধনা যেমন কঠিন, তেমনই সহজ। উহা আত্মাভিমানীর নিকট অসম্ভব বলে মনে হলেও একটি নির্দোষ বালকের পক্ষেও সম্ভব। সত্যের অমূল্যত্ব যেন করতে চায় তাকে ধূলিকণা অপেক্ষাও নীচ হতে হবে। জগৎ ধূলিকণাকে পিষে ফেলে কিন্তু সত্যের পূজারী যদি এমন দীন না হয় যে, ধূলিকণাও তাঁকে পিষে ফেলতে পারে, তবে স্বতন্ত্র সত্যের দর্শন ছল'ভ। বর্ষিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানে ইহা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। খৃস্টধর্ম ও ইসলামও এই বিষয়ের প্রমাণ দেয়।

যদি আমরা সত্যগ্রহী হই এবং নিজেদের সবল মনে করে সত্যগ্রহ অস্ত্র ব্যবহার করি, তাহলে আমরা বলবান এই বিশ্বালে দিন দিন আমাদের বল আরো বাড়িতে থাকবে এবং আমাদের শক্তি বাড়বার সংগে সংগে সত্যগ্রহের ভেজও বাড়িতে থাকবে। আর এই শক্তি যত বাড়বে ততই ইহা পরিত্যাগ করার ইচ্ছা হবে না।

সত্যগ্রহে যদি অস্ত্র প্রয়োগের যথেষ্ট অবকাশও উপস্থিত হয়, তবুও তা সর্বোত্তোভাবেই পরিত্যজ্য। সত্যগ্রহ বা আত্মিক বল এক অস্ত্রবল একে অস্ত্রের বিরোধী, এই দুই বল এক সংগে প্রয়োগ করা যায় না।

সত্যগ্রহ প্রীতি-ভাজনদের প্রতিও প্রযুক্ত হতে পারে।

সত্যগ্রহে বিরুদ্ধ পক্ষকে দুঃখ দেওয়ার চিন্তামাত্র করারও স্থান নেই। সত্যগ্রহে নিজে দুঃখ সহ করে দুঃখ বহন করে বিরোধীকে বশীভূত করার ভাব থাকা চাই।

আমাদের গান্ধীজী

আত্ম-পরীক্ষা ও আত্ম-জিজ্ঞাসা অহিংস জীবন বাপনের মূল কথা ।

সত্য ও অহিংসা আদিম পর্বতেরই মত পুরাতন ।

হিংসা যেমন পশুর ধর্ম, অহিংসা তেমনই মানুষের ধর্ম । সেই জন্যই আমি আত্ম-ত্যাগের প্রাচীন ধর্ম ভারতের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছি ।

প্রেমময় ঈশ্বরের উপর যাদের জীবন্ত বিশ্বাস আছে, অহিংসা দ্বারা তারা অসম্ভব সাধন করতে পারে ।

অহিংসা ও সত্য এমন ওস্তোপ্রোভভাবে রয়েছে যে, উহা একটি টাকার এপিঠ ও ওপিঠের মত । যেদিকেই ওলটাও, টাকা টাকাই থাকবে ।

অহিংসাকে সাধন ও সত্যকে সাধ্য বলে জানবে । সাধন আমাদের হাতের জিনিষ, এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—‘অহিংসা পরম ধর্ম’ ।

সত্যগ্রহের অর্থ হোল সত্যের প্রতি অনুরক্তিংসা । সত্যই ভগবান । অহিংসার আলোকে সত্য প্রতিভাত হয় । স্বরাজ্য হোল এই সত্যেরই একটি অংশ ।

সর্ববিস্ময় লোকের সত্য কথা বলবার সাহস থাকা চাই—সত্য কথা যাদের বিকছে, তাদের সামনেই উহা বলতে হবে ।

আমাদের অন্তরে যে বাণী ধ্বনিত হচ্ছে, তাই সত্য । সত্য স্বপ্রকাশ । যখনই আমরা তার চারিদিকের মাকড়সার জাল উন্মোচন করবো, তখনই তা স্বচ্ছরূপে দীপ্তি পেতে থাকবে ।

অহিংসা ব্যতীত সত্যানুসন্ধান অসম্ভব । তাই অহিংসাই সত্যানুসন্ধানের ভিত্তি ।

সত্য ব্যতীত কোন নিয়মেরই শুদ্ধ পালন অসম্ভব । সত্য উপলব্ধি হয় হু ও কু সর্বপ্রকারের প্রবৃত্তি অতি সহজেই বশীভূত হয় ।

ধর্ম ও ঈশ্বর—

মনের যয়লা দূর করার জন্য উপাসনা হচ্ছে ঐশ্বর ।

সকলকে নির্ভীক হতে হবে, ধর্ম ত্যাগের বদলে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে ।

জগতের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলেও তুমি ধর্মের সন্ধান পাবে না । ধর্মকে বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা যায় না, অন্তর দিয়ে বুঝতে হয় ।

ধর্ম ছাড়া রাজনীতি অর্থহীন ।

শুধু একজন আছেন, যাকে আমরা ভয় করবো, তিনি ভগবান । মানুষ যত উচ্চ পদেই থাক না কেন, তাকে আমরা ভয় করবো না ।

আমি জানি কোন দিনই ভগবানকে জানতে পারবো না, যদি না আমি অজ্ঞানের

আমাদের দাবিদারী

বিশ্বের সংগ্রাম করতে পারি। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে জীবন দিতেও হতে পারে। আমি যত পবিত্র হবার চেষ্টা করবো, তত বেশী ভগবানের নিকটতম বলে উপলব্ধি করবো।

প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্ম-ই সমান। বিভিন্ন ধর্ম একই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা। হিন্দু-মুসলমান খৃস্টান প্রভৃতিতে কোন বিরোধের কারণ থাকতে পারে না।

খৃস্টান ধর্ম ও ইসলাম প্রগতিশীল, আর হিন্দু ধর্ম স্থিতিশীল...বা পশ্চাদমুখী, একথা আমি মানি না। বস্তুতঃ কোন ধর্মেই আমি নিশ্চয়ত্বক কোন প্রগতি দেখতে পাই না। পৃথিবী তো আজ কশাইখানায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম যদি প্রগতিশীল হবে, তবে কি দুনিয়া এমন কশাইখানা হোত ?

ভগবান আমাদের অন্তরে আছেন, আমাদের মাথার উপর আছেন, আমাদের চারিপাশে বিরাজমান। তিনি কাবাতেও নেই, কানীতেও নেই—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তিনি বিরাজমান। যদি আমরা আমাদের চিন্তাবৃত্তিকে অন্তর্মুখীন করতে পারি, তবে আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবো। আমাদের অন্তরে স্বর্গীয় সংগীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে। মৌন থাকার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, যে মুহূর্তে আমাদের অন্তরে সদাই কথা বলছে, তাকে শোনার চেষ্টা করা। আমি সেই অন্তরের একটি অংশ।

গাছে অগণিত পাতা, কিন্তু মূল তাদের সবারই এক। তেমনি ভগবান এক হলেও যত জীব তত শিব বা ধর্ম—যদিও পাতার মত সবার মূল সে একই। লোকে বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তক বা পয়গম্বরের, তথা তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মের অনুসরণ করে থাকে বলে এই সহজ সত্য তাদের কাছে ধরা পড়ে না।

সমগ্র দেশবাসীও যদি একই ধর্মাবলম্বী হয়, তথাপি রাষ্ট্র-ধর্ম বলে কোন ধর্ম হতে পারে তা আমি বিশ্বাস করি না। ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্র হতে ধর্ম পৃথক থাকবে। যত মত তত পথ। এই হেতু কোন অবস্থাতেই ধর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক মানুষেরই ভগবান সম্পর্কে নিজের বিশেষ ধারণা আছে। রাষ্ট্র থেকে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দানের আমি বিরোধী।

ইসলাম বলপূর্বক ধর্মান্তরণ ও নারী-নির্ধাতন অনুমোদন করে না।

ইসলাম বা অন্য কোন ধর্ম যেদিন বাহিরের সমালোচনায় অর্ধেক হয়ে উঠবে, সেদিন ওই ধর্মের পক্ষে দুর্দিন।

স্বষ্টিকর্তাকে ভয় করতে শিখলেই লোকভয় দূর হবে। নিজে ভয় না পেয়ে কেউ কারকে ভয় করে সাহসের সকার করতে পারে না।

আমাদের গান্ধীজী

সকল হিন্দুই যদি ধারাপ হয়, তবে হিন্দু ধর্মই ধারাপ, আর সকল মুসলমানই যদি ধারাপ হয়, তবে মুসলমান ধর্ম-টাই ধারাপ। কিন্তু হিন্দু ধর্মও ধারাপ নয়, ইসলাম ধর্মও ধারাপ নয়। যিন্তবুর্ন বলেছিলেন যে, একমাত্র তিনিই তাঁর শিষ্ট, কারণ তিনিই কেবল তাঁর যত কাজ করেন। ধারা শুধু তাঁকে 'প্রভু' 'প্রভু' বলে তার। তাঁর শিষ্ট নয়। সকল ধর্মের ব্যাপারেই একথা ধাটে।

বলপ্রয়োগ ধারা কল্যা উচ্চারণ করলেই মুসলমান হয় না, ইহা শুধু ইসলামের লক্ষ্যার কারণ হয়।

ঈশ্বরে ধার গভীর বিশ্বাস আছে, তিনি দুর্বল হলেও প্রকৃত শক্তিমান, দরিদ্র হলেও আধ্যাত্মিক সম্পদে সম্পদশালী।

যাদের মুখে মধু, অন্তরে বিষ, তাদের প্রার্থনা যতই আন্তরিক হোক, তা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় না।

ঈশ্বরের সেবা যিনি করেন, ঈশ্বর আপনিই তাঁর হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন।

আমি নিজে কোরাণ পাঠ করেছি। কোরাণ কোথাও অমুসলমানদের হত্যা করবার কথা বলেনি। সকল মানুষের প্রতি ত্রায় বিচার করবার শিক্ষাই কোরাণ দিয়েছেন। কিন্তু সকল মুসলমান সেই শিক্ষা অমুযায়ী চলে না। সকল হিন্দুই কি গীতা বা বেদের শিক্ষা অমুযায়ী চলে থাকে? ইহাতে কি গীতা বা বেদের মহিমা খর্ব হয়? * কতিপয় মুসলমানের অপকারের জন্য কোরাণের মহিমা খর্ব হবে কেন? কোনও ধর্ম-শাস্ত্রের অমুগামীদের মধ্যে যদি কিছু লোক সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে পড়ে, তবে সেই ধর্ম শাস্ত্রের প্রতি বিরাগ পোষণ করা ভুল।

দেহ-মন-প্রাণ ঐকান্তিকভাবে নিপীড়িতের সেবায় নিয়োজিত করতে পারলে তবেই প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায়।

সকলের অপেক্ষা নীচ-অধম-দীনীর মধ্যেই ভগবানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রার্থনা বলতে ঈশ্বরের মহিমা এবং বিভূতি-কীর্তন করাই বোঝায়।

রায়-কৃষ্ণ-রহিম-গড্ প্রভৃতি-যে কোন নামেই ঈশ্বরকে উপাসনা করা যায় এবং তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন।

বোঝা কি তোতলা, অজ্ঞান কি নির্বোধ, উপাসনায় সকলেরই সমান অধিকার আছে।

সত্য কথাটির মূল শব্দ 'সৎ' অর্থাৎ সার বস্তু। যা সত্য নয় তার অভিশ্র নেই। তাই ঈশ্বরের পরিচয় সৎ বা সত্য। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য একথা না বলে সত্যই ঈশ্বর বলাই উচিত। সত্যপথে চললেই 'পবিত্র-জ্ঞান' বা প্রজ্ঞার উন্মেষ হয়।

আমাদের ব্যক্তিত্ব

ঈশ্বরকে তাই আমরা প্রজ্ঞা বা চিন্তা বলেও জানি। প্রজ্ঞার উদ্ভব হলোই আনন্দের সৃষ্টি হয়। সত্য যেমন অনির্বাণ, আনন্দও তেমনই অক্ষয়। ঈশ্বর এই সংজ্ঞা-আনন্দেরই সম্বন্ধ-মুক্তি।

ঈশ্বর-মার্গে কাণ্ডবের স্থান নেই, কিংবা পরাজয়ের স্থান নেই।

ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই জন্তু ভগবানকে মানুষ ধন্যবাদ না দিয়ে স্বাক্ষর করতে পারে না। এই ধন্যবাদেরই নামান্তর প্রার্থনা। প্রার্থনা আমাদেরকে নির্ভীক করে তোলে। ঈশ্বর-উপলব্ধির অর্থই হোল পৃথিবীর সকল ভয় থেকে মুক্তি। প্রার্থনা আমাদের অন্তরের সমস্ত অন্ধকার দূর করে, আমরা স্বার্থ দৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হই।

প্রার্থনা জানিয়ে কোন কাজে নামলে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শেষে সাক্ষ্য লাভ করা যায়।

মানুষ সামাজিক জীব, অতএব প্রার্থনার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, সকলে দলে দলে ভাতে অনায়াসে যোগ দিতে পারে। লোকে যে-সব কাজ করে তা ব্যক্তি বিশেষের জন্তু নয়, সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণের জন্তুই করে। সমাজের জন্তুই মানুষ। সেজন্তু সমাজের মধ্যেই মানুষকে প্রার্থনা করতে হবে এবং প্রার্থনায় যা-কিছু পাওয়া যায় সকলে মিলেই তা গ্রহণ করতে হবে। সমবেত প্রার্থনায় লোকের মনে শান্তি, ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ আসে। শান্তি, ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা দেশবাসীর পক্ষে আজ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মনে রেখো, মানুষের সব চেয়ে বড় পাপ ভগবানকে ভুলে থাকা।

মেহের প্রয়োজন যেমন খাণ্ড, আত্মার প্রয়োজনও তেমনই উপাসনা। উপাসনা ব্যতীত প্রকৃত শান্তি আসতে পারে না।

ভগবানই জীবন, সত্যই আলোক, তিনিই প্রেম, তিনিই পরম কল্যাণ।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যা প্রত্যক্ষ করা যায়, তার কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একমাত্র ঈশ্বরই চিরস্থায়ী।

বিধাতার উদ্দেশ্য নিরূপণের শক্তি কারুরই নেই, সেই অসীম করুণার সমুদ্রে আমরা বিস্ময়াজ্ঞ।

ঈশ্বরলাভের পথ বীরের জন্তুই, ভীরুর জন্তু নয়।

কোন মঙ্গলই পূর্ণ শুভ নিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না, বার বার চেষ্টা করে অনেক বিফলতার ভিতর দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হয়।

আমি মৃত্যুর মধ্যেও জীবনের, অসত্যের মধ্যেও সত্যের, অন্ধকারের মধ্যেও

আমাদের নীতি

আলোকের অভিজ্ঞ দেখতে পাই। সুতরাং আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ভগবানই জীবন, সত্যই আলোক—তিনিই প্রেম, তিনিই পরম কল্যাণ।

প্রয়োজনের মাঝে যুক্তি কার্যকরী হয় না। বিশ্বাসই আমাদের রক্ষা করে। যারা যত খায় তাদেরও যুক্তি থাকে, সেখানে ভ্রান্ত-যুক্তি। যুক্তি প্রেরণার অঙ্গস্বরূপ করে। অনেক সময় আইনজীবীরা বিরোধী পক্ষের যুক্তি এমনভাবে প্রদর্শন করে যে মনে হয়, তাঁদের প্রত্যেকেই ঠিক বলছেন। কিন্তু তথাপি তাঁদের একজন নিশ্চয়ই ভ্রান্ত, হয়তো দু'জনেই। অতএব, যুক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে নীতি ও সত্যের উপর বিশ্বাস।

নীতির চির স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই। আমাদের যত অসম্পূর্ণ মানুষের পক্ষে আশেপাশে নীতিবাদই যথেষ্ট। ভক্তারের কথামত ঔষধ হিসাবে ছাড়া যত খাওয়া নিছক দুর্নীতি। নিজের জী ছাড়া আর কারুর পানে কামড় চোখে তাকানোও অজ্ঞায়। কিন্তু এই উভয় অবস্থাই যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায়। বিরোধী যুক্তিও আছে। ঈশ্বরের অভিজ্ঞ সম্পর্কেও অনেক বিরোধী যুক্তি আছে। বিশ্বাস থেকে যে যুক্তি সঞ্চার হয়, তাই আমাদের আত্মরক্ষার চিরন্তন দুর্গ। আমার বিশ্বাস আমাকে অনেক পতন থেকে রক্ষা করেছে এবং এখনও রক্ষা করে। এখনও আমাকে বিপথে চালিত করেনি। বিশ্বাস কখনও কারুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে আমি জানি না।

সমাজ-নীতি—

অস্পৃশ্যতা আমি হিন্দুধর্মের সকলের চেয়ে বড় কলংক বলে মনে করি।

হিন্দু হয়ে যে জন্মেছে তাকে পতিত বা অস্পৃশ্য মনে করাই পাপ। এরূপ মনে করা শয়তানি ছাড়া আর কিছু নয়। সেইজন্যই আমি ক্রমাগত বলে আসছি যে, অস্পৃশ্যতা একটা মহাপাপ।

অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের অঙ্গ নয়।

অস্পৃশ্যতা অমুসলমান করে হিন্দু ধর্ম পাপ করেছে। এর ফলে আমাদের অধঃপতন হয়েছে। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আজ আমরা 'পারিয়া', এমন কি মুসলমানরা পর্যন্ত এই অধর্মের স্পর্শদোষে দুঃষ্ট এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়, পূর্ব আফ্রিকায়, ক্যানাডায় হিন্দু জাতি মুসলমানরাও 'পারিয়া' বলে গণ্য। এই সমস্তই অস্পৃশ্যতারূপ পাপের বিষময় ফল।

যতদিন পর্যন্ত হিন্দুরা জেনেছেন অস্পৃশ্যতাকে তাদের ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করবে, যতদিন পর্যন্ত বৈদ্যের ভাণ হিন্দু তাদেরই একদল জাইকে স্পর্শ করা পাপ বলে

আমাদের দায়িত্ব

মনে করবে, ততদিন পর্যন্ত স্বরাজ পাওয়া অসম্ভব। যুক্তির তাঁর ফুফুটিকে লগে না নিয়ে বর্গে প্রবেশ করতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছিলেন, আর যুক্তির বংশধরগণ কি আশা করতে পারেন যে, অস্পৃশ্যদের বাদ দিয়ে তাঁরা স্বরাজ পাবেন? যে সকল জ্ঞতির জন্ত আমরা গর্বেরটিকে পরিত্যাগ আখ্যা দিয়ে থাকি, তাঁর মধ্যে কোন অস্ত্রাঘাতী আমরা আমাদের অস্পৃশ্য ভাইদের প্রতি করিনি?

অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নয়, অধিকন্তু হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রবর্তিত একটা পশুশীল পদার্থ, একটা ভ্রম ও একটা পাপ। হুতরাং উহার মূলোৎপাটন করা প্রত্যেক হিন্দুই ধর্ম ও পরম কর্তব্য। প্রত্যেক হিন্দুর উহাকে পাপ মনে করে প্ররোচিত করা উচিত।

অস্পৃশ্যতা বিনাশ না হলে হিন্দুধর্ম অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হরিজনদের অপবিত্র মনে করার অর্থ-ই হচ্ছে ভগবানকে অপবাদ দেওয়া।

যতদিন হিন্দুর পবিত্র ধর্ম অস্পৃশ্যতার দ্বারা কলংকিত থাকবে, ততদিন স্বাধীনতা পাবার যোগ্যতা তাদের হবে না।

যেদিন অস্পৃশ্যতা প্রকৃতই দূর হয়ে যাবে। সেদিন আর কোন পৃথক পৃথক জাতি থাকবে না। কিন্তু যতদিন জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকবে ততদিন অস্পৃশ্যদের মনে বর্ণ-হিন্দুতে পরিণত হবার অভিলাষ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তা'তো সম্ভব নয়। কারণ এরকম চেষ্টার ফলে বর্ণ-হিন্দু ও তপশীলিদের মধ্যে সংগ্রাম দেখা দেবে। কিন্তু যখন জাতিভেদই থাকবে না, তখন সবাই কেবলমাত্র হিন্দু বলে পরিচিত হবে। অস্পৃশ্যদের প্রতি আমাদের এই কর্তব্য যে, নিজেদের মধ্যে সমস্ত বৈষম্য দূর করে হিন্দু ধর্মের আচার প্রতিপালন করা এবং নিজেদের মধ্যে পৃথক ব্যবহার দাবী না করে বিশাল হিন্দুসমাজ-সমূহে নিজেদের মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করাই তাঁদের কর্তব্য। আজাদ-হিন্দুস্থান লাভের এই একমাত্র উপায়।

বর্ণ হিন্দুরা যখন ঘোষণা করেন, তাঁরা অস্পৃশ্যতা বর্জন করেছেন, তখন তাঁদের সে ঘোষণাও বেন অকপট হয়। সত্যি সত্যি তাঁদের দেখতে হবে যে, অস্পৃশ্যতা যে কাজ করে তারা তার যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে সক্ষম এবং প্রস্তুত। প্রয়োজন হলে ভাঙ্গীর কাজ করতেও তাঁদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। অবশ্য যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্নভাবে সে কাজ করা যায় তার ব্যবস্থাও করতে হবে। ইউরোপে আমি ভাঙ্গীদের সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নভাবে মালখের মলমুত্র সরাতে দেখেছি। তাদের বেতের বুড়ি দেওয়া হয়। তার মধ্যে তারা মলমুত্রের ভাণ্ড বহে নিয়ে যায়। এভাবে কাজ করলেও অস্পৃশ্যতা অস্ত্রান্তের সংগে একই বাড়ীতে বাস করতে পারবে ও সমান সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

আমাদের সাক্ষী

বালের আমি অল্প বয়সে, তাদের মধ্যে এসে আমি স্থায়ী হয়েছি। এদের সংস্পর্শে আমি এক, বয়স অল্পদের মধ্যে আমি নিরতম। জাতিভেদে আমি বিশ্বাস করি না। তবু হিন্দু সমাজের নির্দিষ্ট সকলের নীচের ধাপে আমি স্থান নিয়েছি। আপনারা সকলেই তাই করেন। তাহলে আর হিন্দুর প্রবেশ, সার্বজনীন ভোজ ও অম্পৃক্ততা প্রভৃতি সমস্তার কোন অবকাশ থাকবে না। যখন জাতির ভিত্তি কোন মানুষের বিরুদ্ধে কোন বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা হবে না, একমাত্র তখনই অম্পৃক্ততা সম্পূর্ণ রহিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। অম্পৃক্ততার দানবের চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে সার্বজনীন সামাজিক ভোজ সর্বত্র প্রচলিত হওয়া উচিত। ইংরাজদের চোখের সামনে যেকোন নিকিতভাবে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটেছে, তাদের যদি সে শাসন সম্পূর্ণ ধ্বংস নাও হয় তাহলেও বৃটিশ জাতি তার স্তন্য হারাতে বাধ্য। তেমনি অম্পৃক্ততার বিনাশ না হলে হিন্দু ধর্মের ধ্বংস হবে।

অম্পৃক্ততা বর্জনের অর্থ ইহা নয় যে, আহার ও বিবাহাদি বিষয়ে সব একাকার হয়ে যাবে। একে অপরকে স্পর্শ করতে যে ঘৃণাবোধ করে, আমি কেবল তাই দূর করতে চাই। এবং অম্পৃক্ত জাতিরা যাতে সমাজে মানুষের উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে, আমি সেই চেষ্টাই করছি। কিন্তু এই আন্দোলনযুদ্ধে কেউ যদি অপরের আহার কিংবা বিবাহ সম্বন্ধীয় নিয়ম নষ্ট করতে উদ্যত হয়, তবে তিনি তাতে সাহায্য বা সহায়তা করতে পারেন না।...আহার শারীরিক ক্রিয়া মাত্র, ইহা এমন কিছু সাধু বা পবিত্র কার্য নয় যে, দশজনকে উদ্ধার দেয়িত্তে করতে হবে। আমি মনে করি পুত্রের হাতেও পিতা খেতে বাধ্য নয়। মলমূত্রাদি ত্যাগ যেমন লোকে গোপনে সম্পাদন করে থাকে আহারও সেইরূপ গোপনে করা ভালো। সেইরূপ বিবাহ ব্যাপারটি ভোগের ব্যাপার নয়। বিবাহ দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশ উৎপন্ন হয়ে থাকে। তা নিয়ে যথেষ্টাচার করলে ভবিষ্যৎ বংশের অমংগল হবে। সেইজন্য বহু অভিজ্ঞতার ফলে বিবাহ সম্বন্ধে সমাজে যে যে নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে তা কখনই না বুঝে পরিবর্তন করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

হিন্দুরা যেন আত্মপ্রতারণা না করে ভাবে যে, তাদের পক্ষ হতে সবই ভালো চলছে। নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসাবে আমি মনে করি যে, আমরা যদি এরূপ ভাবি তাহলে তা মূর্খের স্বর্গবাস-চিন্তারই সাক্ষী হবে।

যদি ভারতের হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় পরস্পরের বন্ধুত্বপূর্ণে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং পুলিশ ও সৈন্যদলকে কোন ক্ষেত্রেই আর অস্ত্র ব্যবহার করতে না হয়, তবে কতই না আনন্দের বিষয় হবে! সর্বক্ষেত্রে আমরা শুণ্ডাদের

আমাদের পাঁচিল

যদি দিতে অভ্যস্ত, কিন্তু আখরাই এসকল স্তম্ভ নষ্ট করেছে এবং তাদের উৎসাহ দিয়েছে। প্রত্যেকটি অপকীর্তির দ্বারা স্তম্ভগুলির উপর চাপানো ঠিক নয়।

আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আছে সেই পরম্পর, তার স্পর্শে চিত্ত পবিত্র হয়।

হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি রূপেই বাস করত আর দুই জাতি রূপেই বাস করত, মদেরকে প্রতিবেশীরূপেই বাস করতে হবে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যদি জাতীয় বজায় রেখে এক সংগে বাস করতে না পারে, তবে তারা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান কোনটাই পাবে না।

পাকিস্তান বলতে মুসলমান প্রধান প্রদেশে যদি কেবলমাত্র মুসলমানদের ও হিন্দু-প্রধান প্রদেশে কেবলমাত্র হিন্দুদেরই স্বাধীনতা বুঝায় তো তা কখনই গ্রাহ্য হতে পারে না। বিহারে হিন্দুরা স্বাধীন আর মুসলমানরা হিন্দুদের দাস হবে কেন? অথবা সুলতানেরা বাংলার বাদশাহ এবং হিন্দুরা মুসলমানের নফর একগুই বা হবে কেন?

নিজের ধর্মের জন্য যিনি যতটা শ্রদ্ধা পোষণ করেন, অন্যের ধর্ম-বিশ্বাসের উপরও তার ততটা শ্রদ্ধা থাকা চাই।

হিন্দু-মুসলমান ও পার্শ্বগণ একই মাতৃভূমির সন্তান, অতএব নিজেদের পূর্ণ দ্রাঘত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও তাদের রয়েছে।

প্রেম যদি জীবনের নীতি না হোত, তাহলে শত শত মৃত্যুর মধ্যে জীবন বলে কোন কিছুই অস্তিত্ব সম্ভব হোত না।

আমার দেশে হিন্দু মুসলমানকে ভয় করে আবার মুসলমান হিন্দুকে ভয় করে। আমাদের এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে, নিজের ছাড়া দেখলেই আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি।

আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়কেই আমি অস্ত্র দিতে রাজী নই। কারণ ইহা তো বর্বরতার চিহ্ন মাত্র। ঈশ্বরের প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসপ্রসূত দৃঢ় মনই আপনাদের অস্ত্র।

গ্রামে গ্রামে ভারতবর্ষের আদর্শে নূতন পল্লী সমাজ গড়তে হবে। উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা শত শত বৎসর পাশাপাশি বাস করেছে, কোন প্রলয়-পাপবৃষ্টি তাদেরকে চিরন্তন শত্রুতে পরিণত করতে পারে না। দুর্ভোগের কালে প্রতিবিধান করো, কিন্তু দূরদৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন না হয়।

যে লোক খেঁচায় নিজের দোষের কথা পরিষ্কার করে অন্যের কাছে বলে এবং আর না করার প্রতিজ্ঞা করে সে সবচেয়ে পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত করে।

আমাদের গাঙ্গী

কর্মীদের মন থেকে মৃত্যুভয় দূর করতে হবে, এবং যারা বিরোধিতা করবে তাদের চিন্তা জয় করতে হবে। এই চেষ্টার ফলে হয়তো কয়েকজনকে এগুি হারাতেও হতে পারে।

পূর্ববংগে যদি একজন হিন্দুও থাকে তাহলে তাকে আমি বলবো—সাহস অবলম্বন কর, এবং মুসলমানদের মধ্যে গিয়ে বাস কর। যদি মরতে হয় তো বীরের মতই মর। বিনা যুদ্ধে মরার মত অহিংসা-শক্তি যদি তোমার থাকে, তবে বিশ্বয়ে তোমার তোমার স্তুতি করবে। গুণ্ডারা যুক্তি মানে না, কিন্তু সাহস মানে, সে যদি বুঝতে পারে যে, তুমি তাদের চেয়ে সাহসী তবে সে তোমাকে সম্মান করবে।

অপমান ও নির্ধাতন ছাড়া যদি আর কোন গতি না থাকে, তবে পুরুষ ও নারী সকলের অন্তরে মৃত্যুবরণ করার মত সাহস ও নির্ভীকতার সঞ্চার করুন। তবেই হিন্দুরা পূর্ববংগে থাকতে পারবে, নচেৎ নয়।

যারা মার খাচ্ছে তারা যেমন মৃত ও কাপুরুষ, আর যারা মারছে তারাও তেমন মৃত ও কাপুরুষ। উভয়ের মধ্যেই দু'রকম ভীতি বর্তমান আছে।

যে মাছুষ নিজের চোখের জল ফেলে, সে পরের চোখের জল মোছাতে পারে না।

বিবাহ—

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নরনারীর মধ্যে বিবাহ হলে পর তাদের সাদরে বরণ করে নেওয়াই কর্তব্য।

পুরুষ বা নারী জীবনে একবার মাত্র বিবাহ করবে, এই সাধারণ নিয়ম হওয়া চাই। তথাকথিত উচ্চ জাতির স্ত্রীলোকেরা লোকাচারের দল্লশ অনিচ্ছায় বৈধব্য জীবন বাপন করতে বাধ্য হন। কিন্তু পুরুষদের একাধিক বিবাহে আরো বাধা নেই। ইহা কলংকের কথা। সমাজে যতদিন এই আচার চলবে ততদিন বাল-বিধবা বা যুবতী বিধবাদের জামি বিবাহ দিতে বলবো। নরনারীর মধ্যে কেউ কান্নার ছোট বা বড় নয়। অতএব অধিকারও নরনারীর সন্মান।

যারা জাতির সেবা করতে চায় অথবা ধর্মজীবনের আদ্বায় পেতে চায় তাদেরকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে—বিবাহিতই হোক আর অবিবাহিতই হোক। বিবাহ নারী ও পুরুষকে পরস্পরের সামিধ্যে আনে, দু'জনের মাঝে এক বিশেষ ধরণের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় বা ইহ-জীবনে ও পরকালেও অবচ্ছেদ্য। আমাদের বিবাহের যে সংজ্ঞা আছে তাতে কামনার কোন স্থান থাকা উচিত নয়।

নারী—

স্ত্রীলোকদের সাহসী হতে হবে।—ভারতের নারী অবলা নয়। বীরদের অন্ত

আমাদের পান্ডিত্য

ভারা খ্যাতি অর্জন করেছে। সে বীরত্ব কোন ভরবারি বা অস্ত্র ব্যবহার নয়। সে বীরত্ব নৈতিক সাহস ও চরিত্রের পবিত্রতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নোয়াখালিতে বা ঘটছে তার অস্ত্র নোয়াখালির পুরুষেরাই দায়ী নয়, নোয়াখালির নারীরাও দায়ী। সীতা ও শ্রৌণদীর আদর্শ অম্লসরণ কর। সীতা ও শ্রৌণদীর ভগবানে অটুট বিশ্বাস ছিল। তাই কোন দুবৃত্তই তাঁদের মর্দনা নষ্ট করতে পারেনি।...কাপুরুষতা প্রদর্শন করার চেয়ে হিংসার স্থান লওয়া অনেক ভালো।...দুবৃত্তের নিকট আত্মসমর্পণ করার পূর্বে নারীদিগকে আত্মবিসর্জন করতে হবে। নারীই হোক আর পুরুষই হোক মৃত্যুকে তুচ্ছ করার মত আত্মিক শক্তি তাদেরকে সক্ষম করতে হবে।

নারী পুরুষের চিরসংগিনী। পুরুষের স্ত্রায় তাদেরও মানসিক বৃত্তি সমক্ষুর্ত। পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি স্তরে হস্তক্ষেপের এবং পুরুষের স্ত্রায় স্বাধীনতা ভোগের অধিকারও তাদের আছে।

বর্বর যে সব মানুষ স্পর্ধাভরে আপনাকে মুসলমান, হিন্দু অথবা অস্ত্র কোন নামে অভিহিত করছে, তাদের কসাই বৃত্তির সামনে অসহায় দর্শকের মত যেন ঈশ্বর আমাকে না রাখেন।

আইন অম্লসারে পুরুষের যে সকল অধিকার আছে, নারীরও তা থাকা উচিত। পুত্র-কস্তার সহিত ব্যবহারে আমাদের কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

পর্দা টেনে অথবা অস্ত্র কোন কৃত্রিম উপায়ে সতীত্ব বাঁচান যার না। উহা অন্তরের অন্তস্থলের জিনিষ, বাইরে থেকে তা আরোপ করা চলে না। যে সতীত্ব পুরুষের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না তা অতি দুর্বল সতীত্ব।

সংসারের কাজে সারাদিন নষ্ট করা মেয়েদের উচিত নয়।

পুরুষকে নারী তার বন্ধু মনে না করে প্রভু ও কর্তা বলে মনে করতে শিখেছে। কংগ্রেসসেবীগণকে ভারতীয় নারীদের হাত ধরে তুলতে হবে। ইহা তাদের গৌরবময় অধিকার।

মাদক নিবারণের চিকিৎসক, স্ত্রীলোক ও ছাত্রদের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। তাঁদের সশ্রেণ সেবার দ্বারা তাঁরা অতি সহজেই নেশাখোরদের চিন্তনয় করতে পারবেন।

চরকা কাটার সমস্ত দাবিত্ত মেয়েদের উপরেই বর্তেছে, আগের যুগে যেমন ছিল। দুশো বছর আগে ভারতের মেয়েরা কেবল নিজের দেশের জন্তই মৃত্যু কাটতো না, বিদেশের জন্তও কাটতো।...ভারতের নৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা মেয়েদেরই হাতে। ভারতের ভবিষ্যৎ তাদের হাতে, কারণ তারাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাল্য করবে। তারা ভারতের ছেলেমেয়েদের সরল, ভগবৎ-বিশ্বাসী সাহসী নরনারী,

আমাদের গাঙ্কিলী

রূপে গড়ে তুলতে পারে।...এই সব মেয়েদের অনেকেই দিনে এক আনা রোজগার করতে পারে না, তাদের জগুই আমি চরখা ও ডিম্কার বুলি নিয়ে পথে পথে ঘুরছি।

আমার নিকট ইহা পরিষ্কার যে, সম্মতি বা স্বাধীন ইচ্ছার দোহাই দিয়া এক সম্মতদায়ের স্ত্রীলোকের ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ বা ভিন্ন ধর্মের লোকের সহিত বিবাহ স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ চারিদিকে যখন জোর জুলুমের তাণ্ডব চলছিল তখন সম্মতি ও স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলা ত শব্দের অপব্যবহার করা।

আমার মতে নারী ও পুরুষের মধ্যে মূলতঃ কোন বিভেদ নেই, সুতরাং তাদের সমস্তাও মূলতঃ এক। উভয়ের মধ্যে একই প্রাণশক্তি, একই অহুভুতির ধারা প্রবাহমান। একে অপরের পরিপূরক। একজন আরেকজনের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া বাচতেই পারে না।

তবু যে করেই হোক, পুরুষ নারীকে পদানত করে রেখেছে, ফলে নারীর মনেও একটা হীনতা-বোধ জন্মেছে। নারী পুরুষের চেয়ে হীন—এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারে নারীর সহজ বিশ্বাস বিচ্যোদ করেনি। কিন্তু পুরুষের মধ্যে ধারা মহাপুরুষ, ধারা ঋষি তাঁরা উভয়েরই সমান অধিকার স্বীকার নিয়েছেন।

দু'জনের মধ্যে কোথাও কোথাও বে পার্থক্য আছে তাতে সন্দেহ নেই, উভয়ের মূলগত ঐক্য সত্য হলেও উভয়ের অনৈক্যাগুলি মিথ্যা নয়। অতএব দু'জনের কার্যক্ষেত্র আলাদা হতে বাধ্য। মাতৃত্বের বিরূপ দায়িত্ব যাদের বহন করতে হবে তাদের কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী নিশ্চয়ই হতে হবে—যেসব গুণ পুরুষের না থাকলেও চলে। নারী সহিষ্ণু, পুরুষ ক্ষিপ্ত। নারী প্রধানতঃ গৃহলক্ষ্মী। পুরুষ বাইরে থেকে জীবিকার সংস্থান করে আনছেন আর নারী তাকে রক্ষা করেন ও সকলের অংশ-ভাগ করে দেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ করে তোলবার কাজই বিশেষ করে তাঁদের কাজ—তাঁদের যত্ন ছাড়া ভবিষ্যৎ জাতি লুপ্ত হয়ে যাবে।

নারীকেও যদি রাইফেল কাঁধে করে গৃহরক্ষার কাজে বেরিয়ে আসতে হয় তাহলে সেটা আমাদের উভয়ের পক্ষেই সম্ভার কথা। সে যেন বর্ষর যুগে ফিরে যাবারই সমান। নারী যদি পুরুষের মত ঘোড়ায় চড়া শিখতে থাকেন। তাহলে তাতে নারী পুরুষ উভয়কেই যেন নীচে টেনে আনা হয়। নারীর বিশেষ যে দায়িত্ব তা থেকে নারীকে সরিয়ে আনা পুরুষের পক্ষে পাপ। গৃহকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কাজের চেয়ে গৃহের অভ্যন্তরকে স্বন্দর ও হৃদয়ঙ্গর রাখার কাজ কোন অংশে কম সাহসের নয়।

আমাদের নাজিডী

কর্মক্ষেত্রে এই বিভাগকে স্বীকার করে নিলেও সাধারণ গুণগুলি হু'জনের পক্ষেই গমান প্রয়োজন। জাতিগত ভাবেই হোক বা ব্যক্তিগত ভাবেই হোক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসাকে গ্রহণ কর, এই সমস্তায় এইটুকুই আমার দেবার জিনিষ। আমি বিশ্বাস করি যে এই পথে নারীরাই নেত্রীত্ব নিতে পারবেন এবং যদি তাঁরা এই নতুন গ্রহণ করেন তাহলেই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে তাঁরা সহজেই হান খুঁজে পাবেন। তখন তাদের হীনতাবোধ আপনা থেকেই দূর হয়ে যাবে। অহিংসা মানেই হচ্ছে অসীম প্রেম অর্থাৎ কিনা দুঃখ সহ করার অসীম ক্ষমতা। গম্ভীর জননী যে নারী সেই নারী ছাড়া সব চেয়ে বেশী করে এ ক্ষমতা আর কে দেখাতে পেরেছে? স্বদীর্ঘ ন' মাস শিশুকে বহন করে তাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যে দুঃখ পেতে হয় সে-দুঃখও তাঁরা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেন। প্রসব বেদনার চেয়ে বেশী কষ্টের আর কি আছে? কিন্তু সৃষ্টির আনন্দে তারা তা ভুলে যায়। শিশুটিকে গড়ে তোলবার জন্য দিনের পর দিন আর কেইবা এতো কষ্ট সহ করে?

নারীর এই প্রেমকে বিশ্বমানবের অভিযুগী করে দাও—সে পুরুষের কামনার বশ হতে পারে এই কথা তাকে ভুলে যেতে দাও। স্রষ্টা এবং নীরব পথ প্রদর্শক হিসাবে তখন পুরুষের পাশে সে তার গৌরবময় আসন অধিকার করবে।

এই যুগমান জগতে শান্তির সম্ভাবন দেবার কাজ নিয়েই নারী এসেছে।

সত্যগ্রহের নেত্রী সে সহজেই হতে পারে—তার জন্য অনেক বই পড়ে তাকে জ্ঞান লাভ করতে হবে না। যা প্রয়োজন সে শুধু বহু দুঃখে বিদগ্ধ এবং অলস বিশ্বাসে শাপিত একটি দৃঢ় চিত্ত।

আমার ধারণা আধুনিকারা এক ডজন রোমিওর সঙ্গে জুলিয়েটের ভূমিকা অভিনয় করতে ভালবাসে। তারা এডভেকার ভালবাসে। আধুনিকারা রৌদ্র, বৃষ্টি ও ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বেশ করে না, করে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। প্রসাধন করে স্বাভাবিক বর্ণকে উজ্জ্বল করে অসামান্য দেখায়। এদের জন্য অহিংসা নয়।...অহিংসা বহু আয়াস সাধ্য। তা চিন্তা ও জীবনধারায় এক বিপ্লব। এই বিপ্লব ধারায় জীবনকে পরিবর্তিত করতে পারলে মেয়েরা দেখবে যে যে-সব সুখ তাদের লক্ষ্যপথে আসবে তারা তাদেরকে প্রদা করতে শিখবে এবং তাদের সামনে সৌজন্যতা প্রকাশ করবে। কিন্তু তথাপি যদি দৈবাৎ তাঁরা এমন বিপদে পড়েন যাতে তাদের সত্যিকার বিপন্ন হতে পারে, তখন দুর্বৃত্তের কবলে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মৃত্যু বরণ করার মত সাহস তাঁদের রাখতে হবে।...অহিংসায় তাদের বিশ্বাস নেই,

আমাদের দায়িত্ব

তারা সাধারণ আশ্রয়কার কৌশল শিখবে, এবং অসত্য বৃকদের অসৌজন্য ব্যবহার থেকে আশ্রয়কা করবে।

ধর্মিতা স্ত্রীর লজ্জার কিছু নেই। তাকে কোন প্রকারেই অসত্য বা দুশ্চরিত্রা বলা চলে না। যে সমাজ দুশ্চরিত্র পুরুষ বা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের শাসন করে না এবং যে সমাজ বিলাসী সৌখীন স্ত্রী-পুরুষদের অকাজ কুকাজ নীরবে দেখে যায় সেই সমাজই আবার অপর কতৃক ধর্মিতা নির্দোষ স্ত্রীলোকদের সমাজচ্যুত করবার জন্ত উঠে পড়ে লেগে যায় দেখে অবাক হতে হয়। সমাজের এই মনোভাব দর্শনে আমি পীড়া অনুভব করছি। এরূপ পাশবিক অত্যাচারের পরে আমার কণ্ঠা বা স্ত্রী যদি মুক্তি পেতেন বা কেউ তাঁকে মুক্ত করে আনতো তবে আমি কি তাঁকে কখনও পরিত্যাগ করতাম, না দ্বণা করতাম! হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এরূপ স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের আমি বলেছি—তোমাদের লজ্জার কিছু নেই।

মেয়েদের জন্ত স্থান ছেড়ে দিতে পুরুষদের শেখা উচিত। যে দেশ বা সম্প্রদায়ের নারী সম্মান পায় না তা সভ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

ছাত্র—

ছাত্রাবস্থা সন্ন্যাসের অবস্থার মত। ছাত্রদের পবিত্র ও ত্রুষ্ণচারীর যোগ্য হওয়া চাই।

যে বিদ্যা দ্বারা ধর্মশালন করা যায় তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। ‘সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে’—যা দ্বারা মুক্তি পাওয়া যায়, তাই বিদ্যা। এই শ্রুতিটি আমার খুব ভালো লাগে।

জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের বেননার যোগ হোক। অজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ থাকুক না। বাধা পড়লে আমাদের সমাজ অবিলম্বে ধ্বংস পড়বে।

যে জাতির ছেলেমেয়েরা নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা না নিয়ে বিদেশের ভাষায় শিক্ষা লাভ করে, সে জাতি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে। এতে তারা তাদের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

ধর্মশিক্ষা একসঙ্গে শরীর ও মনকে গড়ে তোলে। ইহা দেশের মাটির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে রাখে এবং তার সাহায্যে ভবিষ্যতের এক গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করে।

ছাত্র কথটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে বলা যায়, আমিও একজন ছাত্র। তবে তাদের বিদ্যালয় আলোচ্য। আমার বিদ্যালয়ে এসে আমার গবেষণা কার্যে যোগ দেবার জন্ত তাদের আমি আমন্ত্রণ করে রাখছি।

আমাদের গাঙ্কিলী

বিদ্যার্থীর নিকট বাল্যকালটাই একটি বিশেষ সময়। এই সময় যে জ্ঞান পাওয়া যায় তা খনও ভোলা যায় না। কিন্তু এই সময়টাতেই ছেলেরা যেখানে সব চাইতে কম জিনিষ পায়, যেমন-তেমন-কাজ-চালানো-গোছের একটি ইচ্ছা, তাবের পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইচ্ছার ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যে ছেলেরা যেন শুধুই যাতায়াত না করে, গরা যেন চরিত্রবান শিক্ষকের নিকট চরিত্র গড়ে নিতে পারে। হিন্দু বালক-লিকারা সংস্কৃত শিখবে ও গীতা পড়বে। মুসলমান ছেলেদের আরবী শেখা চাই। কোরাণ পড়া চাই। তা ছাড়া সকলেরই হুন্সর ও মজবুত হুতাকাটা শেখা চাই। এবং তার উপর তুলো ধুনতে ও তাঁত বুনতেও পারা চাই।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রচারের কাজটা অনেক অংশেই বাপমায়ের হাতে আছে। তাকারের লোক-শিক্ষা পুঁথি পড়ায় হয় না, হয় চরিত্র দ্বারা, হাতে পায়ের চেটায় ও রীরের মেহনৎ দ্বারা। গুজরাটের বাপমায়ের পুঁথি-পড়া বিজ্ঞার মোহ যায় নি। তারা এখনও ওই বিজ্ঞার স্বরূপটা দেখতে পান নি। তাঁরা এখনও স্বীকার করেন না যে, বালকদের প্রথমেই নীতি শিক্ষা দিতে হয়, তারপর দিতে হয় শরীরকে তৈরী করার শিক্ষা, তারপর জীবিকা উপার্জনের সাধন হিসাবে কোনও কলা শিক্ষা দিতে হয় এবং তারপর দিতে হয় তাদের মনের বিকাশের শিক্ষা। সর্বশেষে অলঙ্কার হিসাবে তাদের পুঁথিপড়া জ্ঞানে শোভিত করা দরকার।

ছাত্রদের জন্ত গাঙ্কিলী ন'দফা কর্মসূচির নির্দেশ দেন :

- ১। গ্রামই হবে তোমাদের গবেষণাগার ও কর্মক্ষেত্র।
- ২। সত্যিকারের ব্রহ্মচারী হবে। দেহ মন আত্মাকে দৃঢ় ও পবিত্র করবে। গোপনে কোন কাজ করবে না, সাহসী হবে। সময়মত কাজ করবে, এক মুহূর্ত নষ্ট করবে না। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হবার চেষ্টা করবে।
- ৩। সত্য ও ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। বিনয়ী ও নম্র হবে। অসুস্থ ও অভাবগ্রস্তদের নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করতে কখনও ক্লান্তি বোধ করবে না।
- ৪। হুতা কাটবে, খন্দর পরবে। প্রেমের মর্খাদা দেবে। অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা প্রবর্তন করার চেষ্টা করবে।
- ৫। ভারতের ঐক্যের জন্ত অবিশ্রান্ত কাজ করবে। আতিগত ও শ্রেণীগত মনোভাব প্রসূত কার্যকলাপ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখবে। রাষ্ট্রভাষা শিখবে ও শেখাবে। মাতৃভাষার উন্নতি করবে।
- ৬। উদ্ভেদমূলক ও ফলপ্রসূ শিক্ষাধারা প্রচার করবে। অশিক্ষিত ও নিরক্ষরদের মাঝে শিক্ষার প্রসার করবে।

আমাদের স্বাধীনতা

১। পরিষ্কার স্বাস্থ্যকর উন্নতিশীল গ্রাম গড়ে তোল। বাদক নিবারণ কর।
ঘাটে সবাই খেতে পায় তার ব্যবস্থা কর।

২। প্রত্যেকটি মেয়েকে তোমার সমকক্ষ বলে মনে করবে। মা বোন বলে ভাববে। জাতিগঠনে তোমার সহকর্মী বলে গ্রহণ করবে।

৩। কর্মঠ দায়িত্বশীল নাগরিক হও। রাজনৈতিক দলাদলিতে মাথা ঘামিও না। জাতির সেবা ছাত্র হও। দুর্ভোগের দিনে ভারতমাতার জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হও। ছেলেরা প্রত্যেকটি মেয়েকে নিজের মা বোনের মত সম্মান করতে শিখবে। যদি তারা ভদ্র ব্যবহার করতে না শেখে তাহলে তাদের সব শিক্ষাই ব্যর্থ হবে।

স্বাধীনতার রূপ—

আত্মশুদ্ধির পক্ষে জনমতের বিচার আদালতের বিচার অপেক্ষা শ্রেয় : প্রতিশোধ চাই না, চাই সংশোধন।

মাতৃষকে পাশাপাশি বাস করতে হবে। একই অর্থনীতি, একই ব্যবসা, একই বৃহত্তর মানবিক ধর্মে বিভিন্ন ধর্মের অভ্যাস মিলিত হবার সময় এসেছে।

এদেশে চাষের কাজ স্নায় চরকা ও তাঁতের কাজ জাতীয় শরীরের দুই ফুসফুস। যদি সেই দুই ফুসফুসকে রক্ষা করার জন্ত যত্নবান না হই, পরন্তু যদি অযত্নে একটি ফুসফুস নষ্ট হলে যায় তাহলে এ জাতি বেশী দিন জীবিত থাকতে পারে না।

নিজের ওজনে অত্যাচারের পরিমাণ বিচার সম্ভব নয়। কোন পক্ষের দোষ কতটুকু বেশী বা কম তা বিচার করার জন্ত তথ্য প্রমাণ হাতে নেই বটে তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই ব্যাপারে উভয় পক্ষই যখন দোষী, এমনভাবেই একটি সত্যকারের ব্যাপড়ায় উপনীত হতে হলে উভয় রাষ্ট্রকেই নিজ নিজ দোষ ক্রটি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে একটি আপোষ মীমাংসার সর্তে পৌঁছাতে হবে।

আমি যে স্বাধীন ভারতের কল্পনা করি তাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকল ভারতবাসী প্রকৃত বন্ধুর মত বাস করবে। সেখানে কেউ লক্ষপতি থাকবে না। আবার দীন দরিদ্রও কেউ থাকবে না। সমস্তই রাষ্ট্রের অধিকারে থাকবে। কারণ রাষ্ট্রে সকলেরই সমান অধিকার। এই স্বপ্ন সকল করার কাজে মৃত্যু বরণ করাও আমি শ্রেয় মনে করি।

কলপ্রয়োগ ছাড়া ব্যক্তির হাতে মূলধন সঞ্চিত হতে পারে না। কিন্তু অহিংস সমাজ ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রের হাতে বিত্ত সঞ্চয় বেগু সন্তব তা নয়, তা অবশ্যস্বার্থী ও ব্যর্থনীতি।

অসহযোগের গাঙ্কিত

শারীরিক পরিশ্রম না করে খাওয়া আশা করা যে কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ভারতে লাখ লাখ লোক আছে যারা দিনে একবার খাদ্য খেতে পার—একখানি খাদ্য চাশাটি আর একটু নুন। এই মানুষগুলির অন্নবস্ত্রের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যদি কিছু সঞ্চয় থাকে তা ভোগ করার অধিকার আমাদের নেই।

যে জিনিষ আমার এখনই প্রয়োজন নেই তা যদি আমি সংগ্রহ করে রাখি, তাহলে আমি অন্তের চুরি করছি বলে ধরতে হবে।

প্রত্যক্ষ বা দেখা যাচ্ছে তা উপেক্ষা করে প্রমাণ সাপেক্ষ পেঁচালো সিদ্ধান্ত করা কাজের কথা নয়।

যারা ভূমি কর্ষণ করবে, উৎপন্ন ফসলের মালিক তারাষ্ট, ভূমির অধিকারী বলে কেউ নেই। একমাত্র অধিকারী ঈশ্বর, কাজেই শ্রমের দ্বারা যে ভূমি কর্ষণ করবে সেই হবে ভূমির সম্বন্ধিকারী।... এমন সময় আসছে যখন সমস্ত জমির মালিক হবে রাষ্ট্র অর্থাৎ যারা চাষ করবে জমি তাদেরই হবে।*

অসাধারণ প্রতিভা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনার কোন প্রয়োজন নেই। নিজের আহাৰ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্যেকেই যদি শারীরিক পরিশ্রম করেন। কবি, ভাস্কর, উকিল প্রভৃতি তাঁদের মনোবা মানবের সেবার কাজে লাগান, এই নিঃস্বার্থ কর্তব্য নিষ্ঠার ফলে তাঁদের সৃষ্টি আরও উন্নত হবে।... কোন শারীরিক পরিশ্রম না করে নিয়মিত খাদ্য আশা করা যে কোন নাগরিকের পক্ষে অসম্ভব।

সংখ্যায় রাজস্ববর্গ ৬৪০ কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে তাঁরা সংখ্যায় একশোও হবেন না। তাঁরা ছ' শোই হোন বা একশোই হোন, সে প্রশ্ন অবাস্তব। তাঁরা সংখ্যায় এতো নগণ্য যে জাগ্রত ভারতে তাঁরা একমাত্র প্রজা-ভৃত্য হিসাবেই তিষ্ঠিতে পারেন। আজিকার মত নামে প্রজা-ভৃত্য নয়, কাজে।

স্বাধীনতা অর্জনে ক্লান্তসংকল্প ভারতবাসীকে তাদের অভীষ্ট থেকে বিচ্যুত করতে

জমিদারী সম্পর্কে লুই ফিশারকে গাঙ্কিতী বলেন—কিমানেরা থাকনা সেওয়া বন্ধ করবে... তারপর জমি নিজেরা ঈশ্বল করবে।

লুই ফিশার—গায়ের জোরে ?

গাঙ্কিতী—গায়ের জোরের প্রয়োজন হতে পারে, আবার জমির মালিকেরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতাও করতে পারেন।... তারা পালিয়ে যাবেন।

লুই ফিশার—আপনি বলতে চান খেসারৎ না দিয়ে সরকার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করবেন ?

গাঙ্কিতী—জমিদারদের খেসারৎ পেওয়ার মত অর্থ কারই নেই।

আমাদের স্বাধীনতা

পারে এরূপ শক্তি ইংরাজের নেই। এমন কি ইংরাজ তথা রাজতন্ত্রের শক্তিসিদ্ধ শক্তিরও নেই।

স্বাধীন ভারত বিপদে পতিত প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে অবশ্যই এগিয়ে আসবে।

সাধারণের মঙ্গলের জন্য বৃহৎ যত্নশিল্প অবশ্যই কিছু থাকবে; কিন্তু ঐ সকল যত্ন রাষ্ট্রের অধীনে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত হবে।

ব্যক্তির শ্রমের লাভব করবার হিতৈষী মনোবৃত্তির কলে যত্নের প্রচলন হয়নি, লোভই এর জনক। এরূপ অবস্থার বিরুদ্ধেই আমি প্রাণপণ সংগ্রাম করছি।

আজ যত্নের সাহায্যে কিছু লোক লাখ লাখ লোককে পদানত করে রেখেছে। কয়েকটি লোক একচেটিয়া ভাবে বিভ্রাট হলে তা আমি চাই না, আমি চাই সকলেই অর্থের অধিকারী হোক।

আমি কখনই অতি সাধারণ সরল যত্নপাতির বিরোধী নই। এর দ্বারা ব্যক্তির পরিশ্রমের লাভব হয় এবং লাখ লাখ গ্রামবাসী পরিশ্রমের গুরুভার থেকে মুক্তি পায়।

জীবন যাত্রার উপকরণ বৃদ্ধি করে এবং কল কারখানা দ্বারা সে অভাব মিটিয়ে পৃথিবী যে তার গন্তব্য পথে একপাও এগিয়েছে—এরূপ আমি মনে করি না।

প্রয়োজনের মাত্রা বেশী করা অপেক্ষা স্বেচ্ছায় তার যাত্রা কম করার মধ্যেই সভ্যতার প্রকৃত অর্থ নিহিত আছে।

আমি সেই ভারতই গড়তে চাই, যে ভারতে দরিদ্রতম ব্যক্তিও মনে করবে—এই তার দেশ, এই দেশে তার একটি সক্রিয় সভ্য আছে। সেই ভারতে থাকবে না উচু নীচ ভেদ, সম্ভ্রদায়ে সম্ভ্রদায়ে থাকবে অকুণ্ঠ প্রীতি। সেই ভারতে থাকবে না অস্পৃহতার অভিলাষ, থাকবে না মাদকতার বিষ। নারী সেই ভারতে ভোগ করবে পুরুষের সমান অধিকার। সেই ভারত করবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির সংগে সহযোগিতা। আমরা অপরের শত্রু হব না, অপরকে শোষণ চালাতেও দোষ না; এই আমার ধ্যানের ভারত।

যে রাষ্ট্রব্যবস্থা জুলুম করে লোকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তা কখনই বাহনীয় নয়। ভারতবর্ষ কখনও সেরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নেবে না।

স্বদেশী হোক অথবা বিদেশী হোক যে কোন শাসন ব্যবস্থা হতে মুক্ত হবার ক্রমাগত চেষ্টার মধ্যেই স্বাধীনতার অর্থ নিহিত রয়েছে।

যখন আমরা নিজেকে শাসন করতে শিখবো তখনই আমাদের স্বরাজ আসবে।

আমাদের স্বাধীনতা

প্রত্যেক ব্যক্তি যখন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করবে তখনই প্রকৃত স্বাধীন লাভ হবে।

ভারতবর্ষকে যদি পৃথিবীর লব্ধে মাথা ঝাড়া করে দাঁড়াতে হয় তবে কোন দেশী বা দল অথবা উপজাতিকে অনগ্রসর বা পশ্চাৎপদ করে রাখলে চলবে না। ভারতবর্ষ অঙ্গের জোরে কখনও মাথা তুলতে পারবে না।... ভারতবর্ষকে আপন মর্গগত সংস্কৃতির সাহায্যেই গৌরব উজ্জল হয়ে দাঁড়াতে হবে—এই সংস্কৃতি প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে পরিচুর্নিত হবে, আমি সম্প্রতি যে সমাজতন্ত্র-বাদের কথা বলেছি তারই মধ্যে দিয়ে এই সংস্কৃতি প্রকাশ হবে। কারো কোন মত বা পরিকল্পনা সমাজে প্রচার করে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বলপ্রয়োগের নীতি সর্বপ্রকারে বাদ দিয়ে লুপ্ত করতে হবে।

পূর্ণ স্বরাজ বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা নয়। জাতিগতভাবে স্বাধ্যকর ও সম্মানজনক পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই স্বরাজের লক্ষ্য।

যদি ভারতের হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ বসবাস করতে আরম্ভ করে, তবে পুলিশ ও সৈন্যদলের কোন প্রয়োজনই থাকবে না।

আমরা পৃথিবীর অপর লোকদের সংগে শান্তিরক্ষা করে চলবো, আমরা কোন অবস্থাতেই পরকল্প হব না। আমরা শোষণ করবো না, কিংবা শোষিতও হব না। আমাদের সেনাবাহিনী হবে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র।

যে স্বার্থ ভারতের কোটি কোটি মুক জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী নয়, স্বদেশী হোক আর বিদেশী হোক, আমরা সেই সকল স্বার্থ-ই রক্ষা করবো।

এই ভারতবর্ষ আমার স্বর্গ, কিন্তু তা'বলে আমি স্বদেশী ও বিদেশীর মধ্যে কোন ভেদনীতির কথা ভাবতেও স্থণা বোধ করি।

কুশাসনকে অগ্রাহ্য করবার অধিকার প্রজাসাধারণের নিশ্চয়ই আছে। ইহা বহু প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

বিষেব প্রচারে যাহুয়ের কোন কল্যাণ হতে পারে না। পৃথিবীকে নতুন শিক্ষা দেবার জন্য এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা করবার গৌরব ভারতবর্ষই লাভ করবে।

দরিদ্র জনগণের স্বরাজই আমার স্বপ্নের স্বরাজ। রাজস্বগণ ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা যে সকল দ্রব্য ভোগ করেন, সকলেই স্বচ্ছন্দে সেই সকল দ্রব্য ভোগ করতে পারবে, এই হোল আমার নীতি।

আমার কল্পনার স্বরাজ জাতি বা ধর্মের কোনরূপ বিভেদ বিচার করে না। স্বরাজ সর্বসাধারণের জন্য; লাখ লাখ বিকলাঙ্গ, অন্ধ, অনশন-পীড়িত মুক জনগণও তাদের মধ্যে থাকবে।

আমাদের গান্ধিজী

আমাদের সকলেরই এই নিয়ম করা উচিত যে, গ্রামের জিনিষ পেলে কখনও কোথাও অল্প জিনিষ ব্যবহার করবো না।

স্বাধীন ভারতে নয়াদিল্লীর সুরম্য প্রাসাদ ও দরিদ্র শ্রমিকের জীর্ণ কুটার—এই দুই বিসদৃশ জিনিষ একদিনও থাকতে পারবে না।

ধনীরা যদি স্বেচ্ছায় তাদের ধন ও তজ্জনিত ক্ষমতা ত্যাগ না করেন, তাহলে রক্তাক্ত হিংস্র বিপ্লব একদিন অবশ্যস্বাবীরূপে এসে উপস্থিত হবে।

সমস্ত কলকারখানা জাতীয়করণ করতে হবে, রাষ্ট্রের অধীন হবে। চিত্তাকর্ষক ও আদর্শ পরিবেশের মধ্যে সেগুলি পরিচালনা করা হবে। লাভের জন্ত নয়, মানব সমাজের উপকারের জন্ত। উদ্দেশ্য হিসাবে ভালবাসা লাভের স্থান দখল করবে।... পরসার জন্ত এই পাগলের মত ছুটোছুটি অবশ্যই বন্ধ হবে, শ্রমিকদের শুধু জীবন যাপনের উপযুক্ত বেতন দেবার নিশ্চয়তা দিলেই হবে না, তাদের কার্ধ্যারাকে এক-ষেয়েমি থেকে মুক্ত করতে হবে। এই নতুন পরিবেশে যারা কারখানায় কাজ করে আর যারা কারখানার মালিক—উভয়েরই ভালো হবে।...

নিজ নিজ রাষ্ট্রে অধিবাসীদের কার্ঘের জন্ত সেই সেই রাষ্ট্র অবশ্যই দায়ী। তর্ক-বিতর্কে তাদের অধিকার নেই, তাদের কর্তব্য পরিষ্কার, কর্তব্য কর আর তজ্জন্য জীবন দাও।

আমরা প্রকৃতই যদি সত্য ও অহিংসার পথে স্বরাজ অর্জনের জন্ত বদ্ধপরিকর হতাম, তাহলে যার খোঁজ লওয়া হয়নি এমন একটি ভিখারী বা বুষ্ঠরোগীও ভারতে থাকতো না।

কংগ্রেস কমিটিগুলি শ্রমিকদের জন্ত সর্বত্র বিজ্ঞামাগার খুলতে পারে। সেখানে পরিশ্রান্ত শ্রমিকেরা বিশ্রাম করতে পারবে। এই কাজ যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি কল্যাণকর।

দেশের বৃহৎ শিল্পগুলি রাষ্ট্রশক্তির অধীনে পরিচালিত হবে। শহর তখন আর্থিক শোষণের কেন্দ্র না হয়ে স্বাস্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধির কেন্দ্রস্বরূপ হবে।

ভবিষ্যতে ভারতের উৎপাদন ও বন্টন কেন্দ্রগত করা হবে না। চরকার পিছনে সেই আদর্শ নিহিত আছে। গ্রামের উন্নতির জন্ত যা কিছু আবশ্যক, তা সবই উৎপাদন করতে হবে।

আমার কল্পনার এই ভারতে অস্পৃহতা বলে কিছু থাকবে না, মানব দ্রব্য ব্যবহারের সর্বনাশা প্রভাব হতে সকলে মুক্ত থাকবে এবং নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে।

আমাদের গান্ধিজী

ভারতবর্ষ যদি প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে চায়, তবে পুরস্কার কিংবা ক্ষমতা লাভের লোভ না করে সেবার্কারের প্রতি নিরবিক্ষিত্ব একাগ্রতাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আপন বিষয় না ভেবে দেশের বিষয় তাঁদের ভাবতে হবে।

ভারতবর্ষকে ঘি-খণ্ড করা হলেও কান্দীর থেকে কতাকুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতবাসী এক। দেশকে আরও খণ্ডিত করা নিবুদ্ভিতা হবে। আরও স্বতীকরণ বন্ধ না করলে এখানে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আর শেষ থাকবে না, আর সেই সকল রাষ্ট্র ভারতবর্ষ আর পৃথিবীর কোন উপকারে আসবে না।

ভারতের লাট নিজ দেহে এবং পরিবেশে সম্পূর্ণভাবে মানক স্পর্শ যুক্ত থাকবে।...

তাঁর পরিবেশ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশ পাবে চরকায় সূতা কাটা।...

সামান্য কুটীরে তিনি বাস করবেন। তাঁর গৃহের দ্বার সকলের জন্যই সदा অব্যাহত থাকবে।...

দেশী বা বিদেশী মূল্যবান আসবাবপত্র দেশী গবর্ণরের জন্য নয়। তাঁর মন্ত্র হবে 'উচ্চ চিন্তা ও সরল জীবন'। এই মন্ত্র তাঁর গৃহদ্বারে উৎকীর্ণ হয়ে শোভা বৃদ্ধি করবে না, পরন্তু তাঁর দৈনন্দিন কর্মে নিত্য মূর্ত হয়ে উঠবে।

তিনি কোন ক্রমেই কুত্ৰাপি অস্পৃশ্যতা স্বীকার করবেন না। জাতিধর্ম ও বর্ণগত কোন ভেদই তিনি মানবেন না। সকল ধর্মের এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ যাকিছু তা তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হবে।

যে প্রদেশের গভর্ণর হবেন, সেই প্রদেশের মাতৃভাষায় তিনি কথা বলবেন।...

কংগ্রেস আজ ক্ষমতা অধিকার করেছে বলেই কংগ্রেসীগণকে লোভের বশে সরকারী চাকরীর পিছনে পিছনে ছুরতে হবে—এরূপ আচরণ কংগ্রেস আদর্শের বিরোধী।

চরকা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে লাখ লাখ বুদ্ধকর অন্ন মিলবে। ১২০০ মাইল লম্বা এবং ১৫০০ মাইল চওড়া এই বিশাল ভারতের কৃষকগণের ক্রম-বর্ধমান দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান কোন শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারাই সম্ভব হবে না। ভারতবর্ষ একটি ছোট দ্বীপ তো আর নয়। ইহা একটি মহাদেশ। ইংলণ্ডের মত একে শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করা যাবে না। আর পৃথিবীর লোককে শোষণ করার মত কোন পরিকল্পনা ত আমাদের দৃঢ়ভাবে বন্ধ করেই দিতে হবে। আমাদের কুটীরে কুটীরে কার্পাস থেকে বস্ত্র তৈরী করে দেশের ধন বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের যে-সময়টা বিনা কাজে কেটে যায়, তাকে এই শখেই কাজে লাগাতে হবে। এই কর্মই

আমাদের পাক্ষিকী

আমাদের সকল আশার কেন্দ্রস্থল হবে। হুতরাং ভারতীয় জীবনে জল ও বায়ু ম চরকার মনন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।*

অতীতে কংগ্রেসের লোকেরা বিনা বেতনেই তো কাজ করেছে। তবে কংগ্রেসের পাল'মেটারী সেক্রেটারী হলে তাকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে কেন? পাল'মেটারী সেক্রেটারীর দরকার যে কি তা-ও বুঝি না। গবর্নেন্টের উপর বেতনভূ সেক্রেটারী আর না চাপানোই কংগ্রেসের উচিত।...আর না বাড়িয়ে ব্যয় বাড়ানো অবিবেচনার কাজ হবে।...

সং জীবন—

মনো রেখা, তোমার স্ত্রী বন্ধু, সখী ও সহকর্মী, লালসা চরিতার্থ করার য নয়।

অবিবাহিতেরা নিজেকে পবিত্র রাখবে, বিনয় শিক্ষা করবে, সর্বপ্রকার প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করবে।

সদাই সেই শক্তির কথা চিন্তা করবে, যে শক্তিকে আমরা দেখতে না পেলেও অন্তরে অনুভব করি। সেই শক্তি সবাই তোমাকে সাহায্য করবে।

সংযমী জীবনধারা বিলাসী জীবনধারা থেকে ভিন্ন। অতএব, তোমার সমাজ, তোমার পার্শ্ব, তোমার আনন্দ আহরণ ও তোমার খাত্ত নিয়ন্ত্রণ করবে। সং সংগ খুঁজবে। আসক্তিমূলক উপস্থান ও পত্রিকা পড়বে না। একখানি ভালো বইকে সদাই তোমার সংগী করে রাখবে। থিয়েটার ও বায়োব্রোপ বর্জন করবে। ভজন শুনে, যার বাণী ও সুর চিত্তকে উন্নত করে। রুচির জন্ত আহার গ্রহণ করবে না, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ত খাবে। বিলাসী মানুষ খেতে ভালবাসে, সংযমী মানুষ জীবন ধারণের জন্ত আহার করে। যে সব মিষ্টান্ন ও পানীয় স্বাস্থ্য উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যে বিব ভালো-মন্দের বিচারশক্তি হ্রাস করে, তা বর্জন করবে। ভোজনের মাত্রা ও সময় নিয়ন্ত্রণ করবে।

ইঞ্জিয় যখন তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইবে তখন নতজাহ্ন হয়ে ইঞ্জরের কাছে সাহায্য চাইবে। রাম নাথ এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্যকারী। বাহ্যিক প্রক্রিয়া হিসাবে এক বালতী ঠাণ্ডা জলে কোমরটা ডুবিয়ে ক' মিনিট বসে থাকতে পারো। ইঞ্জিয়াসক্তি তৎক্ষণাৎ হ্রাস পাবে।

* লর্ড লোথিয়ান জিজ্ঞাসা করেন—গ্রাম-শিল্প ও কুটীর-শিল্পের লক্ষ্য কি?

পাক্ষিকী বলেন—কি করে করকে অক্ষয়, আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করা যার তা শিখানোই কুটীর-শিল্পের লক্ষ্য।

আমাদের স্বাধীনতা

প্রত্যয়ে ও রাজ্যে শরনের পূর্বে মৃত্যু বাতাসে বীৰ্য জ্বলন করবে।

রাত ন'টায় শোবে, ভোর চারটের সময় উঠবে। শরনের পূর্বে কিছু থাকে না।
সন্ধ্যা ছ'টায় সময় রাজ্যের আহ্বার শেষ করবে।

স্মরণ রেখো, ভগবান ঈশ্বরের প্রতিভূ, জীবের সেবা করাই তাঁর ধর্ম। এবং তাঁর
স্বার্থই ভগবানের মহত্ব ও প্রেমকে সে প্রকাশ করে। সেবা করাই তোমার একমাত্র
আনন্দ হোক, জীবনে আর কোন ভোগের প্রয়োজন নেই।

ধূমপান করা আমি একটা পাপ কাজ বলে মনে করি। ইহা মানুষের বিবেক
নষ্ট করে এবং মস্তপানের চেয়েও ইহা ভয়ানক। কারণ, ইহা অলক্ষ্যে ক্ষতি করে।
ইহা এমনই একটি কু অভ্যাস যার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া বড়ই কষ্টকর। ইহা
ব্যয়সাপেক্ষ পাপ। ইহা আমাদের নিঃশ্বাসকে দূষিত করে। আমাদের দীর্ঘতাকে
বিবর্ণ করে। এবং অনেক সময় ককট রোগ সৃষ্টি করে।

ধূমপায়ীরা যদি এই কদর অভ্যাস ত্যাগ করে, সেই পরস্যাটী জমিয়ে কোন জাতীয়
মংগলের উদ্দেশ্যে দান করে, সে নিজের ও জাতির কল্যাণ করবে।

অনশনক্ৰিষ্ট নরনারীরা বেসব ছোটখাটো চুরী করে সাজা পায়, এদেশে মস্তপান
করা তার চেয়েও বড় অপরাধ বলে আমি মনে করি। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও
অসহায়ের মত ইহা সহ্য করি।...বারা মদ তৈরী করে এবং যারা বারবার নিবেধ
সত্ত্বেও তা পান করে তাদেরকে আমি সাজা দেবার পক্ষপাতী। সন্তান আশুনের
কাছে যেতে অথবা গভীর জলে নাবতে চাইলে আমরা গায়ের জোরেও তাদের নিরস্ত
করি। লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে অথবা বস্তার জলমোতে লাফিয়ে পড়ার চেয়ে মস্তপান
বেশী বিপজ্জনক। অগ্নি ও জল আমাদের দেহকে ধ্বংস করে, কিন্তু মদ আমাদের
দেহ-মন দুই-ই নষ্ট করে দেয়।

আমাদের আহ্বাধ, আমাদের জীবনধারা, আমাদের আলাপ-আলোচনা, আমাদের
পারিপার্শ্বিকতা সব কিছুই পাশব-বৃত্তির উদ্ভেদক। এই উদ্ভেদনাই আমাদের স্বাধ্যের
উপর বিশ্বের মত ক্রিয়া করে।

যারা অবিবাহিত আছে তারা অবিবাহিত থাকার চেষ্টা করবে, অন্ততঃ বতদিন
পারে। সুবকের প্রতিজ্ঞা করবে—পঁচিশ-ত্রিশ বছর অবধি কুমার থাকার।...

পিতামাতার প্রতি আমার অহরোধ, তারা যেন ছেলে-মেয়েদের অল্প বয়সে
বিয়ে দিয়ে গলায় একখানি পাথর বেঁধে দেবেন না।...তারা এই ধরনের কনয়হীনতা
বন্ধ করুন। যদি তারা সত্যই সন্তানের শুভ চান, তাহলে তাদের দৈহিক, মানসিক
ও নৈতিক উন্নতি বিধান করুন।...

আমাদের গাঙ্কিজী

যাদের স্ত্রী মারা গেছে অথবা যাদের স্বামী মারা গেছে, তাদের আর বিয়ে না করাই কর্তব্য, ইহাই সত্যকারের স্বাস্থ্য-নীতি।...

স্বামী-স্ত্রীর রাজ্যে পৃথক শয়ন করা উচিত।...

একবার স্বাস্থ্য ভাঙলে সে স্বাস্থ্য আর পুনরুদ্ধার করা যায় না। একখানি ভাঙা আরসির কাঁচকে যতই জুড়ে রাখো সেটি ভাঙা কাঁচই থাকে।...

সংবাদপত্র—

সংবাদপত্রকে শক্তি বলা হয়েছে। সংবাদপত্র হুনিশিত একটা শক্তি। কিন্তু এই শক্তির অপব্যবহার করা অপরাধ। আমি নিজে সাংবাদিক। সহযোগী সাংবাদিকদের প্রতি আমার এই আবেদন যে, তাঁরা যেন নিজেদের দায়িত্ব বুঝেন এবং সত্যের সন্ধান ব্যতীত অন্য কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে যেন কার্য পরিচালনা না করেন।

রাষ্ট্রভাষা—

হিন্দুস্থানী শিখতে পরাভূত কতিপয় ভারতবাসীর জন্য গোটা জাতির উপর বিদেশী ভাষার বোঝা চাপানো যায় না—কেন্দ্রীয় সরকারের যদি অচিরে এই বিচক্ষণ বুদ্ধির উদ্রেক হয়, তাহলে কোন প্রাদেশিক সরকার ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে সাহস পাবে না। হিন্দুস্থানী অনায়াসে সর্বভারতের ভাষা হতে পারে—কোন প্রদেশের বা কোন সম্প্রদায়ের লোকের তাতে আপত্তি থাকতে পারে না। ইংরাজের রাজনৈতিক পাশ আমরা ছিন্ন করেছি; বা দিয়ে ইংরাজ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, এক্ষণে আমি সেই ইংরাজী শিক্ষার পাশ ছিন্ন করতে বলছি। স্বাভাবিকই সমৃদ্ধ ইংরাজী ভাষা আজিকার যত ভবিষ্যতেও বরাবর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ও কূটনীতির ভাষা থাকবে।

আত্মদর্শন—

আমার জীবনে গোপনতা বলে কিছু নেই। আমার জীবনের প্রতিটি পাতা সকলের জন্য খোলা।

আমি সব চেয়ে গরীব মেথরের পায়ের ধূলা নিতে পারি। কিন্তু সজ্জাটের কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে রাজী নই।

হুচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে যেদিন আলোর রশ্মি দেখতে পাবো, সেদিন আমি সবাইকে ডাক দোব।

আমার জীবন এখানেই শেষ হতে পারে। এতদিন ধরে যে হিন্দু ও মুসলমান

আমাদের ঈশ্বর

জাই-বোনের মত বাস করে এসেছে, তাদের মনে মিলনের প্রতিষ্ঠা করতে আমি আগ্রহ চেষ্টা করবো। ফলশ্রুতি একমাত্র ভগবান।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্বাবস্থাপিত না হলে আমি দেহরক্ষা করবো।

দেখো, আমি এখন বাঙালীর মধ্যে তাদেরই একজন—আজ আমি বাঙালী। আমি নোয়াখালীবাসী। এখানেই আমার কাজ।

আমার মুখের পানে তাকাও, আমি আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃতসমকল্প। হয় আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাবো অথবা এখানেই দেহরক্ষা করবো।

আমি আবার জন্মগ্রহণ করতে চাই না। কিন্তু যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করি তবে যেন অম্পৃক্তদের মধ্যেই জন্মাই। তাতে আমি তাদের অসুবিধার অংশ গ্রহণ করতে পারবো, তাদের মুক্তির জন্য খাটতে পারবো।

আমি নিজেকে খৃস্টান, মুসলমান, পার্শী, ইহুদী, শিখ, জৈন অথবা অপর যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করি। তার অর্থ এই যে, আমি সর্বধর্মের সার মর্ম গ্রহণ করেছি। এই নীতি-পথ ধরে আমি সংঘাতের দায় হতে অব্যাহতি পেয়েছি এবং ধর্ম সম্বন্ধে স্বীয় বিশ্বাসের পরিধি ব্যাপক করতে সমর্থ হয়েছি।

ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে নিজেকে আমি বাইরের লোক বলে মনে করি না। অন্তঃস্থের ধর্মমতের মত ইসলাম ধর্মকেও আমি নিজের ধর্ম বলেই প্রজ্ঞা করি। এই সহায়কৃতি ও বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে তার সমালোচনাও করি।

আমি প্রতিমা পূজায় অবিশ্বাস করি না।

ভগবান, অদ্বৈতবাদ, পুনর্জন্ম ও মুক্তিতে আমি বিশ্বাস করি।

বেদ, উপনিষদ, পুরান, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র অবতার ও পুনর্জন্মে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্বাস করি বাইবেল, কোরাণ ও জিন্দাবেস্তা বেদের মত অপৌরুষেয়।

প্রতিমা পূজা মানুষের স্বভাব-ধর্ম। আমরা প্রতীক চাই। প্রতিমা আমাদের উপাসনায় সাহায্য করে। কোন হিন্দুই মূর্তিকে ভগবান বলে মনে করে না। মূর্তি পূজাকে আমি পাপ বলে মনে করি না।

আমার মনে ভারতবাসীর যে চিত্র আছে, তাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বাবে পাশাপাশি লাগালাগি বাস করবে, তাতে ধনী-দরিদ্রের কোন প্রমুখ থাকবে না। তাদের সকলেই হবে রাজা, আবার প্রজাও। এই স্বপ্নকে স্বার্থক করতে আমি হাসিমুখে মরতে প্রস্তুত। ভারতবাসী গৃহবৃদ্ধ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবে, তা দেখেও বেঁচে থাকার ইচ্ছা আমার নেই।

আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যে-জাতির মাঝে আমি জন্মেছি,

আমাদের শাখিনী

দিনের পর দিন যবে যে জাতির দুঃখকষ্ট আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের সেবা করতে হলে সমস্ত সম্পত্তি ও অধিকার ত্যাগ করতে হবে।

যতক্ষণ তোমার দেহ আছে ততক্ষণ সে দেহকে আবৃত করার জন্য বস্ত্রও প্রয়োজন। কিন্তু ততক্ষণ যত কম প্রয়োজন তাই গ্রহণ করবে। থাকার জন্য প্রকাণ্ড প্রাসাদের দরকার নেই, মাথার উপর সমান্তর একটু আচ্ছাদন হলেই চলবে। খাদ্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

এখন দেখ, তোমার ও আমার মাঝে আধুনিক সভ্যতার যে সংজ্ঞা বিদ্যমান তার মাঝে প্রাত্যহিক ব্যাপারে কত বিরোধ রয়েছে। যে চিত্র আমি তোমাদের সামনে ধরেছি তা আনন্দময় ও বাঞ্ছনীয় সমাজ-ব্যবস্থা। আরেকদিকে দেখ, আমাদের সভ্যতার মূলকথাই হচ্ছে অভাব-বোধকে বৃদ্ধি করা। তোমার যদি একখানি ঘর থাকে তুমি দু'খানি ঘর চাইবে, তার পর তিনখানি, যত বেশী পাবে ততো খুসি হবে। এবং এইভাবেই তোমার বাড়ীতে যত আসবাব পত্র পাবে ততই চাইবে। যত বেশী তোমার থাকবে তুমি সভ্যতার ততো বড় প্রতিভু বলে গণ্য হবে। আমার কথাগুলি তখন হৃদয় হচ্চে না, কিন্তু আমি যা বুঝেছি তাই বলছি।...

অপর পক্ষে তোমার যত কম থাকবে, ততো কমই তুমি চাইবে, ততো ভালো থাকবে...ঈশ্বরের ইচ্ছায় যতদিন এই দেহ আমি ধারণ করে আছি, বিলাস বা আশ্ব-হৃথের জন্য সে দেহকে আমি নিযুক্ত রাখতে পারি না। কিন্তু সারাদিন সেবার কাজেই নিয়োগ করবো। দেহের বেলা যদি এই নীতি খাটে তাহলে বেশ সুস্থার বেলায় খাটবে না কেন?...

যখন জগতের সব কিছু তুমি ত্যাগ করবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত বৈভব তোমারই হবে। তখন যতটুকু তোমার সত্যকারের প্রয়োজন তা তুমি পাবে। যখন স্বাস্থ্য প্রয়োজন হবে, খাবার তোমার কাছে আপনি এসে পড়বে।

ঈশ্বর তোমাকে পরীক্ষা করছেন। যখন তিনি দেখবেন তোমার বিশ্বাস টলে যাচ্ছে, তোমার দেহ আর সহিতে পারছে না, তুমি ভুবে যাচ্ছ তখন ভগবান যেভাবেই হোক তোমাকে উদ্ধার করতে আসবেন। এবং দেখিয়ে দেবেন যে তিনি সবসময় তোমার ভাকে সাড়া দেন। আমি তা দেখেছি। এমন একটি ঘটনাও আমি জানি না, যখন শেষ মুহূর্তে তিনি মানুষকে পরিত্যাগ করেছেন।.....

আমি যদি কোন জিনিস সংগ্রহ করে রাখি বা আমার এখনই প্রয়োজন নেই তা হলে সে জিনিসটি আমি অপরের কাছ থেকে চুরী করেছি বলে গণ্য হবে;...ভারতে লাখ লাখ লোক আছে যারা দিনে একবার মাত্র খেতে পার—একখানি চাপাটি ও

একটু লক্ষ্য। সেই লাখ লাখ লোক বেতে পরতে না পাওয়া পর্যন্ত কোন ভিন্নিবেই
আমার কোন অধিকার নেই।

যখন আমরা আমাদের কোন অভাব মিটাবার জন্য প্রতিবেশীকে ছেড়ে দিয়ে
অস্ত্র কোথাও যাই। তাহলে আমরা জীবনের বর্ষ থেকে পতিত হব।...তোমার গাঁয়ে
শহর থেকে যে নাপিত এসেছে তাকে বাদ দিয়ে গাঁয়ের নাপিতের কাছে যাওয়াই
তোমার কর্তব্য। তুমি যদি চাও তোমার গাঁয়ের নাপিত নৈপুণ্যে শহরের নাপিতের
সমকক্ষ হবে, তাহলে তাকে সেইমত শিক্ষা দিতে পার। তাকে শহরে পাঠিয়ে
দাও। তা না করে অস্ত্র কোন নাপিতের কাছে যাবার কোন সুক্তি নেই। এরই
নাম স্বদেশী।

ভারত পরিভ্রমণ কালে আমি দেখেছি সারা দেশ ভয়ে বিকল হয়ে আছে। পাঁচ
জনের সামনে আমরা মুখ খুলতে পারি না। গোপনে আমাদের মতামত ব্যক্ত
করি।...আমি শুধু আগুনাদের একটি কথা বলতে চাই যে ভগবান ছাড়া আমরা
আর কাউকে ভয় করবো না। যখন ভগবানকে ভয় করবো তখন আর কোন
মানুষকে ভয় করার প্রয়োজন নেই, তা সে মানুষ যত উচ্চপদেই অধিষ্ঠিত হোক
না কেন!

আমি যখন আমার জয়ধ্বনি শুনি তখন মনে হয় যে ভ্রবণ-যাত্র প্রত্যেক ধ্বনি
এক একটি শেলের স্তায় হৃদয় বিদ্ধ করছে। যদি বুঝতাম এই রূপ জয়ধ্বনি করলে
তোমাদের স্বরাজ লাভ হবে তাহলে আমি এ ক্লেশ সহ করতে পারতাম। কিন্তু যখন
দেখি লোকের সমস্ত শক্তি ও সময় কেবল অযথা চীৎকারে ব্যয়িত হয়ে কাজের ক্ষতি
করছে তখন মনে হয় ঐরূপ জয়ধ্বনি না করে তারা যদি চিত্তানল প্রজ্জ্বলিত করতো
তাহলে তাতে প্রবেশ করে আমি হৃদয়ের আলা নিবারণিত করতে পারতাম।

আমি মহাত্মা নই, আমি দীনাত্তিদ্দীন, কেবল মহাত্মা নামের দুঃখ ভোগের বোঝা
যাখায় নিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি ঋষি নই, মুনি নই, অবতার নই, নই সন্ন্যাসী। আমি
গৃহী, আমি দেশের সেবক, আমি শুধু সত্য-সন্ধানী। আমি সাধু নই, রাজনীতিকও
নই। সত্য যে অখিল জ্ঞানের উৎস, ইহাই আমি মাঝে মাঝে গভীর ভাবে উপলব্ধি
করি যাত্র।

আমি যদি কোন পুণ্য অর্জন করে থাকি, তবে সে পুণ্য সত্য ও অহিংসা।
অন্তি মানবীয় কোন শক্তি আমার নেই, সে শক্তির কামনাও আমি করি না।

পৃথিবীকে লুণ্ঠ করবার জন্য আমি কখনও ভগবানের বিরোধিতা করতে
পারি না।

আমাদের গাঙ্কী

আমি জানি ঈশ্বর উর্ধ্বাকাশে বা পৃথিবী গহ্বরে বাস করেন না। তিনি সকল মানবের মধ্যে সমভাবে বিরাজ করে থাকেন। মানব সেবার ভিত্তর দিয়েই আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবার সাধনা করি।

আমি মুক্তি চাই। সমাজের একজন বলে আমি শুধু নিজের জন্তই মুক্তি চাই না। উপরন্তু সকলের জন্তই মুক্তি চাই। তাই আমার এ গণ-প্রার্থনা।

এক অনির্বচনীয় তুষ্টি য় শক্তি সব কিছুকে সমাচ্ছন্ন করে বিরাজ করছে। আমি সেই শক্তিকে প্রত্যক্ষ না করলেও অনুভব করি।

আমি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি যে মৃত্যু জীবনের রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানেই মৃত্যুর মুখোমুখি হব, সেইখানেই তাকে আলিঙ্গন করবো।

পৃথিবী থেকে একজন পাণ্ডিত্যকে অপসারিত করার ইচ্ছায় যদি কেউ আমাকে গুলি করে তাহলে সে গুলিতে আসল গাঙ্কী নিহত হবেন না, আক্রমণকারীর চোখে যাকে পাণ্ডিত্য বলে মনে হচ্ছে সেই গুলিতে সেই মারা পড়বে।

যারা আমার প্রতি দোষারোপ করছে তাদের হাতে মৃত্যু হলেও যেন তাদের অমঙ্গল চিন্তা না করি, ঈশ্বর যেন আমাকে সেইরূপ মানসিক শক্তি দেন।

আমার সামনে যখন যে কর্তব্য এসে উপস্থিত হয় তা সম্পাদন করেই আমি আনন্দিত। কি বা কেন প্রশ্নদ্বারা আমি বিচলিত বা বিভ্রান্ত হতে চাই না।

জীবনে আমি আশা কখনও ত্যাগ করিনি। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আমার অন্তরে আশার উজ্জ্বল আলো জ্বলতে থাকে। আমি নিজে কখনও সে আশা নষ্ট করতে পারি না।

সত্য ও স্নহের পূজারী আমি; সত্য ও স্নহের আরাধনায় নিরোজিত আমার জীবন, সত্য ও স্নহের প্রয়োজনে আহুতি দিতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

মৃত্যুর সম্ভাবনায় আমি উল্লসিত হয়ে উঠি, যেমন করে লোকে বহুদিনকার হারান বন্ধুকে পেয়ে উল্লসিত হয়।

আমি নিজেকে যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত বলে মনে করি। এই কারণে আমি ধর্ম সম্পর্কে নিজের বিশ্বাসের পরিধি ব্যাপক করতে সক্ষম হয়েছি।

আমি ধর্মনীতি ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই—একথা স্বীকার করতে আমি মোটেই প্রস্তুত নই।

মানুষের প্রকৃতিকে আমি কোনপ্রকারে সন্দেহ করতে প্রস্তুত নই। যে কোন মহান ও বহুহলভ কাজে মানুষের অন্তর সাড়া না দিয়ে পারে না।

শত্রুর অন্তর জয় করে তাকে বন্ধুতে পরিণত করাই আমার কাজ।

আমাদের গান্ধী

পবিত্র ও সংজীবনের ভিতর দিয়ে বিনা রক্ত পাতে পৃথিবীতে শান্তিরাশি প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত।

আমি ইংরাজের বিরোধী নই, যা অসত্য ও অজ্ঞায় আমি তারই বিরোধী।

অহিংসা আমার কাছে শুধু দার্শনিক তত্ত্বই নয়। ইহা আমার প্রাণস্বরূপ। সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে কেবলমাত্র অহিংসার পথেই পৃথিবীকে বাঁচানো যায়।

আমার জীবনের মূলমন্ত্রের আদি ও শেষ কথা অহিংসা।

জীবনকে মহৎ ও উন্নত করার জন্য চরকার চেয়ে বড় আর কিছু আমার জানা নেই। দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্য যখন চরকা কাটা যায় তখন সে চরকা কাটা মহানও হয়ে ওঠে।

আদর্শগত ভাবে আমি সমবন্টন চাই। কিন্তু যতদূর মনে হয় এই আদর্শ কোন দিনই সফল হবে না। সেইজন্য আমি উপযুক্ত বস্তুনের পক্ষপাতী।

অসমস্যা পরীক্ষার দ্বারা আমি অহিংসা ও সংঘের যে স্তরে এসে পৌঁছেছি যে কোন নরনারী আমার মত চেষ্টা করলে সেও সেই স্তরে এসে পৌঁছাতে পারে।

আমি ব্যাংকিং বুঝি না, তবে ভয় ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের অভাবেই যে জীবনবীমার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, একথা বেশ বুঝি।

আজ যন্ত্রের সাহায্যে কিছু লোক লাখ লাখ লোককে পদানত করে রেখেছে। কয়েকটি লোক একচেটিয়া ভাবে বিত্তশালী হবে, ইহা আমি চাই না। আমি চাই সকলেই অর্থের অধিকারী হোক।

দেশকে ভালবাসেন বলে সম্মানবাদীকেও আমি শ্রদ্ধা করি। যে বীর দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাঁকে আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই—হত্যা করা কি পুণ্য কাজ?

আমার মত অস্বাভাবিক মাপবার জন্য সত্যের মাপকাঠিকে যেন কখনও বাটো করা না হয়।

মানব সমাজকে সজীব করার জন্য জাতি যেন নিজের জীবন দান করতে পারে, সে জাতীয়তাবাদই আমি চাই এইরূপ জাতীয়তাবাদেরই আমি অনুরক্ত।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় স্বাধীনতার জন্য আমার উদ্ভাবিত পথ অতি দীর্ঘ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এই পথই সর্বাপেক্ষা হৃদয় ও সরল।

আমার জাতীয়তাবাদ উগ্র নহে নেই কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ অপর জাতিকে অগ্রাহ্য করে না, অপর জাতির অমঙ্গল সাধন করতেও জানে না।

আমাদের গান্ধিজী

আমার সেবার যদি প্রয়োজন থাকে এবং ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবো।

এই ভারতবর্ষ আমার স্বর্গ। কিন্তু ভাই বলে আমি স্বদেশী ও বিদেশীর মধ্যে কোন ভেদনীতির কথা ভাবতেও চুপা বোধ করি।

আমার অনশনকে কোন অর্থেই রাজনৈতিক চাল বলে মনে করা উচিত হবে না। ধর্ম ও বিবেকের অনিবার্ণ আহ্বানে আমি অনশন গ্রহণ করি। গভীর স্বর্ষবেদনা হতেই এই অনশনের জন্ম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে নিজের দুর্বলতা না থাকলে কোন মানুষই স্বাধীনতা হারায় না।

ভারতের স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে আমি বিশ্বভাতৃত্ব সম্ভব করে তুলতে চাই। ইহাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত।

শোষণের পিছনে রয়েছে হিংসা। ভবিষ্যৎ অহিংস সমাজে সর্ববিধ শোষণ কলুষ নিশ্চিহ্নভাবে মুছে যাবে—ইহাই আমার কাম্য।

দরিদ্র জনগণের স্বরাজই আমার স্বপ্নের স্বরাজ। রাজস্বগণ ও বিংশালী ব্যক্তিরা যে সকল দ্রব্য ভোগ করেন, সকলেই স্বচ্ছন্দে সেই সকল দ্রব্য ভোগ করতে পারেন—ইহাই হোল আমার নীতি।

ভারতবর্ষকে ইংরাজের কবল থেকে মুক্ত দেখাই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। দেশকে সকল প্রকার হীনতা থেকে মুক্ত করাই আমার পণ।

ভারতবর্ষ তরবারীর নীতি অনুসরণ করে সামরিক জয়লাভ করতে পারে কিন্তু তাহলে সে ভারতবর্ষ আর আমার হৃদয়ের গর্বের বস্তু থাকবে না।

হিন্দুধর্মকে আমি সর্বোচ্চ স্থান দিই না। সেই ধর্মই আমার ধর্ম যা থেকে হিন্দু-ধর্মের উদ্ভব, যা মানুষের প্রকৃতিকে বদলে দেয়, যা অন্ধরের সত্যের সঙ্গে মানুষের মনকে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে, যা আত্মোপলব্ধির জন্য কোন মূল্য দিতেই পশ্চাৎপদ হয় না, যা শ্রুতকে জানতে চায় ও শ্রুতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত করতে চায়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মগত কার্যগুলিকে পৃথক করে ফেলা যায় না। কর্ম থেকে ধর্ম আলাদা নয়।

পূঁজিবাদকে আমি নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাই, গোঁড়া সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদীরা যা চায়, কিন্তু আমার কর্মপদ্ধতি ভিন্ন, আমার ভাষা আলাদা।

মানুষ অনেক সময় দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালবাসে, আমিও দিবাস্বপ্ন দেখি। সারা পৃথিবী ব্যোপে শুধুই সম্মান বিরাজ করছে এই চিত্র পরিকল্পনা করতে আমার

আমাদের স্বাধীনতা

ভালো লাগে।...সমাজতান্ত্রিকেরা বলেন নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, নতুন ধারা প্রবর্তিত হবে। আমিও এক নতুন জীবন ধারার অভিলାষী, যা জগতে বিশ্বাস স্থাপিত করবে।

আমি যত্নকে ধন্য করতে চাই না, তার কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করতে চাই। কুটীর-বাগী কোটি কোটি মানুষের কর্মভার লাঘব করবে যে যত্ন তাকে আমি বাগত জানাই।...যদি গাঁয়ের ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎশক্তি পেঁছাতে পারি, সেই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে গ্রামবাগীরা যত্ন চালালে আমি স্মৃদ্ধ হব না।...কিন্তু যত্ন-সংখ্যক লোকের হাতে বিদ্যুৎ ও ক্ষমতা সঞ্চয় করার জন্য যদি যত্নের ব্যবহার হয় আমি তা অজ্ঞায় ও পাপ বলে মনে করি। অধুনা যত্ন এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।...ভারতের সাত লাখ গায়ে যে সম্ভব যত্ন ছড়িয়ে আছে তার বিকল্পে প্রাণহীন যত্ন বলাতে চাই না। যত্ন যদি মানুষকে সাহায্য করে ও তার কাজকে সরল করে তবেই তার ব্যবহার সার্থক হয়। অধুনা যত্নের ব্যবহার হয় মুষ্টিমেয় লোকের পকেট ভর্তি করার জন্য। যত্ন কোটি কোটি লোকের গ্রাস কেড়ে নেয়, সেদিকে দৃষ্টি দেয় না।...আমাদের দেশের যা কিছু প্রয়োজন তা যদি তিন কোটি লোকের বদলে ত্রিশ হাজার লোকের দ্বারা প্রস্তুত হয়, আমার কেন আপত্তি নেই। কিন্তু ওই তিন কোটিকে অলস করে বেকার বসিয়ে রাখা চলবে না।...পণ্ডিত নেহেরু যত্নশিল্পের পক্ষপাতী, তিনি ভাবেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলে পুঁজিবাদ থাকবে না। কিন্তু আমার মতে যত্নশিল্পের মধ্যেই দুর্নীতি নিহিত আছে, সমাজতান্ত্রিকতা তার মূলোৎপাটন করতে পারবে না।

আমাকে যদি কেউ মেরে ফেলতে চায়, তার হাতে খুঁসি মনে আমি মরতে পারবো এই বিশ্বাস আমার আছে। তাহলে অপর সকলকে আমি বেতাবে মরতে বলি, আমার সেইভাবেই মৃত্যু হবে।

আমি মহাত্মা এমন দাবী আমি কখনও করি নাই। আমি আপনাদের মতই একজন সাধারণ লোক—তর্কাত্মক এই যে আমি আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল। আমার পক্ষে হয়তো আজ একথা বলা যাবে যে আপনাদের চাইতে ভগবানে আমার বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ়। হিন্দু, শিখ, পার্শী, 'মুসলমান ও খৃষ্টান সকল ভারতবাসীই যদি ভারতবর্ষের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে তবে ভারতবর্ষের কখনও কোন বিপদ ঘটবে না। আপনাদের ঋষি বাক্য স্মরণ করতে বলি—একমাত্র সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের কখনও নয়।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমি জীবন পণ করেছিলাম। সেই স্বাধীনতার অপবাস-মৃত্যু আমি দেখতে চাই না। প্রতি শাস-প্রস্থানে ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা

আমাদের দার্জিলী

জানাজি, হয় আগুন নিভাবার শক্তি দাও নয়তো আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নাও !
প্রাদেশিকতা—

সংবাদপত্রে দেখলাম কয়েকজন আসামী মনে করছেন—আসাম কেবল তাঁদেরই। প্রত্যেক প্রদেশে যদি এইরূপ মনোভাবের উদ্গাদনা হয় তাহলে ভারতবর্ষ কার হবে! আমার মত এই যে বিভিন্ন প্রদেশবাসীরা সকলেই ভারতের এবং ভারত তাদের সকলেরই। তবে এর একটিমাত্র সত্য আছে—তা এই যে, প্রত্যেক প্রদেশকে শোষণ, শাসন অথবা কোন মতে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে কেউ তথ্য দিয়ে বলবাস করতে পারবে না। সকলেই ভারতবর্ষের সেবক, এবং সেবার ভার নিয়ে সকলকেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে।

সংবাদ এসেছে (দার্জিলিঙে) একটি সুখী লীগ আছে—ঐ লীগ সমতলের লোক দার্জিলিঙে এলে উদ্ভা প্রকাশ করে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা বল প্রয়োগ করে এরূপ সংবাদ এসেছে।...এই সব যুবকের কল্পনা শক্তি নেই, ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসাও নেই।

বিহার নিঃসন্দেহে বিহারীদের, কিন্তু বিহার ভারতেরও। আর বিহার সম্বন্ধে যে কথা সত্য সে কথা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত প্রদেশ সম্পর্কেও সত্য। কোন ভারতীয়ই বিহারে বিদেশী বলে গণ্য হবে না।...বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে প্রাদেশিক ব্যাপার নিয়ে ব্যক্তিগত বলপ্রয়োগের যে কুৎসিত অভিনয় হোল, তা একেবারেই হওয়া উচিত নয়।

সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা আমাদের জীবনের সকল অনর্থের মূল। ভারতের সীমা যতদূর, আমার প্রদেশ কার্যতঃ ততদূর বিস্তৃত হওয়া উচিত। আর ভারতের সীমাও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সীমারেখায় বিলীন হওয়া চাই। নইলে ধ্বংস হবে।

ধনিক ও শ্রমিক—

শ্রমিকেরা অজ্ঞাতায় ডুবে আছে। তাই হয় তারা ধনপতিদের কথায় উঠে বসে, নয়ত ধনপতিদের জান-মাল বা কলকল্লা নাশ করার গুটতাকে বাহাদুরী মনে করে।... হিংসার আশ্রয় নিলে শ্রমিকদের কল্যাণ হবে না—কলবস্ত্র যুদ্ধের মূলেই তাহলে তারা কুঠারাম্বাত করবে। শ্রমিক ধনপতি অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ।...আমি মনে করি মুক্তা ব্যতীতই কেবল শ্রমিকের দ্বারাই দুনিয়ার কাজ চলতে পারে—ইহা অবাস্তব কল্পনা নয়।...শ্রমিক ধনিক প্রীতির বন্ধনে অভিন্ন দৃষ্টি হোক, ইহাই আমি চাই। পরস্পরের সংগে সহযোগিতা করলে তারা অস্বচন ঘটতে পারবে। কিন্তু সহযোগের পথে বুদ্ধি পূর্বক বস্তাদিন না তারা নিজের মর গুছিয়ে নিচ্ছে, ততদিন ধনিকের সংগে

আমাদের রাষ্ট্রদ্রোহ

তাদের কিছুতেই সমানের সংগে সমানের সহযোগ হতে পারে না। খনিকেরা সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে জানে তাই শ্রমিকদের তারা তাঁবে রাখতে পারছে।... শ্রমিকদের পরস্পরের সংগে সহযোগিতায় যদি কোন ফাঁক না থাকে, তা যদি অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে প্রয়োজনীয় মূলধন আপনিই তাদের হাতে আসবে, যেমন লোহা ছুটে আসে চুখকের আকর্ষণে। সেই ক্ষুভদিনের আগমনে শ্রমিক-খনিকের বর্গজ্ঞা অজ্ঞান হতে পারে। তখন শ্রমিক পরীক্ষা পেতে পারে, বাসযোগ্য হুন্সর হুন্সর কয়েক করতে পারে, সম্ভাব্য উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে, নিজে লোকশিক্ষা করার যথেষ্ট সময় পাবে; প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্তও আর তখন তাদের অবশ্য হবে না।

পাকিস্তান—

স্বীকার করি যে 'লড়কে লেংগে পাকিস্তান' রব তোলা মুসলীম-লীগের অজ্ঞান হয়েছে। ভারত বিভাগের কথা আমি মনেও স্থান দিতে পারি নাই। বস্তুতঃ জোর করে মুসলমানেরা ভারত বিভাগ করতে পারতো না। কংগ্রেস ও বৃটিশরাজ স্বীকার না করলে পাকিস্তান হোত না। যা হচ্ছে তা এখন ওলটানো যাবে না। পাকিস্তানের মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবী এখন গ্রাহ্য। আপনাদের কেবল ভেবে দেখতে বলি স্বাধীনতা আপনারা পেলেন কি ভাবে, কংগ্রেসই বস্তুতঃ লড়ছে। লড়বার অস্ত্র ছিল নিরুপদ্রব আইন বিরোধ। ভারতবাসীর নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কাছে পরাজয় স্বীকার করে ইংরাজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছে। জোর করে পাকিস্তান নাকচ করতে গেলে স্বরাজই নাকচ করা হবে। ভারতবর্ষে স্বরাজ দু'টি রাষ্ট্র। স্বায়-অন্তায়ের প্রতিকারের জন্ত নাগরিকদের কর্তব্য একরাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের বৃথা-পড়া করতে দেওয়া। প্রতিদিন বুখা এই যে জীবন হানি ঘটছে তাতে কারো লাভ হচ্ছে না, অশেষ ক্ষতিই হচ্ছে। আইনের ধার না ধরে লোকে যদি পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে তবে প্রমাণিত হবে স্বাধীনতা আমাদের হাতে সয় না। দুই রাষ্ট্রের যে কোন রাষ্ট্র বরাবর স্বায়ের পথ ধরে চললে অপর রাষ্ট্রের স্বায় আচরণ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। সারা পৃথিবী তখন স্বায়ের সমর্থনে অগ্রসর হবে।.....

আমি চিরকাল যুদ্ধের বিরোধী কিন্তু পাকিস্তানকে যদি কোন ক্রমেই স্বায়ের পথে আনা না যায়, যদি প্রামাণিক অস্ত্রায়কেও পাকিস্তান অস্ত্রায় বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করে, তেমন কিছু নয় বলেই যদি তাকে পাকিস্তান উড়িয়ে দিতে চায়, তবে ইউনিয়ন গবর্নমেন্টের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। যুদ্ধ হাসি ঠাট্টা নয়। যুদ্ধ কেউ চায় না। যুদ্ধ সর্বনাশের পথ। কিন্তু আমি কাউকে

—প্রদ্বাভঙ্গী—

অন্যেদীর্ঘ—

—আমি কি করিয়া তাঁহার কথা প্রচার করিব। তাঁহার ভাষার আশ্রয় তুলনা আমি কিছুই নই। আর যিনি স্বভাবতই যহং তাঁহাকে আর ভেটী করিয়া যহ করিতে হয় না। তাঁহার নিজের প্রভাব নিজেই আশ্রয়স্থান থাকেন এবং যখন সময় জগৎ প্রস্তুত হয়, তখন তাঁহার লোকসমাজে প্রত্যক্ষ হন। যখন সময় আসিবে তখন গান্ধীও প্রচার হইবে, কারণ আজ তাঁর প্রচারিত শ্রম, স্বাধীনতা ও ব্রাহ্মণের বাঁ সমগ্র জগতের বিশেষ দরকার।

সমগ্র প্রাচ্যের আত্মা আজ গান্ধীতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, কারণ তিনিই আর দেখাইতেছেন যে মানবের আদিম উপদেশ, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্য দিয়াই মানবের আত্মার পরিস্ফুটী হয়, কিন্তু বিবেচ ও যুদ্ধ-সজ্জার মধ্যে মানবের দেহ ও মন উভয়েই বিনষ্ট হইয়া যায়।

আমরা গান্ধীজীর নিকট কৃতজ্ঞ, কারণ, মানুষের স্বর্গীয় সম্ভার ভারতের বিশ্বাস যে আজও বাঁচিয়া আছে, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ তিনিই ভারতকে দিয়াছেন।

* মহাত্মা গান্ধী যে নৈতিক শক্তির প্রতিভা এবং পৃথিবীতে একমাত্র প্রতিভা, সেই শক্তিতে আমাদের সকলের প্রয়োজন আছে।

এমন দিন আসিবে, যে দিন দুর্বল, সং, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মানুষ প্রমাণ করিবে যে অবনতরাই পৃথিবীর ভাবী অধিকারী। ইহাই যুক্তিযুক্ত যে মহাত্মা গান্ধী, যিনি শরীরে দুর্বল বস্ত্রসম্পদে অসহায়, তিনিই প্রমাণ করিলেন যে ভারতের নির্বিকৃত নিখ্যাতিত মানুষের অন্তরে অবনত বিনতের অজ্ঞেয় শক্তিই গোপন রহিয়াছে।...

—রবীন্দ্রনাথ

—যে সমস্ত মহাপুরুষ নূতন যুগের বার্তা ঘোষণা করেন। ভগবৎ-দত্ত শক্তিবলেই তাঁহার কার্য করিয়া থাকেন। তাঁদের ভিতর দিয়া আমরা চিরন্তন মহাত্মার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। এই মহাত্ম্যের আলো-রেখা যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সামাজিক আবর্জনাকে এবং অজ্ঞায়কে স্পর্শ করে ও আমাদেরকে আত্মহতুতির সুযোগ দেয়। মহাত্মাজী এমনিতর একটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন—অহিংসব্রত উদ্ঘাপন কর, আত্মাকে অহত্ব কর ও আত্মা হও—ইহাই তাঁহার শিক্ষার মূলমন্ত্র। বিভিন্ন যুগে এই প্রকারই বিভিন্ন শিক্ষা ভারতবাসীকে কর্মের পথে নিয়োজিত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে

আমাদের গান্ধীজী

এই মূলসত্যের উপরেই ভারতীয় সভ্যতা স্থাপিত, এবং এই জন্তই জাতি ও ধর্মাত্মসারে, বহু বিভক্ত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে একতা হৃদ্রে আবদ্ধ করা মহাত্মার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। পাশ্চাত্যের রীতিনীতিই যে এক যাত্রা রীতিনীতি নহে এবং প্রাচ্যের যে অন্ধের দ্বারা পাশ্চাত্যের সভ্যতার অঙ্গসংগ্ৰহ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, মনীষী ব্যক্তিগণ বারংবার ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মার ভিত্তর দিয়াই ভারত এই সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছে।...

—আচার্য অমৃতলাল

—মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা এমনই অনগ্রসাধারণ ও অতুলনীয় যে চিরকালের জন্য আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম অক্ষাঙ্কে লিখিত থাকিবে। ভারতবর্ষের যখন কোনই আশা ছিল না। ভারতবাসীরা যখন জাতীয় সংগ্রামে নূতন পদ্ধতি ও নূতন অস্ত্রের জন্য অন্ধকারে হাতড়াইতেছিলেন, ঠিক সেই শুভ-মুহুর্তে গান্ধীজী তাঁহার অভিনব অসহযোগ ও সভ্যাগ্রহ লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি যেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেন। অচিরাতঃ সমস্ত ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় তাঁহার পতাকাতে সমবেত হইল। ভারতবর্ষ বাঁচিয়া গেল। এতোক ভারতবাসীর মুখ আশায় ও বিশ্বাসে উদ্ভাসিত হইল। চরম জয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ইহা বলিলে বিন্দু যাত্রা অত্যাক্তি হইবে না যে তিনি যদি ১৯২০ সালে সংগ্রামের অভিনব অস্ত্র হাতে আগাইয়া না আসিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের মোহ আজও ভাঙিত না। কোনও একজন ব্যক্তি এরূপ অবস্থার বিপাকে এক জীবনে এতখানি সাক্ষ্য অর্জন করেন নাই। ঐতিহাসিক তুলনা হিসাবে তাঁহার কাছাকাছি মুস্তাফা কামালের নাম করা যাইতে পারে। ১৯২০ সাল হইতে ভারতবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর নিকট দুইটি শিক্ষা পাইয়াছে, স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে যে দুটি অপরিহার্য। প্রথমতঃ তাহারা জাতীয় আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে, যাহার ফলে তাহাদের হৃদয় বিপ্লবাত্মক উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র দেশব্যাপী একটি প্রতিষ্ঠান পাইয়াছে, ভারতবর্ষের দুর্গমতম গ্রামেও, যাহার প্রভাব পৌছিয়াছে। স্বাধীনতার সোজা সড়কে গান্ধীজী আমাদের পৌছাইয়া দিয়াছেন।...

—মেতাজী সুভাষচন্দ্র

—গান্ধীজীর চিন্তাধারার ন্যায় বিচার করিতে হলে—তর্কের পরিবেশে নয়—তাঁর জীবনের কর্মচাক্ষুর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হবে। তিনি নূতন ও পুরাতনের

আমাদের গান্ধিজী

সংমিশ্রণ। একাধারে বিপ্লবী, আবার অতীত আদর্শের অমুরাগী। সত্যি কথা বলতে কি, গান্ধিজীর মধ্যে ভারতের আসল রূপটি ধরা পড়েছে।

ভারতের ধর্ম-ইতিহাসের অমুখাবন করলে দেখা যায় একটা সময় ও সংমিশ্রণের প্রচেষ্টা। উপনিষদ ও গীতায় সমস্ত প্রাচীন ধর্মমতের সমন্বয় ঘটেছে। ভারতবর্ষ সর্বদাই বিভিন্নমুখী মতবাদকে একত্রীভূত করার চেষ্টা করেছে। চিন্তাধারার এমন কোন বিপ্লব প্রাচীন ভারতকে বিপর্যস্ত করেনি যাতে মতবাদের মিলনের সংগীত ব্যাহত হতে পারে। ভারতীয় ধর্ম-জিজ্ঞাসা গঠনের, মিলনের এবং গ্রহণের। ধর্মের নয়।

বিভিন্ন মতবাদকে গ্রহণ করা মানে বিভিন্ন জীবনধারাকে স্বীকার করা। তর্ক-শাস্ত্রের একটা সূত্রের বন্ধনে অথবা গণিতের হিসাবে জীবনকে যাচাই করা চলে না। থিয়োরী হিসাবে যা সত্য তা শুধু থিয়োরীর সত্য, তাতে জীবনের স্পন্দন নেই।... জীবনে অনেক শ্রোত, অনেক গভীরতা।

গান্ধিজীর সমাজ-সেবায় এই জটিল জীবনই মূখ্য হয়ে উঠেছে। সেইজন্তই তাঁর চিন্তাধারা সূদূর প্রসারী—বহু পথ গামী ও বহুল। তিনি কোন্ কথার উপর জোর দিতে চাইছেন, জীবনের কোন্ দিকটায় আলোক সম্পাত করতে চান তা সময়ের মানের উপর নির্ভর করছে। স্থান ও পাত্রের উপর নির্ভর করছে তাঁর মনসিক রূপের অভিব্যক্তি—সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ধর্মোপদেশী, ফকির মহাভিক্ষুক অথবা বিপ্লবী গান্ধিজী কথা বলবেন। তা ছাড়া পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি এমন অনেক কথা সহজেই অবহেলা করেছেন যা অল্প একসময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়েছে। এই আশ্চর্য চিন্তাধারার সময়, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কোন তর্কশাস্ত্রের অমুজ্জা মানে না, কারণ বিচারের সিদ্ধান্ত নিশ্চল—জীবনের সকল ঘটনাবলী, মানব-মনের স্বজনপ্রয়াসী বিপ্লবচিন্তা এই আদেশে চলে না—চলে মুহূর্তের গतिकে আশ্রয় করে প্রগতির পথে। সিদ্ধান্ত শতধা হয়ে যায় জীবনের বিচিত্র লীলায়। জীবনকে যে কাল অনুযায়ী বিচার করা হয় তা একদেশদর্শী সেইজন্তই কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধিজীর জীবন-দর্শন বিজ্ঞান সম্মত বলে মনে না হতে পারে—আপাত দৃষ্টিতে এ-ধরণের ভুল ধারণার সুযোগ রয়েছে।

এ ধরণের ভুল ধারণা ধারা করতে চান তাঁরা গান্ধিজীর অজস্র বাণী থেকে কেন কোন কথা আহরণ করে নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইতে পারেন অথবা তাঁর কোনো কথার উপর জোর দিয়ে সেই কথার পরিবেশকে অবহেলা করতে পারেন। কিন্তু ভাষ্যকারদের মনে রাখা উচিত গান্ধিজীর অজস্র বাণীধারায় সময়ের গতিনির্দেশ রয়েছে।

গান্ধিজীর জড়জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনকে একত্রে বাঁধতে চেয়েছেন এবং

আবাহের গান্ধী

সময়ত এই দুটো জীবনের ক্ষেত্রে কোন একটা সম্বন্ধে আপনার মতবাদ প্রচার করেছেন। এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তাতে জোর দিয়েছেন।

গান্ধীজীর সমালোচকদের মধ্যে হুঁদলের লোক আছেন। একদল আছেন যারা বেহুয়ো একটানা, গান্ধীজীকে না বুঝে বিকৃত সমালোচনা করে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে চেষ্টা করেছেন। ধর্মভীরুদের মতে গান্ধীজী আধ্যাত্মিক আদর্শের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারেন নি, তা রাজনীতি ও ধর্মনীতির সংস্পর্শে কলুষিত হয়েছে, আর যারা ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানে না তাঁরা গান্ধীজীর নৈতিক শক্তি উপলব্ধি করতে না পেরে জিগির তুলেছেন যে হিন্দুধর্ম বিপন্ন।

আরেক দলে আছেন সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা। তাঁরা সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে রাজনীতিগত উদ্দেশ্য সাধনকে মহাভ্রান্তি বলেই মনে করেন। তাঁরা গান্ধীজীর উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে স্থনির্দিষ্ট সংজ্ঞা খুঁজে পাচ্ছেন না। সব কিছুই বাপু সা। তাঁরা জনগণের যুক্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যুদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কাজেই এর মধ্যে গান্ধীজীর নীতি ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে তাঁরা প্রস্তুত নন। তাঁরা বুঝতে চান না গান্ধীজী কেন সত্য ও অহিংসার উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেন।

তাঁরা মনে করেন যে, রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে বিদেশী বা শাসকদের হাত থেকে দেশের মুক্তি এবং জনগণের খাণ্ড বন্টনে সম-স্বার্থ বিধান—এ ব্যাপারে সাধারণের দৃষ্টিকে অহেতুক নৈতিক প্রশ্নে আকর্ষণ না করলেও চলে। স্বাধীনতার সাধনায় তা অসংলগ্ন। শুচিতা ও নীতিকথায় জনসাধারণকে জর্জরিত করে, তাঁরা বলেন, রাজনীতির ও অর্থনীতির ক্রমঃ পরিণতিকে দুর্বল করার কোন অধিকার কার নেই। জাতি বা জনতার ভাগ্যকে এভাবে বিড়খিত করানিশ্চরোজনা। ব্যক্তিগত চিন্তায় নীতির কথা আসতে পারে। কোন বিশেষ কারণে বা কর্তব্যের প্রয়োজনে ব্যক্তি স্বার্থত্যাগ করতে পারে, কিন্তু কোন জাতি নীতির আদর্শকে বড় করার জন্য আর সব বিসর্জন দিতে পারে না।

কিন্তু সমালোচকেরা তুলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে না যে গান্ধীজী কোন সময়েই জাতি বা জনতার সত্যকারের স্বার্থকে উপেক্ষা করেন না। জাতির স্বার্থকে তিনি আশাতৃষ্ণিতে বিবেচনা করেন না—গভীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আসল স্বার্থকে গ্রহণ করেন। গান্ধীজী শুধু বর্তমানে-নিবন্ধ-দৃষ্ট রাজনীতিবিদ নন। তিনি দেশের রাজনীতিক প্রগতি ও স্বাধীন সংগে নৈতিক উন্নতির কোন সংঘাত দেখতে পান না। তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তি বা সমাজের নৈতিক মানদণ্ড ছোট গভীর মধ্যে আত্মকেত্রিক থাকতে

পারে না—নীতির শক্তি অত্রংলিহ। কদাচারের মূল্য দিয়ে হবে—আজ না হয় কাল না হয় পরন্তু এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই।

ধার্মিকেরা গান্ধীজীকে দোষ দেন যে তিনি রাজনীতিকে ধর্মের আচ্ছাদন দিয়ে সাম্প্রদায়িক সংস্কার উদ্ভাবন করেছেন। তাদের মতে রাজনীতি ধর্ম থেকে পৃথক থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁরা জানেন যে গান্ধীজী রাজনীতির সঙ্গে নৈতিক আদর্শের যোগসূত্র স্থাপন করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের স্বযোগ করে দিয়েছেন।

গান্ধীজী কেন্দ্রীকৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষপাতী নন—কিন্তু এই কথাটির বিকৃত প্রচার দ্বারা করেছেন তাঁরা গান্ধীজীর রচনা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে এটিই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, কোন অবস্থাতেই গান্ধীজী কোন শিল্প প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীকৃত করতে চান না—তা ছাড়া তিনি বিজ্ঞানসম্মত কোন পদ্ধতি যানতে রাজী নন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার তিনি প্রীতির চোখে দেখেন না, সেইজন্য প্রকৃতির উপর বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধানের চেয়ে মানবীয় গুণাবলীর বিকাশকে তিনি বড়ো বলে মনে করেন। তাঁর কাছে জাগতিক সমৃদ্ধি থেকে আত্মার উন্নতিই অনেক প্রেয় ও প্রেয়। তিনি কর্মের ভিতর দিয়ে শিক্ষার ব্যবহার পক্ষপাতী, সেজন্য গান্ধীজীকে ইন্টেলেকচুয়াল জ্ঞানের পরিপন্থী বলে আশংকা করা যায়। কিন্তু আশ্চর্য, সমালোচকেরা এটা জানতে চান না যে গান্ধীজীর আসল লক্ষ্য পরিপূর্ণ জ্ঞান সঞ্চয় এবং তা কেবলমাত্র কাজ ও অভিজ্ঞতা থেকে সম্ভব হতে পারে। গান্ধীজীর উক্তি থেকে ভ্রান্ত্যংশ আহরণ করে তাঁর মতবাদকে প্রক্ষিপ্ত প্রমাণ করার জন্ত এঁদের উৎসাহের অন্ত নেই।

গান্ধীজীর সংগঠন প্রতিভা ও জীবনধারা সমন্বয়ের আগ্রহ কোথাও সংঘাত বা প্রতিবাদের মোহে আচ্ছন্ন নয়। হিন্দু ও মুসলিম স্বার্থের বৈরীতাব তিনি কোথাও খুঁজে পান নি। তিনি নিজেকে সকল সম্প্রদায়ের বন্ধু বলে দাবী করেন, আবার নিজেকে সনাতন হিন্দু বলে প্রচার করেন।

গান্ধীজী স্বদেশ ও বিদেশের কল্যাণের পথে কোন সংঘাত দেখতে পান না। ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদীর কাছে গান্ধীজীর মানবতা বিশ্বমৈত্রীর নামে জাতীয় স্বার্থকে অবহেলা করা ছাড়া আর কিছু নয়। আবার আন্তর্জাতিকতাবাদী পণ্ডিতেরা গান্ধীজীকে ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ নিয়ে উদ্বাস্ত বলে মনে করেন। হুঁদলই গান্ধীজীর বিরাট রচনাবলী থেকে কয়েকটি ছেঁড়া পাতা নজীর হিসাবে সংগ্রহ করে লাকালাকি করছেন।

বছর কয়েক আগে একজন ইংরাজ রাজনীতিক কথায় কথায় গান্ধীজীকে বলেন— বিদেশীর চেয়ে স্বদেশবাসীকে তিনি নিশ্চয়ই বেশী ভালবাসেন। তিনি ভেবেছিলেন যে গান্ধীজী তার কথায় লম্বা বিবেন। কিন্তু গান্ধীজীর উত্তর শুনে তিনি অবাক হলেন।

আমাদের গান্ধিজী

গান্ধিজী বললেন—মাছুষে মাছুষে কোন প্রভেদ আমি দেখতে পাই না। ইংরাজদের ততটাই ভালবাসি যতটা ভারতীয়দের ভালবাসি।

—তাহলে আপনার স্বদেশীর মূলমন্ত্র কি ?

—প্রতিবেশীকে ভালবাসা—প্রতিবেশীকে সাহায্য করার জন্য জন্ত জীবন পাতি করাই মানবসমাজের কাজে লাগার প্রথম ও সহজ উপায়।

—তাহলে আপনি মুসলীম লীগের কাজে আত্মনির্যোগ করেন না কেন ?

—আমি কংগ্রেসের কাজেও যেমন লেগেছি—মুসলীম লীগের সেবা করিতেও আমি তেমনি প্রস্তুত। কিন্তু লীগ তা চায় না। আমি জবরদস্তি করে কারও কাজে লাগতে পারি না, যদি সমর্থন না পাই। তাই প্রার্থনা করে সেই ক্ষতি পূরণ করি।

এতদ্বারা গান্ধিজীর দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা প্রকাশ পাচ্ছে। জীবন সম্পর্কে হুঁই সমন্বয় বোধক ধারণা না থাকলে এতটা বিশালতা এতটা উদারতা রক্ত মাংসে গড়া মাছুষের মধ্যে সম্ভব নয়।

গান্ধিজীর রচনাবলী থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে তাঁকে বিকৃতভাবে প্রচার করার প্রচেষ্টা যেমন গান্ধী-বিরোধীদের মধ্যে প্রবল, তেমনি তাঁর লেখার কোন অংশ-বিশেষের সাহায্যে নিজেদের মুন্সিয়ানার বড়াই করার চেষ্টা কোন কোন গান্ধী-ভক্তের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। গান্ধিজীর শিক্ষাকে তাঁরা সম্যকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁরা ততটাই জানেন যতটা তাঁদের সংস্কারকে সাহায্য করে—তাঁদের অহুদার কুত্র চেতনা যতটা পেয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারে।

গান্ধিজীর চিন্তাধারার উপযুক্ত মূল্য দিতে হলে এর মহিমায় এর পরিবেশে তা গভীর অহুভূতিতে হৃদয়ংগম করতে হবে। সমগ্রভাবে একে বিবেচনা করতে হবে—প্রতিটি চিন্তাসূত্রে যে জোর সাময়িক প্রয়োজনে যে রং ফলানো আছে তা মুছে ফেলতে হবে, সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে তবে আসল সুরটির পরিচয় পাওয়া যাবে। তলিয়ে দেখতে হবে চিন্তাধারা কোথায় স্তিমিত গতিতে চলেছে। দেখতে হবে গান্ধিজীর বাণীতে কোথায় পাদপুরণের দরকার আছে সমগ্রকে উপলব্ধি করার জন্য, সংগতি খুঁজে পাবার জন্য। তাঁর কথায় কোথাও যদি দেশের মাটির রং লেগে থাকে, সেই রং ফলানি নরম হয়ে এলে সর্ব দেশের আদর্শকে খুঁজে পাওয়া যায়—বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ সার্বভৌম কল্যাণ। সমগ্র চিন্তাধারা গান্ধিজীর জীবন ও কর্মকে পরিবেষ্টন করে আছে, এর থেকে বোঝা যায় যে তাঁর কাজে ও চিন্তায় যে সংগতি তা তাঁর দেহ ও মনের সুরে বাঁধা বাঁধার যত মহিমাময় রূপটিকে প্রকাশ করে।

এর থেকেই অহুধাবন করা যায় যে গান্ধিজী বর্তমান সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে সব

আমাদের গান্ধিজী

চেয়ে গায়ানুসারী ও বাস্তববাদী। সমাজতন্ত্রবাদের আসল রূপটি কি? কেউ হয়তো বলবেন সাম্য, আবার কেউ বলবেন—শোষণ নীতির উচ্ছেদ, সম্পূর্ণ সাম্য সম্ভব নয়।

শোষণনীতি পরিহারই সমাজতন্ত্রবাদের আসল কথা, সমাজতন্ত্রবাদ নানাভাবে নানারূপে প্রচারিত হচ্ছে। ভারত ও ভারতের বাইরে কোন ছুঁজন সমাজতন্ত্রবাদীকে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিকেই আন্তরিক সমর্থন করতে দেখা যায় না। এই অমিলের মধ্যেও একটি বিষয়ে সকলেরই মনের মিল আছে যে শোষণনীতির পরিহারের জন্য সবাই কৃতসংকল্প।

গান্ধিজীও তাই চান। কাল্‌মার্ক্‌স্‌ ও গৌড়া সমাজতান্ত্রিকেরা শোষণনের স্বরূপটি অর্থনীতির ক্ষেত্রেই আবিষ্কার করতে পেরেছেন, ধনামিকারের বৈষম্য থেকেই শোষণের স্ফূরণ ঘটেছে। কিন্তু অজ্ঞাত অস্ত্রেও শোষণের ভীতি দেখানো হচ্ছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে শোষণনীতি জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ক্ষমতার খেলা হোল বর্তমানের রীতি।

গান্ধিজীর লক্ষ্য হোল—শুধু অর্থনৈতিক শোষণই নয় সর্বপ্রকার শোষণই রদ করা। কেন্দ্রীভূত শিল্প প্রচেষ্টাকে ছড়িয়ে দিলে অর্থনৈতিক শোষণের পথে অনেক বিঘ্ন ঘটে। বিগতযুগে সমাজ বাদের মূল উৎস ছিল কেন্দ্রীভূত শিল্পপ্রচেষ্টা, তখনই বাণ্চালিত কল ও কারখানার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত বাধ্য হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে বৈদ্যুতিক শক্তি স্তলভের দিনে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া চলে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে বিরাট পুঁজী ভাবে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তাতে এতদিন যে অত্যাচার চলছে পুঁজীবাদীদের শোষণনীতির ফলে যে নৃশংস বর্বরতা শ্রেণীগত সংগ্রামে মানুষকে লিপ্ত করেছে তা কি আর থাকতে পারবে?

ভারতবর্ষে আমরা জনবলে বলীয়ান। আমরা জনশক্তি পারি কাজে লাগাতে। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা কুটীরশিল্পগুলি নতুন পথে পরিচালিত করতে পারি—চরকা ও অজ্ঞাত যন্ত্রগুলি বিদ্যুতের সাহায্যে চলতে পারে এবং যে সমস্ত শিল্প একান্তই কেন্দ্রীভূত রাখা দরকার—তা রাষ্ট্রের অধীনে জনসাধারণের মালিকানা সঙ্গে ব্যাপক শিল্প হিসাবে চলতে পারে। এতে আমরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতার খেলা থেকে আমরা দূরে দূরে থাকতে পারি শুধুমাত্র অহিংসার আশ্রয়ে। গণতন্ত্রের প্রধান শক্তিই অহিংসা। অহিংসার আশ্রয়ে আমরা লোকের মাথা না ভেঙে লোকের মাথা গুণতে পারি। অহিংসার নীতিতে যেসব গানের পরিবর্তে বিবেচনা ও উপলব্ধিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

আবাহের গান্ধী

গান্ধীজী তাই একজন সমাজতাত্ত্বিক। তাঁর কাম্য হোল, একটি অকেন্দ্রীকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা... তাতে অর্থনীতি ও রাজনীতিগত শোষণের সুযোগ থাকবে না, এবং তার ভিত্তি হবে অহিংসা। এই সমাজতন্ত্রবাদ গান্ধীজী মার্কসীয় রচনা পাঠ করে অহুশীলন করেন নি—এ তাঁর জীবন-দর্শনের অহুসঙ্ঘিসার ফল—যার সহজ অভিব্যক্তি রাজনীতি ও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এবং গান্ধীজীর অহুসৃত নীতি অবলম্বন করলেই গণতন্ত্রকে বজায় রেখে শোষণ নীতি পরিহার করা চলে। আজ ভারতের নবীন ও প্রবীণ সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে যে ঘোলাটে চিন্তার ছাপ দেখা যায়—তা সহজেই নতুন সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হতে পারে যদি তাঁরা গান্ধীজীকে গভীরভাবে জানবার চেষ্টা করেন, গান্ধীজীর জীবন ও শিক্ষায় সর্বমংগলময় রূপের সমন্বয় বুঝবার চেষ্টা করেন।...

—জাচার্য জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনী

—গান্ধীজী মূলতঃ ধর্মপরায়ন ছিলেন। তিনি খাটি হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোনও গোঁড়ামি ছিল না। তবে ধর্মের সংগে কোন নির্দিষ্ট বা সংস্কারের সম্পর্ক ছিল না। ১৯২৮ সালের জাহুয়ারী মাসে তিনি ফেডারেশন-অফ-ইন্টার-ক্যান্টোনাল-ফেলোশিপের বৈঠকে বলেন : “স্বদীর্ঘ গবেষণা ও অভিজ্ঞতার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সকল ধর্মই সত্য, সকল ধর্মে কিছু কুল-ভ্রান্তি আছে, সকল ধর্মই আমার কাছে হিন্দুধর্মের মতই প্রিয়।”

তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল সত্য। নৈতিক ভিত্তির সংগে না মিললে কোন চিরায়ত প্রথাই তিনি মানতেন না। এজ্ঞ কৰ্মক্ষেত্রে তিনি যা ভাল মনে করতেন সেই পথ অবলম্বনে তাঁর কোনও অহুবিধা হোত না। রাজনীতিক্ষেত্রে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের এতে অহুবিধা হতে পারে, কিন্তু কোন অহুবিধাই তাঁকে সত্য পথ থেকে টলাতে পারত না। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে নিজের উপর দিয়ে পরীক্ষা করতেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা ছিল এইরূপ : “আমি এমন একটি ভারতবর্ষ গঠনের জন্য কাজ করব, যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিরও মনে করবে যে, এটা তাদের নিজের দেশ, যে দেশ গঠনে তাদের হাত থাকবে, এই ভারতবর্ষে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ থাকবে না, সকল সম্প্রদায় পরম ঐক্যের মধ্যে বাস করবে—যে দেশে অস্পৃহতা ও পানদোষ থাকবে না...নারী-পুরুষে সমান অধিকার ভোগ করবে... ইহাই আমার স্বপ্নের ভারত।”

আমাদের জাতি

হিন্দু ধর্মে তিনি একটি বিশ্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। উত্তরাধিকার শূন্যে গ্রাস্ত সংস্কৃতিকে তিনি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বলে মনে করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন : “ভারতীয় সংস্কৃতি—হিন্দুও নয়, ইসলামীয়ও নয়, কারও নিজস্ব নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি এ সকলের মিলনের ফল।”

তিনি জাতির আধ্যাত্মিক ঐক্যকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। ‘শাস্ত্রাভ্যাস’ শিক্ষায় শিক্ষিত অল্প কয়েকজন ধনী ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান, তিনি তা ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি জনগণকে তাদের তন্ত্রা দূর করে জাগরিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই পদদলিত জনগণকে উন্নত করবার ইচ্ছাকে তিনি ধর্মেরও উপরে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন : “অর্থাহারী জাতির কোন ধর্ম, কলা বা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না।...আমি এমন কলা ও সাহিত্য চাই যা লক্ষ লক্ষ জনগণ উপলব্ধি করতে পারে।”

ভারতের লক্ষ লক্ষ নিঃশেষের জন্ত তাঁর মন সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকত। তাঁর যত কিছু কাজ ছিল এদের ঘিরেই। তাঁর আকাংখা ছিল প্রত্যেকের চোখের জল মুছে দেওয়া।

কাজেই এমন একজন লোক যে, ভারতের জনগণকে আকৃষ্ট করবে তাতে বিশ্বাসের কিছু নেই। কেবল জনগণই নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনেও তিনি এক বিরাট বিপ্লব এনে দিয়েছেন। এমন কি, তাঁর বিরোধীদের মনেও।

তিনি যখন প্রথম কংগ্রেসে প্রবেশ করেন, তখন কংগ্রেসের কাজ ছিল উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি কংগ্রেসকে একটি গণতান্ত্রিক ও গণপ্রজ্ঞানে পরিণত করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বৃটিশ শাসনের প্রধান দুটি হোল ভয়, মর্যাদাবোধ ও সহযোগিতা। তাই তিনি এ সকল ভিত্তিকে প্রথম আক্রমণ করেন। আমাদের তিনি বলেন : “তোমরা, যারা কৃষক ও শ্রমিকদের শোষণ করে থাকো, তোমরা তাদের মুক্তি দাও। যে প্রথার ফলে দারিদ্র্য ও দুর্দশার স্রষ্টি হয়, সেই প্রথা দূর কর।”

তিনি আমাদের যে সকল উপদেশ দেন, আমরা সে সকল প্রস্তাব মাত্র আংশিক-ভাবেই গ্রহণ করেছি এবং কখন কখনও মোটেই গ্রহণ করিনি। তাঁর শিক্ষার মূল কথা—সত্য ও নির্ভীকতা এবং কাজ। এই কাজ করবার সময় সর্বদাই দৃষ্টি রাখতে হবে জনগণের মঙ্গলের দিকে। বৃটিশ শাসনের সময় ভারতবাসীর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল ভয়। সেই ভয় তিনি জনসাধারণের মন থেকে দূর করে দেন।

আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা দূর করবার জন্ত অনেক আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এ আন্দোলন কখনও জনগণকে স্পর্শ করেনি।

গান্ধীজীর গান্ধীজী

গান্ধীজী এই আন্দোলন করেছেন জনগণকে নিয়ে। তিনি স্বাভিমন প্রকার মুস আদ্বাত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হিন্দুধর্ম ও ভারতকে যদি বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে এই প্রথা, এই অশুভ্রতা অবশ্যই দূর করতে হবে।

গান্ধীজী পর্দাপ্রথার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই প্রথা অতি অশুভ্র ও নৃশংস। তিনি বলেছেন যে, এই বর্বর প্রথা প্রথমে যে উপকারেই লেগে থাকুক না কেন, এখন দেশের অশেষ ক্ষতি করছে। তিনি বলেছেন যে, নারীকে পুরুষের সমান স্বাধীনতা ও আত্ম-উন্নয়নের স্বযোগ দিতে হবে।

গান্ধীজী ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য—ত্যাগের প্রতীক। তিনি মনে করতেন যে, তাঁর বাণী কেবল ভারতের জন্যই নয়, উপরন্তু বিশ্বের জন্যও। বিশ্ব-শান্তি তাঁর একান্ত কাম্য। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন উগ্রভাব ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা কামনার সংগে সংগে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি ফেডারেশনই একমাত্র সঠিক পথ। সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ তাঁর ছিল প্রধান কাম্য। সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণকে তিনি দেশের কল্যাণের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদ এই ধরণের।

বিগত মহাযুদ্ধ ভারতের সামনে এনে দিয়েছিল বহু অভাব-অভিযোগ। এবং সেই সময় প্রতিষ্ঠিত হই একটি বড় বড় শিল্প যখন কুটির-শিল্পের মূলে কুঠারঘাত করিতে লাগল, তখন গান্ধীজী গুজরাটের প্রসিদ্ধ বণিক-বংশ-ভূত হয়েও ভারতের জীর্ণ কংকাল দেখে শিউরে উঠলেন। ভারতের জনসাধারণের জীবন ধারণের হারের সংগে পাশ্চাত্য দেশের লোকের জীবন ধারণের হারে তুলনা করে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে বুঝতে পারলেন—দেশের অর্থনৈতিক চেহারা বদলাতে হলে কিল্প শিল্প ভারতের যত গরীব দেশে প্রযোজ্য হবে। তিনি ছিলেন গ্রাম্য কুটির-শিল্পের পক্ষপাতী। এতে বেকার সমস্তা যত শীঘ্র দূর করা যাবে, বড় বড় শিল্পের দ্বারা তা সম্ভব হবে না। বড় বড় শিল্প চালানার শক্তিকে মাহুষের বড় একটা কাজে লাগানো হবে না—যত্নই হবে সে শিল্পের প্রধান শক্তি। তিনি বলতেন, একটি বয় হাজার হাজার শ্রমিকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পারে। তিনি যন্ত্রশক্তিকে বড় ভয় খেতেন। এইজন্যই তিনি আজীবন ভারতবাসীকে দীক্ষা দিয়ে গেছেন, যাতে তারা ঘরে ঘরে কুটির-শিল্প গড়ে তোলে এবং অবসর সময়ে তারা যেন চরকা হাতে হাতে কাটা সূতা প্রস্তুত করেন। এই পথ ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক চেহারা বদলাতে হলে দেশের সামনে বাধা আসবে অনেক।...

—পণ্ডিত জবাহরলাল (ভিন্‌কজারী অক্ ইতিহাস)

আমাদের সাক্ষী

—ননকো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের ভিতর মতের অমিল থাকলেও মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজকের দিনে আমরা সবাই একমত। একথা যে অন্তত আমার মুখে শুধু কথার কথা নয়, তাই প্রমাণ করার জন্য আমার মতে তাঁর মাহাত্ম্য যে কোথায়, তা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করব।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল অসাধারণ। এই চরিত্র কথাটা নানা লোকে নানা অর্থে বোঝে। সুতরাং তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায় সেইটাই হচ্ছে ব্রটব্য।

ইংরাজীতে যাকে বলে অ্যাণ্টিসিজ্‌ম তার প্রতি আমার একটা সহজ প্রত্যাশা আছে। কাষায় বসনকে আমি দেখবামাত্র উচ্চ আসন দিই। কিন্তু তাই বলে যিনি শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে উদাসীন, আর যিনি শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দ্যকে বর্জন করেছেন তাঁকেই আমি মহাপুরুষ বলতে প্রস্তুত নই। কেন যে নই, তার উত্তর গীতার শ্লোকে পাবেন :

বিষয়া বিনিবৰ্ত্তন্তে নিবাহারন্তু দেহিনঃ

রসবৰ্জ্জং রসোহপ্যন্ত পরং দৃষ্টা নিবৰ্ত্ততে ॥

মহাত্মা আত্মার ধর্ম, দেহের নয়। সুতরাং আমার কাছে মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যের সংগে উপবাসাদির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে আমি এই ক'টি অসাধারণ গুণ দেখতে পাই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, কথায় ও কাজে তিনি সম্পূর্ণ অকপট এবং সম্পূর্ণ সংযত। তাঁহার নির্ভীকতা ও পরার্থপরতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ভাষা যে কতদূর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, সকলে তা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না। এ ভাষায় কোন আড়ম্বর নেই, কোন অলঙ্কার নেই, কোনও বাহুল্য নেই, কোনও অতুক্তিও নেই। তাঁর এ ভাষা যেমন সংযত তেমনি শক্তিশালী। এর কারণ ভাষায় তাঁর মনের নবরূপ লোকের চোখের সম্মুখে ধরে দেন। তাঁর ভাষার শক্তি ও রূপের পেছনে আছে তাঁর চরিত্র। সম্পূর্ণ অকপট হতে পারলে মানুষের ভাষা যে কি অসাধারণ প্রসাদপূর্ণতা লাভ করে, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধীর ভাষা, যথিচ সে ভাষা তাঁর মাতৃভাষা নয়; একটি বিদেশী ভাষা। আমি তাঁর ভাষার উল্লেখ করলুম তাঁর চরিত্রের একটা গুণ দেখাবার জন্য, তাঁর বক্তৃতার সাহিত্যিক গুণের পরিচয় দেবার জন্য নয়। আমরা যাকে টাইল্‌ বলি, সেটা যে মনের গুণ—ভাষার গুণ নয়, মহাত্মা গান্ধীর ভাষা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ননকো-অপারেশন ব্যাপারের প্রধান বল হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল। এই প্রোগ্রাম যদি অপর কেউ

আখ্যায়িক গান্ধী

সৃষ্টি করতেন তাহলে তাঁর জগদ্বৃত্তা যে একই তারিখে হ'ত সে সম্বন্ধে আখ্যায়িক মনে কোনই সন্দেহ নেই।

লৌকিক মনের উপর মহাত্মা গান্ধীর যে অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁকে ঐতিহাসিক বললেও অস্বাভাবিক হয় না এবং এটুকু জেরে দেখলেই দেখা যায় যে এ ব্যক্তিক হচ্ছে তাঁর চরিত্রবল্লভের স্বাক্ষরিক।

মহাত্মা গান্ধীর নির্ভীকতা ও পরোক্ষতা সম্বন্ধে আখ্যায়িক মনে কখনো ভ্রান্তি থাকেও সন্দেহ স্থান পায়নি। তবে তাঁর কথার কথা যে পুরোপুরি তাঁর মনের কথা, এ বিশ্বাস আখ্যায়িক বরাবর ছিল না। আখ্যায়িক মনে এ সন্দেহ পূর্বে হয়েছে যে, হয়তো তিনি তাঁর মনের কথা সম্পূর্ণ বুঝে বলেননি। রাজনীতির সংগে কূটনীতির যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ও নীতিতে উদ্বেগ যে তার উপায়কে পূত করে আবহমানকালের ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। অতএব, পলিটিশিয়ানদের কথা যে সম্পূর্ণ সরল সে বিষয়ে সন্দেহ মাহুয়ের মনে সহজেই জন্মে। তারপর অসংখ্য ননকো-অপারেশন ভক্তদের মুখে অগণ্যবার শুনেছি, যে একটু ভালিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, মহাত্মা গান্ধীর কথা সাদা ভাবে বোঝা, না বোঝারই সামিল এবং এইসব ভ্রান্তকাররা তাঁর কথার নানা গুণ ও কূট অর্থ আখ্যায়িক শুনিয়েছেন।

আদালতে তার বিচারের সময় তাঁর কথা ও তাঁর ব্যবহার আখ্যায়িক মনে থেকে চিরদিনের জন্য এ সন্দেহ দূর করেছে। তাঁর কথা যে সম্পূর্ণ অকপট, এ বিচারক্ষেত্রেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যেমন কোন কবির প্রতিভা, তাঁর রচিত নানা কাব্যের ভিতর কোনও একখানি বিশেষ কাব্যে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়ে ওঠে, তেমনি উক্ত বিচারস্থলেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সৌন্দর্য ও শক্তি ব্যক্ত হয়েছে। নির্ভীকতা ও সরলতা, সংযমে ও সৌজন্মে ও ক্ষেত্রে তাঁর আত্মোক্তি—আখ্যায়িক কাছে একটা ওয়ার্ল্ড অফ আর্ট স্বরূপে গণ্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি মহাপুরুষের—সক্রেটিসের বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আর সে বিবরণ আজ তিন হাজার বৎসর ধরে মাহুয়ের মনকে মুগ্ধ ও ভুত করে আসছে। মহাত্মা গান্ধীর বিচারের বিবরণ পড়ে আখ্যায়িক ঐ সক্রেটিসের বিচারের কথাই মনে পড়ে। যে সকল জ্ঞানের সত্ত্বাবে সক্রেটিসের আত্মোক্তি সাহিত্যে অবর হয়ে রয়েছে, প্রায় সে সকল জ্ঞানেরই সাক্ষ্য মহাত্মা গান্ধীর আত্মোক্তিতে পাওয়া যায়। সক্রেটিসের এপোলোনি বংশোদ্ভূত অহংকার করবার আখ্যায়িক ইচ্ছা আছে। বরি কখনো সে অহংকার করতে সমর্থ হই, তাহলে বাংলা পার্থক্য নাট্যেই দেখতে পাবেন যে, উভয়ের ভিতর একই রকম আত্মতত্ত্বিক ঐক্য আছে।

আমাদের স্বাধীনতা

বর্তমানে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে মানুষের যত্ন কে কি করে, তাই দিয়ে আমরা যাচাই করি, কে কি সে বিষয়ে ততটা মন দিইনে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার মহাব্যয়ের মাণকাটি ছিল স্বতন্ত্র। আজকাল আমাদের আঙ্গুচেটোর লক্ষ্য হচ্ছে টু-ডু, আর সেকালে ছিল টু-বি, এই দুই অবস্থা এক নয়।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন :—

স্থিত প্রজ্ঞস্তু কা ভাষা সমাধিষ্মস্ত কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাবেত কিমানীত ব্রজেত কিম্।

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বা বলেছেন, তার দু'চারটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

প্রজহাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্তেবাত্মনা তুষ্টিঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।

দুঃখেহল্লক্ষ্মিমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগ ভয়ক্ৰোধঃ স্থিতধী মূর্খিকচ্যতে।

যঃ সর্বজ্ঞানভিনেহন্তন্তং প্রাপ্য শুভাশুভম্।

নাভিনন্দতি ন ঘেষ্টি তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

যে প্রতিষ্ঠিত-প্রজ্ঞ পুরুষের আদর্শ আমরা এতদিন শুধু সংস্কৃত পুস্তকেই পে আসছি, যাহা গান্ধী চরিত্রে সেই আদর্শের বস্তুটা সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে, অগ কাহণ চরিত্রে ততটা পাওয়া যায়নি।

এইসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই প্রকাশ করা যে, মহাত্মা গান্ধী একজন আ পুরুষ একথা সর্বাত্মকরূপে স্বীকার করেও ননু-কো-অলায়েশন প্রোগ্রাম কেবলমাত্র পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম হিসাবে বিচার করার প্রবৃত্তি ও অধিকার আমাদের আছে।

এমন অনেক লোক দেখেছি, যারা মনে করেন যে উক্ত প্রোগ্রাম রচনা করেছে বলেই জনসাধারণের কাছে তাঁর এক মহাত্মা।

মহাত্মা গান্ধী যদি এর ঠিক উল্টো প্রোগ্রাম বার করতেন—অর্থাৎ ন ভারোলেল-এর বদলে তিনি ভারোলেল প্রচার করতেন, তাহলে জনসাধারণ প্রত্যাখ্যান করত, এমন কথা যদি কেউ মনে করেন, তাহলে তিনি স্থিতধীঃ ব্যক্তি বলায় যথেষ্ট যুক্তি যথেষ্ট যুক্তি আছে।

যদি বদলায়তি শ্রেষ্ঠতত্ত্বমেনেকরো ননু।

ন যৎ প্রবাক্ত করতে লোকজনহরকর্তে।

আমাদের গাফিলী

এ কথা কককককের বুকের সর্বদা যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য রয়েছে।
একচুল এদিক ওদিক হয়নি।

আমার শেষ কথা এই যে, ননকো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের যে মতভেদ রয়েছে
তার প্রকাশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমাদের চোখের সম্মুখে রাখা উচিত।
বদ্বিচ আমরা জানি যে, তাঁর মত দ্বিতীয়: হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা
রাগ ঘেঁষ থেকে মুক্ত নই। নির্মমও নই, নিরহংকারও নই। উপরন্তু আমাদের মনে
শাস্তি নেই। আছে শুধু অশান্তি। তবু উক্ত আদর্শ চোখের সম্মুখে রাখলে আমরা
ভয়ে নিখ্যা কথা বলিতে লবৎ সংকুচিত হব এক কথায় অসংযম ও অসৌজন্য দেখাতে
কিঞ্চিৎ সক্ষিত হব।

—প্রথম চৌধুরী (সবুজ পত্র)

—দিনে দীপ জালি' ওরে ও খেয়ালি! কি লিখিল হিজিবিজি?

নগরের পথে রোল ওঠে শোন 'গাফিলী!' 'গাফিলী!'

বাতারনে ভাষ কিসের কিরণ। নব জ্যোতিষ জাগে!

জন সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চক্রে অমুরাগে!

জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশানধারী,

পথ চার কার কাতারে কাতার উৎসব নরনারী!

কুবাণের বেশে কে-ও কৃশ তনু—কৃশাচ্ছ পৃণ্য হবি,—

জগতের ধানে সত্যগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি।

কৌতুক কৃষ্ণ করে কোলাহলি কার সে পতাকা খেচি,

কার সুস্বাদু হাসাইয়া ভরে কলী সোনার ভেরী!

ক্রেতার টাকা কার ভিখা-মুণিতে অপরল অবদান,

আঙুলিয়ার কারে ফেরে কোট কোট হিন্দু মুসলমান!

আম্মার বলে কে পশু-বশের মগজে ভাঁকার যি' যি'

কে রে ও কব' সর্বপূজা!—'গাফিলী', 'গাফিলী!'

এশিয়ার হৃৎ হৃৎসের স্তুতি ইসলাম নরান—

বহুদীপার তিল ভারে বার পুড়িয়া কীদাল প্রাণ,

বরাক বুকতে সারা এশিয়ার বাণীর স্পন্দ বহি,

সব হিন্দুর করে যে' খোদা কোলাকতে দিল সবি,

চিত্ত বদোর চিত্ত দেখারে গেল যে পূর্ব সাত্তা,

সত্যগ্রহ হানে বীজি বড়ের হৃৎ হাড়,

ঐক্যের রাশী কে বোনে দিল হুঁ হিন্দু মুসলমানে,

পাকিস্তান জাফির প্রাণ-ধালা সার' জাফির বার প্রাণে

আমাদের স্বাধীনতা

কারতলার ঝাপ হরণের হরিবারে অধিকার
 নৈরাজ্যের হ'ল সেনাপতি যে রবী হরিবার,
 বিখ্যাতর বেগুনা ধন বোনের ভলারার বীর হাতে
 সোণা হয়ে গেছে সত্যাই-রসায়ন-সম্পাতে ;
 যোযি আভ্যন্তর শাসনবস্ত্র আমলাতন্ত্র সহ
 অভয় বস্ত্র দিয়ে দেশদেশে ছিরিছে যে অহরহ ;
 মহাবাহী বীর শক্তি-আবার অমুদার কড় লহে,
 লুকানো ছাপানো কিছু নাই বার, হাটের মাঝে যে কহে—
 স্বরাজ প্রমোদী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিত হবে,
 জাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কারেম করিব তপে ।

বা কিছু স্বপ্নে সেই তো স্বরাজ সেই তো হরণের স্বনি,
 আপনার কণ্ঠ আগনি যে করে—পেরেছে স্বরাজ গনি ;
 স্ব পাকে স্বরাজ, স্বরাজ স্ব করে নিজের বসন বোণা ;
 স্বরাজ—বদেশী শিল্প-পোষণে স্বাধিকারে আনাগোণা,
 স্বরাজ—আপন ভাষা আলাপনে, স্বরাজ—স্ব রীতে চলা,
 স্বরাজ—বা কিছু অন্তত তাহারে নিজের দুপারে দলা ;
 স্বরাজ—স্বয়ং ভুল করে তারে শোধরানো নিজ হাতে,
 স্বরাজ—প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিখ্যাতর ছনিরাতে ।
 সেই অধিকারে ভার যারা হাত প্রেইজ অজুহাতে,
 স্বরাজ—সে নৈরাজ্য ভেদন আমলাতন্ত্র সাধে ।
 হাতে হাতিয়ারে শিল্প স্বরাজ, স্ব প্রকাশের পথে
 স্বরাজ—সে নিজ ফিটার নিজেরি স্বদেশী পকারতে
 চরিত্র নুলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা,
 কর গত তার গার ছনিয়ার সব সৌলভমালা,
 হাতের নাপালে আছে এর চাবী, আয়াস যে করে লভে,
 অকস ভেবে আপনারে ভুল করো না, কহে যে লবে ;
 স্বাধিকারের যে অরি, নৃত যে প্রভাষ,
 পরাজয় আলো জানেনি যে, সেই গাধীর গাই জয় ।

—সত্যেন্দ্রনাথ বসু

—স্বাধিকারের স্বাধীন হবার যে বৈদম্বিক প্রকৃতি তাহাই স্বাধিকারী অন্তঃসাহার
 ব্যক্তির মূল কথা । আনে যেকোন কোন গারমা বা স্বাধিকার নিয়ে তিনি কো

আমাদের গাঙ্গুলী

সবজার বিচার করছেন না। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর প্রভাবের বোধ ছিল। সেই জন্য তাদের আশা-আকাংক্ষার কথা তারা নিজেরাই স্পষ্ট করে ধারণা করার আগে মহাত্মা গান্ধীর কাছে তা বহু হয়ে উঠেছে। লেনিনের মতই তিনি জনগণের ধর্মীয় গতি অনুভব করতে পারতেন এবং তাদের সংস্পর্শে থেকেই শক্তি ও প্রেরণা আহরণ করতেন। জনগণের জীবন ধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন বলেই সামাজিক রাজ-নৈতিক অসুষ্ঠান থেকে তিনি জনগণের মাঝে বিপ্লবের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারেন। এইজন্যই তিনি পাক্ষাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত এবং নতুন সামাজিক আদর্শ ও পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।...অতিরিক্ত সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বাসের কর্মশক্তি তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আজ এই বয়সেও সম-সাময়িক জগতের বুকে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল বৈপ্লবিক শক্তি। —হুমায়ুন কবীর

—ভারতের ইতিহাসে এতো গভীরভাবে জনসাধারণ কখনও নিজেকে উপলব্ধি করেনি, অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে যেভাবে তারা উপলব্ধি করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী যেভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, জগতের যানব জাতির ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে বলে আমি জানি না। —মৌলানা মোহাম্মদ আলি

(কোকোনদ কংগ্রেসের সভাপতি, ১৯২৬)

—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জনগণের মাঝে প্রেরণা জাগিয়েছে, তারা বিবাল করতে শিখেছে যে, পৃথিবীতে আজ আর এমন কোন শক্তি নেই বা তাদের স্বাধীনতার পথ-রোধ করতে পারে। —এস. এ. ব্রেসলি

—গান্ধীজী আজ ভারতের জনগণের মন যেভাবে অধিকার করেছেন, তার অন্ততম কারণ ভারতের জনগণকে তিনি উপলব্ধি করিয়েছেন যে, প্রত্যেকেরই একটা মহৎ সম্ভাবনা আছে। জাতি গঠনের কাজে প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। পদবিনীত পুরুষের সঙ্গে নারীও আজ উপেক্ষিতা অবহেলিতা। তাদের মাঝে গান্ধীজী এলেন হৃদয়করের মত। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব, দ্রুত কর্মক্ষমতা, বিপ্লবাত্মক সাহস ও বিশ্বাসের কার্যকলাপ দেখলে তাঁকে অসামান্য মৈত্রীসম্পন্ন মহাদানব বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষ। ইহাই তাঁর মহাদানবতার গোপন কথা। তিনি আমাদেরই মত একজন—তিনি শুধু মানুষী। তিনি ভগবান নন, আমাদেরই মত দুর্বলতা ও ভাবপ্রবণতা তাঁরও আছে। সেইজন্যই তিনি আমাদের

আমাদের গান্ধিজী

এক আশঙ্কাজনক। সেইসঙ্গেই তাঁর কঠোর ভারতের বিরূপ অবস্থাকে চকল করে তুলেছে, যুগ ভাঙিয়ে দিয়েছে। —কমলা দেবী

—আমি সরলভাবে স্বীকার করছি, যদিও একথা বলতে আমার আজ শতাই দুঃখ হচ্ছে—ভাষা ও সত্যের কারণে বৈদেশিক সহিষ্ণুতার যে মূল্য আমি গান্ধিজীর মধ্যে দেখেছি, তাতে বীরা নিষেধেরকে খুঁটান বলেন এবং গান্ধিজীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, তাদের তুলনায় গান্ধিজীকে ক্রীষক জাতির একজন সত্যকারের প্রতিনিধি বলে তাঁকে আমার মনে হয়েছে।

—বিশপ হারাইট হেড (মাদ্রাজ)

—১৯৩৮ সালের কথা। আমি নিউইয়র্ক থেকে মোটারে মেক্সিকো বাচ্ছি—তিন হাজার মাইল পথ। চলার পথে ভার্জিনিয়ার এক জায়গায় পেট্রোল নেবার জন্য গাড়ী থামলো, একজন ভৃত্য আমার ভারতীয় পোষাক দেখে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি কোন্ দেশ থেকে আসছেন?

—ভারতবর্ষ।

—ভারতবর্ষ? আপনিদের গান্ধিজী কেমন আছেন?

—জ্বালো।

—তিনি এখনও উপবাস করেন?

—নিশ্চয়।

—তাঁর ছাগলটি কেমন আছে?

—অল্প সবল আছে।

সহর থেকে সে অকলটি বহু দূরে, কিন্তু সেখানেও গান্ধিজী সম্পর্কে লোকের এই আশ্রয়।

অতীত ও বর্তমানকালে বড় বড় নেতারা মানুষের মন ও মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন, গান্ধিজী দেশের নায়ক হিসাবে যে কমতা তাঁরা পেরেছিলেন তা জোরে। গান্ধিজীই একমাত্র মানুষ, যিনি কোন রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর না করে সৌ আধার কর্তন করেছেন। গান্ধিজীর অহিংসার সংখ্যা বড়, তার অর্থক অহিংস আছে, এমন নেতাও পৃথিবীর ইতিহাসে একজনও আছে কিনা সন্দেহ। এখন তাঁর কথা পৌরাণিক কাহিনীর মত বিশ্বাসের হয়ে উঠেছে। —ইউজেন মোহেরারি

—গান্ধিজী মূলত বানরবর্মী রাজনীতিক, কিন্তু যে স্বদেশের রাজনীতিকের মতো আমাদের প্রতিদিন দেখা হয়, গান্ধিজী তাঁদের থেকে মিলে থাকেন। তিনি সত্য

আমাদের গান্ধীজী

আদর্শকে কার্যে রূপান্তরিত করেছেন, চিন্তা, কার্যশীল ও কর্মধারার বহুতর করে তুলেছেন— তিনি চান ভারতের চিন্তাধারার দিক পরিবর্তন করতে—শাস্তাভ্যাস থেকে গ্রাম্যে, বাহ্য জগৎ থেকে অভ্যন্তর জগতে, শহর থেকে গ্রামে, কারখানা থেকে কুঠীতে, যন্ত্র থেকে কুঠীর-শিল্পে, অর্থবাদ থেকে সেবা-ধর্মে, আভরণ থেকে সহজ-সারল্যে, মোটার গাড়ী থেকে চরকার চাকায় ।

—ডাঃ পট্টভি সীতারামিন্দ্রা

(কংগ্রেসের ইতিহাস)

—কেউ কেউ বলে তিনি নিহিলিষ্ট আবার কেউ বলে তিনি টলষ্টয়পন্থী । কিন্তু আসলে তিনি এর কোন পন্থীই নন । আসলে একজন খাঁটি সরল দেশপ্রেমিক যিনি ঈশ্বর, ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থে পূর্ণ বিশ্বাসী ।

—লালা লজপত রায়

—গান্ধীজীর সংঘম আছে । তাঁর বিবৃতি সর্বদুগের জন্য ।...গান্ধীজীকে অল্প কথা বলতেই আমরা শুনেছি । জান্নেকে অনেক দীর্ঘ চাতুর্ঘণ্য বক্তৃতা দেন, কিন্তু আমাদের মন পড়ে থাকে কীর্ণদেহ, নম্র, সদা-হাস্তময় মানুষটির উপর । এক মুহূর্ত তিনি চোখের আড়ালে গেলে আমরা অমুগ্ধব করি কংগ্রেস-সম্মেলনের প্রাণশক্তি হারিয়ে গেছে ।...

—বোম্বে ক্রমিক

—আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি বিদ্যার গান্ধী তাঁর স্বদেশবাসীদের উপর তাঁর আদর্শবাহ প্রভাবিত করতে পারেন তাহলে পৃথিবীতে কোন আতি আর ভারতীয়দের গায়ে হাত দিতে সাহস করবে না ।...গান্ধীজীর নীতি অদ্ব্যংকুই, এ নীতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে চোখ বুঁজে কিছুকল শুধু ভাবতে হবে ।

গান্ধীজী বলেন, অস্ত্রের চেয়ে চরিত্র-শক্তির উপরেই জাতীয়তাবাহ গড়ে তুলতে হবে । বা কিছু খারাপ বলে বুঝবে, তা পরিত্যাগ করবে । অধমকে সম্মান করবে, মৈত্রিক প্রদান করবে, বীর হবে, সৎযমী হবে, সম্মান দাবী করবে না, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের সম্মান অবিকার করবে । পশ্চিমের বহুতান্ত্রিকতা এবং বাণিজ্য-নীতির কাছে মাথা নোদানবে না, স্বাধীনতার জন্য নীতিকে ছুঁবিবে স্বেচ্ছা চলবে না ।

আমরা গান্ধীজীকে ঠিকমত বুঝতে পারি না...আমরা আশা করি, গান্ধীজী ব্রাহ্মসমাজের ক্রম-অগ্রসর নীতি সমর্থন করবেন, যাতে ক্যানাকার মত আত্মসম্মান বিসর্জন না দিয়ে ভারতবর্ষ কৃষ্টি সাহসিকতার ভিতরেই থাকবে ।

—বি ক্যাননিক হোয়াস জন্ম ইতিহাস

আমাদের গান্ধিজী

—ইয়্যুস কলেজ, আকিস আবালত, ঐশ ঠায় হুটশাত, সর্বত্রই আম গান্ধিজীকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে—কোথাও প্রশংসা, কোথাও সমর্থন, কোথাও সমালোচনা, কোথাও ভয়, কোথাও বা আশার কথা। গান্ধিজী যদি সকল হন, তাহলে এদেশে কি হবে, সেই সম্পর্কে যা শোনা যায়, তারই কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।

গান্ধিজী যদি সকল হন তাহলে—

কোটি কোটি নিরন্ন লোকের মুখে ছুটি অন্ন জুটবে,
শিক্ষিতা একটু দুখ খেতে পাবে
মদের দোকান বন্ধ হবে
ঊত্তিরা জীবনরক্ষার মত রোজগার করতে পারবে
কুটীর-শিল্পগুলি আবার বেঁচে উঠবে,
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কমবে,
সরল জীবনযাত্রা সহজ হবে……ইত্যাদি।

—দি কর্ণাটক (পত্রিকা)

—সবাই তাঁর চারি পাশে সমবেত হয়েছে ভায় ও বিশ্বাসের প্রেরণায়। তাঁর নেতৃত্বে এদের অবিচল আস্থা। শীর্ণদেহ পাণ্ডুর, বেঁটে-বাটো বাহুঘটি বিরাট জন-সমুদ্রের আগে আগে এগিয়ে চলেছে, অহুগামীরা নানাসম্প্রদায়ের নানা বৃত্তির—ওজরাভী ব্যবসায়ী, মাস্তাজী কেরিওয়াল, বাডালী কাকতল, বিহারী ও আসামী কিষাণ, সকল ধর্মের নরনারী, ধনী ও দরিদ্র, সবাই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর অহুগমন করেছে—স্বাক্ষর্য ভুলে গেছে, গৃহের বিলাস ত্যাগ করেছে, অর্থের ঘোহ ছেড়েছে কারাগারের শংকা আর তাদের নেই, সব ছাখের সমুখীন হবার জন্য তারা আননে দৃঢ়চিত্তে প্রস্তুত হয়েছে, …অপূর্ব নেতা, বিশ্বকর তাঁর অহুগামীর দল… দক্ষিণ আকরিকায় গান্ধিজী ও তাঁর অহুগামীদের সেই সংগ্রাম ইতিহাস তৈরী করেছে। …

গান্ধিজীর চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বব হীনতা। তিনি অনেক দুঃখ সহ্যেছেন কিন্তু কারাগারের কষ্টও তাঁর মনকে ভিত্ত করে ভুলতে পারে নি। অপর গুণটি হচ্ছে তাঁর সহজাত পূরনত সহিকূতা। অহিংসা নীতির উপর তাঁর বিশ্বকর বিশ্বাস তা তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীরা সহজে বুঝতে পারেন না, কিন্তু সেকর তিনি কখনও বিতর্ক তোলেন না। তার কর্ময জীবনের অনেক দুঃখের সাথ অমেক সহকর্মী, শেষে তিনি বত পোষণ করার জন্য তাঁকে ত্যাগ করেছেন, কেউ কোঁ আবার বিশ্বাসী দলও পোষ দিয়েছেন কিন্তু সেকর তাঁদের সঙ্গে গান্ধিজীর দৃঢ়ত

আমাদের গান্ধী

একটুকু কবে নি। আমার নিজের কথা বলতে পারি যে অনেক সময় তাঁর নীতি ও কর্মসমূহের উপর আমি আস্থা রাখতে পারিনি... সে কথা তাঁকে জানিয়েছি, কিন্তু তাতে তাঁর প্রীতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। বখনই তিনি যাত্রাজে এসেছেন, তত কাকই তাঁর থাক না কেন আমার গৃহে একবার কণেক দর্শন দিতে তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি।

গান্ধীজীর নীতি কংগ্রেসের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে কংগ্রেসকে আজ গান্ধী-কংগ্রেস বলা চলে। কংগ্রেস ও গান্ধীজী আজ এক হয়ে গেছে।

—জি. এ. নটেশ্বর

—১৯৪২ সালে লর্ড লিনলিথগো লুই ফিশারকে বলেন—গান্ধীজী ভারতের বৃহত্তম বস্তু। (Gandhiji is the biggest thing in India)—

—লর্ড লিনলিথগো

—গান্ধী-পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তির উপরেই বেশী আস্থা রাখা হয়েছে। গান্ধী-সমাজের শক্তির উৎস হোল 'নতুন-মানুষ'। আমরা যে সময় পরিবর্তনের কথা ভাবি, এ হচ্ছে তাই। এ ছাড়া কোন বিপ্লবই সম্পূর্ণ হয় না, কোন বিপ্লব ঘটে না, কোন উন্নতিও হয় না। তোমাকে মানুষের অন্তরের কাছে আবেদন করতে হবে, ভালবাসার ভিতর দিয়ে, যুগা দিয়ে নয়।...গান্ধীজীর সমাজে নতুন সমাজের সমস্ত প্রাথমিক গায়িত্র ব্যক্তির উপরেই আছে, পাছে প্রতিষ্ঠানগুলি আদর্শের ধারক হয়ে বসে, সেইজন্য সমাজ-ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব সরল রাখার চেষ্টা হয়েছে।

—এম. এম. দীতওয়াল

—একজন ক্যান্সি-বিরোধী আমাকে বলেন—গান্ধীজীর নেতৃত্ব কংগ্রেসের উপর একটা বোঝা।

—সেইজন্যই তো গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে বিদায় নিয়েছেন।

—নেতৃত্ব একটা চাকরী কি পেশা নয় যে বিদায় নেওয়া চলবে। এটা হোল আদর্শ বহন করার একটা দায়। গান্ধীজীর কংগ্রেস থেকে বিদায় নেওয়া অস্বাভাবিক, কংগ্রেসকে একটা বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে নিয়ে যাওয়া তাঁর কর্তব্য।...

একজন উদারনৈতিক বলেন—এনার্কিষ্ট বলে যদি কেউ থাকেন তাহলে তিনি গান্ধীজী। তিনি শাসনতন্ত্রের বিরোধিতায় বিশ্বাস করেন এবং শৃংখলা বক্ষায় আস্থা রাখেন না। যদি তিনি উদারপন্থী হন, তিনি লবল হবেন। যদি চরমপন্থী হন তিনি

শাখানের শাখিনী

শ্রের বলে বলে করেন, তাহলে রাজনৈতিক অচল অবস্থা চলতেই থাকবে।... তাঁর উচিত তাঁর চিন্তাশীল শীতলবাদের মত উদারনৈতিক মেন্তার উপদেশ মত আইনানুগ কাজ করা এক অসহযোগ, প্রতিরোধ ও আইন-অমান্তের নিষ্পত্তি কর্পনা ত্যাগ করা।...

হিন্দু-মহাসভার এক প্রধান বললেন—নাংগাহাংগামায় মুসলমানদের অত্যাচারের গাখিনী নিন্দা করেননি; সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়রা স্বীকার করে নিয়েছেন।... তিনি সদাই প্রচার করেন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ছাড়া স্বরাজ হবে না। তিনি পাকিস্তান মেনে নিতেও প্রস্তুত। এখন মহাসভার কর্তব্য হচ্ছে মুসলমানদের প্রতি স্তোষণ-নীতি পরিত্যাগ করা, জিন্নার কাছে অপমানিত হতে না যাওয়াই তাঁর উচিত। হিন্দু মহাসভার যদি তিনি যোগ দিতে নাও পারেন, হিন্দু মহাসভাকে দুর্বল করে দেওয়া তাঁর উচিত নয়। তাঁর উচিত হিন্দুদের এক ও সংঘবদ্ধ করা, যেন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে।...

মুসলীর লীগের এক বক্তা বললেন—গাখিনী দেশের একজন নেতা নন, হিন্দু নেতা মাত্র। কারণ রাজনীতিকেরে তিনি অস্পৃহতা, উপবাস প্রভৃতি হিন্দু-রীতিনীতিতেই বেশী গুরুত্ব দেন। তিনি মুসলমানদের কোন সহযোগ-স্ববিধা দিতে চাননা বলেই পাকিস্তানের কথা উঠেছে। ঐক্যের চাবিকাঠি তাঁর হাতে আছে। তাঁর উচিত দেশকে ভাঙ করে মিঃ জিন্নার সর্ভ স্বীকার করে নেওয়া।...

একজন পুঁজিপতি বললেন—গাখিনীই শ্রমিক আন্দোলনের স্তম্ভ শক্তি। চাবী-মজুরদের মাথার তিনি কতকগুলো উদ্ভট ধারণা ঢুকিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি বলেন হরিজ-নারায়ণ, তাতে ভগবানেরও অপমান করেন আবার গরীবের মনেও মাদকতা জাগিয়ে দেন।... তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে কম্বলগৌ মন্ত্রীরা বস্ত্র-শিল্পের উপর কর বাড়িয়েছে, সম্পত্তির উপর কর বসিয়েছে, স্বস্থখোর আর চিনির কারবারীদের লাভা দিতে চাইছে। তিনি খদ্দেরের অবর্তন করতে চাইছেন, যাতে মিলের মালিকেরা পরশা না পায়। যেখানে সম্পত্তি রক্ষা পাবে না, লাভ থাকবে না, মজুরেরা দুর্ভিক্ষ হতে, প্রকারা জমিদারকে মানবে না, সে স্বরাজ আশ্রয় চাই না। এখন গাখিনীর উচিত তাঁর দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে নেওয়া এবং এমন কোন কাজ না করা যাতে জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো ও বিকাশ দুর্বল হয়ে পড়ে।...

এক শ্রমিক নেতা বললেন—গাখিনীই হচ্ছেন পুঁজিবাদীদের শেষ দুর্ভ। গাখিনী বলেন, তিনি জনগণের প্রতিদ্বন্দ্বি, অসংগতিদের স্তম্ভ তাঁর বুক কেটে যাচ্ছে। এ হোম নেহরু জগৎপ্রাণ দুর্ভোগী কথা। আমরা চাই পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি

আমাদের গাছিকী

উদ্দেশ্য করতঃ স্বদেশসেবায় যে বিরাট আন্দোলন হচ্ছে, গাছিকী তাতে যোগ দিল। তা নাহলে জাতীয় আন্দোলনে গরীবদের কোন আকর্ষণ থাকবে না।...

দেশীয় রাজ্যের এক মেওয়ারন বললেন—বরকট, হরতাল, কালো নিশান দেবানো, শিকেটি করা, খাজনা বন্ধ করা, আইন অব্যাহত করা, জেলে বাওরা প্রভৃতি গাছিকী আসার আগে কে জানতো? কালী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন বক্তৃতায় তিনি সামন্ত রাজাদের স্বাক্ষরকেন্দ্র নিন্দা করেন। আপনারা রাজকোটের ব্যাপারে দেখলেন তো? দেশীয় রাজ্যে যত গোলমাল সবেদর জন্ত তিনিই দায়ী। যদি তিনি স্বাধীনতা চান, তাহলে এ ব্যাপারে মাথা ঘামানো তাঁর উচিত নয়।...

দেশীয় প্রজাবল্লভের এক প্রতিনিধি বললেন—গাছিকী সামন্ত রাজাদের অঙ্গপ্রস্থ দেখাবার পক্ষপাতী।... তাঁর ধারণা ওদের মনকে বদলে ফেলা যায়।...

একজন অর্থনীতিবিদ বললেন—গাছিকীর প্রাগৈতিহাসিক যুগের কড়কগুলি ধারণা আছে, যেমন চরকা ও ধানি। এ অর্থনীতিক অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। গাছিকীর উচিত আধুনিক অর্থনীতি সমর্থন করে বড় বড় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা।...

একজন রাজনৈতিক বললেন—গাছিকী রাজনীতি করার উপযুক্ত নয়। তিনি সন্ন্যাসী মাহুদ, মহাপুরুষ,—রাজনীতির কুটিলতা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাঁর নীতি মানার চেয়ে তাঁকে প্রচণ্ড আনন্দে সহজ। তিনি বুদ্ধ, চৈতন্য, কবীর ও বিবেকানন্দের মত ধর্ম-নেতা ও সংস্কারক। গাছিকীর উচিত রাজনীতি তাঁদের হাতে ছেড়ে দেওয়া—হারা কুটিশের চাল ও মুসলিম-লীগের ধাপ্পাবাজীর সমান ভাবে নেবে এসে লংগ্রাম চালাতে পারবে। তাঁর এখন রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া উচিত।...

সবাই চান গাছিকী সব দলেই একযোগে কাজ করুন একই সময়ে।

—গগনবিহারী মেহতা

বিশেষী:

—আমি স্বাভাবিকভাবে আপনাকে অভিনন্দিত করছি। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আমি বিশেষ আনন্দিত।... পৃথিবীর আরেক প্রান্তে থেকেও আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি হিন্দুস্তানে যে কাজ করছেন, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। আমাদের পৃথিবীতে যেখানে বত ভালো কাজ হচ্ছে, সে সবেদর চেয়ে বড় কাজ।... একদিন জুঁ জুঁসান সমাজকেই নয়, হারা জগৎকেই এই কাজের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।...

—ক্যুটল সিও ইন্টার

আমাদের গান্ধীজী

—আমাদের ইউরোপীয় বিপ্লবীদের মত গান্ধীজী আইন-কাহ্নে ও অভিজ্ঞতায় সজ্জিত করার জন্ত আসেননি,—তিনি এসেছেন নতুন মানুষ, নতুন সমাজকে গড়বার জন্ত।... ইনি হলেন সেই মানুষটি, যিনি ত্রিশ কোটি নরনারীকে বিপ্লবের পথের পথিক করে-ছেন, ব্রিটিশ-ভারতের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন এবং যিনি ধর্মের এমন একটা প্রেরণা এনেছেন, মানুষের রাজনীতিকক্ষেত্রে দু' হাজার বৎসরের মধ্যেও যার তুলনা আমরা দেখিনি।... একটা কথা ঐক্য সত্য—হয় গান্ধীজীর আদর্শ জয়লাভ করবে, না হয় তাঁর আত্মা ধূস্ট ও বৃদ্ধের মত নব নব অবতারের রূপ নেবে, শেষে এমন এক অবতারের মধ্যে তাঁর আদর্শের চরম প্রকাশ আমরা দেখতে পাব, যিনি যখন অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক বোম্বা। তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে সেই জীবনের আদর্শ, যা নতুন মানুষকে নিয়ে যাবে নতুন পথে।... —রোল। রোল।

—বাইরের কোন শক্তির সমর্থন তাঁর পিছনে নেই, তবু তিনি দেশের জনগণের নেতা। তিনি রাজনীতিক, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক সাফল্য কোন কলা-কৌশলের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আত্মভাজন ব্যক্তিত্ব-শক্তির উপর। তিনি একজন বিজয়ী যোদ্ধা, কিন্তু তিনি সর্বদা বলপ্রয়োগের নিন্দা করেন। তিনি জানী ও বিনয়ী, দুঃসংকল্প-পরায়ণ ও সামন্ত-বিধায়ক। তিনি সারা জীবন দেশের জনগণের কল্যাণ ও তাঁদের উন্নতি বিধানের জন্ত উৎসর্গ করেছেন। তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি সাধারণ মানুষের মহত্ব নিয়ে ইউরোপের পশু-শক্তির সম্মুখীন হয়েছেন এবং ক্রমশঃ মহত্তর হয়ে উঠছেন। ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, তাঁর মত একজন মানুষ রক্তমাংসের দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছিলেন।...

—আইনষ্টাইন

—আমি আমার নিজের কথা বলতে গেলে একথা নিঃসংকোচে বলতে পারি যে, মহাত্মা গান্ধীর এই নেতিকর (Negative) নীতিকে আমি স্বীকার করে নিতে পারি না। এই নেতিকর নীতির সাহায্যে নিত্যন্ত সংস্কারহীন কোন কাজ হতে পারে।

সাময়িক বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলে বলা হয় যে, ইহা নিরর্থক। ইহা নিরর্থক হতে নয়ই, বরং এত বলপ্রয় যে, এর বল পরিত্যক্ত করা যায় না। যে উদ্বেগ নিয়ে সাময়িক বলপ্রয়োগ করা হয়, সব সময় যে তাতে উল্টা বল হয়, তা নয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বড়টা বল আশ্রয় করা হয়, তাঁর চেয়ে অনেক বেশী বল পাওয়া যায়।

আবাবের সাক্ষী

...ভারতবর্ষকে হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা আধীন করা হয়েছে এবং হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা তাকে শাসনিত করে রাখা হয়েছে। ঠিক আরারল্যাণ্ডকে যেমন হিংসা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা আধীন করা হয়েছে, ভারতবর্ষকেও ঠিক তেমনি হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা আধীন হতে হবে। ইতিহাসের কাছে একথা অস্বীকার করা অল্প অলস বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এ যেন বাথকে বলা যে তুমি অহিংস হয়ে যাও আর ভাত খেয়ে অসহযোগী হয়ে ওঠ। এই সমস্তর একমাত্র মুক্তিপূর্ণ পরিণতি হোল এই যে, যে পর্বত একজনও ইংরাজ ভারতবর্ষে বেঁচে থাকবে সে পর্বত ভারতবাসী নিরাপদ নয় এবং যে পর্বত একজন ভারতবাসী ভারতবর্ষে আছে সে পর্বত ইংরাজ নিরাপদ নয়। হিংসার কল্পনাত হলেই মাহুদ যে কোনও উপায় নিরাপত্তার জন্য উদ্ভাবন করে ওঠে এবং যেহেতু নিরাপত্তা লাভ করা অসম্ভব, সেইজন্য পরিণতিতে অস্ত্রহীন রক্তপাত হিংসা ও বলপ্রয়োগের পথ তৈরী হয়ে মানবতাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে চলে।

সেইজন্যই হিংসাকে মাহুদ পাপ বলে বিবেচনা করে এবং তা থেকে বিরত থাকতে চায়। খুস্ট, বুদ্ধ, শেলী, টলস্টয় ও মহাত্মা গান্ধী এই বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানবতার মুক্তির জন্য অস্ত্র হরণ করেছেন। এবং যেহেতু তাঁরা পাপকে প্রতিশোধ দ্বারা বিরত করতে পারেননি সেইজন্য তার গতিপথও বুদ্ধ হয়নি। যে কারণে পাপের পথ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই কারণে রোধ করে মানবতাকে শান্তির পথ সৃষ্টি করতে হবে। পাপ শক্তিমান, তাকে রোধ করতে হলে তার চেয়েও শক্তিমান অস্ত্র ব্যবহার করে তার পথ রোধ করতে হবে।...

—জর্জ বার্নার্ড শ'

—আমি তাঁকে দিনের পর দিন দেখেছি। তাঁকে দেখেছি ভোরের আগে ঠাতায়, অন্ধকারে। তাঁকে দেখেছি মধ্যরাত্রে, যখন তিনি মুসলমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাড়ীতে ক্রিয়ে এসেছেন। তাঁকে দেখেছি মধ্যাহ্নে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বটীর পর বটী বসে আছেন। তাঁকে দেখেছি একজন ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রীর বসবার ঘরে আগুনের পাশে। তাঁকে দেখেছি সেন্ট-জেন্স-প্যালেসে রাজা মহারাজা এবং যন্ত্রিগণের মধ্যে বসে থাকতে। দেখেছি সব সময়েই তাঁর সেই একই মূর্তি—শান্ত, প্রফুল্ল, কৌতুকপ্রিয়, গুণগ্রাহী, স্বার্থহীন, ভগবান। এক মাহুদের সঙ্গে একসঙ্গে গাঁথা।

—মুরিলেল লিষ্টার

—সাক্ষী একজন বিরাট মাহুদ। তিনি পৃথিবীর একজন স্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি অগতির শেষ মহানানব। তিনি যখন অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রপ্রাণিত—সেই অস্ত্র

আমাদের গান্ধিজী

আমাদের বর্তমান সংকটপূর্ণ জগতে কার্যকরী হবে কিনা সে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যিটার গান্ধী একজন মহান দেশপ্রেমিক, একজন মহামানব, একজন মহান আধ্যাত্মিক নেতা।...

—জেনারেল ম্যাটস

—আমি মনে করি গান্ধিজী অসামান্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মহত্বের অধিকারী... তিনিই একমাত্র লোক, যিনি ভারতীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারেন।...

—অধ্যাপক উড

—সেই হোল পরম ধর্ম, যার লক্ষ্য প্রেম, কন্যা, উদারতা ও শান্তি—সেই ধর্ম হোল অস্ত্রের ধর্ম। এই পরম ধর্মের মর্মকে যারা উদ্ঘাটিত করেছেন এবং তার আদর্শকে যারা সত্য করে তুলেছেন নিজেদের জীবনে—তাদের মধ্যে তিনজনকে ভাবীকাল সর্বোচ্চ আসন প্রদান করবে। এই তিনজনের নাম—গোতম, বুদ্ধ ও গান্ধী।... মহাত্মা গান্ধীর মত স্বার্থলেশশূন্য মানব-হিতে উৎসর্গিতপ্রাণ মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তুলে। জগতের অসংখ্য মহাজনগণের দ্বারা পবিত্রতার প্রতীক এই মহাপুরুষও সব সময় নিজেকে নিত্যন্ত অকিঞ্চিৎ বলে মনে করেন এবং নিজের ক্ষমতার উল্লেখ করে তিনি বলেন: “ভারতের মুক্তিতেই তাঁর নিজের মুক্তি সাধনের একমাত্র আশা।” তাঁর হৃদয়তন্ত্রী অসীমের সুরে বাঁধা, তাই মানুষ তাঁর কি করতে পারে না পারে, তা তিনি গ্রাহ্য করেন না। তাঁর একমাত্র ভয়, ভারত পাছে ত্যাগ ও অহিংসার আদর্শকে পরিত্যাগ করে পশুত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি তাই হয়, তাহলে তিনি হিমালয়ের গভীর অরণ্যে নিজেকে নির্বাসিত করে জীবনের অবশিষ্ট কাল দেশের মঙ্গল কামনার প্রার্থনায় ও উপবাসে কাটিয়ে দেবেন। ঈদৃশ মহাপ্রাণ মহাপুরুষের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তিমানের সর্ববিধ প্রচেষ্টা বিফল।...

—ডাক্তার ওয়ালার ওয়ালস

—যদি বক্তৃকরের সাহায্যে কোন আন্দোলন সাফল্যলাভ করে এবং জরিজরীন নব-নারী নিয়ে রাই গড়ে তুলতে হয়, তাহলে সেই বিষয় গৌরবকে কি ভগবান বিজ্ঞ বলে গ্রহণ করবে? আমাদের তো মনে হয় ভগবান তা করবেন না। আমরা কামনা করি, আরারল্যাণ্ডে একজন গান্ধী জন্মগ্রহণ করুন এবং নন্দারী তাঁকে যদি বলে তাঁর উপদেশ নতুনভাবে পালন করুক।... —আরারল্যাণ্ডের কবি ইয়েটস

—ইতিহাসিক সত্যের নবীরা অন্ধ বেগে চলার সমীপে আসা দিনে আমি বলছি

আমাদের গান্ধী

যীত খুস্টের সংগে গান্ধী একাসনে বসবার যোগ্য ব্যক্তি। এই পবিত্র ও সাধু জীবন-
 বাণনকারী ভারতীয় মহাপুরুষ প্রেমধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন, নিকপত্রব প্রতিরোধের নীতির
 মধ্য দিয়ে তা আচরণ করবার পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি সমাজকে এক অস্তিত্ব
 আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর নতুন রূপ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চান। যদি আমি প্রকৃত
 যীত খুস্টের দ্বিতীয়বার জন্ম পরিগ্রহের বিষয় বিশ্বাস করতাম, তাহলে বলতাম, প্রকৃত
 যীতই যথার্থ গান্ধীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।...

—বাকিল বাকক রেভারেন্ড হোমস

—ভারতে যে সব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, মহাত্মা গান্ধী হলেন তাঁদের
 মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। —

—মরোভ জর্জ

—মিটার গান্ধীর চাইতে ছায় ও কল্পনার এতো বড় প্রতিমূর্তি, কথামূল ও দুঃখ-
 ভোগী আমাদের ক্রুশবিদ্ধ ত্রাণকর্তার এতো বড় খাঁটি প্রতিনিধি আমি আর কাউকে
 জানি না।...

—দি রাইট রেভারেন্ড হোরাইট হেভ

—যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পথকে অমোঘ অস্ত্ররূপে পরিণত করার যে গৌরব, সে
 গৌরব গান্ধীর প্রাপ্য। পাশ্চাত্যের লোক মনে করে সাধু হলেই মায়াব হয় বোকা,
 আর চালাক-চতুর হতে গেলে তাকে অসাধু হতেই হবে। গান্ধী সাধু ও বুদ্ধিমান
 দুই-ই।...

—শেরউড এডি

—যুরোপ থেকে আমদানী আধুনিক সার্বভৌম বেসব রাজনৈতিক নেতা রাষ্ট্রনীতিকে
 করেছেন জীবনের পেশা, তাঁদের সংগে ভারতবর্ষের নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন। জাতির
 মর্মকে বুঝবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। ভারতবর্ষ চায় এমন এক নেতাকে যিনি একা-
 ধারে হবেন তার রাষ্ট্রতন্ত্র এবং ধর্মগুরু। গান্ধীর মধ্যে এই দুয়ের মিলন ঘটেছে।...

—ফুলপ, মিলার

—কল্পনা করুন—বৃংসিখ, কীপদেহ, দুর্বল এলিবাসী, তাবার্টে রঙ, মাথার ছোট
 ছোট চুল, গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট চোখ, মুখে একটিও দাঁত নেই,
 বড় বড় কান, উচ্চ নাসিকা, শীর্ণ হাত পা ও কটিল্লাস পরিহিত একটি মায়াব ইয়রাক
 বিচারকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করার
 অঙ্গসজ্জা। আবার দেখুন—সেই বেশে সেই ক্রমাকটি বিদ্যায় বড়লাটের প্রাঙ্গণে দিলে

আমাদের গান্ধিজী

ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সবার সর্বে আলোচনা চালাচ্ছেন। আমায় কখনো কখনো—সেই মাহুটি আমায় আমায়ের সত্যগ্রহ আমায় আমায় আমায়ের এক-খানি করে একখানি ছোট মাহুয়ের উপর বসে আছেন, তাঁর অধিনায় পা দু'খানি বোলাসনের বস্ত্র স্থাপিত। তিনি চরকা কাটছেন। স্বাধীনতার জনগণের হৃৎকোষে তাঁর মুখ রেখাকিঞ্চ, স্বাধীনতাকামীদের প্রতিটি প্রেরণ উত্তর দেবার জন্য তিনি সদাই প্রস্তুত। এই নর তাঁতিটি বজ্রিণ কোটা হিন্দু-মুসলমানের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা। যখন তিনি জনসভার মাঝে এসে দাঁড়ান, চারিপাশের মাহুয তাঁকে ঘিরে ধরে, পায়ের ধূলা লয়। বৃহদেবের পর ভারতবর্ষে এতো প্রভা আর কেউ পাননি। আজকের জগতে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাহুয সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই, তিনি যে সবচেয়ে চিন্তাকর্ষক লোক সে সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। আজ থেকে বহু শতাব্দী পরে, যখন এ'র সমসাময়িক কোন মাহুয়ের কথাই কেউ মনে রাখবে না, তখন লোকে এঁকে স্মরণ করবে।...

—উইল্‌ ডুরান্ট

—মহান আত্মা—মহাত্মা গান্ধিজীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে একজন বলেছেন, তিনি এক নতুন ভাষার সৃষ্টি করে সমস্ত জগতকে সজ্জিত করেছেন। বিপুল ব্রিটিশ রাজশক্তির সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন শান্তি-সেনা দ্বারা। গোলা-গুলি, বন্দুক, কাষানের জোরে ইংরেজ যেমন নিজেকে নিরাপদ মনে করে, এই বিশাল ভারত-ভূমির সর্বত্র তাঁরা নিরস্ত্রভাবে তলহুত্ব বা ততোধিক নিরাপদ বলে অনুভব করবে। ইহাই মহাত্মাজীর নতুন ভাষার সৃষ্টির বহু। জিশ কোটার অধিক নয়সংসারে তিনি এই বহান বর্ণনাধনে প্রবৃত্ত করেছেন। ভুবণ্ডলের একটি মহাত্মা আমায় বলে পরাধীনতার ক্ষুধলম্বুত হবার জন্য দুঃসংকল্প হয়েছেন।...

—রাজ গুহাইসল

—গান্ধিজী ত্যাগে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। অতাববোধকে সজ্জিত করেছেন। উপবাস করে তিনি আনন্দ লাভ করেন। তিনি এখন হৃৎকোষে যে ছোট শিল্পের বস্ত্র তাঁকে কোলে করে নিয়ে বাঙলা যায়। তিনি শিল্পের বস্ত্রই পবিত্র। তাঁর নামে বিত্তর তুলনা করলে কোন অস্ত্রায় হয় না।...গান্ধিজী একজন দার্শনিক বিদ্বান...যখন তাঁকে আমায় প্রেরণার শব্দ জানানো হয়, তখন তিনি হেসে বলেন—গবর্কেটকে বলে আমি কেবল মোটা চুটে পালাবো কেমন করে?...

—কর্নেল ডুরান্ট উভ (বি কেন—নতুন)

—গান্ধিজীর বস্ত্র মাহুয বহুলা অস্ত্র এক একবার জগতে আবির্ভূত হন। যখন মানব-সমাজে তাঁর একান্ত প্রয়োজন অনুভব হয়। আমায়ের স্বাধীনতা যেমন বর্জন

—বিল্ড এসেছিলেন, তাঁর বাপকে অন্তরে গ্রহণ করার, তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার করার
যত বাহুব তখন প্রস্তুত ছিল না। তবিত্তকালের বাহুব গান্ধীজী সম্পর্কে একথা
যেন না বলেন।...

—বি. ভট্টাচার্য (নিউ ইয়র্ক)

—ভারতে এক অনন্তসাধারণ মানবের আবির্ভাব ঘটেছে।...আমেরিকায় লম্বা
আগত একজন ভারতীয়কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—‘গান্ধীজীর সঙ্গে তোমার পরিচয়
আছে?’ তিনি বললেন—‘গান্ধীজীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি না, কাকুর পক্ষেই
তা জানা সম্ভব নয়, তিনি যহানু, তিনি বিরাট।’ একজন সাধারণ হিন্দু চাষা থেকে স্বক
করে বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হিন্দু প্রাক্তক অবধি সকলেই গান্ধীজী সম্পর্কে এই
একই যত পোষণ করে।.....

গান্ধীজী আদর্শবাদী, তিনি বিশ্বাস করেন যে ভারতের লাখ লাখ জনসাধারণ
যদি অন্তর দিয়ে অহিংসাকে গ্রহণ করেন তাহলে ব্রিটিশের মন বললে বাবে এবং তারা
ভারতের বন্ধু হবে।...

রশিয়ার টলষ্টয়ের যে স্থান ছিল, এই মহাপুরুষ সেই স্থান দখল করেছেন।...

বুবারা ভারতের যে পথ দিয়ে চলেছেন সে পথ জনশূন্য, দোকান-পাট বন্ধ, বাজী
শুলি পরিত্যক্ত। সবাই গেছে গান্ধীজীর বক্তৃতা শুনে। আরেক দিকে বিরাট
জনতার মাঝে একটি টেবিল, টেবিলের উপর একখানি চেয়ার। গান্ধীজীকে সেই
চেয়ারের উপর বসিয়ে দেওয়া হোল, সেখান থেকে অগনিত জনতার মাঝে তিনি
অলহযোগের বাণী প্রচার করছেন।...

—প্রমুখার বুনারেনলী (ওয়াশিংটন)

ম্যাগাজিন—নিউইয়র্ক)

—কর্তবানো জীবিত যে কোন মানুষের চেয়ে গান্ধীজীর অলুগায়ীর সংখ্যা বেশী।
তুম্বু মুক জনগনই তাঁর নেতৃত্ব যেনে নিয়েছে তা নয়, বুদ্ধিজীবীদের কাছেও তিনি
মহাত্মাজী। উচ্চ সরকারী কর্মচারীরাও যেনে করেন নিজের যত স্বীকার করিয়ে
নেবার যত প্রভাবশালী ব্যক্তির তাঁর আছে। পান্ডিত্য আভির বৃকে জগৎগ্রহণ
করেছেন লেনিন—দৃঢ়চেতা, তীক্ষ্ণবী, অল্লাভকরী, বুদ্ধিবাদী ও নৃশল্যা বিদ্যাহক
ব্যক্তিত্ব। প্রাচ্যের বৃকে জগৎগ্রহণ করেছেন গান্ধীজী—তেননি দৃঢ়চেতা, তীক্ষ্ণবী,
অল্লাভকরী। কিন্তু লেনিন ছিলেন হিংসার বিশ্বাসী আর গান্ধীজী অহিংস প্রতিরোধে
আস্থাবান। একজন বিশ্বাস করেন তরবারিতে, আরেকজন আত্মিক শক্তিতে।
আমাদের মূলে শরম্পর বিরোধী যে দুটি নীতিবাদ প্রাধান্য পাবার চেষ্টা করছে, এরা
হইকনে সেই দুইদিকের প্রতীক।...

—বেঙ্গলি-স্কুল (পার্লমেন্টের সভ্য)

আমাদের গান্ধী

ভারতীয়গণের মধ্যে মিটার গান্ধীর বহু ও প্রতিষ্ঠা সমধিক। তাঁর উদ্বেগ অতি বহু, চরিত্র সুবিল। দেশসেবার তাঁর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ফুলনা নেই। ভারত গবর্নেন্ট তাঁকে মিরে বেঙ্গল বিব্রত হয়েছেন, অপর কাউকে নিয়ে সেক্ষণ হননি। মিটার গান্ধীর বহুবর্ষের মধ্যে আমিও অন্ততম। তাঁর অপরায়ণ বহুসংখ্যের জার আমিও তাঁকে অহরোহ করছি যে, তাঁর হাতে যে বিপুল শক্তি রয়েছে, তা যেন তিনি দায়িত্ব বুঝে প্রয়োগ করেন। তিনি সময়ে বুঝতে পারবেন যে, ভারতে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাদের কার্যকলাপের উপর তাঁর কোন হাত নেই; তারা তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতির সুবিধা গ্রহণ করে স্ব স্ব অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়। —মর্ডেণ্ড (ভারত-সচিব হিসাবে ১৯১৯ সালের ২২শে মে পার্লামেন্টের কমন্স সভায় বক্তৃতা)

—আজকের অগতে গান্ধীজীর সমকক্ষ কোন মানুষ নেই।

মিটার গান্ধী আমাদের মনে এমন এক হৃদয়ের দৃষ্ট তুলে ধরেন যা স্বাধীন করুণার উপর গড়ে উঠবে। গোতম যার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন চমিশ শো বছর আগে...তিনি একজন খাঁটি আদর্শবাদী মানুষ, ভারতের জনসাধারণ তাঁকে অবতার হিসাবে শ্রদ্ধা করে।...তিনি যে ভাবে বাস্তবকে দৃশ্য করেন ও শক্তিপ্রয়োগের বিরোধী তাতে তাঁকে আমরা ভারতীয় টলটল বলে ধরে নিতে পারি।...তাঁর বাণী গোতম বুদ্ধ ও যিশুর কথা মনে পড়িয়ে দেয়, তিনি বলেন বর্তমান সভ্যতা ধারণ, তার উচ্ছেদ করা প্রয়োজন...গান্ধীজী ধর্মসংস্কারকের চেয়ে বড়, তিনি একজন মহাপুরুষ মানুষ, দেব-গুণ সম্পন্ন মহাত্মা।...কিন্তু তিনি এমন এক বিপ্লব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, রক্তপাত ও বিন্ধুখলা ছাড়া যার আর কোন পরিণতি নেই। এবং সেজন্য ভারতসরকার ও ভারতীয় জনগণকে প্রস্তুত থাকতে হবে।... —পার্সিভ্যাল ল্যাণ্ডন (ডেলি টেলিগ্রাফ)

—গান্ধীজী এক নৈতিক প্রতিভা, তাঁর নীতি ভাবীকালের জন্য, তিনি বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য যে নীতি ঘোষণা করেছেন তা একদিন মানুষের হিসাবকে অর করবে...তবেই সভ্যতা বাঁচবে... —সি. ই. গ্রন, লোন্ডন

—গান্ধীজী বেশির সত্যান। অতি সাধারণ শীর্ণ দেহ। বশাক অর আহাঙ্ক করেন, হাতে কাটা হাতের কাপড় পড়েন। চরিত্র নিরলুপ। হিন্দু পুণ্য ও শাস্ত্রের উপাসনা দিয়ে কথা বলেন। স্বাক্ষর করে।

...যে সভ্য তিনি উপলব্ধি করেন তাই প্রকাশ করেন, স্বাক্ষর বা বিপ্লবের দৃশ্য

আমাদের ব্যক্তিত্ব

শেকী হন না।... তিনি যুক্তিভর উপরে, তাঁর যিবেক বা বলে তিনি তাই যেন চলে। তাঁর কঠোর সত্যসী-জীকন তাঁকে মহাত্মা নামে পরিচিত করেছে। 'মহাত্মা' শব্দের মানে, বৈদিক যুগের প্রাচীন ঋষির জ্ঞান-মুকুট তিনি সর্বে ধারণ করেছেন। তাঁর স্থান জাতি ও বর্ণের উচ্চে।...পাশ্চাত্য জগৎ হয়তো মিটার গাড়ীকে পাগল বলে ধরবে, কিন্তু প্রাচ্যে এই ধরণের পাগলামি ভগবৎ-প্রেরণালব্ধ বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়।...

—তার ভ্যালেন্টাইন চিরোভ

—কৃতবিনিমার বা ভোগলকাবাদের চারিগাশে যে সব অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলি করে ধুলায় মিশে যাবার অনেক পরেও ভারতবর্ষের মায়েরা ভবিষ্যৎ শিল্পদের শোনাবেন ভারতের অতীতম শ্রেষ্ঠ ঋষি মহাত্মা গান্ধীর গৌরবময় কাহিনী। ইহার কারণ এই যে, ইতিহাসের বুকে গান্ধিজী যে সৌখ্য তুলেছেন, তার উপাধান শাস্ত্র সম্পদের এবং আধ্যাত্মিকতার, স্বয়ং ভগবানের রাজ্যে তার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্রকে দলিত করে এই সৌখ্য গড়ে ওঠেনি, দরিদ্রের প্রতি প্রেম ও সেবাই এর সবচেয়ে বড় উপকরণ। সামরিক শক্তিরও আঁকজমক এখানে নেই, আছে মানবাত্মার শাস্ত্র সম্বন্ধের পুত পরিবেশ। বর্ণবৈষম্য অথবা জাতি-বিচারের স্থান এখানে নেই—ধর্মের তাত্ত্বিক যুক্তিবলই এই প্রশান্ত সৌখ্যের নীরবতা ব্যাহত করতে পারে না; গান্ধিজীর সাম্রাজ্য মানুষের অন্তরের অন্তরে প্রসারিত।...

—বীমবন্ধু এণ্ডরসন

—আমাদের এই যুগের কোন্ বিনায়ককে গান্ধিজীর সহিত তুলনা করা যেতে পারে, তাহাই আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি। এরকম বহু রাষ্ট্রনায়ক আছেন, যারা বেশ কৃতিত্বের সংগে দেশ শাসন করেন, জোরালো বক্তৃতা করেন, নিবীড়নে সাক্ষ্য লাভ করেন, যুদ্ধ জেতেন, শাস্তি-সর্ভ রচনা করেন, কিন্তু তাঁরাই আবার কত তাড়া-তাড়ি বিশ্বস্তির অতলে তলিয়ে যান। প্রকৃতই যিনি বিরাট, ইতিহাসে তিনি হন চিরস্থায়ী। তাঁর মধ্যে যে জীবন্ত সৃজনশক্তি বিস্তারিত তার সাহায্যে তিনি পৃথিবীকে বদলেছেন। আমেরিকার উড্রো-উইলসন ও লিঙ্কন এই মহত্তর সংস্কার আশঙ্কায় মধ্যে আছেন; ইউরোপের লেনিন ও এশিয়ার গান্ধী।

গান্ধী বখনই কোন কাজ করেন বা কথা বলেন, তখনই মানুষ যেন এক বিদ্যুৎ-বোম্ব শব্দেতন হয়ে ওঠে। এমন কি, বখন তাঁর স্বপ্নে যতের অমিল হয় তখনও তাঁর অস্বপ্নের বিপুলতার দ্বারা প্রভাবিত হই হয়ে থাকে যার না। গান্ধী যারি বিশ্ব

আমাদের গান্ধীজী

অস্বাভাবিক ভারতীয়। ভবুও রাজনীতি সম্পর্কে তিনি যে ভাবারার পোষক, বিপক্ষীন—কারণ নীতির উপরেই উহার প্রতিষ্ঠা।... —হুই কিম্বার

—মহাত্মা গান্ধীর অস্ত্র বেশিনগান নয়, তাঁর অস্ত্র আত্মিক বল ও অহিংস প্রতিরোধ। স্বাধীনতা সংগ্রামে এখন পর্যন্ত জয়লাভ না করলেও তিনি বয়েই সাক্ষ্য অর্জন করেছেন। এই ক্ষুদ্রকায় মানুষটির দেহের ওজন হয়তো একশো পাউণ্ডও হবে; বটে, কিন্তু কটিবস্ত্র পরেন ও তকলি কাটেন, বিশ্বাসের অযোগ্য সময় উপস্থান করে অথচ ইনিই বৃটিশ সাম্রাজ্যে সমস্ত শক্তি বুক পেতে নিয়েছেন, এমন কি তাকে বোম্ব হর পরাস্তও করেছেন।... —জন গান্ধার

—জেনারেল বডি মহাত্মা গান্ধীর অবস্থার পক্ষপাত, তাহলে রাজনৈতিক সমস্তা তিনিও মহাত্মা-অবলম্বিত পন্থা গ্রহণ করতেন। কারণ এইভাবেই এক দ্বাতের সোণ এক একই রকমের চিতাশীল; তাঁরা দু'জনেই ছুটি আন্দোলনে বিক্রম দেশের চিত্তাশ্রয়, কি করলে ভাল হবে এবং কি করলে মন্দ হবে, উহা তাঁরা পূর্বেই ঠিক করতে পেরেছেন।... এই হুই বীর কবীরই মুখ্য উদ্দেশ্য এক। রাজ্যশাসনের তাণে অর্থ সৌখ্য করবার ইচ্ছার বারা মানুষের প্রতি পক্ষ অর্থ ব্যবহার করে, তাদের বিরুদ্ধেই তাঁরা যুদ্ধ করেছেন। অর্গতের দুঃখ দূর করে শান্তি স্থাপনই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

—হেমন্তি বাবীল

—সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে গান্ধীজীর অনেক কথা আমাদের কাছে অদৃষ্ট লাগলেও, জাতীয় নেতা হিসাবে সেগুলো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ভারতীয় জনগণ তাঁর কথার মাঝে শক্তির সন্ধান পায়। তাঁর মন সমস্ত ভারতবাসীর মন। তিনি মহাত্মানব, তাঁকে ভারতীয়েরা বিশ্বাস করে, অন্ধের মত নির্দেশ পালন করে, সমস্ত সৈনিক শক্তি ও নৈতিক সাহস দিয়ে... —এজ্জার জো (লুথ এম্পায়ার উইন ইণ্ডিয়া)

—একদিকে বিশাল কমতার নির্দশন ইংলণ্ডের সুব্রাহ্মণ্য, অস্বাভাবিক মাত্র এক টুকরা খন্ড পরিহিত নরপদ সন্ধ্যালী—গান্ধী। উভয়েই ভারতের স্বত্বিকার একই সময় দণ্ডায়মান, কিন্তু ভারতের জনসাধারণের হৃদয় অবিকার করেছেন গান্ধীজী... সমগ্র জাতির হৃদয়স্বত্বিক তিনি অনিয়ন্ত্রিত করেছেন।... —সে গান্ধীন পত্রিকা (জাল)

—মিটার গান্ধী অনন্তসাধারণভাবে দেশের সেবা করেছেন, জাতীয় আন্দোলনের তিনিই উদ্বোধক... —টাইমস

আমাদের গান্ধিজী

—পাচ কীট ছ'ইকি উচু কীণ দেহ, সাধারণ শোষক, এক অতি-সাধারণ চেহারা...কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি ও পরবেশের দৃষ্টান্তকী তাঁকে সাধারণ মানুষের মাঝে অসাধারণ করে তুলেছে...তিনি বক্তা নন কিন্তু সারা ভারত তাঁর কথা শোনে...তিনি কোন দলের লোক নন তবু তিনি আজ এই ৫২ বছর বয়সে সমগ্র ভারতের চিত্ত দখল করে বসে আছেন...তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিচার করা কঠিন...এক বাঙালী স্টেশন মাষ্টার বললেন—‘তিনি ভগবান!’ এক মূর্থ গ্রামবাসী বললেন—‘ভগবান কোটি বৎসরে গান্ধিজীর মত এক একজন মহাপুরুষকে পাঠান!’ একজন ছাত্র বললো—‘গান্ধিজী মহামানব!’ এক সরকারী কর্মচারী বললেন—‘গান্ধিজী আমাদের কাছে বিভিন্ন শিল্প পনের কথা মনে করিয়ে দেন।’ এক বন্ধু বললেন—‘সামান্য গান্ধিজী একজন বিশিষ্টজনক বিপ্লবী!’...আমার বিশ্বাস যদি কোনদিন ভারতে স্বাধীন হুকুমারী গঠিত হয়, তাহলে ইতিহাসে তাকে গান্ধিজীরই কৃতকর্মের সাক্ষ্য বলে দিখিত হবে...

—মাসনো হেরাল্ড

—বৃষ্টি স্ববিশ্রামিত ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করবে বলে যে প্রত্যাশা করেছে, তার প্রতিবাদে ভারতীয়েরা বিপ্লবের ডগ দেখিয়েছে, পূর্ণ স্বাভাব্যের দাবী জানিয়েছে এক সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে। অভিনব সন্ন্যাসীর সেবতুল্য আচরণ ও দৃষ্ট বাচনভঙ্গী ভারতের মাঝে অসঙ্খ্যে বনিয়ে তুলেছে।...

• তাদের ছোট বীণটার বাইরে যে সব মানুষের নাম ইংরাজরা শুনে থাকে তাদের কোনদী মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর * চেয়ে অধিকতর পরিচিত নয়। গান্ধিজী ভারতে যে ঐতিহ্য প্রবর্তন করেছেন সেই গান্ধিবাদ আজ ভারতে ইংরাজ-শাসনের স্বাধিকারকে পকে ভীতিজনক হয়ে পড়েছে।

গান্ধিজীর বয়স এখন ৫১ বছর, অত্যন্ত ধর্মভীর, মিষ্টভাবী লোক, সাধুর মত তিনি চলেন, পায়ে জুতা পরেন না, সাবান কাপড় পরেন কিন্তু তাঁর প্রভাব সমাজের নিরন্তর থেকে উর্বস্বী।

বর্তমান সভ্যতাকে তিনি অভিশাপ বলে মনে করেন। আধুনিক কলকব্জা ও বহুশক্তি, রেলপথ ও টেলিগ্রাফের মধ্যে তিনি জালো কিছুই দেখতে পান না। প্রাচীন ধারার চাষ-আবাদ ও কুটির-শিল্পের উপর তিনি আস্থাধান।...

গান্ধিজী স্বপ্নবিলাসী ভারতের এক রহস্যময় মানুষ।...

—মিউইরক বেরোক

* গান্ধিজীর নাম আমেরিকায় তখন সঠিকভাবে জাভতা না।

শোচনীয়

চিন্তানায়ক :

—আমাদের চতুর্দিকে আজ যে পরিবেশ তাহাতে আমার নীরব থাকাই আমি এ বলিয়া মনে করি। কারণ এই ধরনের ঘটনায় যে কোন কথাই মূল্যহীন হইয়া পড়ে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে এইটুকু আমি বলিব যে, যে আলোক-বর্তি আমাদের স্বাধীনতার পথে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তাহা প্রজ্জ্বলিত থাকিবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভবিষ্যৎ এই জাতি একটি সুমহান ঐক্যবদ্ধ অঞ্চল জাতিতে পরিণত হইবে। ক্ষুব্ধবরমে দ্বারা যেভাবে স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, সেইভাবেই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হই—শোচনীয় যত্নের পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত পরলোকগত সেই নেতার ইহাই ছিল চিহ্ন একমাত্র বিষয়। বহু সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা আমরা যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছি, তাহা যেভাবেই হোক তাহার লক্ষ্যস্থলে আমাদের পৌছাইয়া দিবে। স্বা ও ঐক্যবদ্ধ অঞ্চল ভারত প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের মা তাহার সন্তানদের তাঁর চতুর্দিকে সমাবেশ করিবেন ও তাহাদের একটি সুমহান ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে শক্তি করিয়া তুলিবেন।

—শ্রীঅরবিন্দ (অনু ইতিহাস রেডি)

—অতি বেশী ভাল মানুষ হওয়া কত যে বিপজ্জনক, ইহাও তাহাই প্রমাণ হইয়াছে।

—জর্জ বার্নার্ড

—মার্কিনের শান্ত এক গ্রামপ্রান্তে অত্যন্ত দিনের যত্ন আজও আমাদের হু প্রভাত হোল। বাচ্চারা কিছু দূরের পথে ইত্থবে যাবে, তাই আমরাও উঠ বেল তাকাতাড়ি। তারপর প্রাতঃভোজনের ভেত্রে সববেত হল্য খাওয়ার টেনি আত্মমগ্নিক হিসাবে টুকরো টুকরো দরকারী কথাবার্তা চলতে লাগল আমা ক্ষেত্র। আনালায় নার্সির ওপাশে জনছে পুক তুমারের আত্মরণ; আকাশও র বিজ্ঞ। বাচ্চারা বাইরের দিকে ডাকিয়ে রইল বিজ্ঞ—আরও বেশী তুমার হবে কিনা।

এখন সবাই আমাদের পরিবারের কর্তা টুকছেন আমাদের কক্ষে। সস্তীর তিনি বলছেন—বেতারা এইমাত্র একটি মর্যাদিক সংবাদ ঘোষিত হয়েছে।

গুনবার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ্য আমরা জালালাব ঠার বিকে। বীরে বীরে তিনি বর্ষান্তিক বোধবাটি উচ্চারণ করলেন—“গান্ধী আর ইহসাকে সেই।”

ভারত থেকে কয়েক হাজার হাইল করে ছোট একটি মাঝিন পরিবারে এই শোকাবহ সংবাদটি যে কতখানি বেজেছে, ভারতীয়দের সেই কথাটি আমি জানাব।

ক্রমে সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুন্লাম আমরা। শান্তির পূজারী গান্ধী—লোকহিতে নিজেকে বিনি সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি; নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁকে। সজল চোখে আমাদের দশ বছরের ছেলেটি বললে—“পৃথিবীতে একটা লোকও যদি বন্ধু তৈরী করতে না আসত।”

আমাদের ভেতর কেউই তাঁকে কোনদিন চাক্ষুষ দেখিনি। ভারতে গেলেও কারাগারের বাইরে তাঁকে পাইনি কোনদিন। তবুও তিনি ছিলেন আমাদের সকলের একান্ত পরিচিত। বিশেষ করে ছোটদের কাছে তাঁর মুখখানি এতই জানা, যেন তিনি আমাদের পরিবারভুক্ত কোন বিশিষ্ট আত্মীয়। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী অসমসাহসী যে অল্পসংখ্যক পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীতে, আমাদের চোখে তিনি ছিলেন তাঁদেরই অল্পতম বলে; আর এই বিশ্বাস তো মিথ্যা নয়।

গান্ধীর এই জীবনের শিক্ষা কি এবং তাঁর এই মৃত্যুই বা কি শিক্ষা দিল, আমরা ভাবতে লাগলাম সেই কথা। গান্ধীর মত মহামানবের অল্প হয়েছিল ভারতের মাটিতেই। ভারতের এই সৌভাগ্যে আমরা গর্বিত, কিন্তু সেই সাথে দুঃখে ও কথ্যও বলতে হলো যে, ভারতের চরমতম দুর্ভাগ্য যে, একজন ভারতবাসীই তাঁকে নিহত করেছে। এই কথা ভাবতে ভাবতে বিবাদাচ্ছন্ন মনে আমরা দৈনন্দিন কাজে মনোনিবেশ করতে গেলাম।

ভারতীয়দের কাছে একথা শুন্তে হয়ত খুবই আশ্চর্যজনক লাগবে যে, আমরা (আমেরিকানবাসীরা) সেই মহামানবের সম্বন্ধে কত ধোঁক রাখি। ঘটনাস্থলেক আগে রাতারাি একটি ক্রমক আয়াকে প্রের করলে—“সারা পৃথিবী জামে গান্ধী ছিলেন একজন খাটি মানুষ। বলতে পারেন, তবু কেন তাঁকে বেরে বেলা হোল?”

আমি বীরে বীরে আমার মাথা নাড়লাম। ক্রমকটি বীর্ষবাস ছেড়ে বললে—“আমার কি মনে হয় জানেন? বিজ্ঞকে যেমন বিচার-বিম্রমে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল, এ ঘটনাও ঠিক তেমনি কিছু।” ক্রমকটি খাটি লতাই বলছে। বিজ্ঞর ক্রম হাড়া ইতিহাসে আর এমন কোন নজীর মেলে না, যার সঙ্গে গান্ধীর এই বর্ষান্তিক মৃত্যুকে তুলনা করা যায়। নিজ প্রশংসার হাতে জীবনরান ঠিক যেন ক্রমের পুনরাবৃত্তি। শুধু আমাদের ক্রম ক্রমের মৃত্যুর কয়েকজন নয়—সমস্ত আমেরিকার,

আমাদের গান্ধী

সারা বিশ্বের, সারা একবার তাঁর চাক্ষু্য দর্শনও লাভ করেনি, তারাও আজ এই ঘটনার শোকাচ্ছন্ন। অসম্ভবতার চরম সীমা উঠে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন।

যাত্রা করেতকিন আগেই আমরা গান্ধী'র সম্বন্ধে ক্রম-কোতুলী মার্কিন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম। একথা অস্বস্তব করতে কষ্ট হয়নি যে, মার্কিনের জীবনে গান্ধী'র ক্ষেত্রে বিরাট আসন রূপায়িত হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্যে প্রকৃত প্রকার ভাব আমাদের জনসাধারণের জীবনে অল্পপ্রবিষ্ট হয়েছে। এবং আমরা কেবল তাঁর সভ্যকে বুঝবার চেষ্টা করতে শুরু করেছি। সাময়িক সভ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে আমরা সবেমাত্র গান্ধী'র সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়াস পাচ্ছি। আমাদের পত্র-পত্রিকাগুলিও এই সভ্যকে সর্ব্বনা জানিয়েছে। ভারতবাসীরা আমাদের আগেই গান্ধী'র সত্যের দ্বারা লাভবান হয়েছে। আর আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছি যে, জাতিসমূহের ভেদ-বৈষম্য দূর করবার পক্ষে গান্ধী-দর্শন অপরিহার্য।

আমি যদি পারতাম, তাহলে ভারতের প্রতিটি নরনারীকে এই কথাটি বুঝিয়ে দিতাম যে, গান্ধী-দর্শনকে উপলব্ধ করে বিশ্বের ভাঙারে ভারত কতবড় দাঁনি দিয়েছে। আজকের ভারতের পরিচয় শুধু তার ভৌগোলিক সীমার সীমাবদ্ধ নয়—তার পরিচয় 'বৃহত্তর ভারতে'। বিশ্ব-মানবের প্রতীক আজ সে। চার্চিল বা তার সমগোত্রীয় অনেকের কাছে শুনেছি যে, বিশ্ববাসী সর্বসাধারণের পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, তাদের মতে স্বল্পসংখ্যক শক্তিশালী জাতিই অপরাপর জাতিকে শাসন করবার অধিকারী। তারা বলেছেন—কাউকে না কাউকে শাসক-স্বৈরী হতে হবেই। যারা শাসিত হতে চায় না, তারাই নেবে এই দারিদ্র্য। কিন্তু এই মতবাদে একটুও বিশ্বাস নেই আমাদের। আমরা মনে করি, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার।

মার্কিনের আশা-আকাংক্ষার প্রতিমূর্তি বৃহত্তর ভারত; আমরা সংবাদপত্রে ভারতের সংবাদ পাবার জন্য থাকি উন্মত্ত হয়ে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—চার্চিল বর্ণিত 'রক্ত-প্রাণ' কি সভ্যই রূপ পরিগ্রহ করবে? বাস্তব কি শান্তির পথে নিজের বৈষম্য দূর করতে জানে না? পরস্পর হানাহানির পৃথকী কি চিরতলী হয়ে থাকবে বাস্তবের অস্থিরতার? এই জটিল প্রশ্নের উত্তর রূপে আমরা, সারা বাস্তবকে বিদ্বান করে দর করবার শক্তিতে বিশ্বাসী—পেরেছিলাম গান্ধীকে। অতীত কীরকম নেই মহামানবকে আমরা নিখোঁই আদর্শ করিনি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানবজীবনে অবশেষে সত্যই তিনিই পেরেছিলেন।

গান্ধী'র মঙ্গলপ্রার্থন ভারতের জাতীয় জীবনে শুভ বা অশুভফলক আ-নিকশন করবে

ভারতবাসী। যদি তাঁর দর্শনে দৃঢ় বিশ্বাসীরা এ থেকে নতুন শক্তি লাভ করতে পারে এক ভেদভূত সংকল্প গ্রহণ করতে পারে, তবে শুধু তাদের পক্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের মানবতার বিশ্বাসীদের পক্ষেও তা হবে পরম শুভকর। কিন্তু তাঁর শোচনীয় মৃত্যু যদি তাদেরকে ভয়ানকমাত্র ও পরাভূত করে ফেলে তবে তাদের তো বটেই, বিশ্বের মানবতার স্বহৃদয় ইতিহাস হবে কলকিণ্ড।

মার্কিন চিন্তাবিদরা এই কথাটিই উজ্জল হয়ে উঠেছে আজ। তাই গান্ধীর মৃত্যু-সংবাদে মত দাখল পোকাবহ সংবাদকে আমরা শান্তভাবে গ্রহণ করেছি। মার্কিন-বাসীরা আশা রাখে যে, নেহেরু এখনও জীবিত। ভারতের পক্ষে চরম অসংলগ্ন কিছু ঘটবার আশংকা করবার সময় আসেনি এখনও।

ভারতের অন্তর্ভুক্ত বিখ্যাত সন্তানদের চেয়ে পাশ্চাত্য জগতে থাকে বর্তমানে অনেক বেশী জানে, তিনি হচ্ছেন জবাহরলাল নেহেরু। তাঁর বিচক্ষণতা, কর্মদক্ষতা এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাদের সুগভীর শ্রদ্ধা আছে। ভারত বিভাগের পরিণতি হিসাবে এখন কোন তিক্ততা যেন ভারতের জাতীয় জীবনে না আসে, যার অস্ত্রে বিক্ষিপ্ত জনমতকে পুরোপুরি সঙ্কট না করতে পারবার অজুহাতে নেহেরুকে তাঁর দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে অপসারিত হতে হয়। তা যদি হয়, তা হলে পাশ্চাত্যের বিচারে সত্যই ভারতের পক্ষে সে এক মহাহর্দিন। সুখী ভারতীয়েরা নিশ্চয় এই বকম যারাম্বক ভুল করবেন না। মার্কিন দৃষ্টিকোণ থেকে একথা আমি বলছি না। যারা ভারতের উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসী এবং যারা আশা রাখে যে, বিশ্বের জাতি-সংঘের গতিপথের পুরোভাগে ভারতই একদিন এসে দাঁড়াবে, তাদের পক্ষ থেকেই এই কথা আমি উচ্চারণ করছি। ভারতীয় জনগণ যদি অল্প কয়েকজন চরম এক উগ্রপন্থীর পরিচালনার পরস্পর বিভক্ত হয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে তাদেরই মাটির এই মহা-মানবের আদর্শকে অনুসরণ করতে পারে, তবেই তারা তাদের দেশের এই প্রৌঢ়তম সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে।

ভারতীয়দের কাছে এই কথা কয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ আমাদের আন্তরিক আশা এবং কামনা। —পার্স বাক

—গান্ধী মহাত্মা পরলোকগমন করেছেন, কিন্তু যে কোন্ কোন্ মানুষ এই পৃথিবীতে মানব-সত্যতা রক্ষার জন্য তাঁর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাদের কাছে তিনি মৃত নন। তাঁকে যারা হত্যা করেছে তারা ভারতবাসী নয়। এই বর্বর বাহুবলজি কোন দেশেরই নয়। তবে এরা আমাদের একটি জিনিষ দেখিয়েছে—তাঁকে স্পর্শ করে এখন দায় কাঁদারই নেই। আধিকার মত আর কখনও গান্ধীজীর আদর্শ এক

আমাদের গান্ধী

প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়নি। প্রতীচ্যের একজন অধিবাসী হিসাবে এই কথা বলছি—বলছি একজন লেখক হিসাবে, যে লেখক এইসব কিছু গভীরভাবে চিন্তা করেছে এবং আরেকবার কল্পনাতীত সংকটময় ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের মহান নেতা এক নতুন আশা সঞ্চার করেছেন, আর দিয়েছেন এক নতুন চ্যালেঞ্জ বা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ইহা সমবেত দায়িত্বও বটে।

—উমানন্দ্যান

—মহাত্মা গান্ধীর সাধনা ও সিদ্ধি দেখেই আমরা তাঁর ধর্ম ও জাতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে পারি। পৃথিবীর আর কোন দেশেই একটি বৃহৎ লোকের অনশন জনসাধারণকে অস্ত্রহীন করতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অন্ততম।

—ম'সিয়ে মরিয়াক (করালী লেখক)

—মহাত্মা গান্ধী একজন দেশপ্রেমিক এবং সর্বোপরি একজন চিন্তানায়ক ছিলেন যুগের চেয়ে প্রেমই যে শক্তিশালী তিনি একথাই জগৎকে শিখা দিয়েছেন।

—মসিয়ে ল' জিউন (কাল)

—পৃথিবীর জনসাধারণকে আজ ঠিক করতে হবে যে, তারা আনবিক বোমা পক্ষপাতী কিম্বা মহাত্মা গান্ধীর সমর্থক। মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, আত্ম শক্তিই প্রকৃত শক্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইহা তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। যুগের পরিবেশের মধ্যে তিনি প্রেমের প্রতীকরূপে, প্রতিহিংসা পরিবেশের মধ্যে ক্রম্বার প্রতীকরূপে বাস করেছেন। যাহায্যে মধ্যে যে ঐশী শক্তি আছে, তা জগৎ জয় করতে পারে; ইহাই হোল গান্ধীজীর গোপন বাণী। তিনি ইহাকেই সত্য নামে অভিহিত করতেন। নিজের জীবনে তিনি ইহা কার্যকরী করে তুলেছেন। যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের এই সত্য বীক করে নিতে হবে।

—রোভারেও জন্ হোন্স

—তিনি শান্তির অগ্রদূত ও যুগান্তকারী বন্ধু ছিলেন।

—লোপ (জ্যাটিকান সিটি, ইতালী)

সারসংক্ষেপ :

—তাঁর জীবন ও কার্যব্যাপী তাঁর জীবনের কীর্তিচহ্ন হয়ে থাকবে। তিনি জগৎ রক্ষা হিসেবে বটে, কিন্তু তাঁর আদর্শ ও কার্যবলী বিশ্ববাসীর মনে গভীর রেখণ

আমাদের গান্ধিজী

করেছে। যে শান্তি ও বিশ্ব-ব্রাহ্মণের জন্ম মহাত্মা জীবনপাত করলেন, অগণিত বিশ্ববাসী তা থেকে প্রেরণা লাভ করবে।

গান্ধিজীর হত্যা সংবাদে আমি অভিভূত হয়েছি।

—প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

—মহাত্মা গান্ধীর অপ্রত্যাশিত শোচনীয় মৃত্যুতে আমার মনে যে বেবনার বৃষ্টি হয়েছে, তা আমি ঘোপন রাখতে পারছি না। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র জাতির কতি হোল। তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছেন, তা সকলের মনে বহুমূল না হলে জগতের অপূরণীয় কতি হবে। আমার মনে হয় সকল প্রকার হিংসার নিষা করাই তাঁর বৃষ্টির প্রতি প্রভা জ্ঞাপন করার শ্রেষ্ঠ উপায়।

—প্রেসিডেন্ট গণজালেজ ভিভেলা (চিলি)

—অহিংস উপায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়া শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিংসার আক্রমণে জীবন বলি দিলেন—এই সংবাদে আমরা শোকাভিভূত হয়ে পড়েছি। শুধু ভারত নয়, সমগ্র মানবজাতি শ্রেষ্ঠ নেতাকে হারালো।

—প্রেসিডেন্ট চিরাং কাইশেক ও তাঁর পত্নী (চীন)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে সমগ্র ব্রহ্মদেশ শোকে মূহমান। ব্রহ্মের স্বাধীনতার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিণীয়। এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যুতে আমরা মর্মান্বিত হয়েছি। ভারতবাসী বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে পরিগণিত হবে।

—প্রেসিডেন্ট সাও শোয়ে থাইকি (ব্রহ্মদেশ)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতবাসী যে শোক পেয়েছে, তদন্ত আমি ভারতবাসী ও ভারত গবর্নেন্টকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীরাও ভারতবাসীর এই দুঃখে শোক প্রকাশ করছে। যে দয়া, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির জন্য গান্ধিজী চিরদিন কাজ করেছেন, ভগবানের আশীর্বাদে ভারতবাসী ও অগণবাসী, সেই আদর্শে উন্নত হোক, এই প্রার্থনা করছি।

—প্রেসিডেন্ট সিল ও'কেলি (আয়ারল্যান্ড)

—মহাত্মা গান্ধীর অকাল মৃত্যুতে চেকোস্লোভাকিয়ার সরকার-পক্ষীয় মহাজাতি আনন্দে। চেকোস্লোভাকিয়ার জনসাধারণ গান্ধিজীর মৃত্যুতে আপনাদের মিত্র শোক প্রকাশ করছে।

—অম্বারী প্রেসিডেন্ট (চেকোস্লোভাকিয়া)

আমাদের বাঙালী

—বাগিনভার প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে আপনার দেশে যে মহান ব্যক্তিকে হারালো, তার জন্য আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

—ডক্টর এডোয়ার্ড বেঙ্গেল (প্রেসিডেন্ট, চেকোস্লোভাকিয়া)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের কন্ঠি হোল। তাঁর রাজনৈতিক ও মানবিক মহত্বের জন্য কলম্বিয়ায় অধিবাসীরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

—ম্যারিনো স্পিনাবেবেজ (প্রেসিডেন্ট কলম্বিয়া)

—মহাত্মা গান্ধী ছিলেন শান্তি-দূতের এক অসাধারণ প্রতীক। তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত জগৎবাসী কন্ঠিগ্রস্ত হোল। আমি কেডারেল কাউন্সিল ও জনগণের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে গভীর শোক ও সহানুভূতি জানাচ্ছি।

—প্রেসিডেন্ট (সুইস কনফেডারেশন)

—ভারতের সর্বজনপূজ্য নেতার শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হওয়ায় আমি নিজের ও লেবানীজ গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে ও ভারতবাসীকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে বিশ্ববাসী শোক করবে, কারণ বর্তমান ইতিহাসে তিনি মহান ব্যক্তি।

—প্রেসিডেন্ট (লেবানন)

—ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতার মৃত্যুতে আমি শোকাভিভূত হয়ে পড়ছি। মহাত্মা গান্ধীর পরিবারবর্গকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—প্রেসিডেন্ট জে, কে, পাসিকিভি (ফিনল্যান্ড)

রাজস্বর্গ :

—গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদে রাণী ও আমি মর্মান্বিত হয়েছি। ভারতবাসী ও মানবতার এই অপূরণীয় কন্ঠিতে তাদেরকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করবেন।

—রাজা বর্ড অর্ড ও রাণী (ইংলও)

—প্রাচ্য একজর দেশপ্রেমিক ও মহত্বজ্ঞাতির মহান সেবককে হারালো। আদর্শ পুরুষ মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যুসংবাদে আমি দুঃখমান। দেশপ্রেম ও মানবিক আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর শান্তি-সংগ্রাম ত্যাগ ও বীরত্বের অবজিত্য আদর্শ হয়ে থাকবে।

—রাজা কার্লক (বিশ্ব)

স্বাধীনতা সঙ্গী

—ভারতীয়দের প্রেতম মৃগপাকের শোভনীয় বৃত্তান্তে আবরা ভারতীয়দের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। —রাখা হেইলে সেলাসী (আমিদিবির)

—মহাত্মা গান্ধীর বৃত্তান্তে ভারতের যে কতি হোল তৎকাল আবরা গভীর বেদনা বোধ করছি। —রাজকুমার (কেউয়া ও হওয়াই)

—শান্তিসাধক মহাত্মা গান্ধীর জীবনের এই বিরোগাত্মক পরিণতির সংবাদে আমি মর্মান্বিত হয়েছি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার পারলৌকিক শান্তি কামনা করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছি। ভারতবাসীর প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। —দালাই লামা (তিব্বত)

—ইহা একটি শোকাবহ ঘটনা। —সজাট হিরোহিতো (জাপান)

প্রধান সঙ্গী :

—ভারতের মহাত্মা গান্ধী বর্তমান জগতের অনন্তসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি বর্তমান ইতিহাসে সম্পূর্ণ বৃত্ত এক যুগের লোক বলে বিবেচিত হতেন।

সাধারণ সন্ন্যাসীরূপে বাস করে গেলেও মহাত্মা গান্ধী লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর প্রভূত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা কেবলমাত্র সম-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রায় পঁচিশ বছর বাবং মহাত্মা গান্ধীই ভারতের বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের পুরোধা ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনিই ভারতবাসীর আশা-আকাংক্ষার একমাত্র মূখপাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। বস্তুত: অল্প জাতি কতৃক শাসিত হওয়ার বিরুদ্ধে তিনি ভারতবাসীর হয়ে আজীবন তুহুল সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছেন। এমন কি, তিনি প্রকৃত পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের এক আভাবিক যুগা শোষণ করতেন। পাশ্চাত্য বস্তুত্বের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে আসছেন। সাধারণ সমাজ-জীবনে কিরে যাবার জন্য তিনি সদাসর্বদাই আগ্রহাবিত ছিলেন।

তথাপি তাঁর অহিংসাবাদ একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রশংসনীয় নীতি ছিল। নিজের প্রতিরোধকে তিনি তাঁহার জীবনের অন্ততম আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে নীতি ও আদর্শকে অন্তর ও প্রত্যক্ষ বলে মনে করতেন, তারই বিরুদ্ধে পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত নিজের প্রতিরোধ আত্মসাৎ চালিয়ে আসতেন। হিংসার দ্বারা

ভারতের স্বাধীনতা

উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট তিনি যৌর বিরোধী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁর নির্দেশ অমান্য করে তখনই লোককরকারী আন্দোলন পরিচালিত হোত, তখনই তিনি দুঃখিত হতেন।

যে ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসা অর্জন করতো।

তাঁর জীবনের শেষ ক' মাসে সাম্প্রদায়িক দাংগার ফলে যখন ভারতের নবলক স্বাধীনতা বিপন্ন হবার উপক্রম হয়, তখন তিনি আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত করে সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য আগাইয়া আসেন। শেষ পর্যন্ত হানাহানি বন্ধ হয়ে গিয়ে দেশের আবহাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়।

হত্যাকারীর নিষ্ঠুর আঘাতের ফলে কেবলমাত্র তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। বরং তাঁর জীবনের সংগে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বাণী চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের জনসাধারণ তাঁর এই বাণীকে স্মরণ করে তাঁর আরও কার্য সম্পন্নের জন্য আগিয়ে যাবে এবং সাম্প্রদায়িক ও পারস্পরিক ভ্রাতৃ-বন্ধন দৃঢ়রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার দেশের কলংক মোচন করবে।

—ক্রিস্টেন্ট এটর্নি (প্রধানমন্ত্রী, ইংলণ্ড)

—গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদে আমরা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। তাঁর প্রতি নতমস্তকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। আশা করি, তাঁর ভারতবর্ষের অবস্থা যন্মের দিকে যাবে না।

—রবার্ট শুস্ম্যান (প্রধানমন্ত্রী, কানাডা)

—এই মহান দেশপ্রেমিকের মৃত্যুতে আমরা শোকাচ্ছ। তিনি ছিলেন পৃথিবীর নৈতিক আদর্শের মূর্ত প্রতীক। ভারতের এই গভীর ক্ষতিতে পত্নীক সরকারের পক্ষ হতে আমি সহায়ত্ব জ্ঞানাজি।

—প্রধানমন্ত্রী, পত্নীক

—মহাত্মা গান্ধীজীর শোচনীয় মৃত্যুতে কিনল্যাণ্ডের জনগণের গভীর সহায়ত্ব গ্রহণ করুন।

—প্রধানমন্ত্রী, কিনল্যাণ্ড

—মহাত্মা গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদে ডেনমার্কবাসী ব্যাপনরনাই দুঃখিত। তিনি যুগ বরলে দেশের শান্তির জন্য জীবনদানে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এর পরেই তিনি আত্মত্যাগের হাতে নিহত হলেন। গত মহাযুদ্ধে মাহুবকে পত্নীর হয়ে কতদূর নিয়ে গেছে এই ঘটনাই তাঁর প্রকৃত প্রমাণ।

—ফ্রান্স হেডকফ্ট (প্রধানমন্ত্রী, ডেনমার্ক)

—অহিংসার পূজারীকে হিংসার হুকুমতে খলি হতে হোল, ইহাই লক্ষ্যেণে বোধিতিক।

—ম্যাককেনজি কিং (প্রধানমন্ত্রী, ক্যানাডা)

আমাদের সাক্ষী

—ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতার কল্পনাত্মক ও অল্পতম নেতা মহাত্মা গান্ধীর পরম শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের সংবাদে আমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি। তাঁর এই নৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে সমগ্র জাতি নিবাক্ষ আঘাত পেয়েছে।

—হাসিমি (প্রধানমন্ত্রী, ইরান)

—আমরা কেবল মহাত্মা গান্ধীর জন্ত দুঃখিত নহি, পরন্তু মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছে বলে আমরা সমগ্র জগতের জন্ত দুঃখ বোধ করছি। সমস্ত সমাধানের চেষ্টার উপায় হিসাবে হিংসার উচ্ছেদ করতে হবে।

—ডেংহু কাতারামা (প্রধানমন্ত্রী, জাপান)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদে অস্ট্রেলিয়ার জনগণ ও সরকার শোকাভিভূত। মহাত্মার কল্যাণের জন্ত ও বিশ্ব শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় যে সাধক পূরুষ প্রাণ পণ করেছিলেন, তাঁর পরলোকগমনে অস্ট্রেলিয়া আজ ভারত সরকার ও ভারতবাসীদের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি জানাচ্ছে। —জেলেক চিক্লি (প্রধানমন্ত্রী, অস্ট্রেলিয়া)

—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্ত শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করতে করতে ভারতের শান্তিকামী নেতার মৃত্যু হওয়ায় বিশ্ববাসীর সংগে মিশর গভীর শোক প্রকাশ করেছে। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবদের অল্পতম। কারণ, তিনি সর্বদাই তাঁর দেশবাসীর কল্যাণের জন্ত কাজ করেছেন।

—নোকরানী পাশা (প্রধানমন্ত্রী, মিশর)

—মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যু ঘটায় আমরা শোকাচ্ছন্ন হয়েছি। তিনি ছিলেন শান্তির মূর্ত, শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, ভারতের জনসাধারণের প্রিয় নেতা।

—প্রধানমন্ত্রী, আকগ্যানিস্তান

—প্রাচ্যের বা কিছু মহৎ তা গান্ধীজীর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। তিনি ছিলেন আমাদের পথ-নির্দেশক আলোকবর্তিকা। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়, তিনি অমর, জগতের অল্পতম প্রধান গুরু। পৃথিবী তাঁর বাণী বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করবে। —জিনেসানারক (প্রধানমন্ত্রী, নিহল)

আমাদের স্বাধীনতা

—ভারতের শোভনীয় সংবাদে ব্রহ্ম বর্ষবেষ্ট ও অধিবাসীরাও শোকে বর। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ব্রহ্মদেশবাসীরাও কতি হোল। —**খাকির হু** (প্রধানমন্ত্রী, ব্রহ্মদেশ)

পররাষ্ট্র সচিব :

—মহাত্মাজিতির এই শোকের দিনে সমগ্র ইতালি আত্ম শোকাচ্ছন্ন।

সর্ববাসী যে বিষাক্ত আবহাওয়া আমাদেরকে বিচলিত করছে মহাত্মা গান্ধী নিহত হওয়ায় তা আরও ঘনীভূত হোল।

ইউরোপেই জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকার এই জাতীয়তাবোধ মূর্ত হয়ে উঠছে এবং তথায় অপরাধ ও রক্তপাতের মাজা বেড়ে চলেছে।

—**কাউন্ট স্ফারজা** (পররাষ্ট্র সচিব, ইতালি)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণের যে অপূরণীয় কতি হোল, তৎক্ষণাৎ ব্রাজিল সরকার গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছে।

—**পররাষ্ট্র সচিব, ব্রাজিল**

—গান্ধীজী নিহত হওয়ার সংবাদে ব্রহ্মদেশ মর্মান্বিত হয়েছিল। প্রত্যেক বর্ষ মহাত্মাকে সম্মান করতো। ভারতের এই মহা-সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে সকলো শোকাবুল।

—**উ, সিন, টাট** (পররাষ্ট্র সচিব, ব্রহ্মদেশ)

—ভারত ও পৃথিবীর যে কতি হোল তা প্রকাশের ভাষা নেই।...মহাত্মা গান্ধী শেষ বয়সে যে কঠোর কর্তব্য গ্রহণ করেছিলেন, তৎপ্রতি আমরা সাগ্রহে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা যৎপরনাস্তি মর্মান্বিত হয়েছি। আপনাতো দেশের জনসাধারণের উপর এর যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা আমরা মর্মে না উপলব্ধি করছি। ভারতে মহাত্মা গান্ধী অমরহত শক্তি ফিরে আসুক এবং তাঁর পুত্রস্বত্ব নীতির দ্বারা ভারতবাসী তাঁর অমরহত কার্যবলী সমাধা করতে কৃতক হোল, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

—**জর্জেট বেভিন** (পররাষ্ট্র সচিব, গ্রেট ব্রিটেন)

আমাদের গান্ধিজী

—এই সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ডে আমরা ব্যথিত। ভারতের এই গভীর দুখে আমরা সহানুভূতি জানাচ্ছি। মহাত্মার স্মৃতি নরোত্তরবাসীদের মনে বহুকাল জাগরুক থাকবে। তিনি শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

—পররাষ্ট্র সচিব, নয়ডয়ে

—আজ বিশ্ববাসীর দারুণ দুর্দিন। এক উদ্ভাদের হস্তে মহাত্মানবের জীবন অবসান হোল! এই মহাত্মানবের জীবন, কার্য ও শিক্ষা মানব জাতির পক্ষে এমনই একটা জিনিষ, যা সূচিরকালের মধ্যেই অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।

—জর্জ বিনো (পররাষ্ট্র সচিব, ফ্রান্স)

—মহাত্মা গান্ধী মহানুজাতির বিবেক। তাঁর হত্যায় আমেরিকাবাসী শোকাভিকূত হয়েছে। আমরা এই দুঃসময়ে আপনাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

—জর্জ মার্শাল (পররাষ্ট্র সচিব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

লার্টসাহেব:

—গান্ধিজী নিহত হওয়ার সংবাদে মনে হোল যে, বিরাট আলোকবর্তিকা নির্বাপিত হয়ে গেল। অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সকলের হৃদয় উদ্বেগ-চঞ্চল। আমার মনে হয়, আমাদের এই বিশ্বে আজ নিদারুণ দুর্দিন। গান্ধিজী সকল মানবের। মহাত্মার স্মৃতি সকলের মনে চির জাগরুক থাকবে।

—ম'সিয়ে বার্নে। (লার্টসাহেব, ফরাসী-ভারত)

—সিংহলের অধিবাসীগণ ও গবর্নেন্ট মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদে শোকাভিকূত হয়ে পড়েছে। ভারতের অপূরণীয় কতি হওয়ায় আমরা আপনাদেরকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—লার্টসাহেব, সিংহল

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে অপূরণীয় কতি হওয়ায় বিশ্ববাসী শোকাভিকূত...আমি ভারতবাসীকে তাদের গভীর শোকের সময় সহানুভূতি জানাচ্ছি।

—লার্টসাহেব, সিয়েরেলিও

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হওয়ায় স্থানবাসীরা ব্যাহত হয়েছে। পরম শোকের দিনে স্থানবাসীর গবর্নেন্ট ও অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমরা ভারত গবর্নেন্টকে আমাদের সহানুভূতি জানাচ্ছি।

—বডলাট, স্থান

আমাদের গান্ধী

—কাণ্ডুকাচিৎ আক্রমণের কলে মিটার গান্ধী নিহত হয়েছেন যেনে আমি বর্ষা-
হত। এই শোচনীয় মুহূর্তে কোনরূপ বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা চলে না। তাঁর
সঙ্গে আমার রাজনৈতিক বিরোধ যাহাই থাকুক না কেন, তিনি হিন্দু সমাজের
অন্ততম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং নেতা হিসাবে তাঁদের সকলের আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র
ছিলেন। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবার এত অভ্যন্তরীণ পরে
এরূপ একটি ঐতিহাসিক সংকটময় মুহূর্তে তাঁর মৃত্যুতে যে কতি হয়েছে ভক্ত অমি
বিশাল হিন্দুসমাজ ও মিটার গান্ধীর পরিজনবর্গের প্রতি গভীর দুঃখ ও আন্তরিক
সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। ভারত ডোমিনিয়নের পক্ষে ইহা অপূরণীয় কতি। এই
সংকট-মুহূর্তে সে মহান ব্যক্তির স্থান পূরণ করা অত্যধিক কষ্টসাধ্য হবে।

—জিন্না (বড়লাট, পাকিস্তান)

পরিষদ প্রধান :

—গান্ধী প্রেম, করুণা, দয়া ও ভ্রাতৃত্বের অগ্রদূত। তিনি সর্বদা অকল্যাণের
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। যুদ্ধের সময়েও তিনি ভ্রাতৃত্ব ও আভিসমূহের মধ্যে শান্তির
বাণী প্রচার করেছেন। পৃথিবীর কর্তব্য নিজের বিবেকের অনুসন্ধান করা ও গান্ধীর
ত্রুত পূর্ণ করা। চেকোস্লোভাক জাতির পক্ষ থেকে ইহার শ্রাশ্রাঙ্গাল এসেম্ব্লি
ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্মানের বিয়োগে আন্তরিক শোক প্রকাশ করছে।

—ডক্টর জোসেফ ডেভিড (স্পীকার, চেকোস্লোভাকিয়া)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু পৃথিবীর দুর্ভাগ্য। ইহা সর্বত্র মানব সমাজকে ব্যথিত
করবে।

—প্রেসিডেন্ট, তুরস্ক-পরিষদ

সচিব :

—অতি ভয়ংকর সংবাদ। একজন মহাপুরুষের এই পরিণতি অতীব দুঃখের।

—হারবার্ট বরিসন (সহকারী প্রধানমন্ত্রী, গ্রেট ব্রিটেন)

—পৃথিবীতে যখন আর এরূপ পুরুষের আবির্ভাব হবে না।

—এ. ডি. আলেকজান্ডার (দেশরক্ষা সচিব, গ্রেট ব্রিটেন)

আমাদের গান্ধী

ভূতপূর্ব সচিব :

—ভারতের মহান পথ-প্রদর্শক আমার প্রিয় বন্ধু, গান্ধীজীর নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনে আমি বিশেষ দুঃখিত হয়েছি। আমার মনে হয়, তাঁর অন্তিম কামনা ছিল এই যে, তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ যেন কোনমতেই না লওয়া হয়। এবং তাঁর মৃত্যুতে এশিয়ার এই বিরাট উপ-মহাদেশে যেন শান্তি স্থাপিত হয়।

—**লর্ড পেথিক লরেন্স** (ভূতপূর্ব ভারত ও ব্রহ্ম সচিব)

—অত্যন্ত মর্যাদাসিক ব্যাপার ঘটেছে। আমি মনে করি মহাত্মাজীর জীবন অবসান শুধু ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই ক্ষতিকর। কেননা, বর্তমান যুগে শান্তির জন্য সংগ্রামে তিনি সকলের উর্ধ্বে স্থান পাবার যোগ্য।

—**লর্ড লিট্টেলওয়েল** (ভূতপূর্ব সহকারী ভারত সচিব)

—দল-নির্বিশেষে সমস্ত ইংরাজই এই দুর্ঘটনায় মর্মান্বিত হবে। ইহা সত্যই বেদনাদায়ক যে, যিনি আজীবন ভারতবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বাণী প্রচার করলেন, তিনিই শেষে এইভাবে প্রাণ দিলেন। ভারতবাসী তাঁকে জাতির স্রষ্টা হিসাবেই মনে রাখবে।

—**লিওপোল্ড আমেরী** (ভূতপূর্ব ভারতসচিব)

—এই ঘৃণিত অপরাধে আমি ক্ষুব্ধিত।

—**উইনষ্টন চার্চিল** (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, গ্রেট ব্রিটেন)

—গান্ধীজীর হত্যা ভারত, তথা পৃথিবীর একটি মর্মান্বিত ঘটনা। পৃথিবীতে তাঁর সত্য আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি কেবল অহিংসার কথা বলতেন না, কাজে ও আত্মত্যাগের দ্বারা তা প্রমাণ করে গেলেন।

—**তার ট্যাকোর্ড ক্রিপল**

—আমি অভিভূত হয়েছি। তাঁর মৃত্যুর পর ভারত শান্ত থাকবে বলে আমি আশা করি।

—**ব'সিয়ে জিন্ন'রুস** (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্স)

—গান্ধীজীর মৃত্যুতে দেশ তার অন্তরাত্মকে হারালো। তাঁর এই মৃত্যু আত্মা

আমাদের গান্ধী

হিন্দু ও মুসলমান এবং ভারতের সকল শ্রেণীর মধ্যে সত্যকার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।
—ভাস্কর খানসাহেব (ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, সীমান্ত প্রদেশ)

ভূতপূর্ব লাট :

—গান্ধীজীর মৃত্যুর পর ভবিষ্যৎ-ভারতের অদৃষ্টে কি নিহিত আছে তা বলা যায় না।
—লর্ড লিনলিথগো (ভূতপূর্ব বড়লাট, ভারতবর্ষ)

—মহাত্মা গান্ধীর হত্যার ভারতের পক্ষে দারুণ দুর্দৈব। তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যুর ফলে তাঁর সকল দেশবাসী তাঁর নীতি অনুধাবন করুক, ইহাই সকলে আশা করে। ইতিহাসে এরূপ খুব কম ব্যক্তিরই সন্ধান পাওয়া যায়, যিনি তাঁর সময়ে জনগণের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন।

—লর্ড হ্যালিকাক্স (ভূতপূর্ব বড়লাট, ভারতবর্ষ)

—ভারতের বাইরে বহু লোকই মহাত্মা গান্ধীকে বিপ্লবী বলে জানে। আমি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সংগে পরিচিত হয়েছিলাম।

—আর, জি, কেসী (ভূতপূর্ব লাট, বাংলাদেশ)

নেতৃবৃন্দ :

গান্ধীজীর হত্যার সংবাদে আমি গভীর শোকাহত হই। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর সর্বত্র একজ্ঞ শোক অনুভূত হবে। তিনি আমার সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন এবং আমাদের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য বিস্তারিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতাম। ত্রিশ বছর অথবা ততোধিক কাল আমাদের মধ্যে পরিচয় ছিল এবং তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমশঃই গভীরতা লাভ করেছে। একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ লোকান্তরিত হলেন এবং আমরা ভারতের এই অপূরণীয় ক্ষতিতে তাঁদের সংগে শোক প্রকাশ করছি।

—জেনারেল স্মাইল (দক্ষিণ আফ্রিকা)

—আমাদের এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের প্রায় একই রূপ ছিল। আজ ভারতীয়েরা শোকসন্তপ্ত। তাদের মধ্যে আমরা সমবেদনা জানাই। যে নেতা তাদের জন্ত স্বাধীনতা এনেছেন, তারা তাঁকেই হারিয়েছে। তাঁর আত্মত্যাগ

আমাদের গান্ধিজী

ভারতীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্য আহুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এই সৌহার্দ্য-বন্ধন স্থাপনই তাঁর জীবনের সকলের চাইতে প্রিয় ছিল।

—ইয়ন ডি' ভেনেয়া (আয়ারল্যান্ড)

—মহাত্মার মৃত্যু ভারতের পক্ষে একটা চরম আঘাত—বিশেষ করে তাঁর জাতি-গঠনের সময়। গান্ধিজীর আধ্যাত্মিক জীবন কাহিনীর সংগে সকলেই পরিচিত। তিনি ইহলোকে না থাকিলেও তাঁর প্রভাব দেশবাসীর উপর চিরকাল থাকবে। বিশ্ব-বাসীও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকবে। তাঁর মৃত্যুর এই ভীষণতা ও বেদনা মাহুষের হৃদয় হতে হিংসা প্রবৃত্তি দূর করে দেবে।

—মিসেল্ রুজভেলট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

—আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর আদর্শ বেঁচে থাকবে, সকল জাতির বিবেক আগ্রত হবে এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

—ডক্টর চু চিয়া লুয়া ও ডক্টর তাই চি তাও (চীন)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু শুধু ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে অতীব দুঃখের বিষয় ও অগ্ন্যুত্তম ঘটনা।

—আগা খাঁ (লন্ডন)

—ইতিহাস প্রমাণ করবে যে, মহাত্মা গান্ধী মানবজাতির অন্ততম শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। গান্ধিজীর মৃত্যু হয়নি—তিনি বেঁচে আছেন। দেশের পুত্রদের কখনও মৃত্যু হয় না।

—ডক্টর হিউলেট জনসন (ক্যান্টারবারী)

—শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে মহাত্মাজীর প্রচেষ্টা মানব সমাজ চিরদিন স্মরণ করবে।

—মিষ্টার ল্যাজারাস (বুটেন)

—মৃত্যুতে তিনি আরও শক্তিশালী হলেন। মৃত্যু তাঁর মহাজীবনের পরম পূর্ণতা। যে আদর্শের জন্য তিনি সাধনা করেছেন, সেই আদর্শের জন্যই তাঁর মৃত্যু হোল।

—ষ্ট্যানলি জোন্স (বুটেন)

—মহাত্মাজীর আত্মার প্রভাব কার্ধে পরিণত হলে ভারতে কোন ধর্ম-যজ্ঞ

আবাহের গান্ধিজী

অকৃত্রিম হবে না। গান্ধিজী ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষকের চেতনা লক্ষ্য করে তাদের কতকটা মৰ্যাদা দিয়েছেন। তাঁর আত্মার প্রভাব স্থানীয় সমস্ত অগ্নি নির্বাণিত হবে। তাঁর কণ্ঠস্বর আজ নীরব। —রেজিস্ট্রালড্ লোয়েনসেন (বুটেন)

—মহাত্মা গান্ধী কোন দলবিশেষের নন—সকলের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে মহান আদর্শের বিরূপ কতি হোল। শুধু ভারত ও কপাকিস্তান নয়, সারা বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়া অনুভূত হবে।

—নাহাশ পাশা (ওয়াফ্দ দল, মিশর)

—মানবজাতির প্রতি ইহা জঘন্যতম অপরাধ। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে বিশ্ববাসী একজন মহামানবকে হারালো।

—আজম পাশা (সেক্রেটারী-জেনারেল, আরব লীগ)

—সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিমূল করতেই গান্ধিজী জীবন দান করেছেন। ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট বিভাগকে ধ্বংস করার দায়িত্ব তাঁদেরই। প্রকৃত স্বাধীনতার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হলে দু'পক্ষের মিলিত হয়ে এক পথের সন্ধান করতে হবে।

—রজনী পাম দত্ত (কমিউনিষ্ট পার্টি, ইংলণ্ড)

—গান্ধিজীর বিয়োগে সমগ্র বিশ্বের সহিত আমরা ক্ষতিগ্রস্ত।

—ডক্টর মোহাম্মদ হাতা (রিপাবলিকান পার্টি, ইন্দোনেশিয়া)

—ভারতের এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত মৰ্মাহত হয়েছি। আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করুন।

—এডওয়ার্ড কেলান (ডিরেক্টর জেনারেল, আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান)

—সংবাদটি একই মর্মাত্মক যে, চিন্তা করা যায় না। তাঁর মৃত্যুর কালে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ইহা ছাড়া বর্তমানে আমি কিছুই বলতে পারি না।

—তাকশার ইউজুক দাছ (বলিবি আমেরিকা)

আমাদের শাস্তি

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু মর্মান্বিত। এতে ভারতের অপূরণীয় কতি হোল।

—জে, ডব্লু, মডক্রে (দক্ষিণ আফ্রিকা)

—বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের মৃত্যুতে ভারতীয় আমরা অগণনীর সহিত শোক করছি।

—ভাস্কার জি, এম, নাইকার (নেতাল ভারতীয় কংগ্রেস)

—ভারতের মহাশোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—উইলিয়ম ফিলিপ্‌স্‌ (আমেরিকা)

—মানব-মৈত্রী ও সম্প্রীতির অন্ততম সাধক এবং দরিদ্র ও নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তির একমাত্র প্রতীক, সুগণশ্রেষ্ঠ কর্মবীর মহাত্মা গান্ধীর অমূল্য জীবনের ভয়াবহ পরিসমাপ্তির সংবাদে মরক্কোবাসী অতিশয় মর্মান্বিত হয়েছে।

—আমেদ বেলাক্রেত (সেক্রেটারী জেনারেল, রাবাত, মরক্কো)

—হিন্দু-মুসলীম ঐক্য স্থাপনের আকাংক্ষিত লক্ষ্যের অগ্রসরণে মহাত্মা গান্ধী কর্তব্যরত বীর সৈনিকের মত আত্মোৎসর্গ করেছেন।

—শ্রী পি, জি, যোশী (কমিউনিষ্ট দল, ভারতবর্ষ)

—পাঠানদের মধ্যে ‘মালং বাবা’ নামে পরিচিত মহাত্মা গান্ধীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, এ নিদারুণ ধবরে আমি শোকাভিভূত হয়েছি। আমি আশা করি, আমার অগ্রগামীগণ মহাত্মাজীর পদাংক অগ্রসরণ করবে এবং তিনি যে শান্তি-ত্রিতে আত্মাহুতি দিলেন, তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবে।

—কাবুল উপজাতি সর্দার (সীমান্ত প্রদেশ)

—দেশের চরম সংকটজনক সময় গান্ধীজীর মৃত্যু চরম দুর্ভাগ্যের। অন্ধকার এই ঘোর অন্ধকারের দিনে তিনিই একমাত্র আলোর দিশারী ছিলেন। তাঁর প্রেম, সত্য ও অহিংসার দ্বারা আমাদেরকে পরিচালিত করবে—আমি এই আশা নিয়ে আছি।

—খান আবদুল গক্কর খাঁ (সীমান্ত)

—ভারতের ইতিহাসে ইহা ভয়াবহ মর্মান্বিত ও কলংজনক ঘটনা। গান্ধীজীর

আমাদের গান্ধী

মৃত্যুতে পৃথিবী একজন শ্রেষ্ঠ শাস্তিদূত হারালো। তার গণ তাদের বাপুজীকে চিরতরের মত হারালো।

—চৌধুরী আবদুর খান (সভাপতি, ভারতীয় কর্মচারী সংঘ)

—আমি মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করতাম। আমার মনে হয় তিনি একজন মহাপুরুষ। ডিক শেকার্ড ও আমার স্বামী তাঁকে মহাপুরুষ মনে করতেন। তাঁর স্বাভাবিকতার ও ঔদার্য গুণে পূর্ণ ছিল। ১৯৩১ সালে আমার স্বামী ইংলণ্ডে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমার স্বামীকে বলেছিলেন—‘অল্প ত্যাগে আমি সেলাম জানাচ্ছি।’ তাঁর সে কথা আমি ভুলিনি। শাস্তিকামী জনারেল ফোজিয়ায়েব প্রতি মহাত্মা গান্ধীর ইহাই ছিল অভিনন্দন বাণী। স্বামী গান্ধীকে জানেন, তাঁর কখনই তাঁকে বিবৃত হবেন না। আর দ্বারা তাঁকে জানবার সুযোগ পাননি, তাঁরা তাঁর শ্রেষ্ঠ আদর্শের মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ রাখবে।

—শ্রীমতী গ্রেস ফোজিয়ায় (লণ্ডন)

অন্য :

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে আমাদের গভীর শোক জানাচ্ছি। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, পার্শী প্রভৃতি সকলের পক্ষ হতে আমরা গান্ধীজীর উত্তরাধিকারী আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাই। —দক্ষিণ আফ্রিকার নিজিন্স প্রতিরোধ কমিটি

—সমগ্র সমাজের শাস্তির দূত মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যুতে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। —এড ইউনিয়ন (ফ্রান্স)

—নেতালে তিনি যে সত্যাগ্রহ করেছিলেন, উহাই স্বদেশে সার্থকতার সহিত প্রয়োগ করেন। তিনি যেভাবে জীবনে সংগ্রাম করেছেন, সেইভাবেই প্রাণ দিয়েছেন। সমস্ত বিষয়ে বিবৃত হয়ে একবাক্য ও স্বেচ্ছাবে আমাদের আজ দাঁড়াতে হবে। —মেতাল ভারতীয় সমিতি

—গান্ধীজীর হত্যা ভারত ও পৃথিবীর পক্ষে প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যেহায ঘোষণার শাস্তি তিনি পেলেন। এই সাম্প্রদায়িকতা

আমাদের গান্ধিজী

সাম্রাজ্যবাদী দেশ বিভাগের স্বাষ্টি। আগন্তকের সংস্কারের বে এইরূপ পরিণতি ঘটবে
তা গান্ধিজী পূর্বেই আশংকা করেছিলেন। —ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি

রেসিডেন্ট :

—আমি গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে আপনাকে ও ভারত-
বাসীকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। —ব্রিটিশ রেসিডেন্ট (জামিয়ার)

রিজেন্ট :

—মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক ও ধর্মাত্মিক জীবনাবসানে আমি অত্যন্ত শোকান্বিত
হুত হলাম। শান্তি-প্রার্থনা ও শান্তির বাণী প্রচার করবার জন্যই তিনি জীবনধারণ
করেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। আমি তাঁর বিশেষ
আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং বিশেষ ধর্মীয় কৃত্যাদি উদ্ঘাপন করছি। শোক-
সম্পূর্ণ ভারতবাসীর প্রতি আমি আমার আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন
করছি। আশা করি আপনারা বিশ্ব-শান্তির জন্য সাধকপ্রবরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ
করবেন। —ভিক্টোর রিজেন্ট

সেনাপতি :

—এই সর্বজনমান্য নেতার নিবোধ হত্যার চাইতে বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে
আর কোন ঘণিত ঘটনা দেখা যায় নাই। তাঁর আদর্শ শান্তির প্রতীক।

—জেনারেল ম্যাকআর্থার

নিরাপত্তা পরিষদ :

এক অতি শোকাবহ ঘটনা আমাদের সমস্ত চিন্তাকে সম্বলিত করেছে। গান্ধিজীর
মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সমগ্র জগৎ আজ যে ভাবাবেগে অধীর হয়েছে, তারই প্রভাবের
যথোপযুক্ত আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। এই ঘটনার অর্থ সমগ্র পৃথিবীর নিকট—
বিশেষ করে ভারতবাসীর নিকট কি, তা আমরা ভালভাবেই জানি। আমি নিরাপত্তা
পরিষদের পক্ষ হতে একজন উন্নাদের কার্য-কলাপের ফলে যা হয়েছে ভারতবর্ষের
প্রতিনিধিদের, তাঁদের গবর্নমেন্টের ও সমস্ত জাতির উদ্দেশ্যে সেইজন্য আন্তরিক সহানু-
ভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

গান্ধিজী জগৎকে এক মহান শিখা দিয়ে গেছেন। আপন হৃদয়ের প্রতি এক-

আমাদের গান্ধী

মানব আত্মিকতার পরিচয় বহু মানবের মধ্যেই বিপন্ন। বহুবার তিনি আপনার আত্মিকতার সত্যকে প্রয়োজনে তাঁর জীবনকে আত্মিক সোনার বস্ত্র প্রদত্ত হয়েছিলেন। বহুবার অবিশ্রান্ত থেকেও সমগ্র জগতের সমুদ্রে তিনি এক মহা আশ্রয়ের প্রতীকরূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন—সেই সংগেই তিনি তাঁর স্বাধীনতার স্বাধীনতার ও সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখে গেলেন, তাঁর দীর্ঘ জীবনের ইহা সর্বাধিক সার্থকতা। কিন্তু তিনি কেবল স্বাধীনতারই লাভক ছিলেন না—তিনি তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছুই ধারক ও বাহক ছিলেন। তিনি অহিংসা ও সৌভ্রাতৃত্বের সমর্থক ছিলেন, যা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি। এইজন্যই তাঁর স্মৃতিকে আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত বহন করবো।

তিনি ছিলেন ঐক্য, বিবেক ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক। এইজন্যই তাঁর নাম আমাদের বিভিন্ন বিতর্কের সময় উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের বিশ্ব-মৈত্রী ও শান্তির অমূল্য চেষ্টায় যেভাবেই হোক আমরা তাঁকে আমাদের প্রধান মিত্ররূপে গণ্য করেছি। গান্ধীজীর জীবন অবসানে তাঁর আরও কাজ শেষ হয়ে যাবে না—পৃথিবী হতে অপসারিত হয়েও তিনি দেহবিমুক্ত একটি ভাবরূপেই তাঁর জীবনাদর্শ নিয়ে চিরদিন জাগরুক থাকবেন। তাঁর স্বদেশ ও বহির্বিধে যারা তাঁর স্মৃতিকে সম্মান করবেন, তাঁরা—তিনি যে জন্তু জীবন ধারণ করেছিলেন এবং যে কাজে জীবন উৎসর্গ করলেন, সেই মহাত্মার প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধাশীল থাকবেন। —**জাজানক (সভাপতি)**

—মানব ইতিহাসে কোন কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ আততায়ীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের জীবন যে বিপন্ন, একথা তাঁরা জানতেন। কিন্তু গান্ধীজীর যৎ কেউই মৃত্যুর প্রতি এমন উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করেন নি।

—**কিলিপ নোয়েল বেকার (ব্রিটিশ প্রতিনিধি)**

—সংকট ও বিরোধের কালেই সহনশীলতার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। তাঁর আত্মত্যাগ পৃথিবীর মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তারা দৃঢ়তার সহিত গান্ধীজী আদর্শ গ্রহণ করবে, ইহাই আমরা একান্তভাবে আশা করছি।

—**সেনেটর ওয়ারেন অস্টিন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি)**

—ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধীজী ভারতের ইতিহাসে সত্যের প্রতীক

আমাদের গান্ধিজী

বেরে গেছেন। স্বাধীনতা গান্ধীর জন্য ভারতবর্ষে প্রথমবার যে সংগ্রাম চালিয়েছে, তার সঙ্গে গান্ধিজীর নাম চিরদিন জড়িত থাকবে।

—গান্ধিকো (সোভিয়েট প্রতিনিধি)

—গান্ধিজী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। ক্রান্তি এমন একজন লোকও নাই, যিনি গান্ধিজীর নাম জানেন না বা গান্ধিজীকে শ্রদ্ধা করেন না।

—ভুলিল (করাসী প্রতিনিধি)

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে এশিয়ার এক যুগ-মানবের জীবন অবসান ঘটলো।

—ভাস্কার টি, সিরাস (চীনের প্রতিনিধি)

—গান্ধিজীর মৃত্যু কেবলমাত্র ভারতবর্ষের পক্ষেই বিপর্যয়রূপ নয়। তাঁর প্রভাব চতুরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং শান্তি ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী মানুষের চিত্তে একাবৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে বলেই আমি আশা করি। —জেনারেল মাকনটন (কানাডার প্রতিনিধি)

—গান্ধিজী ছিলেন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব। গৃহ-বৃত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর শান্তিবাদী শক্তিগুলি জয়ী হবে বলেই আমরা আশা করি। —ডক্টর জোসি অকি (আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি)

—গান্ধিজীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তার কলে ভারতে স্থায়ী গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠার কাজ ব্যাহত হবে না বলেই আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি।

—ভাসিলি তারাসেঙ্ক (ইউক্রেনের প্রতিনিধি)

—বিশ্ব যুদ্ধের অদৃষ্টে বা ঘটেছিল, শান্তির বৃদ্ধ প্রতীক গান্ধিজীর অদৃষ্টেও তাহাই ঘটলো। আশা করি যে, তিনি যে বীজ বপন করে গেছেন, উহা একদা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করবে এবং সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সনদকে সার্থক করে তোলার সহায়ক হবে। —কার্লো এল বোয়ী (সিরিয়ার প্রতিনিধি)

সাহিত্যিক :

—তিনি এ যুগের একমাত্র ঋষি ও মহাপুরুষ। জু ভারত বা এশিয়ার যতো দেশেই আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এতোখানি রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব।

আবাহনের শাস্ত্রী

পাশ্চাত্য জগতে এমন কোন দৃষ্টান্ত কোনো দিন দেখা যেতে পারে না, প্রাচ্য রাজনীতিতে পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপ কতখানি অজ্ঞায় এই থেকেই তাদের বোঝা উচিত।

—লিল-মু-ভাং

—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে আমি মর্মান্বিত। আমি বিশ্বীকৃত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব বলে গণ্য করি। তাঁর মৃত্যুতে কেবল ভারতই নয়, সমগ্র বিশ্ব কতিপয় হয়েছে। ভারত তার জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্বাতাকে হারিয়েছে—হারিয়েছে মানবজাতির একজন দরদীকে। মহাত্মা গান্ধী আজীবন অজ্ঞায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং শাস্তির জন্য বথাসর্বদা ত্যাগ করেছেন। —কামিল চন্দ্রজী (ইরাক)

—ভারতের জাণকর্তাকে বলিদান দেওয়া হয়েছে। তিনি আর ইহলোকে নেই। ভারতবর্ষকে এই দুঃপন্যে কলংকের ভার চিরদিন বহন করতে হবে। দুঃখ ও দুর্ভাগ্য-নিপীড়িত দেশবাসীর ভাগ্যে আজ যা ঘটেছে তার জ্ঞায় অবর্ণনীয় মর্মস্পন্দ ঘটনা আর কোনও জাতির ভাগ্যে ঘটেনি। ভারতের দীপ নির্বাপিত হয়েছে—বিশ্বের পবিত্রতম আধ্যাত্মিক শক্তির চরম বিকাশের মুহূর্তে অকালে অবসান ঘটলো।

—ডক্টর সৈয়দ হোসেন

—তাঁর প্রদর্শিত পুণ্য-পথের তিনিই ছিলেন একক যাত্রী, তাঁর পিছনে কেউ হয়তো আসেনি, কত লোক তাঁকে ভুল বুঝেছিল। নোরাখান্দির হুপুরি বাগানের পথে পথে লাঠি হাতে তিনি একাই চলেছেন সারা জীবন ধরে, কেউ নেই তাঁর সংগী অহিংস মন্ত্রের খবির তিনি, ওই মন্ত্রে দীক্ষিত একমাত্র শিষ্যও তিনি। চলার পথে কতবার চেয়ে চেয়ে দেখেছেন, কেউ তাঁর পিছনে নেই, ধূ ধূ শূন্য পথ। তাঁর এই ছবিই আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখছি, মুখের বাগী অন্তরের সায় পেয়েছে এই ছবি ভেবে।

মহাত্মা গান্ধী বিশ্ব-দেবতার হাতে লেখা একখানি এপিক কাব্য—বুড়, যি রচনার পরে কিছুদিন বিশ্রাম করবার পরে এখানান্তে তিনি হাত দিয়েছিলেন।

ট্র্যাজিক পরিপতি দ্বারা এইসব মহাকাব্যকে নিখুঁৎ ক্লাইম্যাক্সে তুলবার কৌশল—সেই স্থান, কাল, মৃত্যুহীন মহাকবির নিজস্ব ধারা—আমরা কি বুঝব তাঁর টেকনিক ? তবে দেখতে পাচ্ছি যে, এই টেকনিক দ্বারা তিনি তাঁর হাতের বড় ব এপিককে অমর ও চিরবরণ্যো করে রেখেছেন বিশ্ববাসীর মনে। অনন্তের সে গ্রন্থাগারের আলমারিতে তাঁর নতুন শেখ-করা কাব্যখানি স্থান পেল, রক্ত-রা

আমাদের দাবিদারী

অক্ষরে লেখা কাব্যের নামটি দিব্য আভায় জল জল করছে শত শতাব্দী পরেও ।

বাপুজী ! আমাদের নাবালক রেখে চলে গেলে, ওপর থেকে সর্বদা দৃষ্টি রেখো আমাদের দিকে । তোমার উপযুক্ত যেন হতে পারি—সর্বদা আশীর্বাদ করো । তোমার আশীর্বাদে সব বাধাকে আমরা জয় করবো । —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—ইচ্ছা হোল চীৎকার করে কাঁদি । চীৎকার করে কেঁদে ডাকি—ডাকি মহাত্মাজীর আত্মাকে ; জীবনের শেষ মুহূর্তটি পবিত্র কর্বের পতাকা, ধর্মের পতাকা বহন করে আততায়ীর আক্রমণকে বুকে নিয়ে সকল কর্ম শেষ করে যে আত্মা চলেছে অমৃতলোকের উদ্দেশ্যে, সেই আত্মাকে ডাকি—ফিরে এস হে পিতা, হে মহাত্মা, হে শান্ত, হে শুভ, হে অনন্ত পুণ্যের প্রতীক, তুমি জিতেছিস, তুমি জিতনিষ্ঠ, জিতাহার, তুমি অপরাজিতা মন্ত্রের তপস্বী, তোমার পরাজয় নেই, তোমার মৃত্যু নেই, তুমি তো জিতমৃত্যু, হতে পারে না তোমার মৃত্যু, তুমি ফিরে এসো—তুমি ফিরে এসো—তুমি ফিরে এসো । —ভারতশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হে মহাপথিক, হে মহাপথ,
হে মহাসারথি, হে মহারথ,
হে উজ্জল ;
নয়ন জল
নয়নে থাক
শুনোছি বন্ধু তোমারি ডাক,
হৃগৃগৃহান্তে যে আস্থান
মধিরা তুলিবে পাষণ গ্রাণ
অসাড় হৃদয়, বারম্বার !
নমস্কার ।

হে মহামুখ, হে মহাজর,
হে মহাজয়, হে মহা-লয়,
হে দিকপাল ;
সকলকাল
কৃতজ্ঞালি
মহতী পূজার হে মহাবলি,
গুজিবে তোমারে আনন্ত শির,
মহাতারতের হে মহাবীর
হে উদ্ভাড়া নব-গীতার
নমস্কার ।

আমাদের শক্তিকী

হে মহাকাব্য, হে মহাকবি,
হে মহানির্দী, হে মহাহবি,
হে নির্ভীক ;

কোটাশে টিক
বেত কবল

রক্ত সাররে হে শতজন !

ছন্দ পঙ্ক বর্ণ রূপ

কি অপরাধ, কি অপরাধ,

দলিহে আলো-অন্ধকার ।

নমস্কার ।

হে মহাকবি, হে মহা-কাজ,
হে মহা-সেবক, হে মহা-রাজ,
জয়তু জয় ;

অশ্রু নয়

নয়কো লাজ

কেবল কাজ—তোমার ডাক

সবার জনরে ভরিয়া থাক

খুলিয়া থাক সকল দ্বার ।

নমস্কার ।

হে মহানিত্য, হে মহাশূন্য,
হে মহা-অন্ত, হে মহা-শূন্য,
চিরন্তন,

হে মহাজন,

হৃৎকর

পছাকীতি হে হৃৎকর,

ভারত-ভারতী বীণার সুর

তোমাতে বাজাল কি হৃৎকর

সত্যের জয় অহিংসার ।

নমস্কার ।

নমস্কার হে মহাকাল,

হে নীল-কণ্ঠ, চন্দ্র-ভাল

নমস্কার

বারবার

হে নির্ভর,

লক্ষ লক্ষ কোটি জয়

ভুজ করিয়া সব ভিত্তির

আলোকে আলোক জলধীর

হে প্রব-ভারা হানবভার,

স্বীকার ।

নমস্কার ।

—কলাইচাঁক মুখোশাখতার (বনমূল)

আমাদের গান্ধীজী

—আজ গান্ধীজীর চিত্তার অগ্নি যখন সবেমাত্র নিভিয়াছে, ধরিত্রী-মাতার যে অঞ্চল তাঁকে শেষ আশ্রয় দিয়াছিল, তার উত্তাপ তখনও সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নাই। সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে—প্রেরণের পথে, চিন্তাচরিতের পথে আমরা গা ঢালিয়া দিব, না, দুর্জয় সাহস লইয়া সমগ্র জগতের জন্ত নূতন পথ, কল্যাণের পথ সন্ধানের সংকল্প গ্রহণ করিব? চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি অন্তর-বর্ষ আমাদের আচরণে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাতে বিচলিত হইবার কিছু নাই। এক হইল, আমরা কি সেই স্রোতের নিকট আত্মসমর্পণ করিব, না, বাহ্যকে স্রোতের, কল্যাণতর বশিষ্ঠা ব্যক্তির জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি, সমষ্টির কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেও তাহাকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সংগ্রাম করিব?

আজ স্বীয় অপকীর্তির আঘাতে সজাগ হইয়া তাহাই বিবেচনা করিবার শুভকণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা অধিক মজল আর কি হইতে পারে?

—নির্মলকুমার বসু

—জাতিকে আগুনে তিনি মুক্তি দিয়েছেন, সবার জন্ত ঠাই ক'রে দিয়েছেন দেশমাতার কোলে; দেবতার মন্দিরে, এবং ভারতের ঠাই ক'রে দিয়েছেন জগতের সব মানুষের সভার মধ্যে! আজ তাঁর শরীর ভয় হ'য়ে গেলেও জাতির সব ভাই বোনের মধ্যে তিনি জীবন্ত হ'য়ে রয়েছেন ছড়িয়ে। যে কাজ তিনি ক'রে গিয়েছেন যে কথা তিনি ব'লে গিয়েছেন জাতির প্রত্যেকটি মানুষ সেই কাজ আর কথাকে সত্য ক'রে তুলে, কি হরিজন কি অগ্রজ্ঞান সকল জনই মহাজন হ'য়ে ভারতকে মানুষের স্বর্গ ক'রে তুলুক।

মানুষের হোক জয়।

মহামানুষ মহাত্মার জয় হোক!

—শ্রীমদ্বিহারজন মিত্র মহামানুষ

• —পৃথিবীর ইতিহাসে এমন লোক খুব কমই দেখা যায়, যারা জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরে সমানভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান, ভক্তি ও ভালবাসা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের নিকট সমানভাবে লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন। সেইরূপ মহা-মানবদের জন্ম হয় দেশ, সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্ত। যুগে যুগে দুর্গত জনগণের পথ নির্দেশ করিতেই তাঁহারা আসেন আবার কার্ষণেবে তাঁহাদের তিরোভাব হয়।

আমাদের গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী সেই শ্রেণীর মহামানবদের একজন, যাহার মত মহাপুরুষ সহস্র বৎসরের মধ্যে একজন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।...

এশিয়া মহাদেশ হইতেছে মহামানবদের জন্মভূমি। এইখানেই বীণ্ডুস্ট জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই জন্মভূমিতেই আরবের মরুভূমিতে মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়া উর্বর মরুভূমিতে প্রবর্তন করিয়াছিলেন প্রেমের ধারা, ফার্সদেশের ও ইরাকের বাণী। জন্মভূমি এশিয়ারই এক শ্রেষ্ঠ মহামানব, তাঁহার নাম কেহ কোন দিন ভুলিবে না। কনফুসিয়াসের নামও চীন দেশের ঘরে ঘরে প্রতিদিন লোকমুখে স্মৃতিত হইতেছে।...

অহিংসার পুণ্য-বাণী বুদ্ধদেবের কণ্ঠ হইতেই স্মৃতিত হইয়াছিল। এই পুণ্য ভূমিতে একে একে কত মহাজনের জন্ম হইল—নানক আসিলেন, কবীর দাও রামানন্দ, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ...

ইংরাজের কঠোর শাসন-নীতির নিষেধে জাতির প্রাণ বধন সঞ্জীবনী স্বধা জন্ম ত্বরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন স্বধার ভাণ্ড লইয়া দেখা দিলেন মহাত্মা গান্ধী।... সে ক্ষীণকায় মানুষটির প্রভাবে চল্লিশ কোটি নরনারীর হৃদয়-বীণার তারে তারে আনন্দলহরী স্মৃতিত হইয়া উঠিত, যাহার কর্ম-প্রেরণার কোটি কোটি পুরুষ ও নারী পথ চলিতে শিখিয়াছিল, যাহার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব ছিল অসামান্য...

—যোগেন্দ্র নাথ শুক

—মহাত্মার বাণী দেশের লোক সর্বাঙ্গ-করণে গালন করছে কি হোত বলতে পারি না—তবে যতটুকু শুনেছে তাতে তার ইটাই হয়েছে। —কালিদাস রায়

হিমগিরি তারে দিন উদারতা
ধরঙ্গী কোমল মেহ
মানব-প্রেমের চন্দনে ওই
চর্চিত পুত দেহ।...
কোটি হৃদয়ের অমৃত বাসনা
ওই বুকে পেলো ভাবা
শিখালো বিধে মানবের প্রতি
মানবের ভালবাসা।...
ভারত আত্মা জেগেছিল কোন
অমৃত সন্ন্যাস।
প্রশাসন করেছে দিব তাঁহাকে
গান্ধী দিয়েছে নাম।

—কটিক কল্যাণাশা

আমাদের গান্ধিজী

জগতের যত রক্ত খামোটে চলেছিল অভিযানে,
সেই অভিযান শেষ ক'রে গেলে নিজের রক্ত দানে ।
দিল্লীর সেই নিধন বক্ষে যে ধোঁয়া উঠিল জেগে,
ভারতবাসীর মুখ হোলো কালি সেই কালো ধোঁয়া লেগে ।

যিরি ভব সমাধিরে—

বুগ বুগ থরি কাঁদিলে মানব, গান্ধিজী এসো কিরে ।

—হুমিৰাল বসু

—কত রাজা, কত রাজ্য, উত্থান-পতন
কত রাজদণ্ড, আর সৌভাগ্যের গৰ্ব্ব-আফালন
মিশাইল ধূলিভলে ; সেই তুচ্ছ কাহিনী প্রাচীন
ক্ষীণ বৃদ্ধদের মত কালগর্ভে হয়েছে বিলীন ।
কিন্তু যেবা সত্যের পূজারী, দুঃখের সাধনা লয়ে
দুর্গম জ্ঞানের পাথে বাহিরিল নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে
মানব কল্যাণ লাগি, তুচ্ছ দেহ বিনাশিয়া তাঁর
কিন্দা তাঁরে বলী করি ক্ষমতার অন্ধ অহঙ্কার
প্রচারিয়া বাহুবলে কে রুখিবে তাঁর অভিযান ?
মধ্যাহ্ন ভাষ্যর যথা ভেজস্বর জ্যোতির নিশান
উড়ায় গগনপাথে মেঘরন্ধ করি অতিক্রম
চলি যার সমুদ্রের পানে, বহু, তেমনি দুর্দম
দুর্জয় সত্যের গতি ।

.....বহু, একি দুঃসহ বেদনা !

বাদের লাগিয়া ধ্বি করিলেন দুঃখের সাধনা
ভারাই বধিল তাঁরে । ঈশ্বরের এ কি অভিশাপ !
কিন্দা বৃগু হুগাস্তের মাহুনের পঞ্জীভূত পাপ
মহামানবের মাকে এতদিনে লভিয়াছে ক্ষয় ?

—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

শত্রু-পত্রিকা :

—আব্রাহিম লিংকনের হত্যার পর থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর
হত্যার ভাষ্য শোচনীয় ঘটনা আর ঘটেনি । মহাত্মাজীর মৃত্যুতে পৃথিবীর শান্তি

আমাদের গান্ধিজী

যে-ভাবে ব্যাহত হয়েছে, সেরাজোভের হত্যাকাণ্ডের পর কোন ঘটনায় পৃথিবীর শান্তি এইভাবে বিপর্যয় হয়নি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। গান্ধিজীর নথর দেহ বিলুপ্ত হলেও তাঁর মৃত্যু হয়নি। তাঁর মহান কার্য ও জনগণের হৃদয়ে তাঁর প্রভাব চিরস্থায়ী। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

গান্ধিজী কেবলমাত্র বিরাট পুরুষ ছিলেন না। তিনি এক লোক ছিলেন। বিরাটত্বের সহিত সত্যতার এই বোগাযোগ খুব কমই পরিলভ্য হয়। গান্ধিজী ভারত ও জগতের কল্যাণ ও শান্তির জন্য যে কাজ করে গেছেন, তা ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়।

—হাট্‌ সংবাদপত্রসমূহ (নিউইয়র্ক)

—মহাত্মাজীর মহামুভবতা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের স্বরণ রাখতে হবে যে, যে জাতিকে তিনি গড়ে তুলেছেন তার মারফতে নয়, সর্বকালের সর্বজাতির কল্যাণকামী মানব হৃদয়েই তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে। আমাদের আজ এই সত্যই হৃদয়গম্য করতে হবে যে, গান্ধিজী শুধু যে মহামানব ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের এমন এক বিরাট ধর্মপ্রাণ পুরুষ, পাশ্চাত্য দেশ যুগ যুগ ধরে যার সন্ধান দিতে পারেনি।

আমাদের অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে আমরা যদি গান্ধিজীর বিচার করতে বাই, তাহলে আমরা হয়তো তাঁর মহত্বকে ছোট করে দেখবো, এবং কল্পনা করে তাঁর দুর্বলতার সন্ধান করতে গেলে বর্তমান যুগের রাজনীতির পরিমাপে হয়তো তাঁর অমর্যাদা করে বসবো।

—লাইক্‌ (আমেরিকা)

—গান্ধিজীর মৃত্যু ভারতের একার ক্ষতি নয়। যে দুঃস্বাদ তাঁকে হত্যা করেছে সে গান্ধিজীর সকল সঙ্গুণকেই অস্বীকার করে এই নিষ্ঠুর কাজ করেছে। কিন্তু এই ক্ষতির মধ্যেও আশার আলো রয়েছে।

হয়তো ইহা দ্বারা ভারতের সকল বৈষম্য নিমূল হবে। এখন নেতৃত্বশ্রমের উচিত সকল হতাশা ত্যাগ করে ভারত ও পাকিস্তানের অর্জিত স্বাধীনতাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য অধিকতর প্রেরণার সহিত কাজ করা। আমরা আশা করি, দেশবাসী গান্ধিজীর মহান আদর্শকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

—বাল্টিমোর সান (আমেরিকা)

আমাদের গান্ধী

—পৃথিবীর লাখ লাখ ধর্মগুরুগণের মধ্যে গান্ধীজীও একজন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাঁর আরও কার্য আপনিই সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

—সানফ্রানসিসকো ক্রনিকল (আমেরিকা)

—গান্ধীজী ভারতের একজন সাধুসন্ন্যাসী বলে পরিচিত ছিলেন। এখন তিনি শহীদের সম্মান লাভ করলেন।

—নিউইয়র্ক ডেলি নিউজ (নিউইয়র্ক)

—মুসলমানগণ তাদের একজন হিন্দু বন্ধুকে হারিয়েছে। গান্ধীজী মানব-জাতিকে ভালবাসতেন। হিন্দু-মুসলমান তাঁর কাছে সমান প্রিয় ছিল।

—নিউইয়র্ক ডেলি মিরর (নিউইয়র্ক)

—মহাত্মা গান্ধী ভারত-পাকিস্তান মৈত্রী স্থাপনের দ্বারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা বিধান ও পৃথিবীর শান্তি স্থাপনের পথ প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন।

ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে মীমাংসা সাধন করতে পারবেন। উভয় ডোমিনিয়নে যে শোকোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে ইহাও খুব স্বলক্ষণ।

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও দেশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করায় একজন ঘাতকের হাতে গান্ধীজীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন তদ্বারা উভয় ডোমিনিয়নে এবং সমগ্র জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখন হইতেই এই কাজে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

—লণ্ডন টাইমস্ (লণ্ডন)

—গান্ধীজী নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য জগৎ আকুল প্রতীক্ষায় আছে। গান্ধীজীর মৃত্যুতে হয়তো ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষের দ্বারা জগতের যে মংগল হয়েছিল, তাও হতে পারে। কিংবা ইহা দ্বারা হিন্দু চরমপন্থীগণ অধিকতর শক্তিশালী করতে পারে।

—সানডে টাইমস্ (লণ্ডন)

—ভারত ও পাকিস্তানের সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্যই মহাত্মা গান্ধীর জীবনাবসান ঘটেছে। আশা করা যায় যে, দেশের এই ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা ভারতের এবং পাকিস্তানের শান্তি ফিরিয়ে এনে মহাত্মার মৃত্যুকে সার্থক করবে।

—ইয়র্কস্টারার পোস্ট (লণ্ডন)

আমাদের গান্ধী

—এই সংবাদ বিশ্ব-মানবের প্রতি কঠোর আঘাত হেনেছে। ভারতের নেতৃবৃন্দ দেশে শান্তি আনতে পারলে মহাত্মার মৃত্যু সার্থক হবে এবং দেশ স্বাধীনতার প্রকৃত গৌরব অর্জন করবে।

—ডেলি ওয়ার্কার (লণ্ডন)

—দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জীবন দান করেছেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ সফল হবে কিনা, এখনও ঠিক করে বলা যায় না।

—ডেলি হেরাল্ড (লণ্ডন)

—তাঁর মহান আত্মা চিরকাল তাঁর দেশবাসীর মধ্যে প্রতিফলিত হতে থাকবে।

—টেলিগ্রাফ (ব্রিটিশ অধিকৃত জার্মানী)

—এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার খুবই সম্ভাবনা আছে।

—ডয়েটল্যাণ্ড (সোভিয়েট অধিকৃত জার্মানী)

—মহাত্মা গান্ধী নিহত হওয়া ভারতের চরম দুর্ভাগ্য এবং দেশে ইহার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

ডারবার্গ (জেনেভা)

—নির্ধাতিত মানবতার এই জীবন্ত প্রতীক রাজনৈতিক উত্তার নিকট প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

—সবোডনে মতি (চেকোস্লোভাকিয়া)

—মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নিশ্চয়ই যুদ্ধে বোগদান করেছিল।

—ডায়ারিও দামানা (পর্তুগাল)

—স্বাধীনতা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অগ্রদূতের মৃত্যু হোল। গান্ধীজীর মধ্য দিয়ে ভারতের আশা-আকাংক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

—এল কম্যাসিও (পেরুভিয়া)

—মানুষ কতদূর কৃতঘ্নতা ও সংকীর্ণতার নীচে নেমে যেতে পারে, তা ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশভক্ত ও ঐক্য বিধায়ক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করায় দেখা গেল।

—আলকোহলা (মিশর)

—সারা বিশ্বে দীর্ঘকাল যাবৎ গান্ধীজীর অভাব অনুভূত হবে। মহাত্মা গান্ধী

আমাদের গান্ধিজী

স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে জগৎকে বিস্মিত করেছিলেন, একথা হয়তো ভাবীকালের মানুষ বিশ্বাস করতে চাইবে না।

—ডেমোক্রেট ইরান (ইরান)

—নব বিভক্ত ভারতের শান্তি প্রতিষ্ঠায় যখন মহাত্মা গান্ধী তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করছিলেন, সেই সময় আততায়ীর হস্তে তাঁর জীবনের অবসান ঘটলো। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও এরূপ উন্নততা ও নৃশংসতা দেখা যায় না।

বর্তমান বিশ্বে মহাত্মা গান্ধীই সম্ভবতঃ একমাত্র মহাপুরুষ—বর্তমান জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি মহামানবস্বরূপ। দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সহিত একাত্মা হয়ে দীর্ঘকাল থাকা, অনাড়ম্বর ও নিঃস্বার্থ জীবন, কুসুমাদপি কোমল ও বজ্রাদপি কঠোর চরিত্র, ব্রত পালনের জন্য তাঁর কঠোর তপস্চর্চা, বিরোধ সংকীর্ণতা ও অসত্যচারণের প্রতি তাঁর উপেক্ষা, জাতিভেদ শ্রেণীভেদ ধর্মভেদ ও বর্ণভেদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ঐকান্তিক শান্তি প্রচেষ্টা ও আধ্যাত্মিক জীবনের নির্দেশনান, সর্বোপরি অহিংসা মতবাদ প্রচার—এই সকল জীবনের ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া তিনি মহাপুরুষ ছিলেন।

—ষ্টেট টাইম্‌স্ (সিংগাপুর)

—গান্ধিজী প্রাচ্য দেশকে আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ শিক্ষা দিয়েছেন। গান্ধিজী চীনে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি সমগ্র বিশ্বের—সমগ্র মানবতার

—সিংহল টাইম্‌স্ (সিংহল)

—পৃথিবীর ইতিহাসে মহাত্মাজী শ্রেষ্ঠ বীর বলে পরিগণিত হবেন। গৌতম বুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর কেউ জনগণের নিকট হতে এত সম্মান লাভ করেনি।

—নিউ লাইট অফ্‌ বর্ম (ব্রহ্মদেশ)

—মহাত্মা গান্ধীর জীবদ্দশাতেই বুঝা গিয়েছিল যে, তাঁর অমুচরদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে শুধু ঋষি বলে মনে করেন, তা নয়, তাঁকে এক নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করেন। এখন তাঁর এই অস্তিম ত্যাগের ফলে তাঁর মতবাদ ধর্মের পর্যায়ে দ্রুত হবে এবং মহাত্মাজী অন্তায় ও পাপের হাত থেকে এবং এক জাতির হাতে অন্য জাতির দাসত্ব থেকে মানবজাতির পরিত্রাণ লাভে পরিগণিত হবেন।

—বার্মিংহাম রিভিউ (ব্রহ্মদেশ)

আমাদের গান্ধী

—মহাত্মা গান্ধী আর ইহলোকে নেই। বিশ্ববাসী আর তাঁকে দেখতে পাবে না, আর তাঁর কঠিনব্রত বাণী শুনতে পাবে না। গত কয়েক মাস ধরে গান্ধী তাঁর দেশবাসীর জন্য তাঁর দেহ ও আত্মা উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর দেহ ও আত্মা প্রেম ও সত্যের প্রতীকরূপে চিরকাল বিরাজ করবে।

বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। সাধারণ ভারতে যে মহাপুরুষের বাণী সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ ছিল, তাঁর বাণীই আজ নিস্ত হোল। মহাত্মার হত্যাকাৰী নরাদমই কেবল এই কসাইস্ফলভ অপকর্মের জন্য দা নয়। এই পাপাত্মার সহযোগী কারা—এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। যাদের কা কলাপের সংগে এই দুরাচার কার্যকলাপের সাদৃশ্য রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই এ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী।

ভারত ও পাকিস্তান গান্ধীজীর মৃত্যুতে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হোল। আমরা আশা করি, এই ঘটনা থেকে দেশবাসী সাবধান হবে এবং মহাত্মার আত্মাহুতির ফ লাখ লাখ প্রাণ রক্ষা পাবে। আজ আমরা আশা করি, ভারত ও পাকিস্তানের হি মুসলমান একসঙ্গে শহীদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের শান্তি অ রূপে আত্মনিয়োগ করবে।

—পাকিস্তান টাইমস্ (লাহো

—মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের শেষ সময় নির্ভীকতার সংগে ভারতের মুসল সংখ্যালঘুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এরূপ একটা মহৎ জীবনের মর্যাদা সমাপ্তিতে কেবল ভারতের মুসলমানেরাই নয়, পাকিস্তানের সকল মুসলমান ও বেদনায় মাথা নত করছে।

গান্ধীজীর ‘করেংগে’ প্রতিজ্ঞা সফল হোল না, অতএব নিজের জীবনের মূল্য তাঁকে নিজের অঙ্গীকার পূরণ করতে হোল। তাঁর নিজের কথায় তিনি গৌরব মুক্তিলাভ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, মহান ব্যক্তি জীবিত যা করতে পারেন নাই, মৃত্যুর পরে তা সম্পন্ন করেছেন। —ডন (ক

সন্ধানী

অ : অমৃতকাউর, রাজকুমারী—২২৫,

৩০১, ৩১২

অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়—২২১,

৩০৪, ৩১৬, ৩১৮

অরুনাংশু দে—২২১

অমৃতলাল ঠাকুর—১০০, ২০৩

অহুশ্রয়া বেন—১০২, ১০৩

অরবিন্দ, শ্রী, ১৩৬

অভয়কর—১১৭

অবন্তিকা বাঈ—১২৬

অলিভ—৭৫

অলিসন—৮২

অমরনাথ—১৬২

অমৃতশহর—১১০, ৩০৩

অন্ধ্র প্রদেশ—২৪১

অক্সফোর্ড—১৮৫, ১২৬

অরিসিয়া—৫৭

অমৃতবাজার পত্রিকা—৫১

অলূলঘ—১২২

অর্থসংগ্রহ—৩৪৬

আ : আভা গান্ধী ২২১, ৩০৪, ৩১৬,

৩১৮

আম্বালাল সরাভাই—১০২, ১২৮

আশাদেবী—১৪৭

আশেদকর—১৭০, ১২৫, ১২৬

আপ্পা সাহেব পটবর্ধন—২০৩

আর্থিনায়কম্—২২৪

আকুনালন্দ—৩২০

আনি বেশান্ত—২৮, ৬৩, ১০০

আযুব মহম্মদ—২২৬

আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা—

১১৬, ২৩১, ২৪৭, ৩১৩, ৩১৭,

৩২৩

আজবল খাঁ, হাকিম—১১৬, ১৩৭

আনসারী, ডাক্তার—১১৬, ১২১

আজাদ সোবানী, মৌলানা—১২১

আব্বাস তায়েবজী—১২১, ১২৪

আবদুল বারী, অধ্যাপক—১২১

আগা থা—১৮৮, ২৭১

আল্লাবক্স—২৫২

আহমদ হুদর—২১২

আলেকজান্ডার, এ, ডি—২৮১

—শ্রীমতী—৫৩

—হোরেস—২২৬

আকুইন, লর্ড—১৫৬, ১৫২, ১৭০,

১৭৩, ৭৪

আম্বীড বাটলেট—১৬৬

আমেরী, লিওপোল্ড—২৪০, ২৭২

আমেদাবাদ—১৩, ২৫, ১০১,

১০৫, ২২০

আগ্রা—৬১

আযিষাপাড়া—২২২

আমাদের গান্ধিজী

আনন্দ ভবন—১৭০	ইমিগ্রেশন স্ট্রিকশন অ্যাক্ট—৭৬
আর্কট—২২৮	উ : উকা—১০০, ১৪০
আসাম—২৪১	উপেন্দ্রনাথ দাস—২২১
আজমীর—২৪১	উলস্ফর—৩২০
আলেকজান্দ্রিয়া—১২৮	উইগেল উইলকি—২৫২
আমেরিকা—১৬৬	উইলিয়ম ফিচার—২৫৩
আফ্রিকা—২৫৫	উইলিংডন, লর্ড—১৭৪
'আউট লাইন্স অফ হিষ্ট্রি'—১৩৬	উড়িয়া—২৩১, ২৪১
'আন-টু দি লাস্ট'—৬৮	উ : উর্মিলা দেবী—১২৮
আশ্রম প্রতিষ্ঠা—৩৫৬	এ : এণ্ডরুজ, দীনবন্ধু—৮২, ১০১, ১১২,
ই : ইন্সলুল যাজ্জিক—১০৩	১১৮, ১৭৭, ১৮৮, ১২৬, ২০০,
ইয়েলারি সান্নায়া—৩২০	২২, ২৫৬, ২৬০
ইউসুফ মিঞা—৭৩	এডগার স্নো—২৫২, ২৬৪
ইস্তিয়াজ আলি কিদোয়াই—৩২০	এডুইন আর্লল্ড—২৪, ২৮
ইয়াকুব হাসান—১১৭	এসকম ৫৫—
ইয়োন্নে নগুচি—২৪২	এলবার্ট ওয়েট—৬৮
ইসিপিঙ্গে—৮৮	এলেন অকটেভিয়ান হিউম—১৭০
ইন্দোর ২২১	এণ্ডারসন, জন—২২২, ২৩০
ইরাক—২৪৮	এসগিন, লর্ড—৪৮, ৭১
ইরান—২৪৮	এলাহাবাদ—১১২, ১৩২, ১৬৪,
ইতালি—১২০	১৬২
ইসলিংটন—১৮৬	এডেন—১৭৫, ১৭৭
ইষ্ট এণ্ড—১৭৮	এ্যাপোলো—৩২০
ইয়ং ইণ্ডিয়া—১১২, ১২৫, ১২২,	ঔ : ওমর সোভানী—১১৭
১৩০, ১৩৮, ১৫৭, ১৫২, ১৬১,	ওল্ড ফিল্ড—২৪
২৫৪	ওয়াডামিলার—১৬৮
ইংলিশম্যান—৫১	ওয়াডেল—২৫৩, ২৭২, ২৮২
ইণ্ডিয়ান ওশিনিয়ন—৬৫, ৬৭, ৮৪	ওয়ায়েল্‌স, এইচ, জি—১৩৬
ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড—১৭৮	ওয়াশিংটন, জর্জ—২৫২
ইলাস্ট্রেটেড উইকলি—১২৬	ওলন্দাজ—৫৭

আমাদের গান্ধিজী

ওয়ার্ধী—১৪৭, ১৪৮, ২২৩, ২২৮,
২৩৮, ২৩৯, ২৪৩

ওয়েষ্ট মিনিটার—১৮৫

—আবি—২৩৫

ওয়াক্ত—১২২

ক : কন্তু রবা—৫৩, ৫৮, ৫৯, ৬৪, ৬৬,
৬৭, ৬৯, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৯,
১৭৪, ১১৩, ১১৭, ১৩৭, ১৪২,
১৪৩, ১৫২, ১২৪, ১২৬, ১২৭,
১২৯, ২০৭, ২২৪, ২২৬, ২৩৪,
২৪২, ২৫০, ২৫৩, ২৬২, ২৬৫,
২৬৬, ২৬৭, ২৭১

কমরুল্লাহ—২৮৯, ২৯০

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়—১৬৪

কবির—১১৯, ২২০

কলেনবেক, হার্মান—৭৮, ৭৯,
৮৬, ৮৮, ২০০

কংগ্রেস—১১৬, ১৩৯, ১৪৪,
১৪৮, ১৫১, ২১৯, ২৪১, ২২০,
২৩১

কলিকাতা—১৪৩, ১৬৪

করপাড়া—২২১

কয়ষেটোর—১২১

কড়াইকুড়ি—১২১

কলম্বো—১৫২

কর্নাটক—২০৬, ২৪১

কাবা গান্ধী—৪, ১২, ২৩৪

কাহু গান্ধী—২৬৫, ২২২

কাকা কালেকার—১৪৭, ১৫২,
২৭৮

কাথিয়াবাড়—১৩, ২১, ২৩৩

কাকিয়াতোলি—২৯০

কাউয়াসজী জাহান্নীর ইনস্টিটিউট—

৫০

কাজির শিল—২২১

করাচি—১৬৫

করাচি—১৭৩

কার্টিয়ার, ম'শিয়ে—২২৬

কাশ্মীর—৩০৩

কালীচরণ ব্যানার্জী, রেভারেণ্ড—

৬০, ১৮০

কায়রো—১৭৬, ১২৯

কাগাওয়া, ডক্টর—২২৭

কাইজার-ই-হিন্দ—১১২

কানপুর—১৫১

কিংসলি হল—১৭৮

কিচলু, ভাক্তার—১১৭

কিপ'লিং—১৩৬

কিশোরীলাল মশরুওয়ালা—১৫২

কুরল্যাণ্ড—৫২

কুড়িয়া মুড়িয়া—১৭০

কুন্তকোনম—১১৯, ৩২১

কুন্তমেলা—২৩

কুমারাপ্পা, জি, সি—১৪৭

কুম্ভকর পাণ্ডে—৬

কুপালনী, আচার্য—৯৮, ১২১,
২৩২, ৩১৯, ৩২৩

কুমদাসজী—১০৫, ১২৫

কুমদাস জাভু—১৪৭

কেথুরী—২৯০

আমাদের শাক্তিকী

- কেশবরাও দেশপাণ্ডে—৫০
 কেপ কলোনী—৫৭
 কেমব্রিজ—১৮৪
 কেপটাউন—৭৭, ৮২
 কেপটাউন যুক্ত হিন্দু সম্মেলন—
 ২০০
 কেলাপ্পন—২০৪
 কেবল—২৪১
 কেলকার—১০৪, ১১৭
 কোর্টস সাহেব—৪৩, ৪৪
 কোদণ্ড রাও, পি—১২৬
 কোরা, টমিকো—২২৭
 কোদাপ্পা—২২৮
 কোচরাব—২৫
 কোহাট—১৩২
 জুগার, প্রেসিডেন্ট—৪৪
 ক্রিপ্স, জার ষ্ট্যাফোর্ড—২৪৫,
 ২৮, ২৮১
 ক্রফোর্ড—১১১
 ক্রকেভিয়া—১৭৬
 ক্যাণ্ডি, মেজর জেনারেল—২৬৩
 ক্রিষ্ণ চন্দ্র নিয়োগী—২৫১
 ক্রেয়ার সেরিডন—১৮৮
 ক্লার্কস ডপ—৮২
 ক্রিমেন্ট এ্যাটলী—২৭২
 : খুরসেদ, শ্রীমতী—২২৪
 খেড়া—১০১, ১০৩
 গ : গঙ্গা—৩০৬
 গঙ্গা প্রসাদ—২৮
 গঙ্গাবেন—১১৩
 গণেশশংকর বিচারী—১১৬, ১৫১,
 ৩০৪
 গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে—২০৬
 গঙ্গাম—৩২০
 গয়ার, জার মরিস—২৩৪
 গিলডার, ডাক্তার—২৬১, ২৬৩
 ২৬৫, ২৭১
 গিলবার্ট মুর—১৮৫
 গিরিজাশঙ্কর বাজপাই—২৬৭
 গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—৬০
 গুর্জর—২০
 গুজরাট—২৪১
 —বিজ্ঞাপীঠ—১৩, ২৭৭
 গুজরাট ওয়ালা—১১২
 গুরুগো—২২০
 গোপালকৃষ্ণ পাথলে—৫০, ৫১
 ৫২, ৬১, ৮২, ৯০, ৯১
 ১০১, ২৬
 গোলাপ মহারাজ—৩০৪
 গোপবন্ধু দাস—১১৬
 গোপবন্ধু চৌধুরী—১১৬
 গোহাটি—১১২, ১৫১
 গোরক্ষপুর—১২২
 গোলাম সেইদাই—১৪৭
 গোবিন্দবল্লভ পঙ্ক—২৩৩
 গ্রিফিথস্—১৩৫
 গ্রীস—২৫২
 গ্যাডগিল, জি, কে—১২৬
 ঘ : ঘনশ্যাম দাস বিরলা—১৭৬, ১৮
 ২
 ঘনশ্যামদাস, শেঠ—২৫৪

আমাদের গান্ধী

চ : চরমগুল—২২১

চম্পারণ—২৭, ৯৮, ১০১, ১১৩,
২৫৪

চট্টগ্রাম—১১২, ১২৪, ১২৬

চাল সটাউন—৩২

চান্দীর গাঁও—২২১

চাঁদপুর—১২৪, ১৪৬

চার্চিল—১৫২, ১৭০, ১৯৩, ২৫১,
২৫৩, ২৬৩, ২৬৪, ২৭৮—৭৯,
৩০২

চার্লি চ্যাপলিন—১৮৬, ৮৭

চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু—১১৬, ১৪৪,
২৬৬

চিত্তর—২২৮

চিয়াংকাইসেক—২৪৪

চীন—২৪৪

চুংকিং—২৪৪

চেষ্টারলেন—৫৫, ৬৪, ১৮৫

চেম্ ফোর্ড, লর্ড—২২, ৯৫

চেয়ারিং ক্রশ—১৭৯

চৈত্রাম গিদোয়ানি—১১৭

চৈতন্যদেব—১৯২, ২২২

চৌমুহানী—২৮৪

চৌপট্টি—৬৪, ১১১, ১২৮

চৌরীচৌরা—১২৯

চৌরঙ্গী—১৬৩

চিত্তাভঙ্গ্য বিসর্জন—৩৪৭

ছ : ছাপরা—২২৬

ছোটানী, সেখ—১১৭

জ : জয়পুর—৬১

জয়প্রকাশ নারায়ণ—২২৭

জহরলাল, পণ্ডিত—১১৬, ১৫৭,
১৬২, ১৬৪, ১৭৪, ২৩৬, ২৩৮,
২৪৪, ২৫২, ২৫৩, ২৯৭, ৩১২,

৩১৭, ৩১৮ ৩২২, ৩২৪

জয়রামদাস দৌলভরাম—১১৭,
১৩৪, ১৬৪, ২৩২, ৩১৯

জব্বলপুর—১৩৯

জগন্নাথদেব—১৪২

জগলুল পাশা—১৭৬, ১৯৯

জগাই মাধাই—১২২

জইলস—১

জাঙ্জিবার—৩৭

জার্মিটোন—৪২

জাগরণী—৮৪

জামসেদপুর—৩১৯

‘জাঙ্গলবুক’—১৩৬

জাব্বির হোসেন—১৪৭

জালালপুর—১৬২

জালিয়ানওয়ালা বাগ—১১২, ৩০৯

জার্মানী—২০০

জিন ডালজিন—২২৬

জিন্না—৯০, ১৫২, ২৩৬, ২৪৬,
২৭৯, ২৮১—৮২, ৩০২

জীবরাজ মেহেতা—৮৯, ২৬৫

জীবনলাল দেশাই—৯৫

জীবন সিং, কর্ণেল—২৮৯

জুনাগড়—১৭

জুল ভার্ণে—১৩৬

জুহু—১৩৮, ১৪৪, ২৪০, ২৭২

আমাদের গান্ধিজী

জুমা মসজিদ—১১০	ডায়ার—১৬৪, ১৮৫
জেন—১৭২	ডিক্রগড়—১১২, ১২২
জেনেভা—১৮২, ২০০	ডিভেলেরা—২৫২, ২৬৪
জেন্টল্যাণ্ড, লর্ড—২৩৬	ডেলি ওয়ার্কার—২৭৩
জেতালপুর—১৬২	—নিউজ—২৮২
জোহানেসবার্গ—৩২-৪১, ৬৫, ৬৭, ৬২, ৭২,—৭৪, ৭৮, ৮২	—হেরাল্ড—১৬৮
জোরোয়াস্তার—৩০০	—মেল—১৭৮
জোড়াপুকুর—১২৭	ডেনিশ মালয়—২০০
জোন্স, মেজর—১৩৪, ১৩৫	ডোক, রেভারেণ্ড— ৭৪, ৭৫
জ্যাক মুভালী—৭৫	‘ড্রপ্ ক্রম দি ক্লাউড্ স’—১৩৬
জীবন পঞ্জী—৩৩১	ঢ : ঢেড়বাড়া—৪২
জি : টেলিগ্রাফ—৭৮—৮১, ৮৩	ত : তমলুক—২৫১
টটেনহাম, রিচার্ড—২৫৫, ২৬০ ২৬১, ২৬৭	তামিলনাদ—
‘টম ব্রাউন্স স্কুল ডেজ’—১৩৬	তাকাওকা, ভাক্তা—২২৭
টাইমস অফ ইণ্ডিয়া—২৪১	তিলক, বাল গঙ্গাধর—৫০, ১৩০, ১৩১, ২২২, ২৬৬
ট্রান্স ভাল—৪৩, ৪৪, ৫১, ৫৭, ৭১, ৭৬, ৭৭, ৮৫, ৮৭	তিরানগামা—১৫৫
‘টিপ টু দি য়ুন’—১৩৬	তেজপুর—১১২
ঠ : ঠাকুর বাপা—২২২	তেজবাহাদুর সাংকর—১৫২, ১৬২, ১২৬
ঠাকুর সাহেব—২৩৪	তোঙ্গট—৮৮
ঠাকুর দ্বারের রাম মন্দির—২০২	তোজো—১২৩, ২৪৮
ড : ডারবান—৩৭, ৬৬, ৬৯	ত্রিপুরা—২৮৩
ডাচ—৫৭	ত্রিছত—২৮
ডায়কলুক—৭৭	ত্রিচিনোপলী—১১২
ডাণ্ডি—৮৭	ত্র্যাঙ্ক রায় মজুমদার—১৭, ২৫
‘ডাক্তার জিকিল এণ্ড মিটার হাইড’—১৩৬	ধ : ধাঘি নাইডু—৭৩
ডালজিয়েন কর্ণেল—১৩৬	দ : দশঘরিয়া—২২২
	দখীচি—৩১৫
	দস্তানে—১৩৫

আমাদের গান্ধী

দালাল, ডাক্তার—১০৫	নন্দিতা কুপালনী—৩২২
দাদী বরোজা—৫৪	নড়িয়াদ—১১১, ১৬২
দাদাভাই নওরোজী—৭১, ১৮০, ২২৪	নবজীবন—১১২, ১৩৮
দাউদ মহম্মদ, শেখ—৭৫	নওগাঁ—১১২
দানিবেন—১০০	নবগাঁ—১৬২
দাণ্ডি—১৬১, ১৬২, ১৬৩, ২০৬	নওজোয়ান সভা—১৭৩
দাস, ডাক্তার—২২৭	নরনারায়ণ মন্দির—২০৩
দাদা আবদুল্লা শেঠ—৩৭, ৪৩	নন্দলাল বসু—২২০, ২২১
দিনশা মেহেতা—২৭২, ৩০৮	নারায়ণ হেমচন্দ্র—২২, ৩০
দিনশা এতুলজী ওয়াচা—৫০, ৫২, ৬০	নাসিক—৩১
দ্বিজেননাথ—২২	নাদির শা—২৮২
দিল্লী—১২৫, ১৩২, ১৬৪, ২৪১	নাদেরী—৫২
দুর্গা—২৫৪	নাগাপ্পান—৭৬
দুর্জয়লিঙ্গ—১৪৪, ১৪৫	নারায়ণ স্বামী—৭৭
দুদাভাই—১০০	নারায়ণ ভাস্কর খারে, ডাক্তার— ১১৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি—২২	নাহাশ, মুস্তাফা, এল—১৭৬
‘দেবী চৌধুরাণী’—২২১	নাহাশ পাশা, মুস্তাফা—১২৮
দেবেন্দ্রনাথ সরকার—২২২	নারায়ণ আগরওয়ালা—২১৮
দেব—১৩৫	নানক—২২০
দেবদাস গান্ধী—১২৬, ১৬৪, ১৭৫, ২০৭, ৩১২, ৩২৩	নারিয়ান—২৩০
দেলাং—২৩১	নাইডু, পি, কে—৮৬
দোরাবজী এতুলজী গিমি—৮	নিউজ ক্রনিকল—১৭০, ২৭২
I : ধরসনা—১৬৫, ১৬৭, ১৬৮	নির্মলকুমার বসু—২৮২, ২২১, ৩০৪
ধর্মবীর—৩১২	নিবেদিতা—৬০
ধোবি তলাও—১২৮	নিউ কাসল—৮৪, ৮৭
II : নর্যদ—২	নেতাল—৪১, ৪৬, ৪৮, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ৬২, ৭০, ৭৫ ১৮৭,
নলিনীরঞ্জন সরকার—২৬৩	নেপোলিয়ন—১১০

আমাদের গাঙ্কিলী

নৈনী—১৬২

নোয়াখালি—২৮৩

নোয়াপাড়া—২৯৫

‘নৌকাডুবি’—১৩৬

গ্ৰামাঞ্চল আইরিশ্ রিপাবলিক

—২০০

প : পরশুরাম—২২১

পয়ধনী—১২৮, ১১১

পঞ্চমজর্জ—১৮৫

পল রবলন—১৮৮

পরশর শাস্ত্রী—১২৮

পট্টিভি সীতারামিয়া, ডক্টর—১১৭,

২৩১

পরকোট—২২১

পদঘাটী—৩২১

পঞ্চাননতলা—১৬৭

পার্ল বার্ক—২৫২

প্যাকেল, স্তার ফ্রডারিক—২৪৭

২৪৮

পাটনা—১১২, ২২৮

প্রাগজী—৭৮

প্রাণজীবন মেহেতা—১৮, ১২

পানিয়াল—২২১, ২২২

পাতঞ্জলি—৬৫, ১৩৫

পালিওয়াল—১১১

‘প্রাচীন সাহিত্য’—১৩৬

পানামা—১৬৭

পূজাভাই হীরাচাঁদ—২৫

পূরী—১৪২

পুষ্কোত্তমদাস ট্যাগুন—১৭৪, ১৭৫

—ঠাকুরদাস—১২৬

পূণা—১২৫, ১২৭, ২০৫, ২০৮

২১২, ২৬২, ২৬৮

পেথিক লরেন্স, লর্ড—২৮১, ২৮২

পেশোয়ার—২৩১

পোলক—৬৮, ৬৯, ৮৭, ৮৮

পোরবন্দর—১৩, ১৪, ৩৪, ৩৬

প্যারিস—১৭৮

প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়—৬০

প্যারিলাল—১৩৮, ১৭৫, ২৭০

৩১৭, ৩২২-২৩

পাঁচগনি—২৭২

প্রহ্লাদ—৩

প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য—৬০, ৬১,

১৬২

—ঘোষ—১১৬

প্রভুদাস প্যাটেল—২৩১

প্রভাশংকর পট্টনি—১৭৬

প্রিটোরিয়া—৪৩, ৫৬, ৬৪,

৭২, ৭৩

প্রমলতা ঠাকুরসী—২০৫

প্রেটো—২৫৪

ফ : ফজলুল হক—২২৭

ফিনিক্স—৬২, ৭৫, ৭৮, ৮১,

৮৪, ৮৮

কিরোজ সা মেটা—৩৫, ৫০, ৬০

৯০, ১৮১

—খান—২৭২

ফোকটোন—১৮২

ফ্রান্স—১৬৭, ২২৪, ২৫২

আমাদের গান্ধিজী

ফ্রিম্যান—১৬৮	বাসন্তী দেবী—১১৭, ১৪৫, ১২৪
ফ্রিডম্যান, মরিস—২২৫	বাটলার—২৬৫, ২৬৭
ফ্রেণ্ডস মিটিং হল—১৭৮	বাবলা—২৫৪
ব : বন্ধিমচন্দ্র—১৩৬	বার্কেনহেড, লর্ড—১২৮
বসন্ত—১৩৬	বার্গার্ড শ—১৮৬-৮৭, ২৬৪, ২৭২
বদরী নারায়ণ—১৬২	বিনোবা ভাবে—১৪৭, ২৩২
বরিলুভি—১৬৭	বিহার—১৪৮, ২৪১
বল্লভভাই প্যাটেল—১০২, ১০৩	বিজ্ঞান কলেজ—১৫৪
১১৭, ১৫৮, ১৭৪, ১২১, ১২৪,	বিষাণ—৩১৬
১২৬, ১২৮, ২২৪, ২৩২, ২৩৪,	বিজয়নগরম্ মহারাজ কলেজ— ৩২০
৩১৭, ৩১৮, ৩২৩	
বরোদা—১১৩, ১৬২	বিরাম গাঁ—২১, ১১১
বরিশাল—১২৩, ১২৪,	বিদ্যুৎ—১০২
বরদৌলি—১২৮, ১৫৮, ১৬২,	বিজ্ঞাপুর—১১৩
২৪২-৪৩	বিঠলভাই প্যাটেল—১১৭, ১৫৮, ১৫৯, ২০৫
বসিফল্লা—২২০	বিখরজন সেন—২২১
বলসুন্দরম্—৪৭, ৪৮	বিবেকানন্দ, স্বামী—৬০
বদরুদ্দীন তায়েবজী—৫০	বিশ্বভারতী—২৪২
বঙ্গবাসী—৫১	বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার—২৬৩, ২৬৪-৬৫, ২৬৮
বলদেব সিং, সর্দার—৩২২	
বাইবেল—১৩৬	বিদর্ভ—২৪১
বাহুল্লা—১৫২, ১৫৬	বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু—২৪২
বারবারা—১৭৬	বীরগুয়ালা—২৩৪
বাকিংহাম—১৮৪, ১৮৫	বীরেশ্বর ঘোষ—৩০৭
বাবুলনাথ—২০২	বুদ্ধদেব—২২, ১১৭, ১৪২, ১৫৪, ২২৮, ৩০০
বাদশাহান—২৩১, ২২৭	
বাংলা—২৪১	বুয়োর যুদ্ধ—৫৭, ৬৪, ৭০, ২৫৮
বাংগালোর—৩২০	বুলার—৫৭
বারানসী—১১২, ৩২০, ৬১	
বাপাত, দেনাপতি ১১৭	

আমাদের পাছিকী

বুর্ক হোয়াইট, মার্গারেট—৩১৭	বাণী—৩৫২-৩৮২
বেভার্লি নিকল্‌স্—২৭৮	—সত্য ও অহিংসা—৩৫৩
বেচারজী—১৫	—ধর্ম ও ঈশ্বর—৩৫৬
বেলেঘাটা—৩০৪	—সমাজ নীতি—৩৬০
বেলগাঁও—১৩২	—বিবাহ—৩৬৪
বেলিয়াল কলেজ—১৮৫	—নারী—৩৬৪
বেলকোর্ড—৮৭	—ছাত্র—৩৬৮
বৈষ্ণনাথ—২৪	—স্বাধীনতার রূপ—৩৭০
বোলপুর—২৭৭	—সং জীবন—৩৭৬
বোথার, জেনারেল—৭৭, ৮৩	—সংবাদপত্র—৩৭৮
বোম্বাই—১১০, ১২১, ১৩৬, ১৬৪	—রাষ্ট্রভাষা—৩৭৮
১৭৪, ২৪১, ৩২০, ৩২১	—আত্মদর্শন—৩৭৮
বোম্বে ক্রনিকল—১১১	—প্রাদেশিকতা—৩৮৬
বোমানজী—১৫২	—ধনিক ও শ্রমিক—৩৮৬
• বোরসাদ—১৬২	—পাকিস্তান—৩৮৭
ব্যাংকার, কর্ণেল—৮২	—দেশীয় রাজ্য—৩৮২
বাঁকীপুর—২২৮, ৩০৩	—সিনেমা—৩৮২
ব্রকওয়ে, ফেনার—২৮৪	ভ : ভবনগর—১৩
ব্রহ্মদেশ—৬১, ১৫৭, ২৪৪, ২৪৮,	ভবানীদাস—
২৫৫	ভগবানদাস—১১৬
ব্রাইটন—২৫	ভগৎ সিং—১৭৩
ব্রিটিশ সোমালিয়াণ্ড—১৭৬	ভাই পরমানন্দ—১১৭
ব্রিনদিসি—১২০	ভারতানন্দ—২২৫
ব্রিষ্টো—২৬৩	ভাইকম—১০০
ব্রমফীল্ড—১৩০	ভাট গাঁ—১৬২
ব্রকলীন—২০০	ভালিয়ামা—৮৪
ব্রেবোর্থ, লর্ড—২২২	ভাণ্ডারী, কর্ণেল—২৬৩
ব্রোচ—১৬২	ভাণ্ডারকর, অধ্যাপক—৫১
ব্র্যাভাট্‌স্কি, ম্যাদাম—২৮	ভাটিয়ালপুর—২২১
	ভাঁসালী, অধ্যাপক—২২৪

আমাদের গান্ধী

ভিক্টর হুগো—২২৬	মজুমদারপুর—২৮, ৩১২, ৩২০
ভিয়েনা—২০৫	মতিহারি—২৮
ভিগি বাজার—১২৭, ১২৮	মদনলাল—১০০
ভিলা লিনেট—১৮২	মহাদেব দেশাই—১০৩, ১৪৪, ১৫২, ১৫৪, ১৭৫, ১৮৭, ১২৪, ১২৬, ১২৮, ২০৭, ২৪২, ২৪৪, ২৫০, ২৫৩, ২৬৬, ২৭০-৭১
ভূলাভাই দেশাই—২০২	
ভুলেশ্বরের রাম মন্দির—২০২	
ভূপাল চন্দ্র কামার—২২১	
ভূপেন্দ্র নাথ বসু—২৩	মধুরা—১১১
ভেঙ্কলায়—৮৮	মহু সুবেদার—১২৬
ভোকশ্রোষ্ট—৮৬, ৮৭	মহা দেবী—২০২
ভোগংকার—১১৭	মহুসংহিতা—২০৮
: মগনলাল গান্ধী—১১৩	মগনওয়াড়ী—২২৩
মতিলাল, পণ্ডিত—১২৬, ১২৯, ১৩৭, ১৫২, ১৬২	মনিবেন প্যাটেল—২৩৪
মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত—১২১, ১৭৪, ১৭৫, ১৯১, ১৯৬, ২১১, ২৬৩, ২৬৭	মহারাত্রী—২৪১
মদনপুরা—১২৮	মহাকোশল—২৪১
মহাভারত—১৩৬	মধুবন—২৫৪
মহম্মদ আলী, মৌলানা—১৩৯, ১৮০	মহাদেব গোবিন্দ স্বাণাডে—৫০
মহার্ণ রিভিউ—১৩৭	মদনজিৎ—৬৭
মহেন্দ্র—১৫৫	মরিৎস্বর্গ—৩৯
মহেশ্বরী, ম্যাদাম—১৮৭	মাধব শ্রীহরি আনে—১১৭, ২০৫, ২০৭, ২৬৩
মনিলাল গান্ধী—৬৩, ৬৪	মাদ্রাজ—১১২
মর্নিং, লর্ড—৭১	মাদুরা—১১২, ২২১
মহম্মদ ইসমাইল—৩১২	মাংগালোর—১৫৬
মতিলাল—২১	মাস'জি—১৭৭, ১৭৮
মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা—২৭	মাতঙ্গী দবে—১৩, ১৬
	মাধব বাগ—২০২
	মার্গারেট সিংগার, মিলেস—২২৭
	মালয়—২৪৮
	মাওলি—২১৮

আমাদের গাঙ্কি

- লেলি সাহেব—১৪
 লেনিন—১৪৩
 লেসিন—১৮২
 লোথিয়ান, লর্ড—২২৭
 লোকনাথ পণ্ডিত—২১২
 নাংকাশায়া—১৮৪
 শ : শঙ্করাচার্য—২২০
 শচীন মিত্র—৩০৬
 শংকরলাল ব্যাংকার—১০২, ১০৩,
 ১২৮, ১৩১, ১৫৫, ১৯৬
 —পারিথ—১০৩
 শংকর রাও দেও—১১৭, ২৩২
 শবরী—১২০
 শাস্তিনিকেতন—২২, ১০১, ১২৭,
 ২২০, ২৪২, ২৭৭
 শা, কর্ণেল—২৬৩
 শা, কে, টি—১৪৭
 সাদুল সিং কবিশের, সর্দার—২০৭
 শিবশর্মা—২৬৫
 শিকাগো—২৮২
 শিরন্তী—২২২
 শিবপ্রসাদ গুপ্ত—১১৬
 শিলচর—১১২
 শুকদেব—১৭৩
 শেঠজী—১৬
 শৈব্যা—৩
 শৈলেন চট্টোপাধ্যায়—২৮৮
 শোলাপুর—১৬৭
 শ্রামজ্ঞান কলেজ—১৩
 শ্রামা প্রসাদ মুখার্জী, ডক্টর—১৫২
 শ্রাংকি, লর্ড—১৮০
 শ্রবণ—২, ৩, ১০
 শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী—২৪, ১১০, ১১৭,
 ১৫১,
 শ্রদ্ধানন্দ পার্ক—১২৩, ১৫১
 শ্রীকৃষ্ণ—২২
 শ্রীকৃষ্ণ সিংহ—২২৭
 শ্রীরামপুর—২১, ২২২
 শ্রীহট্ট—১১২
 শ্রীমদভাগবৎ—১৩৬
 —গীতা—২০৮
 শ্লোকাঙ্ক, জর্জ—১৬৮, ১৬৯
 শ্রদ্ধাজলি—৩২০-৪২১
 —রবীন্দ্রনাথ
 —আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
 —নেতাজী স্বর্গাচন্দ্র
 —আচার্য কৃপালনী
 —পণ্ডিত জহরলাল
 —প্রমথ চৌধুরী
 —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
 —হুমায়ুন কবির
 —মৌলানা মোহাম্মদ আলি
 —এস, এ, ব্রেন্ডি
 —বিশপ হোয়াইট হেড
 —ইউজুক মেহেরালি
 —ডাক্তার পট্টি নীতারামি
 —লালা লজপৎ রায়
 —বোম্বে ক্রনিকল

আমাদের গান্ধিজী

—দি ক্যাথলিক হেরাল্ড অফ
ইণ্ডিয়া

—দি কার্ণাটিক

—জি, এ, নটেশন

—লর্ড লিনলিথ্‌গো

—এম, এল, দস্তওয়ালা

—গগনবিহারী মেহেতা

—কাউন্ট লিও টলষ্টয়

—রোমঁ রোলঁ

—আইনষ্টাইন

—জর্জ বার্ণার্ড শ

—ম্যুরিয়েল লিষ্টার

—জেনারেল স্মাইল

—অধ্যাপক উড

—ডাক্তার ওয়ালার ওয়াল্‌স

—কবি ইয়েট্‌স

—রেভারেণ্ড হোমস

—লয়েড জর্জ

—দি রাইট রেভারেণ্ড হোয়াইট

হেড

—শের উড এডি

—ফুলপ্‌ মিলার

—উইল ছরান্ট

—ব্রাক ওয়াট সন

—কর্ণেল ওয়েজ উড

—বি, ওয়াটসন

—প্রসপার ব্রানেলী

—বেন সি স্প্র

—মস্টেণ্ড

—পার্সিভ্যাল ল্যাণ্ডন

—সি-ই-এম্‌ জোড

—স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরোল

—দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

—লুই ফিসার

—জন গাছার

—হেনরি বর্বাস

—এডগার স্নো

—লে মার্তিন পত্রিকা

—টাইম্‌স্‌

—ব্লাসগো হেরাল্ড

—নিউইয়র্ক হেরাল্ড

শোকোচ্ছ্বাস—৪২২-৪৫৪

—শ্রীঅরবিন্দ

—জর্জ বার্ণার্ড শ

—পার্ল বাক

—টমাসম্যান

—মঁসিয়ে মরিয়াক

—মঁসিয়ে লজিউন

—রেভারেণ্ড জন হোম্‌স

—পোপ

—প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান

—গণজালেজ ভিভেলা

—চিয়াংকাইশেক

—সাও সোয়ে থাইকি

—সিন ওকেলি

—প্রেসিডেন্ট চেকোস্লোভাকিয়া

—ডক্টর এডওয়ার্ড বেনেস

আমাদের গান্ধিজী

- | | |
|--|---|
| <p>—ম্যারিনা স্পিনাবেবেজ
—প্রেসিডেন্ট, সুইস কনফেডারেশন
—প্রেসিডেন্ট লেবানন
—জে, কে, পাসিকিভি
—রাজা যষ্ট জর্জ ও রাণী
—রাজা ফারুক
—রাজা হেইলে সেলাসী
—রাজকুমার, কেউয়া ও হাওয়াই
—দালাই লামা
—সম্রাট হিরোহিতো
—ক্রিমেন্ট এটলি
—রবার্ট গুয়ান
—প্রধান মন্ত্রী, পতু গাল
—ঐ কিনল্যাণ্ড
—ঐ আকগানিস্থান
—হ্যান্স হেডফট
—ম্যাকেন্সি কিং
—হাসিসি
—তেংসু কাঁতায়ামা
—জেসফ চিকলি
—নোকরশী পাশা
—ক্রিসেনানায়ক
—থাকিন সু
—কাউন্ট ফারজা
—পররাষ্ট্র সচিব—ব্রেজিল
—উ-টিন টাট
—আর্নেস্ট বেভিন
—পররাষ্ট্র সচিব, নরোয়ে</p> | <p>—জর্জ বিদো
—জর্জ মার্শাল
—মঁশিয়ে বারোঁ
—লার্টসাহেব, সিংহল
—লার্ট সাহেব, সিয়েরেলিঙ্গ
—বড়লার্ট, হুদান
—জিন্না
—ডক্টর জোসেফ ডেভিড
—প্রোফেসর তুরস্ক পরিষদ
—হার্বার্ট মরিসন
—এ, ভি, আলেকজান্ডার
—লর্ড পেথিক লরেন্স
—লর্ড লিষ্টওয়েল
—লিওপোল্ড আমেরী
—উইনস্টন চার্চিল
—স্যার ষ্ট্যাকোর্ড ক্রিপ্স
—মঁশিয়ে লিং ব্রুম
—ডাক্তার খানসাহেব
—লর্ড লিনলিঙ্গো
—লর্ড হ্যালিফাক্স
—স্যার জি কেসী
—জেনারেল স্মাইল
—ইমন ডি ভেলেরা
—মিসেস রুজভেল্ট
—ডক্টর চু চিয়া হুয়া ও ডক্টর তাই চি তাও
—আগা খাঁ
—ডক্টর হিউলেট জনসন
—মিস্টার ল্যান্ডারাস
—ষ্ট্যানলি জোনস</p> |
|--|---|

আমাদের গান্ধিজী

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| —রেজিনাল্ড সোরেনসেন | —জেনারেল মাকনটন |
| —নাহাশ পাশা | —ডক্টর জোসি অকি |
| —আজম পাশা | —ভাসিলি তারালেস্কু |
| —রজনী পাম দত্ত | —ফারী এল খোরী |
| —ডক্টর মোহম্মদ হাতা | —লিন উ তাং |
| —এডওয়ার্ড ফেলান | —কামিল চন্দরজী |
| —ডাক্তার ইউসুফ দাহ | —ডক্টর সৈয়দ হোসেন |
| —জে, ডবলু গডফ্রে | —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| —ডাক্তার জি, এম নাইকার | —তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় |
| —উইলিয়াম ফিলিপ্‌স | —বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় |
| —আমেদ বেলাক্রেত | —নির্মলকুমার বসু |
| —পি সি যোশী | —দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার |
| —কাবুল উপজাতি সদার | —যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত |
| —খান আবদুল গফফর খাঁ | —কালিদাস রায় |
| —চৌধুরী আকবর খান | —ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় |
| —শ্রীমতী গ্রেস ক্রোজিয়ার | —সুনির্মল বসু |
| —দক্ষিণ আফরিকা নিক্রিয় | —বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় |
| প্রতিরোধ কণ্ঠি | —হাট্ট সংবাদপত্র সমূহ |
| —ট্রেড ইউনিয়ন | —লাইফ |
| —নেতাল ভারতীয় সমিতি | —বালটিমোর সান |
| —ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি | —সানফ্রানসিস্‌কো ক্রনিকিল্ |
| —ব্রিটিশ রেসিডেন্ট | —নিউইয়র্ক ডেলি নিউজ |
| —তিব্বতের রিজেন্ট | —ঐ ঐ মিরর |
| —জেনারেল ম্যাক আর্থার | —লণ্ডন টাইমস্ |
| —লাজানফ | —সানডে টাইমস্ |
| —ফিলিপ্‌ নোয়েল বেকার | —ইয়র্কসায়ার পোস্ট |
| —সিনেটর ওয়ারেন অস্টিন | —ডেলি ওয়াকার |
| —গ্রামিকো | —ঐ হেরাল্ড |
| —তুনিল | —টেলিগ্রাফ |
| —ডাক্তার টি সিয়াং | —ডয়েটল্যাণ্ড |
| | —ভারবার্ণ |

আমাদের গান্ধিজী

- সবোডনে নভিনি
—ভিয়ারিও দামানা
—এল কমাসিও
—আলকোংলা
—ভেমোক্র্যাট ইরান
—ষ্টেট টাইমস
—সিংহল টাইমস
—নিউ লাইট অফ বর্মার
—বার্মিজ রিভিউ
—পাকিস্তান টাইমস
—ডন
- ষ : ষ্টেপ এসাইড—১৪৪
- জ : সরোজিনী নাইডু—২০, ১১০, ১১৭
১৬৭, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৮৭, ১৯৪, ২৫৩
২৬২
সবরমতী—২৫, ১০১, ১০৫, ১৩১,
১৫০, ১৫২
সর্বোদয়—১১০
সত্যপাল, ডাক্তার—১২১
সসারায়—১২১
সরস্বতী—১৩৬
সমালোচক—১৩৭
সতীশ দাসগুপ্ত—২৮৪, ২২১
সফ্রেটিস—২৫৪
সাহারানপুর—২৩
সাকাহানাবাদ—১৩২
সাতারা—১৫৪
সাইমন, জন—১৫৬, ১৫৭
- মাণ্ডাস—১৭৩
মাউদামটন—১৮
মাধনেন্দ্র মিত্র—২৯২, ৩০৪
মানে গুরুজী—৩২১
মালেয়—২২৮
সিংহল—১৫২, ১৫৬, ২৫৫
সিটি অফ বরোদা—১৭৬
সিন্ধু—২৫২
সীমান্ত প্রদেশ—২৪১
সুভাষচন্দ্র, নেতাজী—১১৬, ১৫৭,
১৭৩, ১৯১, ২০৫, ২৩১, ২৩২
সুবার্ট—১৬২
সুযাত্রা—১৬৭
সুভাষপ্যাম, কে, আর—৩২০
সুভাষনিয়ম, ডাক্তার—৫১
সুরেন্দ্রনাথ দাসপাধ্যায়—৫১
সুশীলা পা—২৯১
সুধীরচন্দ্র লাহা—২৯২
সুয়াবদী—৩০৪
সুশীল দাসগুপ্ত—৩০৭
সুচেতা কপালনী—৩২২
সুশীলা নায়াব—২৫৩, ২৫৫, ২৭১
২৯১, ২৯২
সেহুন হাসপাতাল—১৩৮, ২০৮
সেন্ট জেমস—১৭০, ১৭৮
সেন্ট লেজার—১৮২
সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল—২৩৫
সেবাগ্রাম—২২৩, ২২৫, ২৮৪
সৈয়দ মামুদ—২৮২
সোদপুর—২৭৫, ২৮৪, ৩০৪

আমাদের গান্ধিজী

সোরাবজী সাপুর্জী—৭৬

সৌরীন্দ্র কুমার বসু—২৯১

সৌরাষ্ট্র—১৬৫

স্যাডলার, মাইকেল—১৮৫

স্বরূপরাণী নেহেরু—১১৭, ১২৭

স্মার্টস্—৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮৩

৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ২৫২

স্বতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩০৭

ষ্টানডারটন—৪০, ৮৬

ষ্টেটসম্যান—৫১

সাময়িক পত্রের সম্পাদনা—৩৪৬

হর্নিম্যান—১১২

হাবিব, শেঠ হাজি—৭৭

হার্ডিঞ্জ, লর্ড—৮৮, ৯৫, ১০০

হাবড়া—১৬৭

হাজারিবাগ—২৩০

হামবুর্গ শাস্তি সংঘ—২০০

হাজি মোহম্মদ হাজি য়ুসব—৪৪

হিন্দু স্বরাজ—১১০

হিন্দুচীন—২৪৮

হিটলার—১২৩, ২৩৫, ২৬৮-৩৯,

২৪১, ২৪৮, ২৯৬

হোমস্, রেভারেণ্ড জন হেইনস্—

১৫১, ১৬২, ২০০

হ : হরিশ্চন্দ্র—৩, ১০

হরিলাল গান্ধী—২৬৫, ৬৯

হজরৎ মোহম্মদ—২৯৫, ৩০০

হরবং সিং—৮৭

হরদয়াল নাগ—১২৯

হট্টল—১৫৩

হরিভাই দেশাই—২৫৪

হরিজন—২৫১

হরিদ্বার—৯৩, ৯৪

হংস মেহেতা—১৯৬

হোর, স্যার স্যামুয়েল—২৩৬

হোমি মূদী—২৬৩

হৃষিকেশ—৯৪

হৃদয় নাথ কুঞ্জ—১২৬

হস্তাক্ষর—৩৪৯-৩৫১

—বাংলা

—ইংরাজী

—হিন্দী

যে সব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি :

- মহাদেব দেশাই অনূদিত 'অটোবায়োগ্রাফি'
সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনূদিত 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যগ্রহ'
ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া লিখিত 'হিট্টি অফ্ কংগ্রেস'
সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনূদিত 'স্বাস্থ্যরক্ষা'
ফ্রেণ্ড্‌স্ এণ্ড ফো সম্পাদিত 'এম, কে, গান্ধী'
সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনূদিত 'য়েরোডা জেলের অভিজ্ঞতা'
রোমঁ রোলঁ লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী'
কৃষ্ণদাস লিখিত 'গান্ধিজীর সঙ্গে সাতমাস'
মহাদেব দেশাই লিখিত 'সিংহলে গান্ধিজী'
যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'
হেমেন্দ্রলাল রায় অনূদিত 'বিলাতে গান্ধিজী'
বি, সেনগুপ্ত ও আব চৌধুরী সম্পাদিত 'মহাত্মা গান্ধী'
হেমেন্দ্রলাল রায় অনূদিত 'বিলাতে ভারতের দাবী'
প্যারীলাল লিখিত 'এপিক ফাট'
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্পাদিত 'গান্ধিজী জয়ন্তী'
হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'বেসিক গ্যাস সাল এডুকেশন'
লুই ফিশার লিখিত 'গান্ধিজীর সঙ্গে সাতদিন'
প্রভাত বসু লিখিত 'গান্ধিজীর গল্প'
যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী'
বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত 'মহামানব মহাত্মা'
রমণী রঞ্জন গুহরায় লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী'
মহীতোষ রায় চৌধুরী লিখিত 'গান্ধিজীর তিরোধান'
গোপালচন্দ্র রায় লিখিত 'মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান'
হুকুমার রায় লিখিত 'সীমান্ত গান্ধী'
মুবারক সিং লিখিত 'মহাত্মা গান্ধীজ্ কনফেসন'
দুর্লভ সিং লিখিত 'রিবেল প্রেসিডেন্ট'
হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'গান্ধিজীকে জানতে হলে'
কৃষ্ণা হাথিসিং লিখিত 'কোন খেদ নাই'
ঋষি দাস লিখিত 'আবুল কালাম আজাদ'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী' ও 'সংস্কৃতি'
 আর, এন, খান্না লিখিত 'গান্ধিজীম্ ফাইট কর ফ্রীডম্'
 স্বকুমার রায় লিখিত 'নোয়াখালিতে মহাত্মা'
 কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'মহাত্মা'
 শৈলেশ বসু লিখিত 'মহামানব'
 কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'তুমি মহাত্মা'
 তেওলসকার, চলাপতি রাও, মুচুলা সরানাই ও বিঠলভাই ঝাভেরী সম্পাদিত
 'গান্ধিজী'

হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত লিখিত 'দেশবন্ধু স্মৃতি'
 স্বরেন্দ্রচন্দ্র ধর লিখিত 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন'
 কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'
 ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত 'দাদু'
 খাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত 'আশ্রম ভজনাবলী'
 রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'নেতাওকী কলমসে'
 ধর্মপদ

শ্রীমৎভগবদ্গীতা

হরিজন পত্রিকা

শনিবারের চিঠি—গান্ধী সংখ্যা

মাসিক বহুমতী—গান্ধী সংখ্যা

সাপ্তাহিক দীপালী

সাপ্তাহিক দেশ

দৈনিক যুগান্তর

আনন্দ বাজার পত্রিকা

কিশোর এশিয়া

মানাভাবে বাঁরা সাহায্য করেছেন :

ছাপার কাজে : 'মাসপয়লার' সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

দীপালীর সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছবি সম্পর্কে : 'নূতন পত্রের' সম্পাদক স্বধেন্দুবিকাশ সেনগুপ্ত

'শিশুসাথীর' হরিশরণ ধর

মানচিত্র সম্পর্কে : শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

সঙ্কলন সংকলন করেছেন : সন্তোষকুমার মাজি

গান্ধিজীর বাণী প্রকাশের অহুমতি দিয়েছেন : নবজীবন ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষ

রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রকাশের অহুমতি দিয়েছেন : বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ

—এঁদের সকলের কাছেই লেখক কৃতজ্ঞ।

mkfandhi
?



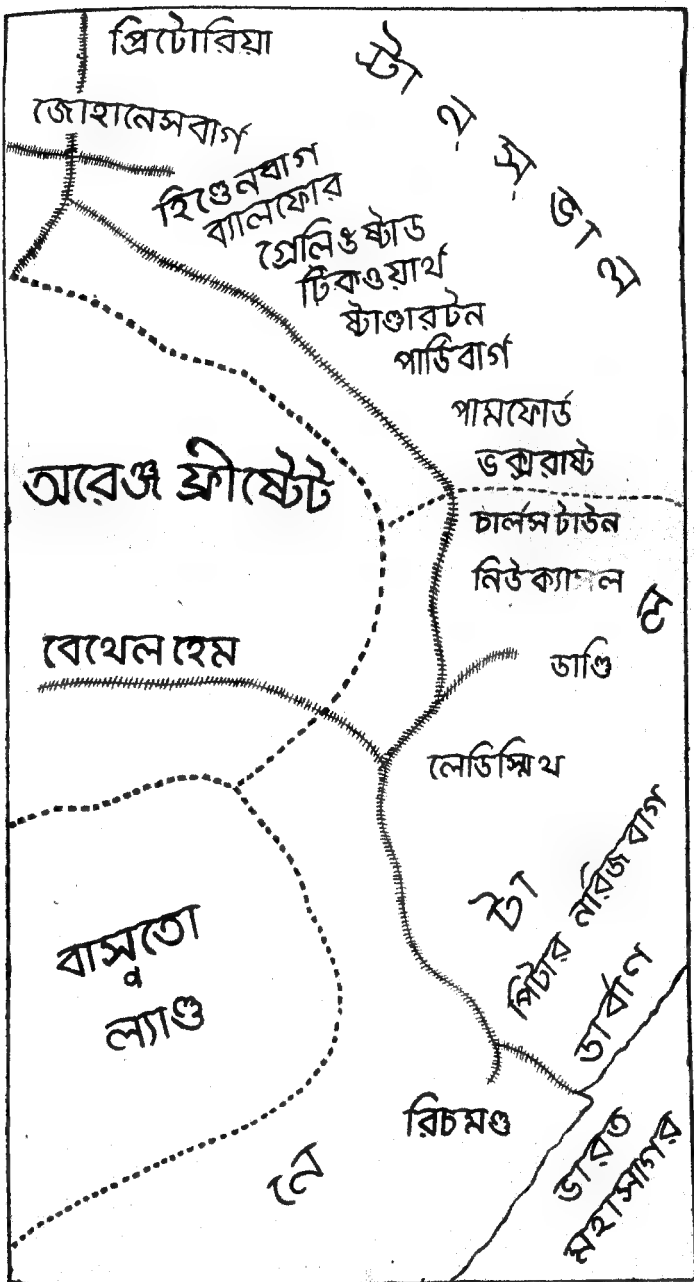
গান্ধিজীৰ পিতা কৰমচান্দ



গান্ধিজীৰ অশ্রম



দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়-এম্বুলেন্স বাহিনী



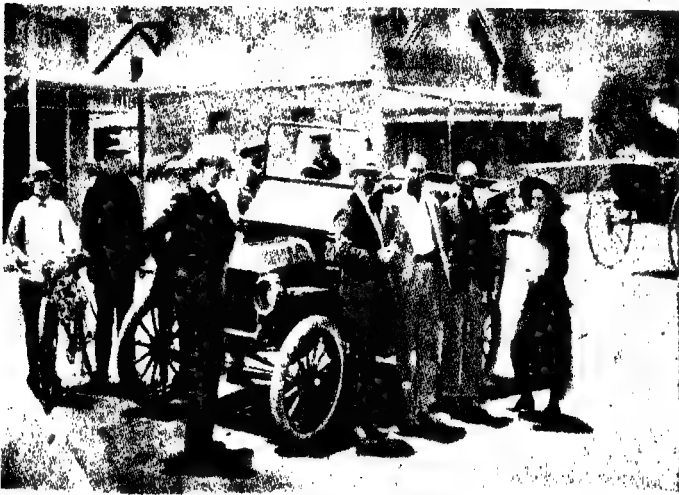
ডাবলিন থেকে প্রিটোরিয়া



উজ্জ্বল ফার্ম গাছিকী



দক্ষিণ আফ্রিকার সভাপতি অভিযান



পাকিস্তানের গ্রেপ্তার



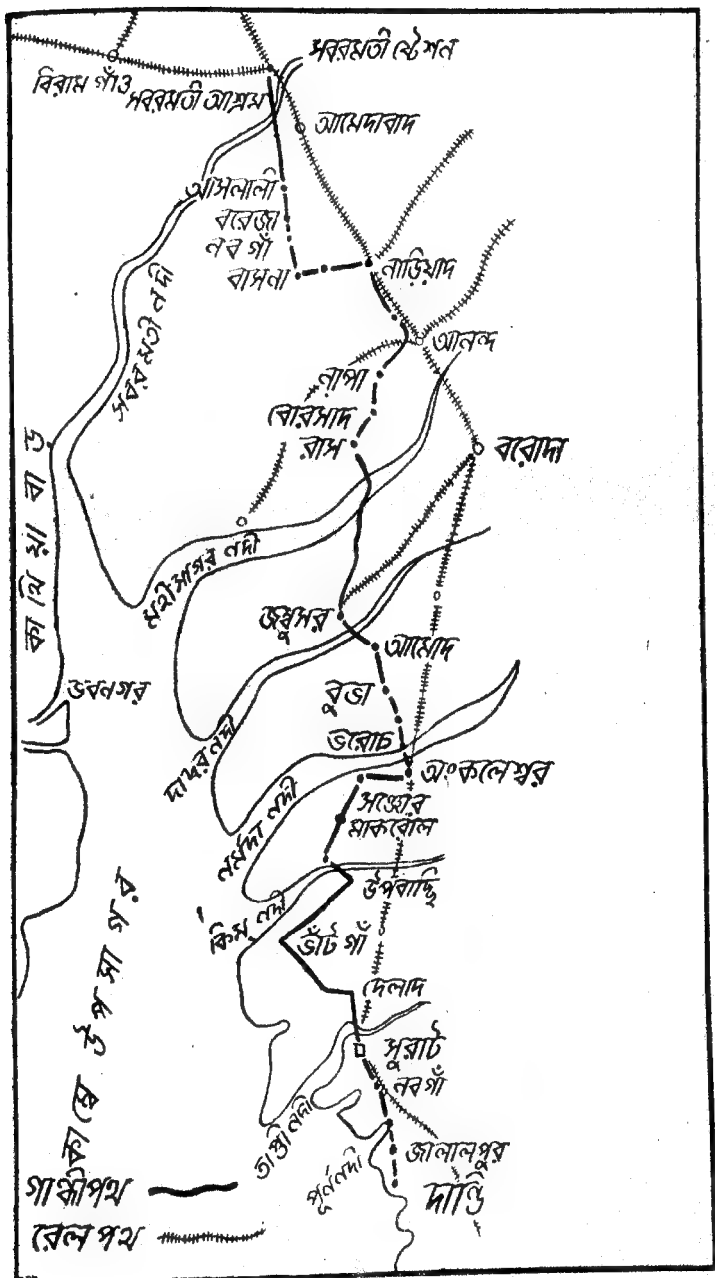
শান্তিনিকেতনে বদৌলতকামে

Dear Mr. Gandhi,

That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India has given me real pleasure - and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our

boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Shanti Niketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the stodhara of both of our lines.

Very sincerely yours
Rabindranath Tagore,



ସବରମତୀର ଥେକେ ନାଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର



সেবাগ্রাম আলম

To the people of Madras
I have made myself
acquainted with your condition
to the extent it was possible
without a local visit. I
think my congratulations
for your courage and patience
with which you have borne
your sufferings out. Your
sufferings will be born
a new nation pulsating
with life. Earthly possessions
are no compensation for loss
of ~~the~~ liberty. It is a matter of
joy that you have preferred
deprivation of these to
that of your liberty. I hope
you will not neglect the study
of manufacturing free
salt.

Allahabad Mr Gandhi
2.2.31

মেদিনীপুরবাসীর প্রতি বাণী



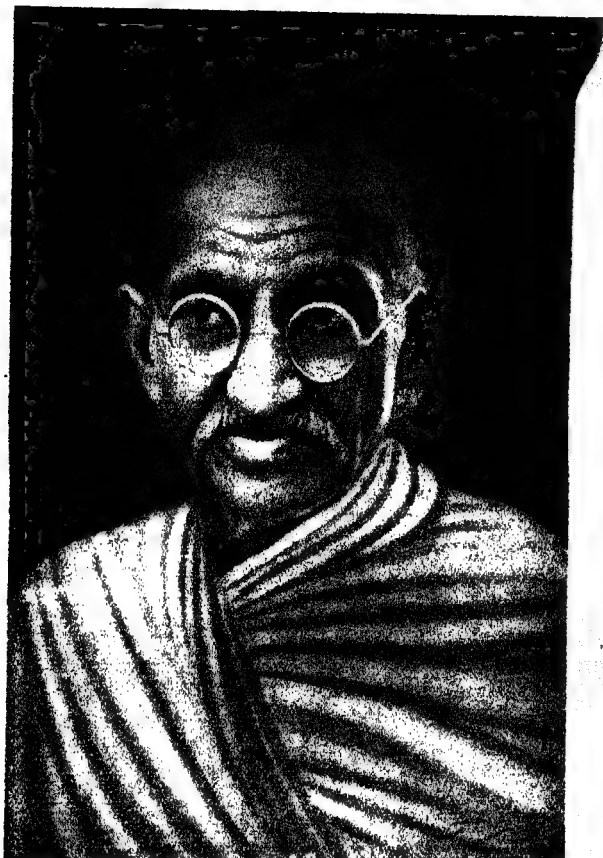
দাণ্ডি-অভিযান





রাজপুতানা জাহাজের শিশু বন্ধু





৬২ বৎসর বয়সে





ବୀର୍ଜି ବାପଜିନ ଓ ସହାୟା ଗାନ୍ଧୀ



মহাদেব দেশাই ও গান্ধিজী :







গান্ধিজী • মুলতান সাবিয়া





गङ्गाजी • बाकिन्



ମାଙ୍କିକା ଓ ଡିସାର କାହିଁକି







মাদ্রিডী ও নর্ড পেমিক নরেন

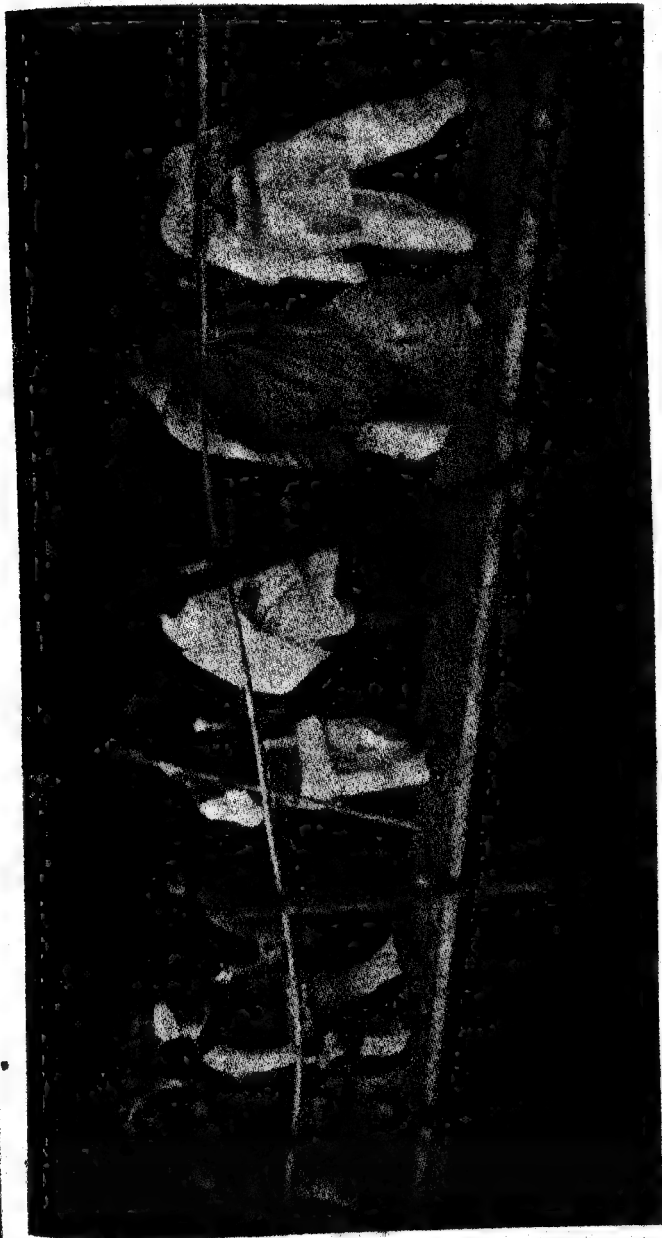


মাদ্রিডী ও মাদ্রিডেয়াটিন



গান্ধী ও স্বভাষচন্দ্র

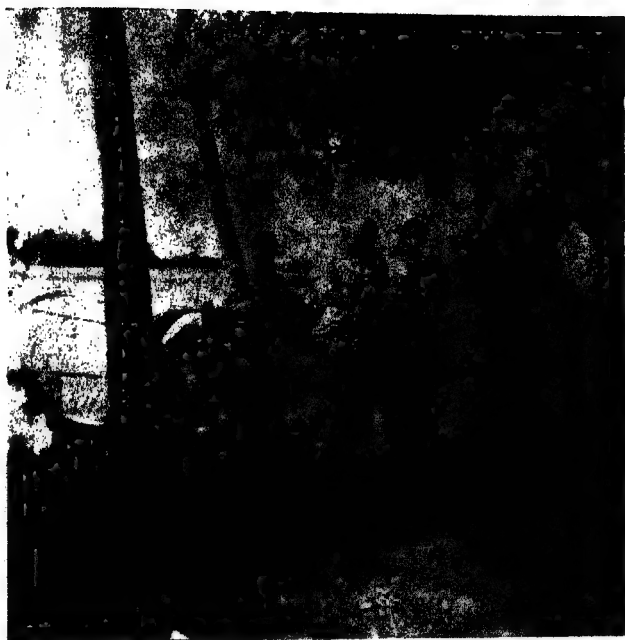




বামধুন গাহিতে গাহিতে গাক্জিও বাণের সাক্ষে। পায় হইতেছেন

নোয়াখালির-আতুতক দুহর ও গাফিলী





সচেতা কুশালনী, সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, পিয়ারীলাল
আভাগাঙ্কীর সহিত রামগঞ্জের নৌকাঘাটে

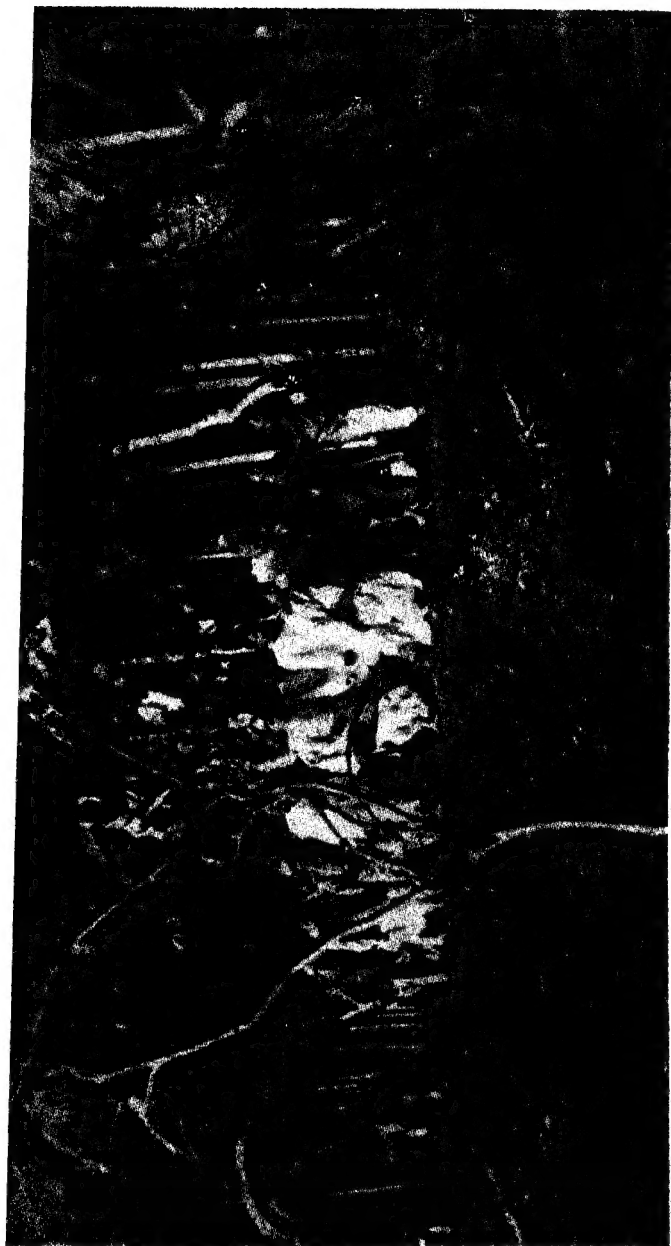


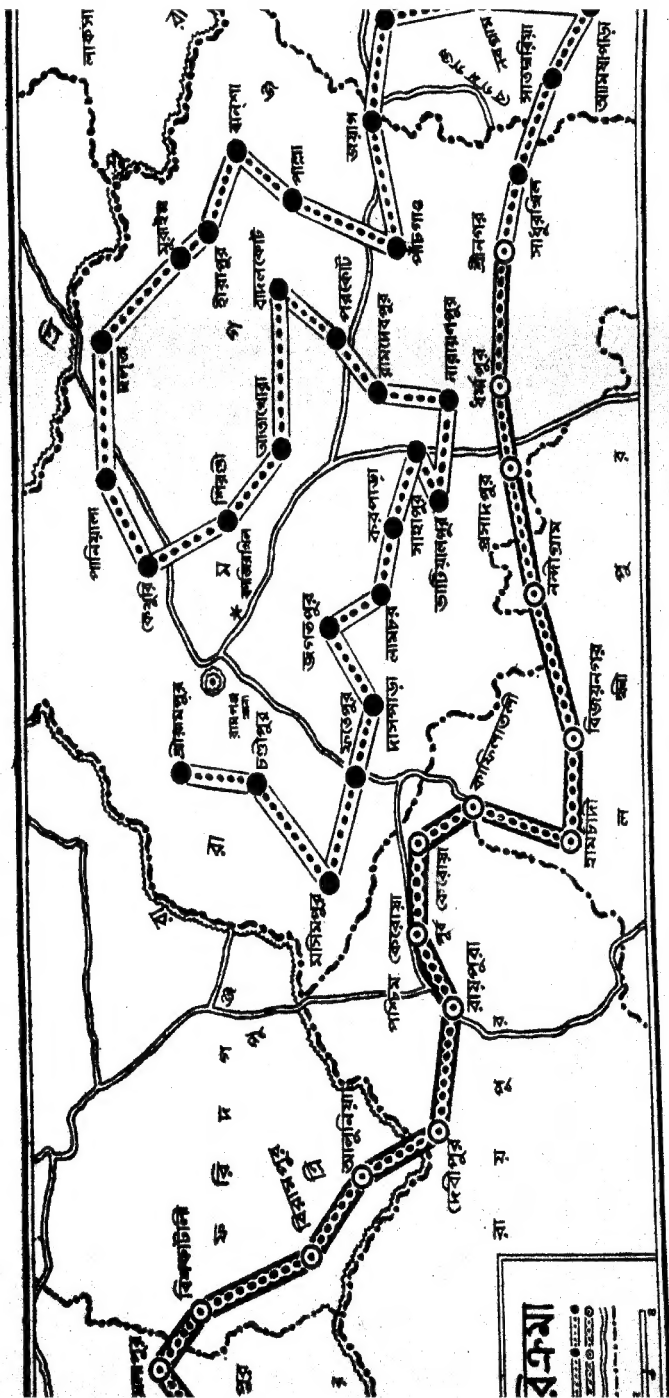




নোয়াখালির কিশোর বন্ধু

নোয়াখালির অকনোপথ





নোয়াখালির মানচিত্র

বিক্রয়

১৯২২ ০ ১১১১
১৯২৩ ০ ১১১১
১৯২৪ ০ ১১১১
১৯২৫ ০ ১১১১



